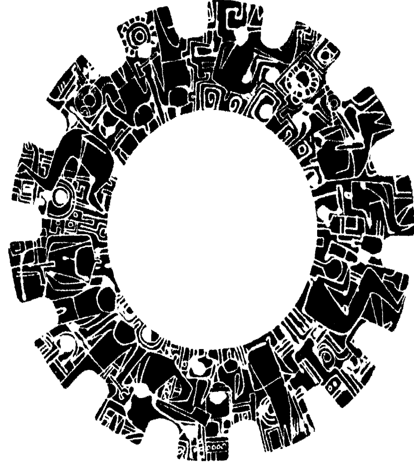
লক্ষ্মীর কৃপালাভ বাঙালীর সাধনা

লক্ষ্মীর কৃপালাভ

বিশ্বকর্মা



বাঙালীর সাধনা

পুস্তক বিপণি ॥ ২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৯

প্রকাশক :
শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ :
খালেদ চৌধুরী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ইম্প্রেসন হাউস
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক :
পি. আর. এস.
দি সরস্বতী প্রিন্টিং. ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা ৭০০০০৬

স্বর্গীয় পিতৃদেবকে
এবং
আমার কৃতীপুত্র
স্বর্গীয় অরুণেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল'কে
যাঁরা দুজনে মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্যে
এ বই দেখে যেতে পারলেন না।

মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ



১৪ই জুলাই, ১৯৬৯

ভূমিকা

বর্তমান বই-এ সঙ্কলিত বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি পড়ে আমি আনন্দিত হয়েছি। বিশ্বকর্মা ছদ্মনামের আড়ালে লুকিয়ে থেকে যিনি এগুলি লিখেছেন তিনি শুধু যত্ন ও পরিশ্রম-সহকারে তথ্য সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত হন নি—রচনাগুলিকে সাহিত্য-গুণান্বিত করে তুলতেও পেরেছেন। আলোচ্য বিষয়ে এমন সরস ও তথ্যগর্ভ রচনা ইতিপূর্বে আমার চোখে বিশেষ পড়ে নি।

বাঙ্গালীর ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে এ বইটি যে সময়োপযোগী প্রকাশন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্তমান যুগকে নিঃসন্দেহে বৈশ্যযুগ বলা চলে এবং এযুগে ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ ছাড়া ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত উন্নতিসাধনের অন্য কোন উপায় নেই। বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন—এটি আমাদের দেশেরই সুপ্রাচীন উক্তি হলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালী যুবসমাজের দীর্ঘদিনের অনীহা অনেক দুঃখের কারণ হয়েছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর বলিষ্ঠ কর্মাদর্শে বহুপূর্বেই আমাদের এ দুঃখ দূর করার পথ নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর সে প্রয়াস যে একেবারে ব্যর্থ হয় নি আলোচ্য বই-এর কাহিনীগুলি তার প্রমাণ। এ বই-এ বাঙালী পরিচালিত বিভিন্ন শ্রেণীর যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিবরণ আছে তাদের অনেকগুলিরই উদ্ভব হয়েছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রেরণায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন কোন ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতে বাঙ্গালী পথিকৃৎ-এর মর্যাদাও দাবী করতে পারেন। তবু আজ আমরা নানা কারণে সর্বভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছি। এ অবস্থার প্রতিকার করতে না পারলে আমাদের ব্যাপক বেকার সমস্যা দূর করাও সম্ভব নয়। ব্যবসা করতে গেলে যেসব গুণের প্রয়োজন, যেমন সততা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, সংগঠননৈপুণ্য, কঠোর পরিশ্রম প্রভৃতি, বাঙ্গালীচরিত্রে তারও যে অভাব নেই সে পরিচয় এ বই-এর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। বইখানি বাঙ্গালী যুবসমাজের মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিতে সহায়তা করবে বলে আমার ধারণা।

আমরা বাঙলা দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার প্রয়াস করছি। সে প্রয়াসে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার অত্যাবশ্যক। বিশ্বকর্মারচিত এ বই বাঙ্গালী তরুণ সমাজকে নতুন করে ব্যবসা-বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধ করে তুলুক এই আমার কামনা। দেশের কল্যাণকামী মানুষ এ বই-এ নতুন চিন্তার খোরাক পাবেন। নির্দেশ-গ্রন্থ হিসাবেও এ বইখানির মূল্য হবে বলে আমি আশা করি। বইখানির বহুল প্রচার হলে লেখকের পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সদুদ্দেশ্য সার্থক হবে।

শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

(অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়)

পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রী

গ্রন্থকারের নিবেদন

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শংসাপত্রের পরে আমার মতো সাধারণ লেখকের পক্ষে আবার একটি মুখবন্ধ রচনা আপাতদৃষ্টিতে নিষ্প্রয়োজন। শুধুমাত্র সংক্ষেপে কৃতজ্ঞতা স্বীকারই আমার পক্ষে যথাযথ হতো; কিন্তু তা সত্ত্বেও ভূমিকা হিসেবে কিছুটা সংযোজন প্রয়োজন।

আমার বক্তব্যের মূল কথাগুলিই মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তাঁর অনবদ্য ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তবে, তাঁর পত্রের প্রথম অনুচ্ছেদে কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি প্রকাশ পেয়েছে। আমার রচনাশৈলীর বিষয়ে যে প্রশংসা তিনি করেছেন আমি নিজেকে তার যোগ্য মনে করি না। যাহোক, এই প্রশংসা আমার মতো ক্ষুদ্রব্যক্তির পক্ষে লক্ষ্মীর কৃপালাভের চাইতে বড়।

কিছুদিন আগে লোকসভার প্রসিদ্ধ বামপন্থী সদস্য শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি শ্রী এস. এম্. ব্যানার্জি, এম. পি, এই নামে সাধারণ্যে খ্যাত) মহাশয়ের কাছ থেকেও 'দেশ' সম্পাদক মহাশয়কে লিখিত অনুরূপ একটি পত্র পেয়ে আমি কৃতার্থ বোধ করেছিলাম। তিনি লিখেছিলেন : "...'বিশ্বকর্মা' ছদ্মনামে 'লক্ষ্মীর কৃপালাভ : বাঙালীর সাধনা' ও 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' ধারাবাহিক বাঙলার শিল্প-বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত সফলতার ঘটনাবলী বেশ কিছুদিন যাবং বের হচ্ছে। ইহা যেমন আকর্ষণীয় তেমনই সময়োপযোগী। আপনার এই প্রচেষ্টা বাঙলার জীবনে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা আনবে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে—আশা করি।...বলা দরকার, আমি প্রবাসী বাঙালী। জন্ম, শিক্ষা এবং চাকুরী সবই বাঙলার বাইরে। তবুও বাঙলা আমার আত্মার কেন্দ্রবিন্দু।...যে মহান ব্রত বিশ্বকর্মার মাধ্যমে শুরু করেছেন সর্বান্তঃকরণে তার সাফল্য কামনা করি। বাঙালীকে বাঁচতেই হবে, সারা ভারতের কল্যাণের জন্য। বাঙালী যদি আবার শিল্প-বাণিজ্যে মন দেয়—বলিষ্ঠ মন নিয়ে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারবেন। আপনাদের 'বিশ্বকর্মা'র লেখনী এ বিষয়ে যথেষ্ট উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারবে এত নিরাশার মাঝেও। আজ চাকুরীর পিছনে না গিয়ে—বাঙালী যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে চলে—আপনাদের যোগ্য নেতৃত্বে—আমি মনে করি আগামী দিনে বাঙলা চঞ্চলা লক্ষ্মীকে করায়ত্ত করতে সক্ষম হবেন। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও আশা করি 'বিশ্বকর্মা' তাঁর সুনিপুণ লেখনী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে চালিয়ে যাবেন যতদিন না বাঙালীরা মোহমুক্ত হন।"

এই দুই বিশিষ্ট নেতার পরেই যাঁরা আমার ধন্যবাদার্হ তাঁরা হলেন 'দেশ' পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ। আমার লেখা তাঁদের ভালো লেগেছিল বলেই আমি ধারাবাহিকভাবে বহুকাল

সেই পত্রিকায় লেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। সে-ও আমার এক পরম লাভ এবং সম্ভবত সবচেয়ে বড় লাভ।

এই বহুমুখী কৃপালাভের মূলে আছেন 'দেশ' পত্রিকার শ্রীসাগরময় ঘোষ। আমি যে লিখতে পারবো এবং শিল্প-বাণিজ্যের মতো নীরস বিষয়ে আমার এযাবৎ অনভ্যস্ত লেখনী থেকে সকলের পাঠের উপযুক্ত কিছু কোনোদিনও নিঃসৃত হবে, এই অনুমান তিনি যে কেমন করে করলেন তা তিনিই জানেন।

বহুকাল ধরে তিনি অনেক ভীরু নবীন লেখক-লেখিকাকে নেপথ্য থেকে প্রকাশ্যে উপস্থিত করে পাঠক সমাজকে নন্দিত করে এসেছেন; কিন্তু আমার মতো পরমভীরু, লেখক সম্প্রদায়ের বহির্ভূত, এক প্রবীণকে দিয়ে কলম ধরানোর উদাহরণ তাঁর পক্ষে বোধহয় এই প্রথম। শুধু তাই নয়, ১৯৬৮-৬৯ সালে বৎসরাধিক কাল তিনি নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে আমার প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

সাতষট্টি সালের দুর্গাপুজোর আগে 'দেশ' অফিসে বসে সাগরময়ের সঙ্গে কথোপকথন কালে তিনিই 'লক্ষ্মীর কৃপালাভ : বাঙালীর সাধনা' ফীচারে কয়েকটি প্রবন্ধ আমাকে দিয়ে লেখানোর প্রস্তাব করেন। একথাটা বোধহয় তাঁর এইজন্য মনে জাগে যে, আমি আকৈশোর কলকাতার শিল্প-বাণিজ্য মহলে ঘোরাফেরা করেছি, এ-ব্যবসা সে-ব্যবসা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি এবং লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী দুজনেরই কৃপালাভ করেছি—দ্বিতীয়ারই বেশি। অভিজ্ঞতা শব্দটির চলতি ভাষায় সংজ্ঞা হলো 'ভুল করে, ঠেকে শেখা'। সেদিক দিয়ে আমি এক পরম অভিজ্ঞ পুরুষ। এমন একটি লোক, যে বাঙালীর ব্যবসার ভালোমন্দ দুটি দিকই দেখেছে, তাকে দিয়ে লেখালে রচনাগুলি তত্ত্ব ও তথ্যগর্ভ হতে পারে—এই চিন্তাই সম্পাদককুলের অন্যতম নায়ক সাগরময়কে উদ্বুদ্ধ করেছিল বলে আমার দৃঢ় ধারণা।

কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়্যাল ম্যাগাজিন হলে এক কথা ছিল, 'দেশ'-এর মতো উচ্চমার্গের সাহিত্য পত্রিকাতে বাঙালীর শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রবন্ধ লেখার মতো দুরূহ কাজ হাতে নিতে আমার মতো নিতান্ত অনভিজ্ঞ লেখকের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছিল। তিন মাসের সময় চেয়ে আমি সাগরময়কে বলে এসেছিলাম, চেষ্টা করে দেখবো।

আটষট্টির গোড়ায় যখন লেখা আরম্ভ করি তখনো আমি ঠিক করে উঠতে পারিনি যে, কোন্ সুরে কোন্ ভঙ্গিতে লিখলে 'দেশ' পত্রিকার অগণিত পাঠক-পাঠিকার কাছে বাঙালীর এই প্রকাণ্ড দিকটিকে, বাঙালীর জীবন-মরণ সমস্যাকে রূপায়িত করতে পারবো। সেইজন্যে আমার প্রথম দিকের লেখাগুলিতে অস্বাচ্ছন্দ্য ফুটে উঠেছে, এই আমার ধারণা। যতটা লিখতে চেয়েছি—বাঙালী মালিকানায় বাঙালী পরিচালনায় শিল্প-বাণিজ্যের কথা ও কাহিনী বাঙালীকে এবং বাঙলাভাষীকে যেভাবে জানাতে চেয়েছি—তার প্রকাশ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যাই হোক, মাঝে মাঝে সাগরময়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ধীরে ধীরে আমি আমার বাঞ্ছিত পথে এগোতে পারলাম। সেইজন্যে প্রবন্ধগুলি 'দেশ' পত্রিকায় যেভাবে, যে তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল মোটামুটি সেটাই এই গ্রন্থেও বজায় রাখলাম, কারণ এই পারম্পর্য, এই বিন্যাস থেকে গ্রন্থের পাঠক বুঝতে পারবেন 'হাউ দ্য হোল থিং টুক শেপ'।

প্রকাশনায় একটি গলদ রয়ে গেল। যাঁদের সম্বন্ধে লিখেছি নানা কারণে তাঁরা সকলে আমাকে সময়মতো ছবি কিংবা ব্লক দিতে পারলেন না, যাতে চল্লিশটি প্রতিষ্ঠানের ছবিই ছাপাতে পারি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছবি ছাপাবার অনিচ্ছাও প্রকাশ পেলো। আরেকটি কথা হলো এই যে, 'দেশ'-এ প্রকাশিত ছেচল্লিশটি প্রবন্ধের মধ্যে চল্লিশটির বেশি এই বইয়ে ধরানো গেল না। ভেবেছিলাম, পরিবর্জন পরিবর্ধনের সময়ে প্রথমটিই বেশি করা যাবে, কিন্তু উল্টোটি হয়ে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলো।

এই ত্রুটির চাইতেও আমার এক দিক দিয়ে বড় আরেকটি বিচ্যুতি হয়েছে। বাঙালীর আরও অনেক বড় ও মাঝারি শিল্প ও বাণিজ্যোদ্যোগের বিষয়ে আমি লিখে উঠতেই পারিনি। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হলেন, প্রকাণ্ড বাঙালী চা-কর ও কয়লাখনির মালিকবৃন্দ, বেঙ্গল ল্যাম্প ওয়ার্কস, শচীন দত্ত মহাশয়ের ভারত ইলেকট্রিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ, চণ্ডীচরণ সাহা মহাশয়ের 'হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্' (যে-প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আবৃত্তি ও গানের ডিস্ক-রেকর্ডিং করেছিলেন), সি. সি. কম্পানি, হাওড়া ও চব্বিশ পরগণার অগুনতি এঞ্জিনীয়ারিং শিল্প এবং সবার বড়, প্রাতঃস্মরণীয় স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কীর্তি, ইণ্ডিয়ান আয়রন ও স্টীল কম্পানি। আর বাদ পড়েছে দুটি বিরাট সংবাদপত্র-গোষ্ঠী, অমৃতবাজার ও আনন্দবাজার পত্রিকার কাহিনী এবং সেইসঙ্গে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের কথা। এ-তো মাত্র কয়েকটি—এরকমের আরও এত আছেন যে, বহুদিন ধরে তাঁদের সম্বন্ধে লেখা চলতে পারে। এই গ্রন্থে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধেও সমব্যবসায়ী অনেকের নামের উল্লেখ করা যেতে পারতো, কিন্তু তাতে প্রবন্ধগুলিকে বোধহয় আমার দুর্বল লেখনী দিয়ে রসোত্তীর্ণ করতে পারতাম না। প্রবাসী বাঙালী ব্যবসায়ীও আছেন অসংখ্য। তাঁদের মধ্যে অবশ্য সামান্য দু'একজন ছাড়া অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে ওঠেনি। যথার্থ সহযোগিতা পেলে যথাযথ উদাহরণ দিয়ে আমি ভালো করেই প্রমাণ করে দিতে পারতাম যে, বাঙালীকে যতটা বাণিজ্যবিমুখ বলে মনে করা হয়, বাঙালী মোটেই তা নয়।

ফলে, এই প্রবন্ধ-সংগ্রহটি, ইংরেজীতে যাকে বলে 'স্যাম্পল সার্ভে'—তাই হয়ে দাঁড়ালো।

এখানে আরেকটি কৈফিয়ত দিয়ে নিই। এই প্রবন্ধগুলিতে আঞ্চলিকতার মনোভাব ফুটে উঠেছে বলে কোনো কোনো পাঠক অভিযোগ করেছেন। কিন্তু ব্যষ্টির সর্বোদয় না হলে সমষ্টির শক্তিবৃদ্ধি অসম্ভব—এটাই আমার দৃঢ় ধারণা।

প্রবীণ পাঠক-পাঠিকারা 'লক্ষ্মীর কৃপালাভ' কীচারটিকে প্রভূত মর্যাদা দিয়েছেন। অবাক হয়েছি পাঠিকা মহলে এর আদর দেখে। তাঁদের মধ্যে প্রবীণারা যে বিশেষ মনোযোগ সহকারে প্রবন্ধগুলি পড়েছিলেন তার প্রমাণ পেয়েছি বিবিধ পত্রের মাধ্যমে। আর নবীনারাও যে এই লেখা আগ্রহ করে পড়েছেন তার পরিচয় পেলাম কয়েকটি তরুণীর পত্র পেয়ে। অবশ্য তাঁদের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ আলাপের সুযোগ ঘটে ওঠেনি, কিন্তু তাঁদের ভাষা ও ব্যঞ্জনা থেকেই তাঁদের নবীনতা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, কুমারী রমলা দেব তরুণীসুলভ উচ্ছল ভাষায় আমাকে যে একাধিক পত্র লিখেছিলেন তার প্রথমটিতে ছিল : "...আপনার লেখা 'লক্ষ্মীর কৃপালাভ' পড়তে এত ভালো লাগে যে কি আর বলব। আপনার এই লেখা পড়ে (বাঙালীর সম্বন্ধে) কত কিছু

যে জানছি, আর আরও ভাল লাগছে। অথচ প্রথমটা আমি—ওসব ব্যবসার কথা পড়ে কি হবে ভেবে পড়িনি।...”

রমলার এই চিঠিগুলিকে আমি সযত্নে রেখে দিয়েছি, কারণ তরুণ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এর মতো ভালো সার্টিফিকেট আমার আর জোটেনি। বেশ কয়েকজন তরুণ তরুণী আমার নিন্দাই করেছেন। 'কি করে একজন ধনী আরও বড়লোক হয়েছে' সেই ইতিহাস লেখা গর্হিত কাজ—এই ছিল তাঁদের অনেকের রায়। অনেকে আবার আমার তত্ত্ব ও তথ্যগত ভুল শোধরাতে গিয়ে কটুভাষণ করতেও ত্রুটি করেননি। তবে, কয়েকজনের কাছে সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ। আমার বেশ কয়েকটি ভুল আমি শোধরাতে পেরেছি মনে হয়, তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছিলেন বলেই। এইসব বিষয়ে অনেক সময়ে সরাসরি জবাব না-দিয়ে আমার মন্তব্য আমি বিভিন্ন প্রবন্ধে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। অতএব ভূমিকায় তার আনুপূর্বিক উল্লেখের আর প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজন আছে, ইতিমধ্যে শিল্পজগতে যে বিশেষ ঘটনা ঘটে গেল, সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ পর্বটি জাতির পক্ষে যুগ পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। সম্রাট ও শ্রেষ্ঠীর রাজত্বকাল উত্তীর্ণ হয়ে আমরা যে ক্রমশ গণনেতৃত্বের অধীনতা স্বীকার করে নিচ্ছি, এটি তারই উদাহরণ। এই মুহূর্তে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের মধ্যে ভালোমন্দের বিচার করতে গিয়ে অনেকেরই মনে হচ্ছে যে, ভালোর চাইতে মন্দই হবে বেশি। তাঁরা দৃষ্টান্ত হিসেবে জীবনবীমা করপোরেশনের বর্তমান বিশৃঙ্খল পরিচালনার কথা বলছেন; বলছেন, স্টেট ট্রেডিং করপোরেশনের কথা, বিভিন্ন ইস্পাত ও বিদ্যুৎ প্রকল্পে পরিচালকবর্গের অকর্মণ্যতা এবং অনাচারের কাহিনী। কিন্তু সেটা আমাদের জাতিগত দোষের জন্যেই ঘটেছে এবং ঘটছে বলেই আশঙ্কা হয়। ঠিক এই ধরনের ইনডিসিপ্লিনের জন্য ও 'বিজনেস্ অনেস্টি'র অভাবে বেসরকারি বিবিধ শিল্প ও বাণিজ্যোদ্যোগেও কি মহাপ্রলয় ঘটে যায়নি? চলতি কথায় যাকে বলে 'গণেশ উল্টোনো' সে কাণ্ড তো হামেশাই ঘটছে আমাদের ব্যবসায়ী মহলে। এটা লেখার সময়ে যে দৃষ্টান্ত আমার মনে ছবির মতো ফুটে উঠলো সেটা হচ্ছে, বাঙালীর, তথা ভারতবর্ষের, অসংখ্য কটন মিল বন্ধ হয়ে যাওয়া। পুরনো মিলের দরজা বন্ধ দূরের কথা, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা ন্যায্যমূল্যে মেটানোর জন্যে আরও অনেক নতুন মিলের পত্তন হওয়াই উচিত ছিল। তবে? তবে এই অসঙ্গতি কেন? উত্তরে একই কথা বলতে হয়—আমাদের অনিয়ম ও অন্যায়ের শোচনীয় পরিণামে এই অনর্থ ঘটেছে।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার দেখানো উদাহরণসমূহ থেকে সকলেই অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত পাবেন বলে আশা করি। পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টর—কোথাও এই শ্রেণীর নায়কের নেতৃত্ব ব্যতীত কিছুই হবে না।

সাগরময় ছাড়াও আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর আরও কয়েকজনের কাছে আমার অপরিসীম ঋণ। তাঁরা হলেন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী এবং শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ। তাঁদের উৎসাহে আনন্দবাজার পত্রিকাতেও আমি প্রায় ছ'মাস ধরে 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' শীর্ষক প্রবন্ধমালায় বাঙালীর কয়েকটি ছোট ছোট শিল্প ও বাণিজ্যোদ্যোগের

বিষয়ে লেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ'-র একটি প্রবন্ধও আমি এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছি।

স্বয়ং শ্রীঅশোককুমার সরকার মহাশয় এবং তাঁর দুই পুত্র শ্রীমান অভীককুমার ও শ্রীমান অরূপকুমারও উৎসাহ উদ্দীপনার দ্বারা আমাকে উদ্বুদ্ধ করে এসেছেন। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা শ্রীকানাইলাল সরকার মহাশয়ের অর্থাৎ, আমাদের কানাইদা'র সস্নেহ অনুপ্রাণনাও আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছে।

ওপরে যাঁদের নাম করলাম তাঁরা সকলেই আমার ঘরের লোক। এ'দের সঙ্গে প্রায় একই রকমে আমাকে উপদেশ, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন বুদ্ধদেব বসু মহাশয়, সাহিত্য আকাদেমি'র স্থানীয় সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশ রায়, প্রখ্যাত সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন, কবি ও সাহিত্যিক শ্রীগোপাল ভৌমিক এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের উপগ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'জন প্রাক্তন রাজবন্দী (বর্তমানে বিশিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) শ্রীশান্তিময় গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অযাচিত সহায়তাও আমাকে বিশেষ উপকৃত করেছে।

যাঁদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছি তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত গ্রন্থের প্রকাশিকা এবং আমি এই বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ প্রকাশনায় যে নামতে পারতাম না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের উভয়ের পক্ষ থেকে আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। কিন্তু একজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ না করলে আমার এই স্বীকৃতি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি হলেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং বেঙ্গল ন্যাশান্যাল চেম্বার অব কমার্সের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীবটকৃষ্ণ দত্ত। তাঁর পরিচালিত ব্যাঙ্কের বিষয়ে লেখার বহুপূর্ব থেকেই চেম্বারের সভাপতি হিসেবে তিনি আমাকে এই প্রবন্ধমালা রচনায় সমধিক উৎসাহিত করে এসেছেন। কৃতী বাঙালী শিল্পনায়কদের কৃচ্ছ্রসাধনা ও সফলতার কাহিনী পাঠ করে নিরাশহৃদয় আত্মবিস্মৃত বাঙালীর মধ্যে কিছুটা সাহসের, কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হোক, বাঙালীর বাণিজ্যবিমুখতা অপগত হোক—এই চিন্তাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল আমাকে উৎসাহিত করতে।

প্রকাশনা সৌষ্ঠবের বিষয়ে যাঁদের কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ তাঁদের মধ্যে, একাধারে লেখক, কবি ও শিল্পী শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর পত্রীর নাম করবো সর্বপ্রথমে। উঁচু ঘরানার পেশাদার কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই গ্রন্থের ক্ষেত্রে পেশা ভুলে গিয়েছিলেন। কী করে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় সেটাই তাঁর নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কন্যাকে বিবাহসভায় উপস্থিত করার আগে তার প্রসাধন ও অলঙ্করণে যেমন করে যত্ন নেওয়া হয়, আমার এই গ্রন্থের প্রকাশনার প্রতিটি পর্যায়ে পূর্ণেন্দুশেখর তেমনি যত্ন ও আগ্রহ দেখিয়েছেন। স্নেহাস্পদ শ্রীমান সব্যসাচী সেনের বুদ্ধি পরামর্শও এই বিষয়ে আমাকে প্রভূত সহায়তা করেছে।

পূর্ণেন্দুশেখর ও সব্যসাচীর পরেই যাঁদের নাম উল্লেখ্য তাঁরা হলেন রেডিয়্যাণ্ট প্রোসেসের কর্তা মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃযুগল, বেঙ্গল বুক বাইণ্ডিং কম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীশম্ভু মুখোপাধ্যায় এবং স্টুডিও গ্র্যাফিকের কর্তা শ্রীসুনীল দাস। 'লক্ষ্মীর কৃপালাভ'-এর প্রসাধন পর্বে এ'দেরও অসামান্য দান।

নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করার কাজে পরামর্শ দিয়েছেন জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীঅমল সরকার। শ্রীমতী শকুন্তলা সেন, শ্রীমতী অনসূয়া, শ্রীশমীন্দ্রনাথ ও শ্রীইন্দ্রজিৎ দত্তের সক্রিয় সহযোগিতাও উল্লেখযোগ্য।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস ও আনন্দ পাবলিশার্সের কার্যাধ্যক্ষ শ্রীফণীভূষণ দেব এবং তাঁর সহকারী শ্রীচিত্তরঞ্জন দে, শ্রীবাদল বসু, শ্রীসুধেন্দু গুহ এবং শ্রীপঙ্কজ দত্ত নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সুশৃঙ্খল কার্যপদ্ধতি ব্যতিরেকে মাত্র আড়াই মাসের মধ্যেই প্রায় চার-শ' পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব ছিল।

উপসংহারে, গ্রন্থের প্রকাশিকা শ্রীমতী দত্ত মহাশয়াকে এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সামান্য কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশের উপলক্ষে সুদীর্ঘ ভূমিকা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ঘটা আধুনিক বিদগ্ধ পাঠকের কাছে কৌতুকের বিষয় মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ঋণস্বীকারে আমি সর্বদাই তৃপ্তিলাভ করে এসেছি। উপরন্তু, এই স্বীকৃতির অবকাশ আমি আর না-ও পেতে পারি, কারণ জীবনে এইটাই সম্ভবত আমার প্রথম ও শেষ গ্রন্থ।

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

বিশ্বকর্মা

সূচীপত্র

লক্ষ্মীর কৃপালাভ

বাঙালীর সাধনা

বিশ্বকর্মা



এক

ছোট ফিটফাট অফিসটিতে ঢুকে প্রথমেই নজরে পড়লো দেয়ালে টাঙানো ফ্রেমে-আঁটা চারটে ফটো এবং অশোকস্তম্ভ-লাঞ্ছিত হিন্দী ভাষায় মুদ্রিত কয়েকটি সার্টিফিকেট। চারুদর্শন এক যুবক পুরস্কার নিচ্ছেন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাধাকৃষ্ণন ও জাকির হোসেন এবং প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী মহাশয়ের হাত থেকে। একটু লক্ষ করে বুঝলাম, ওই সার্টিফিকেটগুলিই যুবকের হাতে তুলে দিচ্ছেন আমাদের প্রাক্তন ও বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানেরা।

অল্পক্ষণ পরেই খোদ মানুষটির সঙ্গে পরিচয় হলো। রেডিয়্যান্ট প্রোসেসের ছোটকর্তা সুধীর মুখোপাধ্যায়। আলাপ করিয়ে দিলেন বড় ভাই নীরদবরণবাবু।

হাহুতাশ করে লাভ নেই, অন্যকে দোষ দেওয়াও অন্যায়। শিল্প ও বাণিজ্যে বাঙালীর স্থান যে তালিকার একেবারে নীচের দিকে তার জন্যে দায়ী আমরা বাঙালীরাই। তার কারণ সম্বন্ধে প্রতিদিন এতভাবে আলোচনা হচ্ছে যে, সে বিষয়ে এখানে বেশি কিছু বলা বাহুল্য হবে। এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ও নয় সেটা। বাঙালীর সেই লজ্জাকে কিছুটা লাঘব করেছেন সামান্য যে দু-একটি শিল্পের কর্ণধারেরা—শুধু তাই নয়, সেই সব শিল্পে বাঙালীকে বলতে গেলে সবার উপরে তুলে ধরেছেন—তার মধ্যে মুদ্রণ ও প্রোসেস এনগ্রেভিং অর্থাৎ ছাপার ব্লক তৈরির কথা প্রথমেই মনে পড়েছিল। তাই এই ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি শুরু করা গেল বাঙালীর মালিকানায় সম্পূর্ণভাবে বাঙালীর পরিচালনায় সার্থক এই ব্লকমেকিং শিল্পটি নিয়ে।

ভূমিকা আরও একটু বাড়িয়ে বলা যেতে পারে যে, এই যন্ত্রশিল্পটির সঙ্গে চারুকলা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে বলেই বোধ হয় বাঙালী আজও এতে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। ভারতে ব্লকমেকিং শিল্পের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত অনুবৃত্তিতে সর্বাগ্রেই সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাতে হয় আমাদের সত্যজিৎ রায়ের পিতামহ স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়কে। তিনিই ভারতে ব্লকমেকিং-এর পথিকৃৎ। এই শতকের গোড়ার দিকে নানান পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত ইউ. রায় অ্যান্ড সন্সের রঙীন ও সাদাকালো হাফটোন মিডলটোন ও কোয়ার্টার টোন ছবিগুলি

রেডিয়্যান্ট প্রোসেস্
৬-এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড
কলিকাতা—১৩

আমাদের মধ্যে যাঁরা প্রবীণ তাঁদের অনেকেরই স্পষ্ট মনে আছে। ঠাকুর-পরিবারের পরেই সাহিত্যে ও চিত্রকলাতে বাংলা দেশে যে পরিবারটি আজও, শুধু ভারতে কেন, বিশ্বে স্বনামধন্য, সেই পরিবারের একজনের শিল্পীমন ও কল্যাণহস্ত এর উপরে ছিল বলেই হয়তো আজ এদেশে এই শিল্পের মান এত উচ্চে।

বছর দুই-তিন আগে লোকপরম্পরায় শুনেছিলাম যে, ইউ. এস. আই. এস-এর কোনো প্রধান আমেরিকা থেকে কলকাতায় এসে তাঁদের ভারতে প্রকাশিত 'স্প্যান' পত্রিকার ব্লকমেকিং-এর উৎকর্ষের তুলনা করেছিলেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ব্লকমেকিং-এর সঙ্গে। এর ব্লকগুলি সবই রেডিয়্যাণ্ট প্রোসেস করে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে নীরদবাবু সবিনয়ে বললেন, "দেশী ও বিদেশী শিল্পপতির সফলতার ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে, তাঁদের নিজ নিজ মেধা ও অধ্যবসায়ের তারিফই তাতে বেশি থাকে। কিন্তু যে-কোনো কৃতী শিল্পপতির সাফল্যের পিছনে মেধা ও প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যের আনুকূল্য যে কতটা থাকে সাধারণত বাইরের লোকে তা কোনোদিনই জানতে পারে না। আমার মনে হয়, প্লাক্ ও লাক্-এর মধ্যে অধিকতর ক্ষেত্রে লাকটাই বড় পার্ট প্লে করে। যেমন আমাদের ক্ষেত্রে। ছিন্নমূল হয়ে পার্টিশনের পরে বিক্রমপুরে নিজের দেশ ছেড়ে কলকাতায় এসে নিজের পায়ে কী করে আবার দাঁড়াতে পারি দিবারাত্র তাই ভাবতাম। আমাদের মাতুল পরলোকগত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সম্প্রতি লোকান্তরিত পিতা উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের উৎসাহ-উদ্দীপনায় খুবই ছোট করে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বউবাজারের গঙ্গাধরবাবু লেনে ব্লকমেকিং-এর কারখানা খুললাম। সম্বল একটি ১৫"×১২" ক্যামেরা ও গুটিকয়েক আনুষঙ্গিক মেশিন ও সরঞ্জাম। মোট দাম কুড়ি হাজার টাকা। ভাগ্যের অনুকূল আমাদের যা হলো, তা হচ্ছে দুজন অতি কর্মঠ ও নিপুণ সহযোগীকে আমাদের সঙ্গে পাওয়া। তাঁরা হলেন শ্রীসত্যরঞ্জন আম্বলী ও শ্রীভবরঞ্জন মজুমদার। এ'দের দু'জনের সুপরামর্শ ও সাহচর্য এবং জনপনেরো বিশ্বস্ত কর্মীর কর্তব্যপরায়ণতা যদি আমাদের সহায় না থাকত তা হলে আমাদের দুই ভাইয়ের কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও আজ মাত্র পনেরো বছরের মধ্যে আমরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশংসা পেতাম না।"

"১৯৫৬ সালে গঙ্গাধরবাবু লেন থেকে উঠে এলাম এই ৬-এ, সুরেন ব্যানার্জি রোডে। সেই বছরেই আমরা ব্লকমেকিং-এর সঙ্গে আমাদের ছাপাখানার বিভাগটি খুললাম। ১৯৫৮ সাল থেকে কাজ অনেক বেড়ে গেল এবং কাজের কোয়ালিটির জন্যে ব্লকমেকিং ও ছাপা দুইয়ের জন্যেই বছরে বছরে অনেকগুলি প্রাইজও পেলাম। দিল্লীতে সরকারী প্রতিযোগিতাতে ছাড়াও মাস্টার প্রিণ্টারস ফেডারেশনের কম্পিটিশনেও পেলাম।"

রেডিয়্যাণ্ট প্রোসেস এখন ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহত্তম ব্লকমেকিং প্রতিষ্ঠান—অবশ্য ছাপাখানার বিভাগটি তা নয়। ১৫ জন থেকে এখন এ'দের কর্মীসংখ্যা তিন শো-তে দাঁড়িয়েছে। মেশিনের মধ্যে আছে ক্যামেরা ৪টি; এচিং মেশিন ১৮টি; কাটিং মেশিন ৪টি; রাউটিং মেশিন ২টি; সব রকমের অনেকগুলি স্ক্রীন; স্টিরিও কাস্টিং-এর উপকরণও যথেষ্ট আছে। ছাপাখানায়

আছে ১৭টি প্রিন্টিং মেশিন (বড় ও ছোট) এবং ১টি ভারনিশিং মেশিন। টাইপ এবং অন্যান্য সরঞ্জামও যথাযথ।

এই সব যন্ত্রপাতির দাম সাড়ে আট লক্ষ টাকা। কোথায় সেই কুড়ি হাজার টাকার মেশিনারী আর কোথায় আজ ১৫ বছর পরের এই বৃহৎ করখানা!

রেডিয়্যাণ্টের কাজের আদর বেড়েই চলেছে। কেন্দ্র ও সকল রাজ্যের সরকারী দপ্তরগুলি, বিদেশী দূতাবাস, বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশক এবং শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির চাহিদা পেরিয়ে এখন বিদেশ থেকেও অর্ডার আসছে। আরও মেশিন চাই, আরও জায়গা চাই। তাই সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হয়েছে বেহালা তারাতলাতে প্রায় সাড়ে তিন বিঘা জমিতে।*

এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা কেবল কাজই করেন না, এ'দের অবসর বিনোদনের পদ্ধতিও সুষম। আন্তঃডিপার্টমেন্ট ফুটবল লীগ খেলা হয়। অফিস লীগেও খেলেন। ক্লাব, লাইব্রেরী আছে। বছরে বছরে মঞ্চাভিনয় করেন সকলে মিলে। ব্যক্তিবিশেষের কার্যকলাপেরও কিঞ্চিত উল্লেখ প্রয়োজন। ছোট কর্তা সুধীর মুখোপাধ্যায় মশায় দক্ষিণ কলকাতা রোটারি ক্লাবের অন্যতম সক্রিয় সভ্য এবং সেই সঙ্ঘের মুখপাত্র 'দি ল্যাম্প' পত্রিকার সম্পাদক। মঞ্চাভিনয় ব্যাপারেও সুধীরবাবুর কুশলতা আছে।

এই হল রেডিয়্যান্টগোষ্ঠীর মোটামুটি বিবরণ।

তবুও—নীরদবাবু বললেন, এ যুগের কোটি কোটি টাকার বিশাল উদ্যোগগুলির পাশে ব্লকমেকিং-এর এই বৃহত্তম কারখানাটিও কুটিরশিল্পের মতো।

সামগ্রিকভাবে বাংলার ব্লকমেকিং শিল্পের আলোচনাও নীরদবাবুর সঙ্গে হল। তখন তিনি আর রেডিয়্যাণ্টের মালিক নন, তিনি ব্লকমেকারস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি স্থলাভিষিক্ত যেন অন্য এক ব্যক্তি। তাঁর মতে এই শিল্পের মালিকেরা হলেন নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী, যাঁদের দৈনন্দিন মূলধনের অভাবের চাপে প্রায় দিন-আনা দিন-খাওয়া করেই কারবার চালাতে হয়। মালের ও কাজের চাহিদা বলতে বেশির ভাগ ব্লকমেকারেরই নিয়মিত কিছু নেই। কখনো হয়তো একগাদা কাজ এলো : চার-ছ' ঘণ্টার মধ্যে সেই কাজ নামিয়ে খদ্দেরকে পেঁাছে দিতে হবে, আবার কখনো দিনের পর দিন কাজ প্রায় থাকেই না। প্ল্যান করে কিছু করবার জো নেই।

"অ্যাসোসিয়েশন" থেকে অনেক হিসেব কষে বিভিন্ন কাজের রেট হয়তো বাঁধা হল, তা ছ' মাস কাটতে না কাটতেই কাঁচামালের অর্থাৎ এই শিল্পের ক্ষেত্রে দস্তার ও তামার পাতের, সীসের, ফটোগ্রাফিক প্লেটের, কেমিক্যালের—এমন কি খাঁটি স্বদেশী প্রুফের কাগজের দামও রাতারাতি হঠাৎ দেড় দু' গুণ বেড়ে গেল। কর্মীদের মাইনে ও ভাতা বাড়াতে হল চাল-ডালের দাম বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে। সব হিসেব বানচাল। যাঁদের কাঁচামালের স্টক ছিল না, অ্যাসোসিয়েশনের বিক্রয়মূল্যে তৈরী মাল বেচতে গেলে তাঁদের ডাহা লোকসান। রিজার্ভ বা সংরক্ষিত তহবিল

* সম্প্রতি ১৯৬৯ সালে রেডিয়্যাণ্টের তৈরি ব্লক বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। কোনো অনুন্নত দেশে নয়, ফ্রান্স ও অ্যামেরিকার মতো দেশে এই রপ্তানি হয়েছে।

তো কারুরই প্রায় নেই। এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়া ছাড়া গতি নেই।

"সব চাইতে বেসামাল করে দেয় দুর্মূল্য ভাতার বেহিসেবী চাপ। সরকারি কানুন অনুযায়ী প্রাইস ইনডেক্সের (দ্রব্যমূল্যসূচীর) পয়েন্ট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বছরে দু'বার করেও কর্মীদের মাথাপিছু এই ভাতা দশ টাকা করে বাড়াতে হয়েছে। অথচ সেই অনুপাতে ব্লকের দাম বাড়ালে ক্রেতারা বেঁকে বসবেন। ব্লকের প্রধান খরিদ্দার হলেন অন্যান্য শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান। মন্দার বাজারে অনেকেই নিহত : বাকী যাঁরা টিঁকে আছেন তাঁরা সাংঘাতিক আহত। খরচ কমাতে হয়—তাই কমাও বিজ্ঞাপন। ক্যাটালগ ও ব্যালেন্স-শীট সুন্দর সুন্দর ব্লক দিয়ে এ বছরে আর ছাপিয়ে কাজ নেই। সঙ্গতি যেটুকু আছে তা দিয়ে মজুরদের ভাতা বাড়াও। মালের বিক্রি নেই যার, কী দরকার তার নানা রঙের ক্যাটালগ ব্যালেন্স-শীটের বাহারে? কাজেই, করুক ব্লকমেকার তার দিন গুজরান অর্ধাহারে বা অনাহারে।"

নীরদবাবুর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে পথে নামবার আগে আবার চোখে পড়লো রিসেপশন রুমের দেওয়ালে বসানো কাঁচের আলমারির ভিতরে আরও কতকগুলি পুরস্কার। সেই আলমারির নীচে একটা কাঠের বোর্ডে সাঁটা রেডিয়্যাণ্টের ব্লকে ছাপা ভারী সুন্দর কতকগুলি রঙীন কাজের নমুনা। এ যেন পঞ্চদশী রেডিয়্যাণ্টের রূপের ঝলক! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো, ছোট ছোট আরও যাট-সত্তরজন বাঙালী ব্লকমেকারের কথা। মনে মনে ছবিটা এঁকে দেখলাম—যেন একটা সলিড ব্লকের নিরেট ছাপ—গাঢ় কালো কালিতে ছাপা।

৬ জানুয়ারি, ১৯৬৮





দুই

মেশিনের পার্ট তিনটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে একটি বেছে নিয়ে সুপারভাইজারের হাতে তুলে দিলেন হৃষীকেশবাবু। বললেন, 'গ্রাইন্ডারে চাপিয়ে আধসুতো ডায়মেটার মেরে নাও।' আমার দিকে ফিরে ক্ষমা চাইলেন আমাদের কথাবার্তায় ছেদ পড়ার জন্য।

কম করে এক কোটি টাকার এই ঈগল লিথোগ্রাফিং প্রাইভেট লিমিটেড কম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীহৃষীকেশ দাস মশায় তাঁর ক্ষুদ্রতম নাট-বল্টুর সম্বন্ধেও এতটা ওয়াকিবহাল দেখে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না।

ফটো-অফসেট প্রণালীতে ছাপার কাজে এ অঞ্চলে ঈগলই হলো বৃহত্তম কারখানা।

মাস্টার প্রিন্টারস সমিতির পত্রিকা 'প্রিন্টারস ভয়েস'-এ বছর দুই আগে কলিকাতা মেট্রোপলিটান সংস্থার সমীক্ষার উপরে লেখা শ্রীভবভূতি রায়ের একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। এই অঞ্চলের মুদ্রণশিল্পের কর্মীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জন কর্মী বাঙালী এবং ছাপাখানা ছাড়াও অন্যান্য যত শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে তার শ্রমিকদের বেতনের সমষ্টির শতকরা ১২ ভাগ বেতন উপার্জন করেন কলকাতার ছাপাখানার কর্মীরা। অতএব আমাদের বাঙালী পরিচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিক্রমার সূচীতে মুদ্রণশিল্পের স্থান যে অতি উচ্চে তা বলা-ই বাহুল্য। অবশ্য ঈগল লিথো বৃহত্তম ছাপাখানাগুলির মধ্যে একটি। যাঁরা একটা বা দুটো মেশিন নিয়ে প্রেস চালান তাঁদের সংখ্যা শুধু বেশিই নয় সমস্যাও অনেক। কিন্তু আজকে আমরা কেবল ঈগলের কথাই লিখবো। উদ্দেশ্য, পাঠকের কাছে একটি বিশিষ্ট বাঙালী ছাপাখানার বিষয়ে ছোট করে একটি পরিচিতি পেশ করা এবং তার মাধ্যমে মুদ্রণশিল্পের বিশেষ একটি ধারা ও তার সংজ্ঞা সহজ ভাষায় সকলের কাছে বলা। এই সূত্রে বাঙালীর মুদ্রণশিল্প, তথা সাধারণভাবে বাঙালীর পরিচালিত বেশির ভাগ শিল্পোদ্যোগের মূলে যে প্রধান একটি ত্রুটি থাকে সে বিষয়েও সংক্ষেপে বলতে হবে। পরের বারে যখন আমরা সাধারণ লেটার-প্রেসের বিষয়ে বলবো তখন এই শিল্পের অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

ঈগল লিথোগ্রাফিং কম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
২৬-বি ক্রিস্টোফার রোড,
কলিকাতা—৪৬

গোবরা অঞ্চলের ক্রিস্টোফার রোড। ইস্টার্ন রেলের সাউথ সেকশনের লাইনটির ঠিক পূর্বদিক। ঈগল-লিথোর গেটে প্রবেশ করে দেখলাম প্রকাণ্ড তেতলা ছাপাখানা বাড়িটির ছাদের কার্নিসের ওপরে হাওয়ায় দুলছে নারকেলশাখার শ্রেণী। গেট থেকে ছাপাখানায় পৌঁছবার রাস্তার বাঁদিকে মালিকদের বসতবাড়ী। তার সামনে বাঁধানো ঘাটের পরে মাঝারি একটু পুকুর। সেই পুকুরের ওধারেও গাছের সারি। রাস্তার ডাইনে সাজানো একটি তরকারীর বাগান। কপি ও টোমাটোর সবুজ চারা বেশ পুষ্ট হয়ে উঠেছে। ঈগলের ছাপা ১৯৬৭ সালের একটা ক্যালেণ্ডার দেখেছিলাম 'আডভার্নি ওয়েরলিকন' কম্পানির। আর দেখেছিলাম আমেরিকান প্রকাশক প্রেণ্টিস হল-এর ইস্টার্ন ইকনমি এডিশনের একখানি বই 'ইঞ্জিনীয়ারিং মেকানিক্স'—সেটাও ঈগলের ছাপা। মুগ্ধ হয়েছিলাম।

মনে হলো এই প্রাকৃতিক পরিচ্ছন্নতার মধ্যে আলো হাওয়ায় ভরা এমন সুন্দর একটি ছাপাখানায় যাঁরা কাজ করেন তাঁদের মেশিনে যে কাজ বেরুবে তা নিপুণ শিল্পীর হাতে-আঁকা ছবির মতো হওয়াই স্বাভাবিক।

হৃষীবাবুর সঙ্গে একটু সময় কাটাবার পরে কিন্তু মনে হলো যে পরিবেশের চমৎকারিত্বই কেবল কর্মীদের প্রেরণার উৎস নয়। হৃষীবাবুর নেতৃত্বই এর মূল। আরও গভীরে যেতে হয়—হৃষীবাবুর যোগ্যতা ও কৃতিত্বের গোড়ার কথায়।

সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে ঈগ্লের অফিসে উপস্থিত হয়ে প্রথমেই একটু আশ্চর্য লেগেছিল। ডাইনে ও বাঁয়ে লক্ষ টাকার দামী দামী এবং ভারতে বিরল দুটি ডার্করুম টাইপ প্রোসেস ক্যামেরা, সামনে ১০।১২টা লোহার আলমারী ও আশেপাশে স্তূপীকৃত ছাপা-কাগজের মাঝখানটিতে টেবিলে বসে হৃষীবাবু আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। রিসেপশনিস্টের হাতে কার্ড দিয়ে এয়ারকণ্ডিশনড চেম্বারে ঢুকে সোফাসেটি পরিবৃত পুরু কার্পেট-মোড়া ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের যে-সব দুষ্প্রবেশ্য ঘরে এ যাবৎ ঢোকবার অবকাশ হয়েছে এ তা নয়। কাজের লোক হৃষীবাবু আমাদের কাছের মানুষও। নিজের কাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকটা তো নখদর্পণে আছেই, উপরন্তু ছাপাখানার নিম্নতম শ্রমিক থেকে শ্রেষ্ঠ দেশী ও বিদেশী অভিজাত গ্রাহক-খরিদ্দারের কাছে তিনি সহজলভ্য। আমার মতে, এইটাই হলো ঈগল্ লিথো কম্পানির সফলতার উৎস।

হৃষীবাবুর আদর্শ তাঁর পরলোকগত পিতা চণ্ডীচরণ দাস মহাশয়। প্রায় নব্বই বছর আগে চণ্ডীচরণ জন্মেছিলেন কলকাতার এক ক্ষয়িষ্ণু বনেদী পরিবারে। পাড়ার অন্য সঙ্গীসাথীরা যখন স্লেট পেন্সিল হাতে স্কুলে পড়তে গেল, বালক চণ্ডী তখন অভাবের চাপে বেরোলেন রুজির সন্ধানে। এক অংশীদার জুটিয়ে রবার-স্ট্যাম্পের ব্যবসায় নামলেন। কাজ মন্দ চললো না; কিছু দিন পরে ১৯০৫ সালে নিজ মালিকানায় উড এনগ্রেভিং অর্থাৎ খোদাই-করা কাঠের ব্লকের এক কারখানা খুলে ফেললেন। তখনকার দিনে এই কাঠের ব্লকে ছাপা কাজের বেশ চাহিদা ছিল। হল-এণ্ডারসন, হোয়াইটওয়ে লেড-ল, আর্মি নেভি স্টোর্স প্রভৃতি চৌরঙ্গী পাড়ার বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ক্যাটালগ ছাপার একচেটিয়া কাজ হলো চণ্ডীচরণের। চণ্ডী তাঁর ছোট প্রতি-

স্থানটির নাম দিলেন "ফাইন আর্টস কটেজ"। সঙ্গে রইলেন ছোট দুই ভাই, বঙ্কুবিহারী ও গোষ্ঠবিহারী।

একবার হল অ্যান্ডারসনের এক অর্ডার সাপ্লাই করতে চন্ডীচরণের দেরি হয়ে গেল। মালিক হল-সাহেবের কাছে খুব বকুনি খেয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে চন্ডী বললেন, "আদ্যি-কালের কায়দায় হাতে ছাপার কাজে সময় ঠিক রাখতে পারি না, স্যার। মেশিনে ছাপালে ক-বে আপনাকে ডেলিভারী করে দিতাম।" উত্তেজিত হল-সাহেব বললেন, "তা তুমি মেশিনে ছাপাও না কেন?" "মেশিন কেনবার পয়সা নেই সাহেব" কুণ্ঠিত চন্ডীচরণ উত্তর দিলেন। ছেলেটিকে ভালোবাসতেন মিস্টার হল। বললেন, "বলো, কত টাকা চাই তোমার। বসাও মেশিন। আমি তোমায় টাকা ধার দেবো। কাজ করে শোধ দিও।"

সেই হলো সূচনা। একের পর এক লিথো-ছাপা, সাধারণ ট্রেডল ও ফ্ল্যাটবেডে (যাকে এক কথায় বলে "লেটার-প্রেস") ছাপা, ব্লক তৈরি, ইলেকট্রোপ্লেটিং--এইরকম সব কাজে দ্রুত এগিয়ে চললো "ফাইন আর্টস কটেজ"। এলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। লাভের উদ্‌বৃত্ত টাকা ফেলে না রেখে উদ্যোগী চন্ডীচরণ নতুন নতুন ব্যবসাতে লাগিয়ে দিলেন। স্বধর্ম ছাপাখানার লাইনের সঙ্গে পরধর্ম ট্যাক্সির ব্যবসা আরম্ভ করলেন ৫০টা ট্যাক্সি দিয়ে। করলেন ইঁটখোলা, ফাঁদলেন আতসবাজির কারখানা। যা হবার ছিল, হলো-ও তাই। অনভিজ্ঞতার জন্যে ও যথাযথ তদারকের অভাবে একটার পর একটা কারবার বন্ধ হয়ে চন্ডীবাবু একদিন ফেল হয়ে গেলেন পর্বতপ্রমাণ ঋণের বোঝা নিয়ে। পাওনাদারদের কিন্তু জবান দিলেন যে যত দেরীই হোক, টাকা তিনি শোধ করবেন।

অনেক ভুলের মধ্যে কিন্তু একটি দূরদর্শিতার কাজ করেছিলেন প্রগতিবাদী চন্ডীচরণ। যুগের হাওয়া দেখে তিনি বুঝেছিলেন যে, মন্থরগতি লিথো-ছাপা বড় বড় কাজে আর চলবে না। ফটো-অফসেটের যুগ আসছে। হাজারে বা লাখে লেবেল পোস্টার ছাপাতে হলে চাই দ্রুতগতি অফসেট মেশিন।

চন্ডীচরণের কথা বুঝতে গেলে আমাদের জানা দরকার "লিথোগ্রাফিং" ও "অফসেট" শব্দ দুটির অর্থ। গ্রীক শব্দ 'লাইথো'-র মানে পাথর ও 'গ্রাফইন্'-এর মানে লিপি। শিলালিপি। 'লিখন' শব্দের বদলে 'লিপি' কথাটি কেন ব্যবহার করলাম তা-ও বলি। এটা আমাদের বৈদিক যুগের কথা, যখন ভূর্জপত্র বা 'প্যাপিরাস'-এর ওপর তুলি বা খাগের কলম বুলিয়ে 'লিপি' রচনা করতেন মানবজাতির পূর্বপুরুষেরা। আর ধাতুর শলাকা বা তেমন শক্ত কিছু দিয়ে জমানো মাটি, পাথর অথবা ধাতুর উপরে উৎকীর্ণ করে হতো 'লিখন'।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে জার্মেনীর মিউনিখ শহরে অ্যালয়েস সেনেফেলডার নামে এক ব্যক্তি বিশেষ এক ধরনের সরন্ধ্র চুনাপাথরকে (পোরাস লাইমস্টোন) জলে ধুয়ে তেলরও দিয়ে তার ওপরে ছবি আঁকেন এবং সেই ছবির প্রতিলিপি কাগজে ছেপে প্রথম লিথোগ্রাফির প্রচলন করেন। সেদিনের বহু চিত্রকরও এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তাঁদের অনেকের

'লিথোগ্রাফ' পরে অয়েলপেণ্টিং বা ওয়াটারকালার চিত্রের মত বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিল। চিত্রকরেরা এখনো এই প্রণালীতে অনেক ছবি আঁকেন। তখন থেকে ইয়োরোপের মুদ্রণশিল্পেও এটি পুরোদমে চালু হলো।

পাথরের ওপরে কাগজ সেঁটে অতি মন্থর গতিতে এই কাজ হয়। কিন্তু দুশো পাঁচশো কপি মোটা ছাপের থিয়েটার পোস্টার বা "জারমলিন জ্বরের যম"-এর বিজ্ঞাপন ছাপার জায়গায় যেখানে লক্ষ লক্ষ 'বাটা'-র জুতোর অথবা 'ফিলিপস'-এর বাতির পোস্টার, শো-কার্ড ছাপাতে হবে সেখানে চাই অতি দ্রুতগতি ফটো-অফসেট প্রণালী। লিথোয় ব্যবহৃত হয় এক চাঁই পাথর— বিকল্পে পাথরের ওপরে দস্তার পাত। অফসেট মেশিনে আছে তিনটে রোলার। তিনটির উপরেরটিতে সাঁটা থাকে মূল ডিজাইনের ফটো-ওয়ালা পিসবোর্ডের মতো দস্তার অথবা অ্যালুমিনিয়মের পাত। তিনটি রোলারের যুগপৎ ঘূরন্ত অবস্থায় সেই দস্তার পাত থেকে ছবিটিব প্রতিলিপি উঠে আসে মাঝের রবার-মোড়া সিলিন্ডারে। এর ঠিক নীচে ছাপার কালি মাখা তৃতীয় সিলিন্ডারটির খাঁজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় সাইজ করে কাটা পোস্টার ইত্যাদির কাগজ। উলটো দিক দিয়ে সেই কাগজ ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে। কোনো মেশিনে বারবার প্লেট বদলে সেই একই কাগজ বারে বারে ঢুকিয়ে দিতে হয় বিভিন্ন রঙে ছাপবার জন্যে, আবার কোনো মেশিনে একই সঙ্গে একাধিক রঙ ছাপা হয়ে আসে। সোজাসুজি ওপরের মূল ডিজাইনের ফটোপ্লেটের (অর্থাৎ ফর্ম-এর) সিলিন্ডার থেকে কাগজে ছাপ না লেগে মাঝের রবারের উপরে আসা প্রতিচ্ছবির (অর্থাৎ ইমেজ-এর) থেকে ছবিটি কাগজে ওঠে বলেই ইংরাজীতে এই পদ্ধতির নাম হয়েছে 'অফ-সেট'। সংক্ষেপে এই হলো ফটো অফসেটের সংজ্ঞা। আমেরিকাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ইংল্যাণ্ডে ১৯০৮ সালেই নাকি অফসেট ছাপাইয়ের কাজ আরম্ভ নয়।

আর একটি প্রণালী আছে। ফটোগ্রেভিওর। অফসেটে যেখানে পূর্ববর্ণিত 'লিপি' পদ্ধতিতে কাজ হয় ফটো-গ্রেভিওরে 'লিখন' পদ্ধতিতে মোটামুটি সেই একই কাজ হয়। যদিও সেই খোদাই করার কাজটি কোনো লেখনী দিয়ে করা হয় না। মূল ডিজাইনটি এচিং করা হয় উজ্জ্বল পালিশকরা তামার প্লেটের ওপরে। তারপরে সেই প্লেটটি একটি রোলারে ফিট করে মোটামুটি অফসেট মেশিনের মতো করে ছাপা হয়। বিশেষ ধরনের এক একরকম ডিজাইনের কাজের পক্ষে ফটো-গ্রেভিওরই বেশি ভালো অফসেটের চাইতে।

চণ্ডীচরণ দূরদ্রষ্টা। তাই ১৯২১ সালে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র বালক হৃষীকেশকে হোয়াইটওয়ে লেড ল'র এক সাহেবের সঙ্গে বিলেত পাঠিয়ে দিলেন। হৃষীর বয়স তখন ১২। প্রথমে গ্রামার স্কুলে পড়ে লণ্ডনে ম্যাট্রিক পাস করে হৃষীকেশ লীডসে জর্জ ম্যান কম্পানির অফসেট মেশিন তৈরির কারখানায় ভর্তি হলেন। বছর ৫।৬ পরে চণ্ডীচরণ মেজো ছেলে কিশোর যজ্ঞেশ্বরকেও হৃষীকেশের কাছে পাঠালেন।

এদিকে ১৯২৮ সাল এল। ফাইন আর্টস কটেজের কাজের তখন রমরমা। লিথো, লেটার-প্রেস, লাইনোটাইপ, কাগজের বাক্স তৈরির মেশিন এবং একটি সম্পূর্ণ ব্লক মেকিং বিভাগে

দিবারাত্র কাজ চলছে। চণ্ডীবাবু সেই সঙ্গে দুটি অফসেট মেশিন কিনে ফেললেন। ভারতে এই প্রথম অফসেট আমদানী হলো।

এমন সময়ে চঞ্চলা লক্ষ্মী আবার বাদ সাধলেন। ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৩০ সালে গান্ধিজী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলেন। বললেন, বিদেশী বয়কট কর। দড় দড় ইংরেজ প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা বন্ধ হয় হয়। ফাইন আর্টস কটেজের বিদেশী খদ্দেরই বেশির ভাগ। গ্রাহকের লোকসানের ধাক্কায় চণ্ডীবাবুর কারবার ফেল পড়লো। ১৯৩১ সালে ফাইন আর্টস কটেজ প্রাইভেট লিমিটেড লিকুইডেশনে গেল। বিলেতে হৃষীকেশের শিক্ষানবিসী শেষ হয়ে আসছিল। ইতিমধ্যে বাবার ব্যবসা হলো অচল। বাড়ি থেকে টাকা আসা বন্ধ হলো। বাধ্য হয়ে তিনি জর্জ ম্যান কম্পানিতেই মেশিন ডেমনসট্রেটারের কাজ নিলেন। কম্পানি প্রথমে তাঁকে সুমাত্রা জাভা ও সিঙ্গাপুর পাঠালো। সেখান থেকে জর্জ ম্যান কোং ইণ্ডিয়া লিমিটেডের কলকাতার অফিসে।

কিন্তু ওদিকে চণ্ডীচরণের জীবননাট্যের তৃতীয় অঙ্ক শুরু হয়েছে। চণ্ডীচরণ আবার লড়াইয়ে নেমেছেন। ১৯৩৩ সালে ঈগল লিথোগ্রাফিং কম্পানি প্রতিষ্ঠা করে সুশিক্ষিত ছেলেকে তাতে টেনে নিলেন। তাঁর বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ইম্পিরিয়াল টোবাকোর চেয়ারম্যান বেকার সাহেবের জামিনে বিখ্যাত জন ডিকিনসন কম্পানির কাছ থেকে কিস্তিতে দুটি অফসেট মেশিন নতুন করে কিনলেন চণ্ডীবাবু। ১৯৪২ সালে তিনি ফাইন আর্টস কটেজের পুরোনো পাওনাদারদের পাইপয়সা পর্যন্ত শোধ করলেন। ১৯৪৩ সালে বিধাতার দেনা-ও শোধ করে চণ্ডীচরণ শেষনিশ্বাস ফেললেন।

হৃষীবাবুর আমলে ঈগল লিথোর কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। ১৫টি অফসেট মেশিন সহ মূল্যবান যন্ত্রপাতি আছে প্রায় ৫০টি। প্রায় সবই ভালো ভালো বিদেশী মেশিন। জমি বাড়ি গাড়ি বাজার পাওনা সব নিয়ে কম্পানির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির দাম এখন কোটি টাকার ওপরে—বিশেষ করে ডিভ্যালুয়েশনের পরে।

কিন্তু হৃষীবাবুর শ্রেষ্ঠ অবদান বোধ হয় এই যে, যে-অভিজ্ঞতা তিনি চণ্ডীচরণের জীবনের ওঠা-পড়া থেকে অর্জন করেছেন তার মর্যাদা দিয়েছেন কম্পানির দশ লক্ষ টাকার একটি নগদ (লিকুইড) রিজার্ভ ফাণ্ড অর্থাৎ সংরক্ষিত তহবিলের সৃষ্টি করে। আবার মন্দা এলে কারবার যেন অচল হয়ে না পড়ে।

বাঙালীর ব্যবসার প্রধান গলদ বোধ হয় এইখানটিতেই। আমরা সুদিনে যখন লাভ করি তখন ভুলে যাই যে, ভবিষ্যতে দুর্দিন আসতে পারে। আসতে পারে কেন, আসবেই। এখন যেমন এসেছে। সুদিনে যৌথ কারবার হলে বেশি বেশি ডিভিডেণ্ড দিয়ে আয়ের অপবণ্টন করে ফেলি; আর একক বা পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠান হলে নানাভাবে অমিতব্যয়ী হয়ে পড়ি। অথবা প্রতিষ্ঠানটির আয়তন বৃদ্ধির জন্যে যন্ত্রপাতি সাধ্যের বেশি কিনে ফেলে কার্যকরী মূলধনের অভাবে গলাকাটা সুদে টাকা ধার করি, যার ফলে শেষ পর্যন্ত আমাদের আসলটিও যায়। পর্যাপ্ত নগদ রিজার্ভ ফাণ্ড আমাদের থাকে না যা দিয়ে মন্দা বা সংকট এলে তা আমরা

কাটিয়ে উঠতে পারি। ফলে দেখা যাচ্ছে যে অসংখ্য বাঙালী শিল্প প্রতিষ্ঠান একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাঙালীর হাতে কঠোর পরিশ্রম করে গড়া বড় বড় প্রতিষ্ঠানও মিতব্যয়ী তীক্ষ্ণবুদ্ধি ধনী অবাঙালীর কবলে চলে যাচ্ছে। এ যাবৎ শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি বাঙালী অনেক করেছে, কিন্তু বাঙালীর হাতে তার স্থিতি হয়নি, এমন দৃষ্টান্তই বেশি। সেইজন্যেই ঈগল লিথোর কথা এত করে বলছি। হৃষীবাবুদের দূরদর্শী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্যেই ঈগল লিথোগ্রাফিং কম্পানি অসাধারণ বাঙালী প্রতিষ্ঠান। না হলে তাঁর টেকনিক্যাল শিক্ষা ও পরিকল্পনা সবই বিফল হত।

তাই এই মন্দার বাজারেও ঈগলের জয়যাত্রা অক্ষুণ্ণ, যদিও প্রচুর লাভ থাকে এমন দামী দামী ক্যালেন্ডার ছাপার কাজ খুব কমে গিয়েছে। গত বছরে ঈগল ২২।২৩টা প্রতিষ্ঠানের প্রেস্টিজ ক্যালেন্ডার ছাপিয়েছিল। এক একটি ক্যালেন্ডারের পড়তা গড়ে হয়তো দশ টাকা—এই রকম লক্ষ লক্ষ ক্যালেন্ডার ছাপা হয়েছিল। সেই জায়গায় এ বছরে মোট ৪।৫টির বেশি অর্ডার আসেনি। পোস্টার ছাপাও কিছু কমেছে। স্ট্রাইক লক আউটেও অনেক প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে আছে। তাই লেবেল ছাপাও কম। তবুও কোয়ালিটির সুনামের জন্যে ঈগলে অন্যান্য কাজের অর্ডার এসেছে। তার ওপরে হৃষীবাবু পরে আছেন রিজার্ভ ফাণ্ডের কঠিন বর্ম। লাভ কম হলেও, এমন কি দু এক বছর লোকসান হলেও তিনি নির্ভয়। যে সব প্রতিষ্ঠানের তা নেই তাঁদের কথা ভাবতেই ভয় হয়।

ক্যামেরা, স্টুডিও, প্লেটমেকিং, অফসেট, লেটারপ্রেস, বক্সমেকিং, ভারনিশিং—বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট হৃষীবাবুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখে একটি জায়গায় এলাম। সেখানে তৈরী হচ্ছে মানচিত্র, গ্লোব, দেওয়ালে টাঙাবার ম্যাপ। এগুলো তৈরী হলে পাঠানো হবে এ'দের একটি আদি প্রতিষ্ঠান ধর্মতলার চণ্ডীচরণ দাস কম্পানির কাছে। ঈগল লিথো কম্পানিতে হৃষীবাবুর সঙ্গে আছেন তাঁর তিন ভাই যজ্ঞেশ্বর, মহেশ্বর ও জগদীশ; চণ্ডীচরণ দাস কম্পানিতে আছেন আর দুই ভাই মণিমোহন ও বিশ্বেশ্বর। মনে পড়লো স্কুলে পড়বার সময়ে জিওগ্রাফি ক্লাসে নদী-শহর-জেলা-মহকুমা আমরা ছাত্ররা দেখাতে না পারলে আমাদের দু' ঘা কষে নিয়ে সেই বেতেরই আগা দিয়ে আমাদের ভূগোল-স্যার নদীনালা যে ওয়াল-ম্যাপে দেখিয়ে দিতেন সেই মানচিত্র চণ্ডীচরণ দাস কম্পানির।

দুপুরের বিরতি হলো। ৭৫,০০০ বর্গ ফুটের কারখানা বাড়ীর দুটি তলায় ঘুরে ঘুরে তেষ্টা পেয়ে গিয়েছিল। সময় বুঝেই হৃষীবাবু আমাকে তেতলায় কর্মীদের ক্যাণ্টিনে নিয়ে গেলেন। চা খেতে খেতে দেখলাম পরিচ্ছন্ন ক্যাণ্টিনে কর্মীদের লাঞ্চ খাওয়া। কম্পানির সাহায্যে সস্তায় লাঞ্চ। এত বড় ঈগল লিথোর কর্মিসংখ্যা কিন্তু মাত্র ২৪০। যান্ত্রিক প্রগতির নিদর্শন।

আমার পরিক্রমায় সব শিল্পপতিকেই আমি শ্রমিকসমস্যা নিয়ে বিশেষভাবে প্রশ্ন করি। হৃষীবাবু বললেন, স্ট্রাইক, লকআউট, ঘেরাও এসব এখানে নেই। সর্বনিম্ন বেতন প্রায়

পৌনে দুশো টাকা, আবার ৭।৮০০ টাকা বেতনের যন্ত্রী-পরিচালকরাও আছেন। ওঁদের বোনাস, মেডিক্যাল ও অন্যান্য অ্যামেনিটিজও আছে। একটু থেমে থেমে হৃষীবাবু আবার বললেন, 'কিন্তু এরা এখন যতটা কাজ করে তার দেড়া করা উচিত। তবে আমরা বেশি চাপ দিই না।'

ফেরার পথে আমিও ভাবতে ভাবতে এলাম—বেশি চাপ না দেওয়াই ভালো। হৃষীবাবুর উদাহরণ সামনে না থাকলে যতটা কাজ এরা সুষ্ঠু সুন্দর করে করছে সেটাও না করে এরাও গাইতো, রাঁচীর শ্রমিকদের নবতম "রামধুন"—

রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পুরা পয়সা আধা কাম॥

১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৮





তিন

ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এখনো সামান্য যে কয়েকটি শিল্প মাথা উঁচু করে, অগ্রগতি বজায় রেখে, বাঙালীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ ভারতবাসীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, আমি পূর্ব-প্রবন্ধে বলেছি যে আমার মতে তাদের সামনের সারিতে আছে মুদ্রণশিল্প ও ব্লক-মেকিং। কলকাতা মেট্রোপলিটন পরিকল্পনা সংস্থার (সি-এম-পি-ও) সমীক্ষার ১৯৬২ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে কলকাতা ও শহরতলির প্রেসগুলিতে সেই সময়ে ৩২০০০ কর্মী নিযুক্ত ছিলেন। তার মধ্যে শুধু কলকাতা শহরের প্রেসগুলিতেই ছিলেন প্রায় ২৭০০০। কেবলমাত্র কলকাতা শহর ধরলে সমষ্টিগতভাবে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের (শুধু মুদ্রণ নয়) কর্মীদের শতকরা ৯·৬ জন ছিলেন ছাপাখানার শ্রমিক। সেই বছরে এই মুদ্রণ কর্মীদের মোট উপার্জন ছিল কলকাতায় ৩½ কোটি টাকা এবং বৃহত্তর কলকাতা নিয়ে ৪ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। তাঁদের মধ্যে শতকরা ৭৯ জন ছিলেন বাঙালী এবং তাঁদের মাথাপিছু আয় ছিল গড়ে মাসিক ১২৫৲ টাকা আন্দাজ। সেই বছরে সমষ্টিগত বেতনের শতকরা ১২ ভাগ উপার্জন করেন মুদ্রণ শ্রমিকেরা। প্রতিষ্ঠানগুলির মেশিনারী কারখানা ইত্যাদির দাম ছিল প্রায় ১৬ কোটি টাকা এবং কার্যকরী মূলধন ছিল প্রায় ৮ কোটি টাকা। ১৯৬২ সনের পরে এ বিষয়ে সি-এম-পি-ও'র আর কোনো পরিসংখ্যান হয়নি বলেই আমরা শুনেছি। একটা কথা সকলেই বোধ হয় জানেন যে সি-এম-পি-ও'র সমীক্ষা ক্ষেত্রের আয়তন আনুমানিক ৪৫০ বর্গমাইল।

পূর্ব প্রবন্ধে প্রকাণ্ড এই মুদ্রণ শিল্পের নানা সমস্যার বিষয়ে পরে কিছু জানাবো বলে পাঠককে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমার জ্ঞান সীমিত; তাই আমার সংগৃহীত তথ্যের ভুলত্রুটি নির্ণয়ের জন্য সেদিন গিয়েছিলাম এই শিল্পের একজন দিকপাল, শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডের সর্বাধ্যক্ষ ডিরেকটার শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে। তাঁর একার প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্মিসংখ্যাই হলো ৮০০, আদায় করা মূলধন প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা এবং গত বছরে এঁদের মুদ্রণকর্মের বাবদ মোট আয় (গ্রোস আর্নিং) ছিল প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা।

যাঁর মতামত এতটা মূল্যবান, সেই ব্যক্তি, তাঁর সহযোগীবৃন্দ এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে, খুব ছোট করে হলেও, পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া কর্তব্য।

এক কথায়, শ্রীসরস্বতী প্রেস হলো ভারতীয় মুদ্রকদের মধ্যে বৃহত্তম 'কমার্শিয়াল প্রিন্টিং' প্রতিষ্ঠান। অবশ্য বোম্বাইয়ের 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' প্রেসের মতো যে-সব সংবাদপত্র গোষ্ঠী নিজেদের বিরাট বিরাট ছাপাখানাতে কেবলমাত্র নিজেদের লক্ষ লক্ষ কপি দৈনিক, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রপত্রিকা ছাপিয়ে প্রকাশ করেন তাঁদের এই শ্রেণীভুক্ত করছি না। আমরা কেবল সেইসব মুদ্রকের সঙ্গেই শ্রীসরস্বতীর তুলনা করছি যাঁরা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অন্যের জন্য ছাপার কাজ করেন। তবে ঈগল্ লিথোগ্রাফিং কম্পানির বিশেষত্ব যেমন অফসেট মুদ্রণে, শ্রীসরস্বতীর প্রাধান্য তেমনি লেটারপ্রেসে, যদিও এঁদের অফসেট সামর্থ্যও যথেষ্ট আছে।

যে-সব প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র আয়তন থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে তাদের প্রায় সকলেরই ঐতিহ্য ও পুরাবৃত্ত সাধারণত জীবিকা-সন্ধানী মানুষের উপার্জনের প্রচেষ্টার জন্য বাণিজ্যভিত্তিক অথবা কোনো বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার-ভিত্তিক। বণিক গোষ্ঠী লয়েডস অফ লন্ডন অথবা আবিষ্কারক টমাস অ্যালভা এডিসনের মতো। তুলনায় অনেক অনেক ছোট শ্রীসরস্বতী এখন যদিও পুরোপুরি একটি বাণিজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান—এঁদের ঐতিহ্য কিন্তু দেশপ্রেম ও রাজনীতির।

অগ্নিযুগ ১৯১৬ সালে বরিশাল থেকে দুটি বিপ্লবী যুবক কলকাতায় এলেন। অধুনা পশ্চিমবাংলার রাজ্যসভার সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ও লোকসভার সদস্য শ্রীঅরুণ গুহ। এঁরা ছিলেন বরিশাল শঙ্করমঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর মন্ত্রশিষ্য। এঁরা আবার বিপ্লবী যুগান্তর পার্টির নিষ্ঠাবান কর্মীও ছিলেন। স্বামীজী বলতেন, কোনো রাজনৈতিক দলের কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে হলে একটা প্রকাশন ও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার। তাই শিষ্যযুগল রাজবন্দী হয়ে ক্রমাগত জেলে যাওয়া ও বাইরে আসার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলেন সরস্বতী লাইব্রেরী নামে একটি প্রকাশন উদ্যোগ। সঙ্গে ছিলেন যুগান্তর দলের আর একটি যুবক, ঢাকার শৈলেন গুহরায়। তিনজনেই গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। এঁদের সঙ্গে কর্মচারী হিসেবে ছিলেন গোপীনাথ সাহা (যিনি কলকাতার বাঘা পুলিস কমিশনার টেগার্টকে মারতে গিয়ে ভুল করে এক 'ডে' সাহেবকে মেরে ফেলে ফাঁসী গেলেন) এবং মহেন্দ্র দত্ত নামে আর এক বিপ্লপন্থী। ১৯২৩ সালে সামান্য ৩০০০৲ টাকা মূলধন নিয়ে এঁরা স্বামীজীর উপাধি অবলম্বনে শ্রীসরস্বতী প্রেস-এর প্রতিষ্ঠা করলেন বেনিয়াটোলা লেনে। প্রধান সহায়কদের মধ্যে ছিলেন ইন্ডো-সুইস ট্রেডিং কম্পানির অংশীদার যতীন হুই। মহেন্দ্রবাবু একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে, যতীনবাবু শৈলেনবাবুদের বাকীতে মেশিন না দিলে হয়তো সরস্বতী প্রেস কোনোদিনই গড়ে উঠতো না, কারণ সে-কালেও একটি কাজ চলার মতো প্রেস গড়ে তোলার পক্ষে ওই ৩০০০৲ টাকা সামান্যই ছিল। উপরন্তু আদর্শবাদী মালিক ও কর্মীদের প্রেসে ছাপানো হতো অনিলবরণ রায়ের 'সারথি', মুজাফ্ফর আহমেদের 'গণবাণী' ও সন্তোষকুমারী গুপ্তার 'শ্রমিক'-এর মতো সব রাজনৈতিক পত্রিকা যার পরিচালকেরা ঠিক মতো ছাপার খরচ দিতে পারতেন না। যে ব্যবসার এইরকম গ্রাহকবর্গ সে

ব্যবসা চলে কী করে? প্রেস বিক্রি হয় হয়। কিন্তু কারাগার থেকে অরুণ গুহ লিখে পাঠালেন : "যে রকম করিয়া হউক প্রেস বাঁচাইতে হইবে।" অরুণবাবু ও মনোরঞ্জনবাবু অর্থাৎ দাদারা জেলে বন্দী। ভায়াদের অর্থাৎ শৈলেনবাবু ও মহেন্দ্রবাবুর—সরস্বতী প্রেসের মস্তিষ্ক, হৃদয় ও দক্ষিণ-হস্তের—তখনকার সেই ক্লেশের ইতিহাস একটি রোমাণ্টিক গল্পের মতো। তাও শৈলেনবাবু অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ছিলেন; বেঙ্গল ল্যান্ডহোলডারস অ্যাসোসিয়েশনে দিনের বেলায় ভালো একটি চাকরি করে বিনা পারিশ্রমিকে সন্ধ্যা থেকে অনেক সময়ে সারারাত ধরেও প্রেসের কাজ দেখতেন। সরস্বতীর বর্তমান প্রোডাকসন ম্যানেজার মহেন্দ্রবাবুর তো কুলি, কম্পোজিটার, মেশিন-ম্যান, প্রুফরীডারির অমানুষিক খাটুনি খেটেও অনেকদিন ভাতই জুটতো না।

শৈলেনবাবু তাঁর নিজের সম্বন্ধে বললেন, আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহায়তায় সুরেশবাবুর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে শৈলেনবাবু হাতে কলমে কাজ শিখেছিলেন। এ-কথা তিনি সকৃতজ্ঞভাবে বললেন। তার আগে নাকি তিনি সত্যজিৎ রায়ের পরলোকগত পিতা কবি ও হাস্যরসিক সুকুমার রায় মশায়ের আমলে ইউ-রায় অ্যান্ড সন্সের মুদ্রণ বিভাগেও কিছুদিন শিক্ষানবিসী করেছিলেন।

এই হলো শ্রীসরস্বতী প্রেসের জন্মকথা। সামান্য তিন হাজার টাকার পার্টনারশিপের ছোট্ট ছাপাখানা থেকে আজকের এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের শেয়ালদার ভাড়া বাড়িতে এবং নিজস্ব ৭½ বিঘা জমির উপরে বেলঘরিয়ার প্রকাণ্ড বাড়িতে আধুনিক লেটার-প্রেস আছে পঞ্চাশটিরও বেশী, ফটো-অফসেট মেশিন আছে আটটি, (আরো তিনটি অফসেট মেশিন শীঘ্রই আসছে; একটি ৪-কালার, কলকাতায় যেটি নাকি হবে সর্বপ্রথম, একটি ২-কালার এবং একটি এক-কালার), ব্লক মেকিং আছে, সিলকস্ক্রীন প্রিন্টিং আছে, পাঁচটি লাইনো ও চারটি মনোটাইপ মেশিন আছে, সর্ট-কাস্টার ও সুপার-কাস্টার টাইপ-তৈরির মেশিন আছে—যে টাইপ তাঁরা বাজারেও বিক্রি করে থাকেন; আর আছে দ্রুততম বেগে ছাপার উপযোগী ৩৬"×৫০" সাইজের কাগজে একসঙ্গে কাগজের দুই পিঠে ৬৪ পৃষ্ঠা করে ঘণ্টায় ৬৫০০ কপি মুদ্রণ শক্তিসম্পন্ন 'লেটার-প্রেস শীট-ফেড্ পারফেক্টর রোটারি প্রেস'। অতি আধুনিক, ছয় লক্ষ টাকা দামের জার্মানিতে তৈরী এই অতিকায় যন্ত্রটি ১৯৬৭-র সেপ্টেম্বর মাস থেকে চালু করা হয়েছে। এই শীট-ফেড মেশিনটি আবার এশিয়ায় (সম্ভবত জাপান বাদে) সর্বপ্রথম আমদানী। ১৯৬৯-এর জুলাই মাসে এইরকম আরো একটি মেশিন শ্রীসরস্বতীতে বসানো হবে বলে জানলাম।

প্রসঙ্গত বাঙালীর মালিকানায় অন্যান্য বড়ো বড়ো প্রেসের বিষয়ে শৈলেনবাবুর সঙ্গে আলোচনা হলো। শ্রীঅশোককুমার সরকারের শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস ছাড়াও ঈগলের হৃষীবাবু, গোসেনের নীরদবাবু, লালচাঁদ রায়ের লালচাঁদবাবু, নাভানার গোপাল রায়, লয়াল আর্টের নারায়ণ লাহিড়ী, রেডিয়্যাণ্টের মুখোপাধ্যায়দের, ইটন প্রেসের কানাই ও বলাই চট্টোপাধ্যায়ের, নবমুদ্রণের ব্রজদুলাল সেনের, ক্যাক্সটনের অরুণ ঘোষের, রায় কোম্পানীর শুভেন রায়ের এবং অন্যান্য কয়েকজন মুদ্রকের সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা শৈলেনবাবুর মুখে শুনলাম।

এর পরেই গুহরায় মশায়কে আমার মূল প্রশ্নে ফিরিয়ে আনলাম। সমস্যা ও সমাধান।

শৈলেনবাবুর নির্দেশে তাঁর একান্ত সচিব বরুণবাবু আমার হাতে দিলেন 'বাংলায় মুদ্রক সমিতি'-র ১৯৬৭ সালে অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি শ্রীকালীচরণ পাল (নবজীবন প্রেস) মহাশয়ের অভিভাষণের একটি কপি। সম্পূর্ণ অভিভাষণটি দীর্ঘ। কিছু কিছু উদ্ধৃতি থেকেই আমার প্রশ্নের উত্তর অনেকটা পাওয়া যায় : "স্বাধীনতার পরে ভারতের দ্রুত উন্নতি এবং শিক্ষাপ্রসারের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বাহন মুদ্রণশিল্প।...আজ সমগ্র পৃথিবীতে মুদ্রণ পারিপাট্যের উপযোগী নব নব যন্ত্রাদি আবিষ্কার হইতেছে।...মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান মুদ্রক ব্যতীত গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সাধারণভাবে মুদ্রক গোষ্ঠী সরকারী আমদানী নীতির বাধা অতিক্রম করিয়া নূতন যন্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন নাই। মূলধনের অভাব, নূতন মেশিনের আকাশ-স্পর্শী দাম এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণের বেড়াজালের মধ্যে পুরাতন মেশিন পরিবর্তন করা বা আধুনিকীকরণের কল্পনাও তাঁহারা করিতে পারেন না।...মুদ্রণের দরের সহিত পড়তার কোনও সম্বন্ধ নাই। মৌলবস্তুর দাম বাড়িতেছে, শ্রমিকের মজুরী বাড়িতেছে, সরকারী ট্যাক্স বাড়িতেছে, মুদ্রকদিগের পারিবারিক খরচ বাড়িতেছে অথচ কাজের দাম সেই অনুপাতে বাড়িতেছে না।.. সমস্যা অনেক। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদ্বেগজনক সমস্যা শ্রমিক অশান্তি। কিছুকাল ধরিয়া, বিশেষভাবে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানে, শ্রমিক আন্দোলন আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া আছে।...ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানই আজ নিশ্চিন্তে অর্ডার লইতে পারেন না।..."

মুদ্রণ শিল্পের আগামী দিনের কর্মীদের প্রশিক্ষার অব্যবস্থার প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে কালীচরণবাবু বলেছেন, "আর একটি সরকারী অব্যবস্থিতচিত্ততা প্রিন্টিং স্কুল সম্বন্ধে। পশ্চিম বাংলার প্রিন্টিং স্কুল স্থানীয় মুদ্রকদিগের চেষ্টা সহযোগিতা এবং বদান্যতায় স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে এই শিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে শিল্পের প্রতিনিধি নাই। ক্রীড়াবিদের দ্বারা ধর্মসভা পরিচালিত হইতেছে। ইহাতে ছাত্র এবং শিল্প কাহারও লাভ হইবে না। আমরা সরকারের কাছে বার বার প্রতিবেদন দিয়াছি কিন্তু কোনও ফল হয় নাই।"

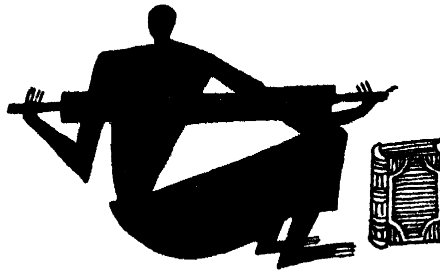
মুদ্রকগোষ্ঠীর কোনো কোনো লোকের মুখে এর আগে শুনেছি যে, কেবল এই পশ্চিম বাংলার প্রিন্টিং স্কুল স্থাপনেই নয়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রেসকর্মী গড়ে তোলার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারদের উদ্বুদ্ধ করার মূলে রয়েছেন আমাদের গুহরায় মশায় নিজেই। তাই মুদ্রক সমিতির সভাপতির ভাষণটি পড়ে আমি এ বিষয়ে শৈলেন-বাবুর নিজস্ব মতামত জানতে চাইলাম। তিনি বললেন যে, স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মুদ্রণ-শিল্পের গবেষণাগার স্থাপনের জন্য সরকার থেকে কল্যাণীতে ৫০ বিঘা জমি দিয়েছিলেন; কিন্তু নানা কারণে তার রূপায়ণের কোনো কিছুই করা সম্ভব হয়নি। এখন গুহরায় মশায় সচেষ্ট যাতে জাতীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের) উদ্যোগে এই প্রশিক্ষা ও গবেষণা বিদ্যালয়টি সত্বর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

উপসংহারে আবার উঠলো শ্রমিক সমস্যার কথা অর্থাৎ আমাদের শিল্পোদ্যোগের এখন যেটা গোড়ায় গলদ। সে সম্বন্ধে শৈলেনবাবু বললেন যে, সরকারের মূল নীতি যদি 'ওয়ার্ক'

বায়াসড্ এমপ্লয়ে ওয়ার্কার বায়াসড্ হয়' অর্থাৎ কাজ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহের পক্ষে না হয়ে সরকারের নীতি যদি শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হয়, তা হলে সমস্যার সমাধান হবে না। রুমানিয়ার মত কমিউনিস্ট দেশেও শিল্পের উৎপাদনের সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না বলে সেই রাষ্ট্র তাঁদের শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের নীতির পরিবর্তন করে সম্প্রতি জোর দিয়েছেন যাতে শ্রমিকের কর্মপটুতা পুরস্কৃত হয়। অন্যথায় দণ্ড—মাইনে কম দিয়ে। মোট কথা, রুমানীয় সরকার এখন রাজনৈতিক অনুশাসন ও নতুন নতুন শ্রমিক আইন প্রবর্তনের মত অবাস্তব উপায়ের চাইতে ভালো কাজের জন্য, বেশী উৎপাদনের জন্য নগদে অথবা বস্তুতে (মেটিরিয়্যাল) পুরস্কার দেওয়াটাকেই শিল্পোন্নয়নের রাজপথ বলে ধরে নিয়েছেন। আমাদের সরকারের শ্রম বিভাগও যদি একটা সৎ, আন্তরিকতাপূর্ণ, বলিষ্ঠ নীতি গড়ে তুলে ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে মালিক ও শ্রমিক পরস্পরের সমস্যা সমাধান করতে পারেন—যে নীতি শ্রমিক এম এল এ'র চীৎকার বা মালিকের বড় কারখানার চিম্‌নির ধোঁয়ায় অন্ধ না হয়—তা হলেই এই সমস্যার জটিলতা অনেকটা কমে আসে।

তা যদি না হয় তা হলে, এখন যেমন ন্যায্য দামে সময়মত ছেপে ডেলিভারি পাওয়ার আশা নেই বলে কলকাতার বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান তাঁদের লেবেল-ক্যালেণ্ডার কলকাতার প্রেসে ছাপতে না দিয়ে সুদূর মাদ্রাজের দ্রুত-প্রগতিশীল শিবকাশি শহর থেকে ছাপিয়ে আনছেন, তেমনি বাঙালীর রাজনীতি-নেশায় মশগুল অবস্থায় হয়তো কিছুদিন পর থেকে বাঙালী ছেলেমেয়ের স্কুলের বাংলা বই 'কিশলয়'ও ছাপিয়ে আনতে হবে কাশ্মীরের পহলগাঁও অথবা নেফার বমডিলা থেকে। অর্থাৎ যে স্থানে এখন শিল্পের নামগন্ধও নেই সেখানেও হয়তো ততদিনে শিল্পোদ্যম এতটা এগিয়ে যাবে যে, নেশাতুর বাঙালী হঠাৎ একদিন চট্‌কা ভেঙে উঠে দেখবে যে, শুধু মুদ্রণ কেন, সব ব্যবসা-বাণিজ্যই বেহাত হয়ে গিয়েছে।

২০ জানুয়ারি, ১৯৬৮





চার

১৯৩৩-৩৪ সাল। স্থান—প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সনসের কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের অফিস। চেয়ারের ওপরে উবু হয়ে বসে, হাঁটুতে খবরের কাগজ রেখে নিত্যসহচর চুরুটটি হাতে এক মনে পড়ছিলেন শরৎ চাটুজ্যে মশাই। শুভ মুখার্জি নামে বাইশ তেইশ বছর বয়সের একটি ছেলে গুরুদাস লাইব্রেরীর মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, কিছু বই বাঁধাইয়ের অর্ডার আনা। খবর পেয়েছিলেন যে শরৎবাবুর নতুন লেখা বই ছাপানো হবে—যদি বাঁধাবার কাজটা পাওয়া যায়। আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল—মামুলি বাঁধাইয়ের বদলে শরৎবাবুর বইগুলির মলাটে যদি কিছুটা অলঙ্করণ থাকে, যাতে সুদৃশ্য বই পাঠকের মনোরঞ্জক হয়।

হরিদাসবাবু ইশারায় শরৎবাবুকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "ওঁকে কথাটা বলো না!" শুভবাবু শরৎবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাগজটি নামিয়ে শরৎবাবু তাঁর দিকে তাকালেন। প্রস্তাবটা শুনে মুখখানা আবার কাগজের আড়ালে নিয়ে শরৎবাবু বললেন, "খবরের কাগজে বাঁধিয়ে দিও!" সারার্থ—সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বইয়ের মলাট পুরনো খবরের কাগজ দিয়ে বাঁধালেও পাঠক তা কিনবে ও সাগ্রহে পড়বে। শুভবাবু আর কথা বলবার সুযোগ পেলেন না। সেই কৃচ্ছ্রতার যুগে 'বাজে খরচ' করে গ্রন্থ প্রকাশের পড়তা বাড়ানো উচিত ছিল না বলেই, অথবা কারুশিল্পের প্রয়োগে বইটিকে সুদৃশ্য করবার প্রয়াসের প্রতি অনীহাবশতই শরৎবাবু সেই উত্তর দিয়েছিলেন কিনা তা বলা যায় না। শুভবাবু মামুলি ছাঁদেই বাঁধালেন : অনুরাধা, সতী ও পরেশ—তিনটি গল্পের একটি বই।

কিন্তু জীবিত থাকলে আজকের দিনে শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই শুভবাবুকে সে উত্তর দিতেন না। পাঠকের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছে। তারা কেবল ভালো বই-ই চায় না, সুন্দর বই-ও চায়। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী দৌহিত্র বেঙ্গল বুক বাইন্ডিং কম্পানির স্বত্বাধিকারী শুভ মুখোপাধ্যায় সেই অল্প বয়সেই এই তত্ত্বটি বুঝেছিলেন যে, হাওয়া বদলাচ্ছে—দেশবাসীর সৌন্দর্যবোধ বাড়ছে। পুস্তক-গ্রন্থনকেও শিল্পবস্তু করে তুলতে হবে।

কিন্তু বাস্তবে তার প্রথম রূপ দেওয়ার সৌভাগ্য তাঁর হয়ে ওঠেনি। তখন থেকেই বিশ্ব-

ভারতীর বই বাঁধাইয়ের একটা কৌলিন্য ছিল ঠিকই, কিন্তু শুভবাবু যা চেয়েছিলেন সে-পথ সর্বপ্রথমে বেছে নিলেন সিগনেট প্রেস। প্রচ্ছদ-শিল্পী সেই সত্যজিৎ রায়—যাঁর কথা আমাদের পূর্ব প্রবন্ধের মতো এইভাবে বারে বারেই বোধ হয় বলতে হবে—এবং দিলীপ গুপ্ত, সিগনেট প্রেসের যিনি ছিলেন প্রাণ এবং এখন যিনি 'বাটা'-র প্রচার-সচিব। বাঙলার, তথা ভারতের পুস্তক-গ্রন্থন ব্যবসায়ে এঁরা দুজনে সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিলেন।

কলকাতার দপ্তরীপাড়া। বৈঠকখানা, অ্যান্টনিবাগান, করিস চার্চ লেন অঞ্চল। আদিকাল থেকে পূর্ববঙ্গের দরিদ্র মুসলমান দপ্তরীরা এই অঞ্চলে ছোট ছোট কারখানাতে কঠিন পরিশ্রমে কাজ করতেন। ১৯২৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে হিন্দু প্রকাশকদের কাছে সেই অঞ্চল দুর্গম হয়ে উঠলো। রবীন্দ্রনাথেরও কতকগুলি বই ছাপা হয়ে পড়ে রইলো। বাঁধানো হচ্ছিল না। অবনীন্দ্রনাথের বড়ো-জামাই, রবীন্দ্রনাথের নাত-জামাই নির্মল মুখোপাধ্যায় মশায় এ-ব্যবসা সে-ব্যবসা করতেন। রবীন্দ্রনাথ একদিন কথায় কথায় তাঁকে বললেন যে, দু'তিনজন মুক্ত রাজবন্দী ভদ্র হিন্দু ছেলে বুক-বাইণ্ডিং করছেন বলে শোনা যাচ্ছে, কিন্তু মূলধন ও অভিজ্ঞতার অভাবে তাঁরা চালাতে পারছেন না। তা' নির্মলবাবু এই ব্যবসাটি করলেই তো পারেন; তাহলে লেখক প্রকাশকদের এমন মুশকিলেও পড়তে হয় না; আর এই কাজের ভবিষ্যৎও তো ভালোই মনে হয়। উপদেশটি নির্মলবাবুর মনে গাঁথা হয়ে রইলো।

শুভবাবু তখন সতের আঠার বছরের ছেলে। ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেল প্রেসে অ্যাপ্রেণ্টিস। ১৯৩০ সালে সেখানে তিনি পাকা চাকরি পেতে পারতেন। কিন্তু ইংরেজের অধস্তন হয়ে কাজ করতে চাইলেন না শুভবাবু সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে। বাবা, নির্মলবাবু তাঁকে নিয়ে পত্তন করলেন এই বেঙ্গল বুক বাইণ্ডিং কম্পানির। ব্যবসা-ভিত্তিকভাবে এঁরাই হলেন প্রথম বাঙালী হিন্দু সম্ভ্রান্ত পরিবার যাঁরা দপ্তরীর কাজ বেছে নিলেন।

এখানে শুভবাবুর মুখে শোনা, ছোট অথচ জ্ঞাতব্য একটি তথ্য, অবান্তর হলেও বোধ হয় উল্লেখযোগ্য। শুভবাবু একদিন স্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচার কম্পানিতে গেছেন কাজের সন্ধানে। অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র পরিচয়টা ম্যানেজার মহাশয়ের জানা ছিল। তিনি বললেন যে, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা যাতে কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশনের ভার স্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচার পায় সেই প্রস্তাবটি যদি শুভবাবু বিশ্বভারতীর কাছে উত্থাপন করেন তো খুব ভালো হয়। শুভবাবু সে কথা বিশ্ব-ভারতীর প্রকাশন বিভাগের তদানীন্তন সহ-সচিব কিশোরীমোহন সাঁতরা মশায়ের কাছে বলেন। অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন কিশোরীবাবুর ঊর্ধ্বতন—সেক্রেটারী। বুদ্ধিমান লোক। তিনি পরামর্শ দিলেন যে বিশ্বভারতীই সে ভারটি নিজে রাখুক। তাই হলো। চামড়াতে বিশেষভাবে বাঁধানো প্রথম একশো সেট যাঁরা নেবেন তাঁদের কাছ থেকে একশো টাকা করে অগ্রিম নিয়ে বিশ্বভারতীর প্রথম পর্যায়ের রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রকাশ শুরু হলো। ছাপা হলো 'তাপসী প্রেস'-এ এবং বলা বাহুল্য বাঁধাইয়ের কাজ পেলেন বেঙ্গল বুক বাইণ্ডিং। এটা হলো ১৯৩৯ সালের কথা। এই রচনাবলীর যে রেক্সিনে বাঁধাই সংস্করণটি একই সঙ্গে প্রকাশিত হলো, তাও নাকি একদিক দিয়ে অসাধারণ। শুভবাবুর মতে সেইটিই নাকি ভারতে প্রথম রেক্সিনে বাঁধানো গ্রন্থ।

এই সময়ে আর একটি প্রতিষ্ঠান জন্ম নিলো। অধুনাখ্যাত বাসন্তী বুক বাইন্ডিং। মালিক শ্রীআশুতোষ মজুমদার। শিক্ষিত বাঙালীর আর একটি সফল প্রতিষ্ঠান। এর পরে যাঁরা আবির্ভূত হলেন তাঁদের কয়েকজনের মধ্যে এলেন আমাদের লেখক মনোজ বসু মশায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীশচীন বসুর নিউ বেঙ্গল বাইন্ডারস এবং শ্রীমাখনলাল ভট্টাচার্যের স্বপ্না প্রিন্টিং অ্যান্ড বাইন্ডিং ওয়ার্কস। এঁদের মধ্যে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের আয়তন বেঙ্গল বুক বাইন্ডিং-এর চাইতে এখন অনেক বড় হয়েছে। ভারত সরকারের অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতাতে বাঙলার গ্রন্থকেরাই এ যাবৎ বেশির ভাগ পুরস্কার পেয়েছেন। স্বপ্নার মাখনবাবুর বিশেষ কৃতিত্ব হলো যে, ১৯৬৭ সালের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতাতে সর্বভারতীয় গ্রন্থকদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তিনটি পুরস্কারই তিনি নিয়ে এসেছেন।

এর আগে যে ঈগল লিথো, সরস্বতী প্রেসের কথা লিখেছি, তাঁদের পুরোদস্তুর গ্রন্থন বিভাগ আছে; কিন্তু এই প্রবন্ধে যাঁদের কথা লিখছি তাঁরা সবাই হলেন একক বাঁধাইয়ের কাজের দপ্তরীখানা।

পুস্তক গ্রন্থনের টেকনিক্যাল দিকটির বিবরণ লিখে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। কেবল একটি তথ্য সকলের কাছে উপস্থিত করছি। সাধারণ ফোঁড়-সেলাই কিংবা জুস-সেলাই (সেকশ্যানাল থ্রেড স্টিচিং) ইত্যাদি ছাড়া এখন যেমন বিলিতি পেপার-ব্যাক সিরিজে বিনা সেলাইয়ে বাঁধাই চালু হয়েছে, ভারতীয় গ্রন্থন শিল্পেও তা এসেছে ১৯৫৬-৫৭ সালে। বেঙ্গল বুক বাইন্ডিং-ই এখানে তার প্রবর্তন করেন বলে শুনলাম। কিন্তু বাতাবরণের প্রতিকূলতার জন্য এই জাতীয় সেলাই-ছাড়া বাঁধাই বোধহয় চালানো যাবে না, কারণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আঠা গলে গিয়ে এই বাঁধাই খুলে যায়।

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু মহাশয় তাঁর 'শিল্পকথা'-তে বলেছেন : শিল্পচর্চার দুটো দিক আছে—একটা আনন্দ দেয়, আর-একটা অর্থ দেয়। চারুশিল্প ও কারুশিল্প। কারুশিল্প আমাদের জীবনযাত্রার পথকে কেবল যে সুন্দর করে তোলে তাই নয়, অর্থাগমেরও পথ করে দেয়। প্রয়োজনের ক্ষেত্র থেকে শিল্পকে বাদ দেওয়া জাতির পক্ষে অর্থাগমের দিক দিয়েও অত্যন্ত ক্ষতিকর।

গ্রন্থন কাজে কারুশিল্পীর প্রকৃত শিল্পসৃষ্টির সময় আসে বাঁধাইয়ের পরে। প্রচ্ছদের অলঙ্করণ যেন অভিসারিকার-অঙ্গরাগ। সাধারণভাবে পুরু কাগজের উপরে প্রেসে-ছাপানো নানা রঙের নয়নাভিরাম ছবি ছাড়াও বেনারসী ব্রোকেড, মুগার কাপড়, র'-সিল্ক কিংবা মিহি মাদুরের মনোহর সজ্জায় বইয়ের মলাটকে শোভিত করা হয়। তার উপরে সোনালী রুপালী পাতে (গোল্ড এমবসিং করে), নয়তো সিল্ক-স্ক্রীনে করা হয় তার নামাঙ্কন—যেন বরবর্ণিনীর চন্দন-চর্চা।

এতক্ষণ ধরে কেবল প্রকাশকের বই বাঁধাইয়ের কথাই বলেছি। আমাদের দেশের বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য উপহারের উপযোগী 'নভেলটি আইটেমস্' তৈরি করাও আমাদের গ্রন্থক-

দের বেশ একটি লাভের ব্যবসার দিক আছে। বিদেশে অবশ্য এর প্রচলন আগেই হয়েছিল, কিন্তু এই সব জিনিসকে ভারতীয় কারুশিল্পে সজ্জিত করবার পথ দেখিয়েছেন আমাদের বাঙালী শিল্পীরাই। এখন এখানকার দেশী ও বিদেশী শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁদের গ্রাহক খরিদদারদের তোষণের জন্যে ডায়েরী, ক্যালেণ্ডার, ক্যাটালগের মতো অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস এই সব গ্রন্থকদের দিয়ে করিয়ে নিয়ে উপহার দেন। টি-বোর্ডের ১৯৬৫ সালের মাদুরের মলাট ও ১৯৬৮ সালের র' সিল্কে মোড়া ডায়েরী দুটি এবং কেশোরামের ১৯৬৮ সালের ডায়েরীটি নমুনা হিসেবে দেখিয়ে শুভবাবু বললেন যে, এক একটির মোট খরচ নাকি পড়েছে প্রায় ত্রিশ টাকা করে। 'নভেলটি আইটেমস'-এর মধ্যে প্লাস্টিক ও রেকসিনে বাঁধানো চিঠিপত্রের ফাইল, কাগজ রাখার ফোলডার, শুভবাবুও অনেক রকম তৈরি করেন তাঁর জার্মেনী থেকে আমদানি করা দামী দামী প্লাস্টিক ওয়েলডিং মেশিনে।

নিপুণ হাতে কঠিন অধ্যবসায়ে যাঁরা এই সব মনোহর জিনিস তৈরি করেন, যাঁরা বইগুলি সুন্দর করে বাঁধিয়ে দিলে মালিক পান জাতীয় পুরস্কার, তাঁদের কথা অর্থাৎ বাইণ্ডিং শ্রমিকদের কথায় শুভবাবু বললেন যে, বেঙ্গল বুক বাইণ্ডিং-এর মতো আয়তনের একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মি-সংখ্যা আন্দাজ ৫০জন। মাসিক আয় এঁদের ৭৫ টাকা থেকে ২০০ টাকা। আমাদের দক্ষ মুসলমান কারিগরেরা প্রায় সকলেই পাকিস্তান চলে গিয়েছেন। অধিকতর ক্ষেত্রে তাঁদের স্থান নিয়েছেন পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা মানুষেরা। শুধু পুরুষই নয়, মেয়েরাও। কাগজ ভাঁজাইয়ের (ফোলডিং) কাজে প্রধানত মেয়েরা থাকেন আর পুরুষেরা করেন সেলাই ফোঁড়াই মেশিন চালানোর কাজ। কিন্তু সেই মুসলমান দপ্তরীদের মতো দক্ষতা এখনো এঁদের হয়নি। তাঁদের মতো নতুন কর্মীদের চাই উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। কিন্তু—বারবার বলতে ভালো লাগে না—আমাদের যাদবপুরের সরকারি প্রিণ্টিং স্কুলে নাকি এই বিদ্যাও শিক্ষার্থীরা ভালো করে পান না। সুপারভাইজার হতে পারেন—শ্রমিক নয়। হাওড়া হোমস্-এও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ফল হয় একই। গ্রন্থকদের নিজেদের একটি সমিতি আছে, 'পুস্তক গ্রন্থন ব্যবসায়ী সমিতি।' উচিত তাঁদের পক্ষ থেকেই বাঁধাই শেখানোর ব্যবস্থা করা, শ্রমিককে কাজে নেওয়ার আগে। কিন্তু যে-শিল্প মাত্র গত দুই-তিন দশকে বস্তি-শিল্পের পর্যায় থেকে কুটির শিল্পে উন্নীত হয়েছে বহু চেষ্টার পর, সেই শিল্পের মালিকদের সে ব্যবস্থা করবার সামর্থ্যই বা কতটুকু? আজকের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক মোট বিক্রি যেখানে টাকার হিসেবে কোটি পেরিয়ে অর্বুদে পেঁছয়, সে জায়গায় এই গ্রন্থন-শিল্পের এক একটি প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিক্রি মাত্র দেড়-দু লক্ষ টাকা। লাভ বা উদ্বৃত্ত যা থাকে তার থেকে বাঁচিয়ে একটা স্কুল খোলার ব্যবস্থা করা এঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

হায়, আমাদের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার! যাতেই তাঁরা তাঁদের মঙ্গলহস্তের স্পর্শ লাগান সেটাই হয়ে দাঁড়ায় পর্বতের মূষিকপ্রসব তুল্য। তিন তিনটি পাঁচসালা প্ল্যান কেঁদে ফলাফল আজ যেখানে এসে ঠেকেছে তা হলো অগণিত মানুষের অনাহার ও অর্ধাহার এবং শতকরা চুয়াত্তরজন ভারতবাসীর নিরক্ষরতা। সেই সরকার আবার প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় চালাবেন! সেদিন শুনলাম যে স্বর্গীয় ডাঃ বিধান রায় ফুল ও ফল ফলানো বিদ্যায় বাঙালী তরুণকে হাতেকলমে কাজ শেখানোর জন্যে এক 'ফ্লাওয়ার বোর্ড' গঠন করে কল্যাণীতে বিস্তৃত জমির বন্দোবস্তও করে দিয়েছিলেন। ভালো ফুলফলের রপ্তানির বাজার আছে প্রকাণ্ড। হল্যাণ্ড দেশটি তো টিউলিপ ফুল রপ্তানি

করেই প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে—আর আমরা বাঙালীরা? আমাদের কল্যাণীর ভাবী শালিমারবাগে এখন গরু-ছাগল চরে।

যান্ত্রিক আধুনিকতা আনাও গ্রন্থকদের আর-একটি অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু এখানেও সেই সমস্যা—মূলধনের অভাব। যাঁরা এঁদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল তাঁদের আবার সমস্যা সরকারি আমদানি নীতির বেড়াজাল ভেদ করে আসা।

তবুও নিরুদ্যম হলে চলবে না, লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

বাঙালীর ব্যবসা নিয়ে যখন লিখতে বসেছি তখন তার অর্থকরী দিকটার উপরেই আমাদের বেশি লক্ষ্য। তবুও নন্দলালের ভাষায় আর-একবার এ কথা বলে শেষ করি যে, নানা বাধা-বিঘ্ন লঙ্ঘন করে অতি কষ্টে অর্থাগমের পথ করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই বাঙালী কারুশিল্পীরা—এই শুভবাবু, আশুবাবু, শচীনবাবু, মাখনবাবুরা—তাঁদের সৌন্দর্যের সোনার কাঠি আমাদের নিত্যপ্রয়োজনের জিনিসগুলিতে ছুঁইয়ে আমাদের জীবনযাত্রার পথকে আরও সুন্দর করে তুলুন।

২৭ জানুয়ারি, ১৯৬৮





পাঁচ

বর্ণ পরিচয়! স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ! স্বরের আবার বর্ণ কি? ব্যঞ্জনবর্ণের মানে কি?

বলতে লজ্জার কিছু নেই যে, মলয়বাবুর তূণের প্রশ্নবাণ ক'টির ঘায়ে আমার মতো সামান্য রিপোর্টার কেন, অনেক সাহিত্য মহারথীও উত্তর খুঁজে না পেয়ে ধরাশায়ী হবেন।

কালিকা টাইপ ফাউনড্রী প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেকটর শ্রীমলয় চক্রবর্তী, এম-এ, যে ঠিক পাণ্ডিত্যাভিমান বশেই এই প্রশ্নগুলি করলেন তা নয়। আমি তাঁকে টাইপ ফাউনড্রী ও টাইপোগ্রাফির গোড়া থেকে শুরু করতে বলাতেই আমার এই বিপত্তি। শুধু তাই-ই নয়, যে দু'তিন ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে আমি কাটালাম, সেই ছোট সময়টুকুর মধ্যেই তিনি পঞ্চতন্ত্রকথামুখম্ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, বৈষ্ণবসাহিত্য, সমরসেট ম'ম, বার্নাড শ' পার হয়ে আমাকে স্তম্ভিত করে যখন উর্দু আর ফার্সী শায়ের ও রুবাই আওড়ে শেষ করলেন, তখন আমি বার দুই ঢোঁক গিলে বলেই ফেললাম যে, কোনো শিল্পপতির সঙ্গে ইণ্টারভিউ করতে এসে কখনো এত বেকায়দায় পড়িনি মশাই—ডেঞ্জারাস লোক তো আপনি!

টাইপোগ্রাফ ও লিপিতত্ত্ব রসজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেছেন যে, সব দেশেরই সাংস্কৃতিক মান বিচার করবার দুটি মাপকাঠি আছে—স্থাপত্য ও মুদ্রণশৈলীর সৌন্দর্য। তাঁরা আরও বলেছেন যে, সফল টাইপোগ্রাফারকে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হবে অতীত ও বর্তমানের আর্ট, সাহিত্য, অক্ষরসজ্জা ও ছাপার কায়দা, সব বিষয়েই। তাঁকে একজন কৃষ্টিবান ব্যক্তি হতে হবে আর ভালো টাইপ ফাউণ্ডারকেও টাইপোগ্রাফি জানতে হবে ভালো করে।

কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে (অবশ্য আজকের বাঙলা দেশের সংকর সংস্কৃতির কথা বাদ দিয়ে) আমরা হাই-মার্কস পাবো এবং ব্যক্তিগতভাবে মলয়বাবু বোধ হয় ফার্স্টক্লাসই পাবেন।

মলয়বাবুরা পাঁচ ভাই। মধ্যমপাণ্ডব নিলয়বাবুর বয়স বছর পঁচিশেক। তিনি কালিকা টাইপ ফাউনড্রীর শিক্ষানবিস কর্মাধ্যক্ষ।

ভাইয়েদের মধ্যে সকলের ছোট সঞ্জয়কে মলয়-নিলয় লাগিয়েছেন মেশিন চালানো শেখার

কাজে। তার জন্যে সঞ্জয়কে নাড়া বাঁধতে হয়েছে কালিকার তিনপুরুষের একনিষ্ঠ কর্মী পঞ্চুবাবুর কাছে। দেখে ভালো লাগলো যে নিতাই, মদন আর দুখীরামের সঙ্গে সঞ্জয়ও একনাগাড়ে মেশিন চালিয়ে যাচ্ছেন সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত। মালিক ও শ্রমিকের ভেদাভেদ দূর করার এ এক সার্থক প্রচেষ্টা।

মলয়বাবুর পোর্টফোলিও হলো পলিসি, ফিনান্স ও লিয়্যাজ°; নিলয়বাবু হলেন, যাকে বলে অফিস-মাস্টার; আর সঞ্জয়ের দায়িত্ব হবে প্রোডাকশন।

মলয়বাবুর সঙ্গে আলোচনা সবে শুরু করেছি, এমন সময়ে এক অতি সুপুরুষ বৃদ্ধ ঘরে ঢুকলেন। মলয়বাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, তাঁর পিতৃদেব মনোরঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। পিতা-পুত্র—ইংরেজীতে যাকে বলে, 'কোয়াইট এ হ্যাণ্ডসাম ফ্যামিলি'। এ'রা সকলেই আবার কুস্তিগির। স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিতে সমুজ্জ্বল!

মলয়বাবু আবার একটি প্রশ্ন করলেন—কুস্তিগিরের শামতুল্লাহ্ মুগুরের এক ঘা'—তালব্য শ'য়ে হ্রস্ব-উকার 'শু' অক্ষরটি 'শু' না হয়ে হাতের অক্ষরের ওরকম পুঁটলির মতো হয়ে গেল কেন তা আমি জানি কিনা। আমার একই উত্তর, জানি না।

এবারে তিনি তাঁর ড্রয়ার খুলে একটি বই বের করে আমাকে দিলেন। পুরনো কিন্তু ঝরঝরে ছাপা। বইটার নাম: "কবিতা রত্নাকর" (কবিতা রত্নাকর—কালেকশন অফ স্যানস্ক্রট প্রোর্ভাবস ইন পপুলার ইউজ। ট্রানস্লেটেড ইনটু বেঙ্গলী অ্যান্ড ইংলিশ। কমপাইলড্ বাই নীলরত্ন হালদার)। তার নীচের লাইনটা পড়েই চমকে উঠলাম—'সেকেণ্ড এডিশান, শ্রীরামপুর ১৮৩০'—১৩৭ বছর আগেকার ছাপা বই! তাতে ওই হাতের টাইপের পুঁটলির মত শ'য় উ-কার এবং 'শু' ছাড়াও আর একটা অক্ষর বিশেষ করে চোখে পড়লো। তখনকার অনুস্বার। বিন্দুটি বাঁকাদাঁড়ির ওপরে না হয়ে নীচে। মলয়বাবু বললেন যে, সংস্কৃত অনুস্বারের মাত্রার উপরকার বিন্দুটি তখনকার টাইপ ফাউন্ডারদের মর্জিমতো এইভাবে বেঁকানো মাত্রার নীচে নেমে গিয়েছিল, এখন আবার উঠে এসেছে। দেখবার মতো, ভাববার মতো তথ্য।

মলয়বাবু এই রকমের আরও কয়েকটি অতি পুরাতন বই তাঁর ড্রয়ার থেকে বের করে দেখালেন। কিন্তু 'শু' না হয়ে সংস্কৃত হ্রস্ব-উকার জুড়ে হাতের হরফের পুঁটলির মতন কেন হলো—প্রশ্নটা আমার জানতে ইচ্ছে করছিল। তিনি বললেন যে, এটা হলো সেই দেড়শো বছর আগেকার প্রথম বাঙালী টাইপ ঢালাইওয়ালা ত্রিবেণী নিবাসী পঞ্চানন কর্মকার বা তাঁর গুরু চার্লস উইলকিনসের কাণ্ড। অক্ষরসজ্জা করতে গিয়ে যখনই তাঁদের লাইন মেলাতে অসুবিধা হতো তখনই ওইরকম চেহারা করে দিতেন, বিশেষ করে যুক্ত অক্ষরের টাইপগুলিকে। মলয়বাবুর যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারলাম না, কারণ, দেখলাম যে, যেখানে নীচের লাইনের ওপরে যথেষ্ট স্থান আছে সেখানকার 'শ'-এ হ্রস্ব-উ পুঁটলি করা নয়—আজকের ছাপা 'শু'-এরই মতন। লিপিতত্ত্বের পণ্ডিতেরা এ বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তার ফলাফল আমরা ইতরজনেরা পাকাপাকি জানবার কোনো সুযোগ পাইনি।

ইংরেজ টাইপ ফাউন্ডারদের এদেশে টাইপ তৈরির আগেও এখানে বাঙলা বই ছাপা হয়েছিল।

জেসুইট পাদরীরা ছাপিয়েছিলেন। কিন্তু তার টাইপ এসেছিল ইংল্যান্ড ফ্রান্স থেকে।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি ও বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের কাল। কুখ্যাত শাসক হেস্টিংস কিন্তু আমাদের একটি পরম উপকার করেছিলেন। তিনি শিক্ষার প্রচার ও জ্ঞান বিতরণের ব্যাপারে দারুণ উৎসাহী ছিলেন। তাঁর কথাতেই ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড নামে এক ইংরেজ পন্ডিতের প্রণীত একটি বাঙলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হলো। প্রথম বাঙলা ব্যাকরণ। হুগলি শহরে কোনো এক অ্যানড্রুজ সাহেবের প্রেসে এই বইটা ছাপালেন পঞ্চানন কর্মকারের গুরু চার্লস উইলকিনস। তিনি ভারতে এসেছিলেন কম্পানির 'রাইটার' হয়ে। জ্ঞানের পিপাসা ছিল, তাই সংস্কৃত ও ফারসী শিখেছিলেন। উপরন্তু এই দুই ভাষায় টাইপ তৈরি নিয়ে কিছু গবেষণাও করেছিলেন। ঘটনাপ্রবাহে তিনি ইতিহাসে স্বাক্ষর রেখে গেলেন।

উইলকিনসের কাছে পঞ্চানন আর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র (অথবা জামাতাও হতে পারেন) মনোহর টাইপ 'পাঞ্চ' ও ঢালাই করা শেখবার কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় পাদরী উইলিয়ম কেরী সাহেবের ডাকে তাঁরা চলে গেলেন শ্রীরামপুরে। কেরী সাহেব বাঙলা ও অন্যান্য দেশী-ভাষায় বাইবেল ছাপাবেন, কিন্তু বিলেত থেকে এক একটি অক্ষরের 'পাঞ্চ' আনাতে খরচ পড়তো তখনকার দিনের ১৫।১৬ টাকা করে। তাঁর মিশনের সাধ্য ছিল না অত খরচ যোগাবার। পঞ্চানন তখন এক একটি টাইপের হাতে তৈরি (সম্ভবত কাঠের) ছাঁচ ও ঢালাইয়ের জন্যে পাঁচসিকে করে নিতেন। তাই তাঁকেই কলকাতা থেকে নিয়ে এলেন কেরী সাহেব।

এমনি করে শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্মকার হয়ে উঠলেন প্রথম ভারতীয় টাইপ ফাউন্ডার। সহকারী মনোহর আরও চল্লিশ বছর ধরে টাইপ তৈরি করেছিলেন। তাঁর হাতে টাইপের শ্রী-ও অনেক ফিরেছিল।

তারপরে কবে যেন (সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে) ইংল্যান্ড থেকে আমদানী হলো প্রথম হ্যান্ড-কাস্টার মেশিন, যার উন্নত রূপের মেশিন এখনো ভারতের বহু ফাউনড্রীই ব্যবহার করে থাকেন। কলকাতার জন ডিকিনসন কম্পানি এর প্রধান ইম্পোর্টার ছিলেন।

গত শতাব্দীর শেষের দিকে এই ডিকিনসন কম্পানির কাছ থেকে মলয়বাবুর পিতামহ স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী একটি 'অলিভার টিচেনার' মেশিন কিনলেন।

১৮৮০ সাল। কলকাতার কাছেই জয়নগর মজিলপুরের এক জমিদার মথুরামোহন চক্রবর্তীর ছেলে শরৎচন্দ্র গুরুজনদের সঙ্গে মতবিরোধ করে গৃহত্যাগ করলেন। জমিদার ছাড়াও বাপ মথুরামোহন ছিলেন মজিলপুরের বিখ্যাত ধন্বন্তরী কালীর সেবায়েত। ছেলে কলকাতায় এসে শরণ নিলেন মা লক্ষ্মীর। সম্বল বাড়ী থেকে আনা দুশোটি টাকা।

১৮৮০ সালের দোলযাত্রার দিনে তিনি এক পানাপুকুরের পাড়ে খোলার চালের ঘরে স্থাপনা করলেন ক্ষুদ্র একটি ছাপাখানা। নাম দিলেন "কালিকা-যন্ত্র"। স্থানটা ছিল মানিকতলা স্পার (আজকের বিবেকানন্দ রোড) আর নন্দকুমার চৌধুরী লেনের মোড়ে, যার কাছাকাছি এখনো পুরোদমে চলছে মূল কালিকা-যন্ত্রের এক কন্যা "কালিকা প্রেস", মলয়বাবুর কাকা শ্রীকৃষ্ণকালী চক্রবর্তীর মালিকানায়।

কিছুদিনের মধ্যেই ব্যবসাতে লাভ হতে লাগলো। তখন প্রেসের চাহিদা মেটাবার জন্যে

এবং উদ্বৃত্ত হলে তা বিক্রির জন্যে শরৎবাবু হস্তচালিত একটা টাইপ-ঢালাই মেশিন বসালেন। এইটাই হলো সেই 'অলিভার টিচেনার' মেশিন। পঞ্চাননের বংশধর শ্রীরামপুরের অধর কর্মকারের টাইপ ছিল সেদিনের নামকরা টাইপ। সেই অধরের টাইপ থেকেই কালিকার প্রথম টাইপ ঢালার ছাঁচ তৈরি হয়।

ঢিমেতালে কালিকা-যন্ত্রের কাজ চলছে, এমন সময়ে একদিন জন ডিকিনসনের বড়ো-সাহেব শরৎচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন। ডিকিনসন কম্পানি সরকারি জরিপ বিভাগের নিজস্ব ছাপাখানা "সেটেলমেণ্ট প্রেসের" জন্যে অনেক টাইপের অর্ডার পেয়েছে। সাহেব চাইলেন যে, শরৎবাবু সেই টাইপ ঢেলে দেন। বাণিজ্যলক্ষ্মী এবারে পূর্ণদৃষ্টি ফেরালেন শরৎবাবুর দিকে; কালিকা টাইপ ফাউনড্রীর শুভ-মুহূর্ত সম্পন্ন হলো।

এখন থেকে কালিকার পদবিক্ষেপ দ্রুততর হলো, বলিষ্ঠ হলো। তখন ধর্মপুস্তক প্রকাশের একটা হিড়িক উঠেছিল। কালিকা তার জন্যে তৈরি করলেন স্মল পাইকা অ্যান্টিক টাইপ। সেই 'কালিকা অ্যান্টিকের' নাম নিশ্চয় প্রবীণ মুদ্রকদের আজও মনে আছে। এইসব প্রবীণ প্রকাশক ও মুদ্রকদের মধ্যে বহু দিকপালের সঙ্গে কালিকার উন্নতির ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মনোরঞ্জনবাবু বললেন, গোলদীঘির পূর্বদিকে যখন আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম প্রকাশ হয় তখন তার জন্যে ব্যবহৃত হয় কালিকার টাইপ। পরলোকগত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় মনোরঞ্জন-বাবুকে খুব স্নেহ করতেন। সুরেশবাবুর সহায়তায় মনোরঞ্জনবাবু অনেকদূর এগিয়ে গেলেন। তাঁরই পরামর্শে তৈরি করলেন খবরের কাগজের জন্যে ১০ পয়েণ্ট বাঙলা টাইপ। সেইজন্যে যুগান্তর, ভারত, আজাদ, স্বাধীনতা, ইত্তেহাদ প্রভৃতি কাগজের সঙ্গে তাদের প্রথম প্রকাশের সময় থেকেই কালিকা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির গুরুর স্থানে আসীন মুজফ্‌ফর আহমেদ সাহেবের লেখা 'কাজি নজরুল ইসলামের স্মৃতিকথা'-তে কালিকার সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে তার উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আহমেদ সাহেব ১৯১৯ সালে ফজলুল হক সাহেব প্রমুখ কয়েকজনের সহযোগিতায় "নবযুগ" প্রেস স্থাপনার উদযোগ করছেন। "যাক, প্রেসটিকে তো চালু করতে হবে। কোথা থেকে কার টাইপ কিনব তা আমি তখনও জানি না। অনেকের নাম অনেকে বললেন, অধরের নাম কেউ কেউ বললেন, একজন কালিকা টাইপ ফাউনড্রীর কথা বললেন। আমি গেলাম সেখানে। প্রতিষ্ঠাতা মালিক শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী নিজেই কারবার চালাচ্ছেন। তাঁর বড় ছেলে শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী কিছু কিছু কারবার দেখাশুনা তখন শুরু করেছেন। ওখানে গিয়ে দেখলাম ভালোই করেছি। কারণ, শরৎবাবু কখনও কথার খিলাপ করেন না, যেদিন টাইপ ডেলিভারি দেবার ওয়াদা করেন, যেমন করেই হোক সেদিনই তিনি ডেলিভারি দেন টাইপ। সেই যে আমার মাথায় কালিকা টাইপ ফাউনড্রী ঢুকেছে ৭৫ বছর বয়স পার হওয়ার পরেও তা আমার মাথা থেকে বের হয়নি। কোন না কোন প্রেসের সঙ্গে সংযোগ তো রয়েছেই। শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর ছেলে মলয় চক্রবর্তী এখন কারবারের দেখাশুনা আরম্ভ করেছেন। একজনদের তিনপুরুষের কারবার কম কথা নয়। আমার তো ভাবতে বেশ লাগে।......"

আমারও দেখে বড় ভালো লাগলো। ফুলের বাগানের সামনে বাঁধানো চত্বর। তার দক্ষিণে মস্ত বড় বাড়িটার নীচের তলায় প্রথমে অফিস, পরে ভিতর দিকে ফাউনড্রীটা। সারে সারে অটোম্যাটিক টাইপ-কাস্টারসের সুবিন্যাস। জার্মেনী, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড থেকে ইমপোর্ট করা অটোম্যাটিক মেশিনগুলি সুন্দর একটা ছন্দে চলেছে, যেন অর্কেস্ট্রার ক্যাস্টানেটের, ম্যারাকাসের দ্রুতলয়ের কটকটানি আর ঝুরঝুরানি। এই আধুনিকাদের চাকচিক্যের এক পাশে প্রবীণা মাসিপিসির মতো দাঁড়িয়ে আছে চার পাঁচটি হ্যান্ডকাস্টার—'অলিভার টিচেনার', 'ব্যানারম্যান' প্রভৃতি—বার্ধক্যে জীর্ণ, অথচ সম্ভ্রান্ত। তারা যেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে রসোচ্ছলা নবীনাদের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, এরা তো আমাদেরই ঘরের রূপসী কন্যা, খরযৌবনা বধূ! আহা, দ্যাখো এদের ঠাট, এদের ঠমক!

মলয়বাবু আমাকে একধারে নিয়ে গেলেন। আলমারি খুলে মার্কা দেওয়া বাক্স বের করে করে দেখালেন অক্ষরের পাঞ্চ ও ম্যাট্রিক্স—সোজা কথায় ছাঁচ। ইমপোর্ট করাও আছে, আবার নিজের তৈরিও আছে। ৮ পয়েন্ট থেকে ৪৮ পয়েন্টের রকমারি ছাঁচ। সুকঠিন ইস্পাতের পাঞ্চ এবং তামার ও পেতলের নানা ম্যাট্রিক্স। পাশেই মাটিতে বসে একটা নীচু বেঞ্চের ওপর যন্ত্রপাতি দিয়ে দুই কারিগর ম্যাট্রিক্স 'ফিনিশ' করছেন। পিতা নগেন্দ্রনাথ কর্মকার ও ছেলে মন্মথ।

অন্যদিকে সাজানো রয়েছে মিশ্রধাতুর এক একটি বাট (বার)। প্রতিটি ঢালাই মেশিনের সংলগ্ন গ্যাসের চুল্লিতে এগুলিকে ফেলে গালানো হচ্ছে। সেখান থেকে সেই সীসে, টিন ও অ্যান্টিমনি (সুর্মা) বিগলিত ধারায় গিয়ে পড়ছে মেশিনের যেখানে ম্যাট্রিক্স বসানো আছে। তারপরে সেই ধাতু বেরিয়ে আসছে সুন্দর সুন্দর টাইপ হয়ে—বাঙলা 'ক' অক্ষরগুলো বেরিয়ে আসছে, যেন কারও তোয়াক্কা রাখে না এমনি ভাবে কোমরে দুহাত রেখে পলটনি কায়দায় আর 'প'গুলি যেন ব্রীড়াবনতা ললনা। দেবনাগরী 'গল্লিদার' নানা পয়েন্টের, লাইট-বোল্ড-মিডিয়ম টাইপ দেখলাম। আরও দেখলাম ইংরেজী রোমান ইটালিক্‌স ও বোল্ড, অসমিয়া, মারাঠী, গ্রীক এবং নানাবিধ গাণিতিক সাইনের টাইপ।

দেখে মনে হয়, এখন এমন একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে লাখ দশেক টাকা তো লাগবেই।

মলয়বাবু বললেন, টাইপের শ্রী যাকে বলে, লোকের চোখের সামনে তা কিন্তু তুলে ধরেছিলেন 'শ্রী' টাইপ ফাউনড্রীর যতীন্দ্রচন্দ্র হুই মশায়। তিনি আবার প্রিন্টিং মেশিনারী ব্যবসায়ী ইন্ডোসুইস কম্পানির অংশীদারও ছিলেন একসময়ে। হেডিং-এর টাইপে মৌলিকত্ব আনা ছাড়াও নানাভাবে যতীনবাবু টাইপ ফাউন্ডারদের পথিকৃৎ ছিলেন। এ বিষয়ে আরও দুটি প্রাচীন বাঙালী প্রতিষ্ঠানের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইস্টার্ন টাইপ ফাউনড্রী অনেক রকম ইংরেজী টাইপ এবং বিশেষ করে হেডিং ও ডিসপ্লে (বাহারী) টাইপের জন্যে প্রসিদ্ধ। হেডিং টাইপের নিজস্ব ম্যাট্রিক্স থাকার জন্য ইস্টার্ন 'সর্টস্ টাইপ' সাপ্লাইয়েও সক্ষম। 'রক্ষিতের' বাঙলা স্মলপাইকা ও পাইকা টাইপের বাজারে খুব আদর। এঁরা ছাড়াও নামী টাইপ ফাউনড্রীদের মধ্যে আছেন 'রুদ্র', 'বরদা', 'রাধা', 'ফ্রেন্ডস', 'প্রেসিডেন্সি' প্রভৃতি। শ্রীসরস্বতী প্রেসের নিজস্ব

ফাউনড্রীর কথায় মলয়বাবু প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁদের এই ফাউনড্রী হলো ডাইভারসিফিকেশন গোছের। একক টাইপ ফাউণ্ডার হিসেবে তাঁদের তুলনার মধ্যে আনা বোধ হয় উচিত হবে না।

ইস্টার্ন টাইপ ফাউনড্রীর নাম আরও এক দিক দিয়ে উল্লেখ্য। আজকের স্বত্বাধিকারী মানবেন্দ্র ও রথীন্দ্র এবং তাঁদের ভ্রাতাদের পিতামহ স্বর্গীয় গোষ্ঠবিহারী দে, পিতা স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ দে এবং খুল্লতাত শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে মহাশয়রা মুদ্রক হিসাবেও বাংলা দেশে বিখ্যাত। এঁদের প্রেস ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস থেকেই নাকি আদিযুগে নামকরা সেই 'বটতলা'-র বইয়ের এক বৃহদংশ প্রকাশিত হতো। তাছাড়া গোষ্ঠবাবু ও নরেনবাবু বাংলা ও হিন্দীতে 'প্রিণ্টারস গাইড' নামে তিনটি বই লিখে ও প্রকাশ করে মুদ্রণশিল্পের কর্মীদের বিশেষ উপকার করে গেছেন। উপরন্তু টাইপ তৈরীর জন্যে রথীনবাবুরা মিশ্রিত ধাতুর বাট না কিনে ধাতুগুলিকে পৃথকভাবে সংগ্রহ করে নিজেদের কারখানাতেই বিশেষ উপায়ে মিশিয়ে নেন। এঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চললে সব বাঙালী ফাউণ্ডাররাই তাঁদের পড়তা কমাতে পারবেন বলে মনে হয়।

কালিকার বার্ষিক বিক্রি দশ-বারো লক্ষ টাকা। এঁদের টাইপের চাহিদা সারা ভারতে। তাই বিক্রয়কেন্দ্র কলকাতায় ছাড়াও আছে গৌহাটি, পাটনা, এলাহাবাদ, দিল্লী, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও বরোদাতে।

কালিকার শ্রীবৃদ্ধির মূল কারণ কিন্তু বাংলা দেশের কম্পোজিটার কুলের পৃষ্ঠপোষকতা। এই কম্পোজিটারবর্গের অনেকেই তাঁদের 'স্টিক'-এ প্রথম যে টাইপ রেখেছিলেন তা ছিল কালিকার এবং পঁচিশ পঞ্চাশ বছর পরে তাঁরা যখন সেই 'স্টিক' তাঁদের উত্তরসাধকদের হাতে তুলে দিয়েছেন তখনও দেখা গেছে যে তাতে আছে সেই কালিকারই টাইপ। ১৮৮০ সাল থেকে এই ১৯৬৮ পর্যন্ত এরই পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে।

টাইপ ফাউণ্ডারদের একটি সংঘ আছে—নাম 'টাইপ ফাউণ্ডারস অ্যাসোসিয়েশন'। বাঙলার ফাউণ্ডারদের প্রধান প্রতিযোগী হলেন বোম্বাইয়ের ও দক্ষিণের নর্টন, নেলসন, মাদ্রাস, স্বদেশী, উইলসন প্রভৃতি অবাঙালী ফাউনড্রী। মলয়বাবু বললেন যে, বাঙালী ফাউণ্ডারদের মধ্যে সমঝোতার উন্নতি হলে অন্য রাজ্যের ফাউণ্ডাররা এসে আজকের মতো বাঙলার বাজারে তাঁদের মাল বিক্রি করতে পারতেন না। "তাঁরাও অবশ্য আমাদের বন্ধু, কিন্তু তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় ব্যবসা করলেই ভালো হয় না কি?" মলয়বাবুর যুক্তিতে আমি ঠিক সায় দিতে পারলাম না, কারণ, তিনি নিজেও এই নীতি লঙ্ঘন করে অন্যান্য বেশ কয়েকটি রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন।

এঁদের কাঁচামালের ব্যাপারে নাকি পুরোদস্তুর একটি কালোবাজার চালু আছে, কিন্তু এই ব্ল্যাকমার্কেটটিকে ভারত সরকার নাকি আইনকানুনের আর্যপ্রয়োগ করে সিদ্ধ করে রেখেছেন। থুড়ি!—ব্ল্যাকমার্কেট নয়, সদাশয় সরকার বাহাদুর 'মনোপলি' দিয়ে রেখেছেন মুষ্টিমেয় কয়েকটি

প্রতিষ্ঠানকে। ইমপোর্ট করবার একচেটিয়া অধিকার সামান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া আছে। এই ইম্পোর্টারদের যে মাল আমদানি করে পড়তা পড়ে দু' আড়াই হাজার টাকা করে টন, হুবহু সেই মালই নাকি ফাউণ্ডাররা তাঁদের কাছ থেকে পাঁচ ছ' হাজারে কিনতে বাধ্য হ'ন। এই অভিযোগ যদি কিছুটাও সত্যি হয় তো সেই অবিচারের অবিলম্বে প্রতিকার করা ভারত সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

ফাউণ্ডারদের সমস্যা আরও আছে। দিল্লীর মানক সংস্থা নাকি টাইপে ব্যবহৃত ধাতুর মিশ্রণের পরিমাণ নির্ধারিত করেছেন অর্থাৎ ঠিক করে দিয়েছেন তাতে কতটা সীসে, কতটা টিন ও কতটা অ্যাণ্টিমনি থাকতে হবে কোন কোন টাইপের জন্যে। আমাদের বনেদী টাইপ ফাউণ্ডাররা সেই মান বজায় রেখে চলতে চান। কিন্তু শহর কলকাতাতে বহু প্রেস আছে যারা সেই উন্নত মানের টাইপ বেশি দাম দিয়ে কেনার চাইতে আপাত-ব্যয়সংকোচ করার উদ্দেশ্যে, মিস্তিরি জাতীয় ছোট ছোট ঢালাইওয়ালাদের কাছ থেকে সস্তায় পুরনো টাইপের সংস্কার করিয়ে কাজ চালাচ্ছেন। তাঁদের উপায় নেই, কারণ ছোট প্রেসদের মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতা, তার উপরে মূলধনের অভাব। কিন্তু এতে আমাদের ছাপার স্ট্যাণ্ডার্ডের অসীম ক্ষতি হচ্ছে। এই পুনরুদ্ধার করা টাইপ খুব শীঘ্রই আবার অকেজোও হয়ে পড়ে। আখেরে এই ছোট মুদ্রকদের লাভের চাইতে ক্ষতিই বেশি।

কালিকার বাড়ীতে ঢোকবার সময়ে প্রবেশদ্বারের পাশের দেয়ালে দেখেছিলাম মস্ত করে একটি কাস্তে আঁকা—'এ যুগের চাঁদ কাস্তে'। ভাবলাম সম্প্রতি বোধ হয় কোনো স্ট্রাইক-টাইক হয়েছিল। মলয়বাবু বললেন, তা নয়, ওটা ভোটরঙ্গের ব্যাপার।

কালিকার শ্রমিকসংখ্যা মাত্র ১৮—সবাই বাঙালী। স্বয়ংক্রিয় মেশিনে বেশি লোক লাগে না। কর্মীদের নিম্নতম বেতন ১৫০ টাকা, গড়ে জনপ্রতি ২০০ টাকা। বছরে দু'মাসের মাইনে বোনাস দেওয়া হয়। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ইত্যাদি আছে। ইউনিয়নটি 'প্রেস এমপ্লয়ীস অ্যাসো-সিয়েশনে' সংশিলষ্ট। কিন্তু মলয়বাবুদের এটা যেন এক গোত্র, একান্নবর্তী পরিবার। কর্মীদের কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করা, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা, বাড়ি তৈরির দরকার হলে থোক কিছু দেওয়া অথবা আগাম দেওয়া—এইভাবেই সব চলে। মলয়বাবু এখন গোত্রপতি।

কিন্তু 'গোত্রপতি' আখ্যায় যে সম্ভ্রমের আতিশয্য প্রকাশ পায় মলয়বাবুর সঙ্গে কালিকার কর্মিবৃন্দের সম্পর্কে সেটা নেই। আছে সহজ নিঃসঙ্কোচ অথচ সশ্রদ্ধ ভালোবাসার ছোঁয়া।

মলয়বাবুর কাছে বিদায় নেবার আগে তাঁকে আমি মনে করিয়ে দিলাম যে তাঁর গোড়াব সেই তিন চারটে প্রশ্নের উত্তর আমি তাঁর কাছ থেকে চাই। পরে দেবো বলে আবার তিনি এড়িয়ে গেলেন।

নিজেই আমি খুঁজতে লাগলাম। কিছুটা পেলাম—পেলাম, যে আমাদের সংস্কৃত ও বাঙলা বর্ণমালার উৎপত্তি 'ওঁ' শব্দটি থেকে।

স্বরের বর্ণ আছে। সূর্যের সাত রঙের মধ্যে নিহিত আছে। মিশরের আদি পিক্টোগ্রাম ও তারপরের হিয়েরোগ্লিফিকস্; সুমেরীয়, অ্যাসিরীয়, ব্যাবিলনের প্রাচীরচিত্র ও শিলালিপি এবং চীনের বর্ণমালার যুগ পেরিয়ে এসে কবে কোন্ কালে আমাদের ঋষিরা ওঁ=অ+উ+ম অক্ষর তিনটিকে নির্ণীত করলেন সূর্যের লাল, হলুদ ও নীল এই তিনটি মূল বর্ণের প্রতীক হিসেবে,

তা কে বলতে পারে? এই যে আমাদের বাঙলা লিপি, তার কতটা এসেছে খরোষ্ঠী থেকে, কতটা ব্রাহ্মী থেকে আর কতটাই বা শারদা থেকে তার হিসেব দিতে পারতেন জার্মেনীর ডঃ বুলহেয়ে আর পারেন সুনীতি চ্যাটার্জি মশায়। কিন্তু অক্ষরের আদি জন্মকথা?

বাঙালীর একটি টাইপ ঢালাইয়ের কারখানার কথা বলতে শুরু করে যে তত্ত্বকথা দিয়ে শেষ করবো, আগে তা ভাবিনি। কিন্তু কথাগুলি ভালো লাগলো, অদ্ভুত লাগলো; তাই না বলে পারলাম না। তা ছাড়া, শব্দ না থাকলে অক্ষরের জন্ম হতো না, সেই অক্ষর না থাকলে ত্রিবেণীর সেই পঞ্চু কামারের গল্প আমরা জানতে পারতাম না, আর তাহলে তো আজকের এই কালিকা টাইপ কারখানার কাহিনীও আপনাদের বলা যেত না।

নিরুত্তরতন্ত্রোক্ত ধ্যানে আছে বর্ণমালার আর এক নাম মাতৃকাবর্ণ। সংস্কৃত ও বাঙলা বর্ণমালার সংখ্যা একান্ন। মুণ্ডমালিনী কালীর গলায় যে মুণ্ডমালার পঞ্চাশ (মতান্তরে একান্ন) মুণ্ড তা হলো মাতৃকাবর্ণের প্রতীক আর সেই মালা ঝুলেছে স্বরের অধিষ্ঠান ক্ষেত্রে অর্থাৎ কণ্ঠে। বর্ণমালার প্রথম 'অ' অক্ষরটিরও অন্যতম শাস্ত্রীয় অভিধা নাকি 'শ্রীকণ্ঠ'।

"দেবী শব্দব্রহ্মময়ী পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী"।

বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকা। তাই 'কালিকা'-ও আজ আপনার জন্যে, আমার জন্যে সৃষ্টি করে নব নব বর্ণ।

১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮





ছয়

বাঙলা ১৩৪১, মানে ইংরেজী ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত একটি সুভেনিয়ারের উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রবন্ধ শুরু করছি :—

"প্রবাসী কার্যালয়—কলিকাতা ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১—অতীতকালে কোন এক সময়ে ব্যবসাবাণিজ্যেও বাঙালীদের কৃতিত্ব লক্ষিত হইত, ঐতিহাসিক এইরূপ কোন তথ্য হইতে আমরা তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না; এবং তাহা হইতে আমাদের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যারও সমাধান হইতে পারে না। বর্তমানে আমাদিগকে ব্যবসাবাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে এবং সাফল্য লাভ করিতে হইবে। ব্যবসাবাণিজ্যে কোন বাঙালীকে ও বাঙালী কম্পানিকে সাফল্য লাভ করিতে দেখিলে এইজন্য আমি আনন্দিত হই। ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্সের কারবারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিতে আমি এই কারণে প্রীত। আমার প্রীতির আরও একটি কারণ এই যে, বহু বৎসর ধরিয়া আমি তাঁহাদের সহিত ব্যবসা সম্পর্কে সম্পৃক্ত আছি। ......(স্বাঃ) শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।"

এইটি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ আরও অনেক বিশিষ্ট বাঙালী ও অবাঙালীর এবং ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর সাধুবাদে পূর্ণ এই স্মৃতিগ্রন্থটি প্রকাশনের উপলক্ষ ছিল ভোলানাথ দত্ত অ্যান্ড সন্সের গৃহপ্রবেশ উৎসব। সেদিন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পৌরোহিত্যে অফিস-পাড়ায় জ্যাকসন লেন ও চীনেবাজারের মোড়ে, ১৬৭নং ওল্ড চায়নাবাজার স্ট্রীটে নিজেদের সদ্যনির্মিত বিশাল তেতলা বাড়িতে প্রাচীন বাঙালী কাগজ ব্যবসায়ী ভোলানাথ দত্ত অ্যান্ড সন্সের গৃহপ্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। সেই ১৯৩৪ সালেই প্রতিষ্ঠানটির বয়স ছিল প্রায় ৭০ বছর।

ভোলানাথবাবুর পরিচয় দিতে হলে আমাদের পাঠককে কয়েক শ' বছর পিছিয়ে নিয়ে যেতে হয়। কিছুটা কিংবদন্তী ও কতকটা ইতিহাসের ওপর নির্ভর করে একটি কাহিনী বলতে

ছয়—কবিকঙ্কন চণ্ডীর ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান :

গন্ধবণিক জাতি দেশ গৌড় নাম
সাকিম মঙ্গলকোট উজ্জয়িনী গ্রাম।
দত্তকুলে উৎপত্তি নাম ধনপতি
বিক্রম কেশরী মহীপালের খেয়াতি॥

ইনি লহনা-খুল্লনার স্বামী এবং শ্রীমন্ত সদাগরের জনক উজানি গ্রামের সেই ধনপতি—গন্ধবণিক জাতির চূড়ামণি বণিকশ্রেষ্ঠ ধনপতি দত্ত, সপ্তডিঙা 'মধুকর' নিয়ে যিনি সিংহলে বাণিজ্যে গিয়েছিলেন, আর যেতে যেতে সাগরবক্ষে দেখেছিলেন তাঁর অপমানে ক্রোধান্বিতা চণ্ডীর মায়ার খেলা, 'কমলে কামিনী' রূপে।

১৩৩০ সালের মহালয়ার দিনে প্রকাশিত ভোলানাথ দত্ত মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় রঘুনাথ দত্তের একটি প্রবন্ধ থেকে এই দত্ত বংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে তথ্য রঘুবাবুর ভাষাতেই বলছি—"যে মহান পবিত্র বংশে বণিকপ্রবর ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর জন্মগ্রহণ করিয়া সমগ্র বঙ্গীয় গন্ধবণিক জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন সেই পবিত্র কুলে স্বর্গীয় বলরাম দত্ত মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন।......তাঁহার পূর্ব বাসস্থান বর্ধমানের অন্তর্গত 'ন-পাড়া' গ্রামে ছিল।......"

'ইয়োরোপীয়ান ট্র্যাভেলার্স ইন ইণ্ডিয়া ডিউরিং দি ফিফটিনথ সিকসটিনথ অ্যাণ্ড সেভেন-টিনথ সেঞ্চুরিস' (লেখক, ওটেন—লণ্ডন, ১৯০৯) বইটিতে আছে যে, ইংরেজ বণিক র‍্যালফ ফিচ্ ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৮০টা নৌকায় করে নানা বিদেশী পণ্য নিয়ে সেকালের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রামে এসেছিলেন। সরস্বতী নদীর তীরে সপ্তগ্রাম অবস্থিত, এখন তাকে 'আদি-সপ্তগ্রাম' বলে।

আর এই সপ্তগ্রামেই নাকি ধনপতি সদাগরের জ্ঞাতি শিবভক্ত চাঁদ সদাগর হিন্তালের লাঠির ঘায়ে দেবী মনসার কোমর ভেঙে দিয়ে সদর্পে বলেছিলেন :

যে হাতে পূজেছি আমি দেব শূলপাণি,
সে হাতে পূজিব পুনি চেংমুড়ি কানী?

থাক কিংবদন্তীর কথা, ইতিহাসে ফিরে আসি। র‍্যালফ ফিচ্ সপ্তগ্রামে এসে সেখানকার গন্ধবণিকদের সঙ্গে গোলমরিচ, লবঙ্গ, সীসে, তামা প্রভৃতি দ্রব্যের বিনিময়ে নানান মসলা, গন্ধদ্রব্য, কাপড় ইত্যাদি পণ্যের আদানপ্রদান করেছিলেন। ফিচ্-এর বিবরণীতে প্রকাশ যে, ওই ব্যবসায়ীরা সকলেই ছিলেন হুগলি ও বর্ধমান জেলার বণিক সম্প্রদায়ের।

সরস্বতী নদীটি আসলে ছিল হুগলি শহরের কাছে গঙ্গার একটি খাঁড়ি। কালক্রমে পলি পড়ে ওই নদীটি মজে গেল। নৌকা চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। তখন সপ্তগ্রামের বণিকরা বাঙলার নানা ব্যবসাকেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ল। ভোলানাথ দত্ত মশায়ের পূর্বপুরুষ বলরাম-ও সেই সময়ে জ্ঞাতিগুষ্ঠি নিয়ে সুতানুটির অন্তর্গত হাটখোলায় গঙ্গার ধারে আড়ত খুললেন। আর কাছা-কাছি শোভাবাজারে নিজেদের ঘরবাড়ি তৈরি করে বাস করতে লাগলেন। এটা হলো আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের কথা। ধীরে ধীরে আরও অনেক গন্ধবণিক ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির তৈরি নতুন শহর কলকাতার গঙ্গার দুই তীরে বসতি করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ব্যবসা-

বাণিজ্য করতে শুরু করলেন। তাঁদের সমবায় পরে 'গঙ্গাতীর চাকলার সমাজ' নামে অভিহিত হলো। বলরামের বংশধররা এখনো শোভাবাজারে অনেকে আছেন। বর্ধমানের ন-পাড়া থেকে পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন বলে নাকি এঁদের বলা হন 'ন-পাড়ার দত্ত'।

দেড়শো বছর পরে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বলরাম দত্তের এক দরিদ্র বংশধরের ঘরে ভোলানাথ জন্মগ্রহণ করলেন। পৌত্র মানিকবাবু বললেন যে, ভোলানাথের জন্মের অব্যবহিত আগেই তাঁর বাবা মারা গিয়েছিলেন। একে গরীব তার ওপরে অনাথ; কাজেই মাত্র ১৩ বছর বয়সে ভোলানাথকে জীবিকার সন্ধানে বেরুতে হলো। তাঁর নিজের এবং বিধবা মায়ের কোনোমতে পেট চলবার মতো একটি চাকরি জুটলো চীনেবাজারের এক কাগজ-বিক্রেতা, ঠাকুরদাস নাগের দোকানে।

বলরাম দত্তের বংশধর, তাই রক্তে ছিল বাণিজ্য; সুতরাং বালক ভোলানাথ সামান্য চাকরি করা সত্ত্বেও কাগজের ব্যবসার আঁত-ঘাত খুব সহজেই রপ্ত করে নিতে লাগলেন। নগদ কিছুই ছিল না বটে, কিন্তু ভোলানাথের একটি সম্বল ছিল। দাদামশায়ের দেওয়া ছোট্ট একটা সম্পত্তি। তার থেকে আয়ের কোন উপায় ছিল না, কিন্তু সাবালক হলেই ভোলানাথ সেই বিষয়টুকু বিক্রি করে নিজের স্বাধীন ব্যবসার মূলধন জোটাবেন বলে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন।

১৮৬৬ সালে ১৯ বছরে পড়েই ভোলানাথ সেই বিষয়টা বিক্রি করলেন নগদ ৮০০ টাকাতে। তাই দিয়ে তিনি ১৩৪নং ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীটে ছোট একটা কাগজের দোকান খুললেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বাণিজ্যে সর্বাঙ্গীণ সফলতা এনে দিল। ১৯০৬ সালে তিনি 'জে এন পাল' নাম দিয়ে আর একটি কাগজের দোকান খুলে এক নিকট-কুটুম্বকে সেটি চালাবার ভার দিলেন। আর ১৯০৭-এ তিনি বাঙালীর চিরপরিচিত ভোলানাথ দত্তের হ্যারিসন রোড (আজকের মহাত্মা গান্ধী রোড) শাখা-দোকানটি খুললেন 'বইপাড়া'-র গা ঘেঁষে।

ভোলানাথ দত্ত, চন্দ্রমোহন সুর ও পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু—স্কুল কলেজে পড়া কলকাতার যে-কোনো বাঙালীর কাছে হ্যারিসন রোডের এই পুরনো দোকানগুলি অতি পরিচিত।

একটি বিষয় বাকী পড়ে গেছে। 'কাগজের' জন্মের গল্প। সেটা অনেকেই জানেন; তবুও ছোট্ট করে বলেই ফেলি।

ইতিহাস বলে যে, চ্চাই লুন নামে চীন দেশের এক রাজমন্ত্রী নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে ১০৫ খৃষ্টাব্দে 'কাগজ' আবিষ্কার করেছিলেন। তার আগে চীনে পুঁথি লেখা হতো সিল্কের কাপড়ের ওপরে, বাঁশের পাতে অথবা কাঠের পাতলা তক্তার ওপরে। চ্চাই লুন কেন কাগজের কথা ভাবলেন ও কিভাবে তৈরী করতে পারলেন তার বিশদ বিবরণ দিতে চাই না, কারণ তার কতটা সত্য ও কতটা কিংবদন্তী তা ঠিক করে বলা যায় না। তৈরি করবার প্রণালীটির প্রথম পর্যায়ে ছিল পুরনো কাপড়, ছেঁড়া মাছ ধরার জাল, গাছের ছাল প্রভৃতি টুকরো টুকরো করে, জলে ভিজিয়ে নরম করবার পরে একটি ভারী কাঠের মুগুর দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে মণ্ড (পালপ) তৈরি করা। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল সেই মণ্ডকে তরল অবস্থায় একটা ফ্রেমে আঁটা সিল্কের কাপড়ের ওপরে বিছিয়ে নিয়ে জল ঝরতে দেওয়া সবশেষে সেই মণ্ডের পাতলা 'আস্তর' শুকিয়ে গেলে তাকে মসৃণ করে নেওয়া।

এইভাবে কাগজ তৈরি হয়ে চীনে তার চলন হলো সেই ১০৫ খৃষ্টাব্দে। মিশরে কখনো

চলছে 'প্যাপিরাস' নামে একরকমের গাছের ছাল আর ভারতে চলছে ভূর্জপত্র ও তালপাতা।

এক পথে চীন থেকে হিমালয় পেরিয়ে কাশ্মীর, তিব্বত ও নেপালে কাগজ এলো। অন্য-পথে চীন থেকেই মধ্য এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা হয়ে কাগজ মন্থরপদবিক্ষেপে ইয়োরোপে পৌঁছলো দশম-একাদশ শতাব্দীতে এবং ইংল্যাণ্ডে পৌঁছলো চতুর্দশ শতাব্দীতে। মিশরে কাগজের প্রচলন হবার পরেও কাগজের সঙ্গে সঙ্গে প্যাপিরাসের ব্যবহারও শ' দেড়েক বছর ছিল। দশম শতাব্দী থেকে প্যাপিরাসের ব্যবহারও বন্ধ হয়ে গেল।

ভারতবর্ষে কাগজের প্রচলন হলো খুব সম্ভব মুসলমান রাজা বাদশারা যখন এলেন। অভিধানে আছে যে, 'কাগজ' শব্দটার ব্যুৎপত্তি হয়েছে আরবী 'কায়গদ্' শব্দ থেকে।

কাগজের কল। লোকে বলে ভারতে কাগজের প্রথম কারখানা বসেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। দক্ষিণের ট্রাংকুইবারে সাইগেনবাল্‌গ নামে এক খ্রীষ্টান মিশনারি তাঁর মিশনের ছাপাখানার প্রয়োজনে নাকি একটি কাগজের কল বসিয়েছিলেন। সেটা কেমন কাগজের কারখানা ছিল ঠিক করে তা বলা যায় না। সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে। টাইপ ফাউণ্ড্রীর প্রবন্ধে রেভারেণ্ড উইলিয়াম কেরীর অবদানের কথা বলেছিলাম। বাংলা দেশের শ্রীরামপুরে তথা ভারতে প্রথম রীতিমতো একটি পেপার-মেশিন বসানোটাও কেরী সাহেবের আর একটি কীর্তি। প্রথমে নাকি সেই মেশিন হাতে চালানো হতো। ততে অনেক লোক লাগতো। পরে কেরী সাহেব বিলেত থেকে একটা স্টীম এঞ্জিন আনিয়ে সেই মেশিনটার সঙ্গে জুড়ে দিলেন। কিন্তু এত করেও কিছুদিন চলার পরে মিলটা বন্ধ হয়ে গেল। বেশ কয়েক বছর বন্ধ থাকার পরে অন্য এক প্রতিষ্ঠান ওই মেশিনারিই কিনে নিয়ে বালীতে একটা কারখানা খুলে ফেললেন। নাম দিলেন 'রয়্যাল পেপার মিল'। ১৮৮২ সালে রয়্যাল মিল যুক্ত হয়ে গেল নবপ্রতিষ্ঠিত টিটাগড় পেপার মিলের সঙ্গে।

'শ্রীরামপুর' ও 'বালী' কাগজ কিন্তু সাদা ছিল না। আমরাও স্কুলে পড়ার সময়ে 'রাফ-খাতার' জন্যে প্রচুর পরিমাণে বালীর কাগজ ব্যবহার করেছি। রঙ দেখে ভাবতাম বোধ হয় কাগজটায় বালি দিয়ে কিছু করা হয়, তাই তার নাম বালির কাগজ। আসলে কাগজটাকে ব্লীচ করা হতো না বলেই বালির মতো রঙ ছিল।

টিটাগড় পেপার মিলের আগেই লক্ষ্ণৌ-এর কাছে মহল্লা-মশজিদবাগ নামে একটি জায়গায় ১৮৭৯ সালে 'আপার ইণ্ডিয়া কুপার পেপার মিল' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। ১৮৮৯ সালে রানীগঞ্জে বেঙ্গল পেপার মিল স্থাপিত হলো। ১৮৯৪ সালে নাকি ইম্পিরিয়্যাল পেপার মিল নামে আরও একটি কল স্থাপিত হয়েছিল; পরে সেটাও টিটাগড় কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ১৯১৮ সালে নৈহাটির কাছে হাজিনগরে 'ইণ্ডিয়া পেপার পালপ' নামে আর একটি মিল বসে।

প্রথম থেকেই ভোলানাথ দত্ত আর এক দিকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। সঙ্ঘবদ্ধ হলে শক্তির যে কতখানি বৃদ্ধি হয় তা তিনি বুঝতেন; বলরাম দত্তের বংশধর বলে সেটাও তাঁর মজ্জাতেই ছিল বোধ হয়। তাই তাঁর মাত্র ২৪ বছর বয়সে চীনেবাজারের কাগজ-

ব্যবসায়ীদের নিয়ে ১৮৭১ সালে তিনি 'পেপার মারচেন্টস অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সঙ্ঘ গঠন করলেন। শম্ভুচন্দ্র সিংহকে সভাপতি করে নিজে হলেন অবৈতনিক সম্পাদক। সেই সঙ্ঘের মূল কাগজপত্র মানিকবাবুদের কাছে সযত্নে রক্ষিত আছে। যদিও তখন মহারানীর রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে, তবু অনেক কাজ উর্দু-ফারসীতে চলত। তাই ওই সঙ্ঘ গঠনের অনুমোদনের সময়ে সরকারী সীল-মোহর পড়ল উর্দু ভাষাতে।

ভোলানাথবাবুর বড় ছেলেটি অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিলেন। মেজো ছেলে রঘুনাথকে ভোলানাথবাবু মাত্র ১৯ বছর বয়সেই জেনারেল অ্যাসেম্বলি (অধুনা স্কটিশ চার্চ) স্কুল ছাড়িয়ে ব্যবসাতে টেনে এনেছিলেন। এক দিক দিয়ে সেটা বড় দুঃখের কথা। এনট্রান্স ক্লাসে উঠেছেন রঘুনাথ; পড়াশোনাতে, বিশেষ করে অংকশাস্ত্রে খুব ভাল; আশা করছেন যে, ফাইনাল পরীক্ষায় জলপানি পাবেন। এমন সময়ে বাবা তাঁর সে আশা নির্মূল করে এনে ফেললেন নীরস ব্যবসার মধ্যে। ভোলানাথবাবু সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। তাই কিশোর রঘুনাথকে কাগজের ব্যবসা সম্বন্ধে অল্প কিছুও শিখিয়ে রেখে যাবার জন্যে অমন করে পড়া ছাড়িয়ে আনলেন। তাঁর সিদ্ধান্তটি যথাযথ হয়েছিল। কারণ, ১৯০৪ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত ওই চার বছরে যদি রঘুনাথ কাজ শিখে নিতে না পারতেন তবে ১৯০৮-এ ভোলানাথ-বাবু মারা যাবার পরে অত বড় ব্যবসাটির ভার বওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। হয় সেটা হাতছাড়া হয়ে যেত; নয়তো যেত বন্ধ হয়ে।

ভোলানাথ যে বটবৃক্ষটির বীজ বপন করে সযত্নে লালন পালন করে সতেজ সবল যৌবনে পৌঁছে দিয়ে গেলেন, রঘুবাবু তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যবসায় দিয়ে তাকে এক বিরাট মহীবৃহে পরিণত করলেন। পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সেজো ভাই বীরেশ্বর এবং কনিষ্ঠ বিভূতিভূষণ।

ইতিপূর্বে রঘুবাবুরা যেসব বিদেশী কাগজ বিক্রি করতেন সেগুলো তাঁরা নিজেরা আমদানী করতে পারতেন না। কয়েকটা বিদেশী ফার্মের কলকাতা অফিসের মারফত সেই কাগজ কিনে বেচতে হতো। পড়তা কমাবার জন্যে ১৯১০ সাল থেকে রঘুবাবু কলকাতার এই মধ্যবর্তী বিদেশী ফার্মগুলির তীব্র বাধা অতিক্রম করে সরাসরি বিদেশী পেপার মিলগুলির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুললেন। ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যখন ইংরেজের শত্রুপক্ষের অনেক দেশ থেকে সোজা পথে কাগজ আনা বন্ধ হলো তখন রঘুবাবু নিরপেক্ষ দেশগুলির মাধ্যমে সেইসব দেশ থেকেও আমদানি বজায় রেখেছিলেন। মিত্রপক্ষের দেশ থেকে আমদানি তো চলতোই।

আপার ইন্ডিয়া কুপার, টিটাগড়, বেঙ্গল প্রভৃতি যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশী পেপার মিল তখন ছিল, তাদের কাগজের উৎপাদন খুবই কম ছিল। কোয়ালিটিও বিশেষ সুবিধের ছিল না। তা সত্ত্বেও রঘুবাবুরা সেই সব মিলের এজেন্সি আগে থেকেই নিয়ে রেখেছিলেন এবং তাদের মাল বাজারে চালাবার জন্যে খুব চেষ্টাও করতেন। শুধু তাই নয়, মিলের পরিচালকরা তাঁর পরামর্শ নিয়েও অনেক সময়ে ঠিক করতেন যে, কোন্ কোন্ কোয়ালিটির কাগজ তৈরী করলে বাজারের চাহিদা-বরাবর হবে।

দেশী দৈনিক পত্রিকাগুলির কথাও ধরা যাক। রঘুনাথ তাঁর সহায়তা ও সহানুভূতি দিয়ে 'ফরোয়ার্ড', 'লিবার্টি', 'অ্যাডভান্স' ও 'আনন্দবাজারের' মতো উগ্র জাতীয়তাবাদী কাগজের কর্তৃপক্ষকে যে-ভাবে বাঁচিয়ে রাখতেন তার কথা সবিস্তারে বলতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বেশী বড় হয়ে যাবে। রঘুবাবুদের কাছ থেকে পাঁচ রীম নিউজপ্রিন্ট কাগজ ও দু' পাউন্ড কালি ধারে নিয়েই নাকি আমাদের আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম প্রকাশ হয়।

এখানে রঘুবাবুর দুই ভাইয়ের কথাও উল্লেখ্য। সেজো ভাই বীরেশ্বরবাবুর প্রধান কাজ ছিল ভোলানাথ দত্ত অ্যান্ড সন্সের কলকাতার বাইরের শাখা-অফিসগুলি মাধ্যমে ফার্মের ব্যবসায় সম্প্রসারণ। কাশী, এলাহাবাদ, কটক, গৌহাটি, ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় শহরে শাখা-অফিসগুলি স্থাপনা করা থেকে আরম্ভ করে তার সুষ্ঠু পরিচালনার সব কিছুই তিনি নিপুণভাবে করতেন।

আর কনিষ্ঠ বিভূতিবাবু—তিনি ছিলেন বই-পাড়ার প্রকাশকদের কাছে অতি আদরের 'ছোটবাবু'। হ্যারিসন রোড শাখা ছিল তাঁর কর্মকেন্দ্র। বড় বড় প্রকাশনের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য থাকাটা বড় কথা নয়। তাঁর মহত্ত্ব ছিল দরিদ্র লেখক ও প্রকাশন সংস্থাগুলির প্রতি সংবেদনশীলতার মধ্যে। তাদের ভিতর যাদের সৎ মনে করতেন তাদের তিনি ভান্ডার খুলে ধারে মাল দিতেন। ফলে, মাঝে মাঝে ফার্মের অনেক টাকা মারা যেত। সেই গরীব লেখক ও প্রকাশকদের অনেকেরই বই ছাপা হয়ে গুদামজাত হয়েই থাকতো, বিকোত না। কিন্তু তাতেও বিভূতিবাবু দমতেন না, তাঁর দক্ষিণ হাত গুটিয়ে নিতেন না। মাঝে মাঝে যখন ওই রকম 'বিলাত বাকী' পড়ে যেত তখন দাদাদের বলতেন যে, সে-টাকা আর আদায় হবে না। দাদারা তাঁর ওপরে কোনো কথা বলতেন না, কারণ তাঁরা জানতেন যে, ব্যবসাবুদ্ধি দিয়ে ভাই নিজেই সেই সাময়িক ছোট লোকসান ছাপিয়ে অনেক বড় লাভ করতে পারবেন ফার্মের জন্যে।

যে কোনো প্রকাশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রবীণ বাঙালীরা এই তিন ভাইয়ের কথা ভাল করেই জানেন। বিশেষ করে খদ্দরের ধুতী পাঞ্জাবী ও চাদর পরিহিত রঘুবাবুর চেহারা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে। সে পোশাক আবার খুব ধোপদুরস্তও থাকত না। তাই প'রেই তিনি পাকা সাহেব কম্পানি হুগলি ইঙ্ক-এর ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং-এ যেতেন—কারণ ছাপাখানার কালি তৈরির এই বিরাট ইংরেজ কম্পানির রঘুবাবু এক বড় শেয়ারহোল্ডার ও ডিরেক্টর ছিলেন। আবার ওই পোশাকেই বেঙ্গল মিলওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বস্ত্রশিল্প সঙ্ঘ) সভাপতির অভি-ভাষণও দিতেন। ঐশ্বর্যের অহঙ্কার তাঁর ছিল না।

রঘুনাথ দত্ত মশায় শ্রীদুর্গা কটন মিলের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বাঙলার বস্ত্রশিল্পেও মাননীয় ব্যক্তি ছিলেন। অবশ্য পরে তিনি শ্রীদুর্গা থেকে সরে এসেছিলেন, কিন্তু বেঙ্গল ফাইন স্পিনিং ও উইভিং মিলের ডিরেক্টর হিসেবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল।

১৯৪৪ সালে রঘুবাবু ব্যবসার সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য কারণে আরও দুটি ফার্ম খুললেন —রঘুনাথ দত্ত অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ও ভোলানাথ দত্ত (পেপার মার্চেন্টস) লিমিটেড। ১৯৫২ সালে ৬৭ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। পৈতৃক ব্যবসা ছাড়াও যে ক'টি প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করে গেলেন তাদের বার্ষিক বিক্রি এখন কোটি টাকারও বেশি। উপরন্তু কলকাতা শহরে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পত্তিও রেখে গেছেন প্রচুর।

সাধারণত বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই সব কৃতী পুরুষরা যখন চলে যান তখন সন্তান-সন্ততি যাঁদের রেখে যান তাঁদের চালচলন হয় ধনীর দুলালের মতোই কিন্তু রঘুনাথ দত্ত অ্যান্ড সন্সের নিজেদের ব্র্যাবোর্ন রোডের ম্যানসন বাড়িতে—বর্তমান হেড অফিসে—রঘুবাবুর বড় ছেলে মানিকবাবু ও মেজো গৌরবাবুর সঙ্গে আলাপ করে পেলাম তার আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

টেরি-উল বা দামী গরম কাপড়ের নয়, অতি সাধারণ ফুলহাতা হাওয়াই শার্ট ও ট্রাউজার পরা রঘুনাথ দত্ত অ্যান্ড সন্সের চেয়ারম্যান ৫৮ বছর বয়স্ক শ্রীমানিকলাল দত্তের কথাটাই বলি। ইনি ভোলানাথবাবুর জ্যেষ্ঠ পৌত্র, রঘুনাথের আট ছেলের মধ্যে সকলের বড়। জার্মেনির মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। জার্মান ভাষায় যে তিনি বিদগ্ধ তার পরিচয় পেলাম যখন তিনি কথায় কথায় গোয়েটের একটি কবিতা সুললিত আবৃত্তি করে আমাকে শুনিয়ে তার ভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনার ভাবার্থের আংশিক মিল বুঝিয়ে দিলেন। মানিকবাবু আবার রোটেরিয়ান। রোটারি ক্লাবে নাকি তাঁর প্রকাশিত বুলেটিনের খুব সমাদর আছে। ভুল করে আমাকে সাহিত্যিক ঠাউরে তিনি সাহিত্য, দর্শন ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আলোচনা তুলেছিলেন। আমাকে দু-একটা উচ্চমার্গের প্রশ্ন করে কালিকা টাইপ ফাউণ্ড্রীর মলয় চক্রোত্তি মশায়ের মতো আর একটু হলেই বেকায়দায় ফেলেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি চালাক হয়ে গিয়েছি। বেদান্তের আলোচনায় অংশ নেবার যে আমার বিন্দুমাত্র যোগ্যতা নেই তা বুঝতে না দিয়ে বললাম, আজ আপনার প্রশ্ন শোনবার বা উত্তর দেবার সময় আমার নেই, আমিই আপনাকে প্রশ্ন করতে এসেছি। এই নিন আমার কোয়েশ্চেনেয়ার (প্রশ্নপত্র)—আপনি উত্তর দেবেন। মানিকবাবুর কাছে আমি এক মূর্তিমান রসভঙ্গ হয়ে দাঁড়ালাম।

বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে মানিকবাবু তাঁর ব্যক্তিগত টেকনিক্যাল ও ব্যবসায়ী জীবনের কথা বললেন। মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বিশেষ পাঠ্যবিষয় ছিল 'পেপার টেকনোলজি'। ১৯৩০ সালে ২১ বছর বয়সে পারিবারিক ব্যবসা ভোলানাথ দত্ত অ্যান্ড সন্সে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৩২-এ স্ট্যাণ্ডার্ড স্টেশনারি লিমিটেড এবং ১৯৩৮ সালে হিন্দুস্থান কারবন অ্যান্ড রিবন ও দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস নামে তিনটি প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করে প্রধান পরিচালক হলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের তরফে কাগজশিল্পে এক্সপার্ট হিসেবে তাঁকে (১৯৪৬ সালে) জার্মেনি যেতে হলো। তাঁর ওপর ভার দেওয়া হলো যুদ্ধকালীন জার্মান কাগজশিল্পের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে যুদ্ধোত্তর কালে মিত্রপক্ষ কীভাবে সেই দেশে তাদের কাগজশিল্পের সম্প্রসারণ করতে পারে সে বিষয়ে রিপোর্ট দেবার। তখন তাঁকে 'কর্নেল' পদ দেওয়া হয়েছিল। তারপরে ১৯৪৯ সালে তিনি আমেরিকান গভর্নমেন্টের আমন্ত্রণে জাপ-ভারত বাণিজ্যিক সহযোগিতার উন্নতি সাধনের জন্য জাপানে গেলেন।

মানিকবাবু এখন নিজেদের ব্যবসাতে ছাড়াও আসানসোল ইলেকট্রিক সাপ্লাই, বেঙ্গল ফাইন স্পিনিং, বর্মা লাইম প্রভৃতি কোম্পানীতে ডিরেক্টর। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার, বঙ্গীয় মুদ্রক সমিতি প্রভৃতিতেও তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য। উপরন্তু তিনি কেন্দ্রীয় মানক সংস্থার (ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ডস ইনস্টিটিউশনের) কাগজ-শিল্প বিষয়ক কমিটির সক্রিয় সভ্য। এই কমিটির ওপরেই ভারতের কাগজশিল্পের মান-নির্দেশ ও উন্নয়নের ভার ন্যস্ত।

ইতিমধ্যে মানিকবাবুর মেজো ভাই ভোলানাথ দত্ত পেপার মার্চেন্টস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর

গৌরলাল দত্ত মশায়ও দাদার ঘরে ঢুকলেন। সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবি পরা সুপুরুষ ভদ্রলোক; কথাবার্তা চালচলনেও অনাড়ম্বর। ইনি নাকি ফাঁসির গোপীনাথ সাহার উত্তরসূরী। ইংরেজের পুলিস কমিশনার বাঘা টেগার্টকে হত্যার নতুন চেষ্টায় অন্যান্য সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে টেগার্ট মার্ডার কেসের আসামী হয়েছিলেন এককালে।

সেজো ভাই নিতাইলাল দত্ত রঘুনাথ দত্ত অ্যান্ড সনসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্সে এম এস-সি। এক সময়ে ইউনিভার্সিটির লেকচারার ছিলেন। এখন সরস্বতীকে ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্মীর সাধনা করছেন। দত্ত পরিবারের তরফে তিনি হুগলি ইঙ্ক কম্পানির ডিরেক্টর; আর বড় দাদার মতো ইনিও মানক সংস্থায় কাগজ-শিল্পের প্রতিনিধি হিসেবে সভ্য।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ ছোট পেপার মিলের বর্তমান সঙ্কটের কথায় মানিকবাবু বললেন যে, ছোট মিলগুলির জন্যে 'রিটেনশন প্রাইস' বাড়ানো ছাড়াও সমষ্টিগতভাবে উৎপাদন পরিকল্পনা (প্রোডাকশন প্ল্যানিং) স্থির করা দরকার। ব্যাখ্যা করে মানিকবাবু বললেন যে, একটা ছোট মিলে পাঁচ রকম কাগজ তৈরি করে বড় মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে না নেমে বেছে বেছে এমন দু-এক রকম কাগজ তৈরি করা উচিত যাতে প্রতিযোগিতা কম। বিভিন্ন কাগজ এই শ্রেণীতে পড়ে, যেমন পোস্টার, প্যাকিং, র‍্যাপিং, ফিল্টার ইত্যাদির উপযোগী কাগজ। এই সব কাগজ আবার মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় পড়ে না। 'রিটেনশন প্রাইস' যদি বা বাড়েও সঙ্গে সঙ্গে কাঁচামালের দামও বাড়বে। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত মূল্যের যে সব কোয়ালিটির কাগজ আছে তা তৈরি করে ছোট মিলেরা কোনোদিনই লাভ করতে পারবে না।

সুতরাং সমাধান হচ্ছে প্রোডাকশন প্ল্যানিং। সেই পরিকল্পনাকে রূপ দিয়ে চালু করবার দায়িত্ব নেওয়া উচিত ইন্ডিয়ান পেপার মিলস অ্যাসোসিয়েশনের। সঙ্ঘের উদ্যোগে প্রথমত ছোট মিলগুলিকে উৎপাদনশক্তির ভিত্তিতে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা উচিত। তারপরে কানুন করে বিভিন্ন শ্রেণীর মিলকে বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ রকমের কাগজ তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া উচিত।

কাগজ শিল্পের সামগ্রিক দিকটা সংক্ষেপে বিচার করে দেখা যাক। ইন্ডিয়ান পেপার মিলস অ্যাসোসিয়েশনের গত ২১ ডিসেম্বর ১৯৬৭-তে বাৎসরিক জেনারেল মিটিং-এ এই কাগজ-কল সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীহরিশঙ্কর সিংঘানিয়া যা বলতে চেয়েছেন সেটা একটি সাময়িক পত্রিকার পরিসংখ্যান ও গবেষণামূলক প্রবন্ধটি পড়লেই বিষয়টা সরল হয়ে আসে। পত্রিকাটি বোম্বাই থেকে প্রকাশিতজনাম 'পেপার-প্রিন্ট-প্যাক'। সম্পূর্ণভাবে কাগজ মুদ্রণ ও আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়েই এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি তথ্যবহুল এবং সুসম্পাদিত।

'পেপার-প্রিন্ট-প্যাকের' ১৯৬৬ সালের পরিসংখ্যান থেকে পাচ্ছি যে ভারতের ৪৭½ কোটি জনসংখ্যার মাথাপিছু কাগজ ও পিসবোর্ডের চাহিদা এখন মাত্র ৩·৩ পাউন্ড। অর্থাৎ মোট ৭ লক্ষ ২০ হাজার টন। অথচ সারা দেশের ৪৬টি পেপার মিলের মোট উৎপাদন ৭ লক্ষ ৪ হাজার টন, যার থেকে রপ্তানীর ৮৪,০০০ টন বাদ দিলে দেশের জন্যে থাকে ৬ লক্ষ ২০ হাজার টন। তার মানে এই দাঁড়ায় যে, ১৯৬৬ সালে দেশের চাহিদা যা ছিল তা থেকে সরবরাহ ১ লক্ষ টন কম ছিল দেশীয় পেপার মিলগুলির কাছ থেকে। বিদেশ থেকে ৮০,০০০ টন কাগজ

আমদানি হয়েও মোট চাহিদাতে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে।

বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের এই মাথাপিছু ৩·৩ পাউন্ড চাহিদা খুবই কম। আমেরিকার জনপ্রতি চাহিদা ৪৩৭·৮ পাউন্ড এবং ইংল্যান্ডের ২০৭ পাউন্ড। কোনো তুলনার মধ্যেই আসে না। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে ক্রমে ক্রমে ভারতের চাহিদাও অনেক বেড়ে যাবে।

ওদিকে সঙ্ঘের সভাপতি হরিশঙ্কর সিংঘানিয়াজি বলছেন যে, দেশী মিলের ১৯৬৭ সালের উৎপাদন হয়েছে ৬½ লক্ষ টন। অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের চাইতে ৫৪,০০০ টন কম। পুরানো মিলগুলি কলেবর বৃদ্ধির জন্যে এবং নতুন কয়েকটি কম্পানি মিল প্রতিষ্ঠার জন্যে যা লাইসেন্স পেয়েছে সেই অনুযায়ী উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়লে ১৯০৭-৭১ সালে ভারতে ৮½ লক্ষ টন কাগজ ও বোর্ড তৈরি হতে পারবে। অতএব সিংঘানিয়াজির মতে আগামী দু'বছরের মধ্যে দেশে কাগজের দারুণ অভাব হবে।

তাঁর প্রতিবেদন থেকে আর একটি কথা জানলাম। দিনে ১০০ টন কাগজ উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন একটি মিল বসাতে আজকের দিনে নাকি ১৮ কোটি টাকা লাগে। কাগজের বর্তমান দামের কথা—সরকারী নিয়ন্ত্রণে দাম বাঁধা। ভারত সরকার লোহা, কয়লা, সিমেণ্ট প্রভৃতি অনেক অত্যাবশ্যক জিনিসের দাম বাড়াতে দিচ্ছেন, অথচ ১৯৬২ সালের পর থেকে কাগজের দাম বাড়াবার অনুমতি কিছুতেই দিচ্ছেন না।

কারণগুলির বিষয়ে যে তথ্য পেয়েছি তা বলছি :

দেশে যত কাগজ তৈরি হয় (সামান্য রপ্তানী বাদ দিয়ে) এবং আমদানি হয় (দুই নিয়ে মোট ৭ লক্ষ টনের কিছু বেশি) তার ব্যবহার মোটামুটি নিম্নলিখিত অনুপাতে হয়ে থাকে বলে জানলাম :—(১)গভর্নমেন্টের বিভিন্ন দপ্তর এবং বিশেষ করে প্রতিরক্ষা দপ্তরের জন্য শতকরা ৪০ ভাগ, (২) জনসাধারণের বিদ্যাশিক্ষার জন্যে প্রকাশন ও হাতে লেখার কাগজ হিসেবে শতকরা ৩০ ভাগ এবং (৩) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনে শতকরা বাকী ৩০ ভাগ।

অতএব কাগজের দাম বাড়তে দিলে প্রথমত সরকারের নিজস্ব খরচ অত্যন্ত বেড়ে যাবে। দ্বিতীয়ত জনসাধারণের শিক্ষা দীক্ষার খাতেও ভীষণভাবে খরচ বাড়বে। ভেবে দেখলে কথাটা খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

কিন্তু এই কেন্দ্রীয় সরকারেরই শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রক কি ভয়ানক অবিমৃষ্যকারিতা করেছিলেন সেই কথাটি এখানে বলতে হয়। শিল্পমন্ত্রকের উদ্যোগ ভবন থেকে লাইসেন্স না দেওয়া হলে ব্যবসায়ীরা ছোট ছোট মিল প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না। অথচ শিল্পমন্ত্রকের ধুরন্ধরেরা জানতেন যে বছরে কমপক্ষে ১৫।২০,০০০ টন কাগজ যে মিল উৎপাদন করতে পারবে না, বর্তমান নিয়ন্ত্রিত বিক্রীর দামে কাগজ বিক্রী করতে হলে সেইসব ছোট ছোট ইউনিটের মিলগুলির কিছুতেই লাভ হতে পারে না। অর্থাৎ 'ইকনমিক ইউনিট' না হলে এইসব মিল বাঁচতে পারবে না। তা সত্ত্বেও উদ্যোগ ভবন থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু ছোট ছোট ইউনিটের মিল প্রতিষ্ঠা করবার অনুমতি দিয়ে লাইসেন্স দেওয়া হলো। অথচ পাকা হিসেবটি করে কাজ করলে আজ এতগুলি ছোট পেপার মিলও স্থাপিত হতো না। আর এই বিপত্তিটিও ঘটত না।

তবু এ সমস্যার আংশিক সমাধানের পথ হতে পারে। সরকার এখন কাগজের ওপরে

গড়ে শতকরা ৩৫ টাকার মত শুল্ক চাপিয়ে রেখেছেন। অর্থাৎ যে কাগজ আপনি আমি ১০০ টাকায় কিনব তার মধ্যে আন্দাজ ৬৫ টাকা পাবে পেপার মিল এবং বাকী ৩৫ টাকার মত পাবে গভর্নমেণ্ট। বড় বড় পেপার মিলগুলির ক্ষেত্রে না হয় তাই থাক। কারণ দেখা যাচ্ছে যে, এত উচ্চহারে শুল্ক দিয়েও ১৯৬৬ সালে বেঙ্গল পেপার মিল ডিভিডেণ্ড দিয়েছে শতকরা ১৫ টাকা এবং বিড়লাদের ওরিয়েণ্ট পেপার মিল দিয়েছে শতকরা ২০ টাকা। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট মিলগুলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেয়ে যাচ্ছে। ভারত সরকারের উচিত, তাদের ক্ষেত্রে গভর্নমেণ্টের প্রাপ্য শুল্কও কম আদায় করে মিলগুলিকে বাঁচতে দেওয়া। রিটেনশন দাম বাড়তে দেওয়া অর্থাৎ জনসাধারণ বা যে কোনো ক্রেতা যে কাগজের দাম ১০০ টাকা দেবে তার মধ্যে শুল্ক হিসেবে ওই ৩৫ টাকার জায়গায় ১০।১৫ টাকা রেখে বাকী ২০।২৫ টাকা এইসব ক্ষুদ্র আয়তনের মিলগুলিকে পেতে দেওয়া। অবশ্য এই পন্থা অবলম্বন করলে শুল্ক খাতে সরকারের আয় খানিকটা কমে যাবে। কিন্তু মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং শত শত শ্রমিকের বেকার হওয়ার মত ভয়ঙ্কর লোকসানের কাছে সরকারের এই ক্ষতি সামগ্রিকভাবে দেখলে সামান্যই হবে।

এইটুকু করেই সঙ্ঘের ক্ষান্ত হলে চলবে না। দেশের ছোট মিলগুলির অনেকেরই পালপ মেকিং (মণ্ড প্রস্তুত)-এর ব্যবস্থা একেবারেই নেই, অথবা অসম্পূর্ণভাবে আছে। তারা নাকি পুরনো কাগজ ইত্যাদি কিনে কাঁচামালের কাজ চালায়। তাতে পড়তা খুব বেশি পড়ে। এর সমাধান হতে পারে যদি সঙ্ঘের এবং সরকারের মিলিত চেষ্টায় সমবায় গঠন করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কো-অপারেটিভ পালপ মিল বসানো হয়। নিজ নিজ অঞ্চলের পালপ মিল থেকে সস্তায় মণ্ড কিনে ছোট মিলদের নাকি লাভ অবধারিত।

পেপার মিলস অ্যাসোসিয়েশন এবং গভর্নমেণ্টকে দিয়ে এই কাজটি করানোতে বাঙালীরই বেশী তৎপর হওয়া উচিত। কারণ বাঙালীর মুষ্টিমেয় মিল ক'টি ছোট এবং ভবিষ্যতেও মূলধনের অভাবে বাঙালীর পক্ষে চট করে বড় মিল স্থাপনা সম্ভব হবে না বলেই মনে হয়।

পড়তা কমাবার আর একটি বিশেষ প্রণালী হল ভাল 'ওয়েস্ট রিকভারি প্ল্যাণ্ট' প্রত্যেক মিলে রাখা। একই কেমিক্যাল, বাষ্প ও জল যাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার ব্যবহার করা যায় তার ব্যবস্থা করাই হল এই মেশিনের কাজ। মানিকবাবু বললেন যে, ১ টন কাগজ তৈরি করতে নাকি ১০০ টন জল লাগে। তাহলেই বেশ বোঝা যাচ্ছে যে কেন এই ব্যবস্থা প্রত্যেক মিলে থাকা অত্যাবশ্যক।

বাঙলা দেশ, তথা ভারতবর্ষের শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানা জটিল ও বৃহৎ সমস্যার কথা ক্রমাগত বলছি। রাম-শ্যাম-যদুর মতো গভর্নমেণ্টকে আমরাও প্রচুর দোষারোপ করছি এবং সম্ভবত আরও অনেকবার করবো। পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক যোজনার দোষ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করে সকলের সামনে তুলেও ধরবো।

কিন্তু যাই বলি না কেন, একথা স্বীকারও করতে হবে যে আমরা ভারতবাসীরা নানা ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়েও এগিয়েই চলেছি। অন্য উন্নতিশীল দেশের তুলনায় আমরা নাকি অনেক

পিছিয়ে পড়ছি; চীনের অগ্রগতি নাকি প্রাতঃস্মরণীয়—এবম্প্রকার আক্ষেপ ও বিলাপে প্রতিদিন আমাদের কর্ণপটহ ছিন্ন হবার উপক্রম হয়। কিন্তু ধরা যাক এই কাগজশিল্পের কথাটাই। পরিসংখ্যান থেকে পাচ্ছি যে, ১৯৬০ সালে ভারতে কাগজ উৎপন্ন হয়েছিল ৩ লক্ষ টন আর ১৯৬৭ সালে হয়েছে দ্বিগুণের বেশী, প্রায় ৭ লক্ষ টন। ১৯৭১ সালে হবে প্রায় ৯ লক্ষ টন।

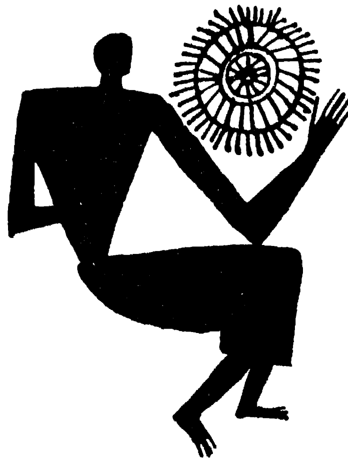
হয়তো দ্রুততর হতে পারতো, কিন্তু এই গতিবেগই বা কী এত মন্থর?

চীনের কাগজ শিল্প সম্বন্ধে পরিসংখ্যান বলছে, যে সেখানে ১৯৬০ সালে উৎপাদন ছিল ১২½ লক্ষ টন আর ১৯৬৬-তে হয়েছিল ১৬ লক্ষ ৩০ হাজার টন। আর ৬৪ কোটি জনসংখ্যার ভিত্তিতে কাগজের জন্মভূমি চীনে কাগজের ব্যবহার মাথা পিছু ৪ পাউন্ড। তার মধ্যে অবশ্য দেয়ালে সাঁটতে গিয়ে কতটা খরচ হয় তার পরিসংখ্যান চীন থেকে পৃথকভাবে কিছু পাওয়া যায়নি।

ভারতের প্রগতি নেহাত তাচ্ছিল্য করবার মত নয়। আর বাঙালীও একেবারে বাণিজ্য বিমুখ নয়।

ধনপতি-শ্রীমন্ত-বলরামের কথা না হয় বাদই দিলাম। তিন পুরুষে ভোলানাথবাবু, রঘুনাথবাবু আর মানিকবাবুদের অবদানের কথায় বোঝা যায় যে নিজেদের শিল্পবাণিজ্যে উদ্যমের বিরুদ্ধ সমালোচনায় বাঙালীর এতটা মুখর হবার কোনো কারণ নেই।

২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮





সাত

বইপাড়া থেকে বাড়ি ফিরে দুম্‌ করে ব্যাগটা তক্তপোশের ওপরে ফেললাম। চমকে উঠে গৃহিণী তাঁর দ্যাশের লোক সৈয়দ মুজতবা আলীর লেটেস্ট বেস্ট-সেলারটার পাতা থেকে মুখ তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

আমি।—কাল থেকে লেখা ছেড়ে দিচ্ছি—ছেড়ে দিচ্ছি এই রিপোর্টারের পেশা।

উনি। হঠাৎ হলোটা কী?

আমি।—ব্যবসায় নামবো; বইয়ের ব্যবসা। বইপাড়ার ফুটপাথে 'কিশলয়' বেচবো—মানের বইসহ। সীজন টাইমে দু চার হাজার কামাতে হবে। তারপরে অফ-সীজনে বেচবো উপন্যাস। ধরো তোমার এই শংকর, জরাসন্ধ, সমরেশ বসু—সক্কলের বই বেচবো ওই ফুটপাথেই। তাতে হাজার না হোক, পাঁচ সাত শো তো চোখ বুজে—

উনি।—(ঝংকার দিয়ে) তামাশা না করে আসল কথাটা বলেই ফেল না।

পাতায় একটা হেয়ারপিন গুঁজে ঠাস করে মুজতবা আলী বন্ধ করলেন। রোষকষায়িত নেত্রে আবার আমার দিকে তাকালেন।

শুধু গৃহিণীকে নয়, আসল কথাটা—নিজের চোখে দেখা যাচাই করা কথাটা—আপনাদেরও বলি। প্রায়ই কাগজে দেখছিলাম যে, সরকার প্রকাশিত স্কুলের নীচু ক্লাসের বই 'কিশলয়' নাকি অধিকাংশ লোকই স্কুল পাঠশালার মারফত পাচ্ছে না; অথচ চোরা পথে অনেক বেশি দাম দিয়ে স্বচ্ছন্দে পাওয়া যায়। যাচাই করতে নিজেই গিয়েছিলাম। মূল্য পঁচাশি পয়সা লেখা দেখে তাই দিয়ে একখানা কিনতে গেলাম। ফুটপাথওয়ালা খেঁকিয়ে উঠে বললো, "সঙ্গে একটা মানের বই নিতে হবে; চার টাকা ষাট পয়সা দিন।" আমার বিস্ময়ের ভান দেখে বইখানা আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে নীচু গলায় পাশের বেরাদার দোকানদারকে বললো, "ব্যাটা মফস্বলের লোক, কিছু জানে না। ফজুল টাইম নষ্ট করছে।" কিছুদিন ধরে 'বাঙাল' বলাটা উঠে গেছে

মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২
বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১ শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬

গ্রন্থপ্রকাশন : প্রথম পর্ব

দেখছি; তার বদলে বলে 'মফস্বলের লোক'।

সেটা অবশ্য ফুটপাথওয়ালার একটা কথার কথা। কেবল কলকাতার কেন, সারা বাঙলার সব অপোগণ্ডের বে-অকুফ মা-বাবা জানেন যে, এক কপি 'কিশলয়' কিনতে গেলে সঙ্গে এক কপি সমরেশ সেন-এর মানের বই নিতেই হবে। কিশলয় ৮৫ পয়সা, মানের বই ৩·৭৫ পয়সা— মোট ৪·৬০ পয়সা। দিতেই হবে, নচেৎ খালি হাতে বাড়ি ফিরে যান।

কথাটা জানকীবাবুর কাছেও শুনেছিলাম। জানকীবাবু অর্থাৎ 'বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার' সাধারণ সম্পাদক এবং পাঠ্য ও পাঠ্যোত্তর পুস্তকের প্রকাশন সংস্থা 'বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীজানকীনাথ বসু মহাশয়। গ্রন্থ প্রকাশন বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লেখবার বাসনা নিয়ে ক'দিন তাঁর কাছে ঘোরাফেরা করছিলাম তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধানে।

বইপাড়ায় ওই ব্যাপারের পর সোজা আবার তাঁর কাছে গেলাম। তিনি তাঁদের অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র 'গ্রন্থজগৎ' কয়েক কপি আনিয়ে দিলেন। তার একটি (এপ্রিল-মে ১৯৬৭ সংখ্যা) খুলে জানকীবাবু একটা চিঠি দেখালেন। গত বছর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়কে লেখা একটা চিঠির কপি। জানকীবাবুই অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি হিসেবে সেটাতে সই করেছিলেন :—

"কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় ফুটপাথের দোকানদারেরা শিক্ষা অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত প্রাইমারী পুস্তক প্রকাশ্যভাবে প্রচুর সংখ্যক বিক্রয় করিয়া চলিয়াছে—এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি। ফুটপাথের এই পুস্তক বিক্রেতারা এইসকল বই হয় অনেক বেশী দামে বিক্রয় করে, না হয় অভিভাবক ও ছাত্রদের অত্যধিক দামে অত্যন্ত বাজে মানে বই সমেত এই সকল বই ক্রয় করিতে বাধ্য করে।...আমরা শিক্ষা অধিকারের দৃষ্টি বার বার আকর্ষণ করিয়া ইহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছি যে, যদি ব্যবসায়ের স্বাভাবিক ধারায় অর্থাৎ এই সভার সভ্যদের, যাহারা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মাধ্যমে শিক্ষাধিকার প্রকাশিত বই বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হয়, এবং যদি এই সকল বই যথাসময়ে নিয়মিত সরবরাহ করা হয়, তাহা হইলে দুর্নীতি বা বিশৃঙ্খলার প্রশ্ন কোনদিনই উঠিতে পারে না এবং ছাত্রগণ মুদ্রিত মূল্যেই কোনরকম অসুবিধা ছাড়াই বই পাইতে পারে। শিক্ষা অধিকার দুর্নীতি রোধের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও এই সকল বইয়ের বহুলাংশ এই ফুটপাথবিক্রেতাদের কাছে চলিয়া আসিয়াছে। এই সকল বই-ই নূতন ও আধুনিকতম সংস্করণের। এইসকল বইয়ের বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয় সরকারী কর্মচারী, না হয় শিক্ষকদের মাধ্যমে করা হইয়াছে। অন্য কাহাকেও এই বই বিক্রয় করিতে দেওয়া হয় না। কি করিয়া তবে এত প্রচুরসংখ্যক বই ফুটপাথওলাদের নিকট আসিয়া গেল?..."

'বাঙালী জাগো' সঙ্ঘের প্রতিবেশী আমার এক ভবানীপুর বেলতলার বন্ধু ক'দিন আগেই বলছিলেন যে, বাঙালীর এমনই দুর্দশা যে সব ব্যাপারেই আমরা থার্ড ক্লাসও নয়, একেবারে

ফিফথ ক্লাস—ভাল একটা পকেটমার হবারও হেকমৎ নেই আমাদের! বন্ধুটি আমার খুব ওয়াকিবহাল নন। নয়া সালের সীজন টাইমে তিনি একবার বইপাড়ার ফুটপাথে যদি বৈকালিক পদচারণা করে আসতেন তাহলে তাঁর আফসোস থাকতো না।

শিক্ষামন্ত্রী জ্যোতিবাবুকে জানকীবাবু প্রায় ওই একই সময়ে একটি মেমোর‍্যাণ্ডাম পেশ করেন। তাতে পাঠ্য পুস্তকের রাষ্ট্রীয়করণ বিষয়ে অনেক কিছু ছিল। সরকার তিনটি উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয়করণের পথ বেছে নিয়েছেন; (ক) পাঠ্য পুস্তকের মান উন্নয়ন, (খ) বিনামূল্যে বা সস্তায় পুস্তক সরবরাহ, এবং (গ) পাঠ্য পুস্তকের বিক্রয় ও বিতরণের সুবন্দোবস্ত করা।

(খ) ও (গ)—এই দুইয়ের বিষয়ে সরকারের শিক্ষা অধিকারের অভূতপূর্ব সফলতার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ক-মার্কা উদ্দেশ্যটির বিষয়ে জানকীবাবুর বক্তব্য তিন দফা। প্রথমত, প্রতিযোগিতা না থেকে একচেটিয়া রাষ্ট্রায়ত্ত প্রকাশন হলে গ্রন্থের লেখক নির্বাচনের ব্যাপক ভিত্তি থাকে না। তাতে লেখার কাজ থেকে বিশিষ্ট পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতীরা বাদ পড়ে যেতে পারেন। প্রকাশকরা নাকি এ বিষয়ে তৎপর। দ্বিতীয়ত, এই একচেটিয়া নীতির ফলে বহু লোক তাঁদের পেশা থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন—যেমন ছাপাখানা, গ্রন্থক, কাগজের ব্যবসা ইত্যাদি। তৃতীয়ত, পাঠ্য পুস্তক বিক্রির লাভ থেকে দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও গবেষণামূলক পাঠ্যোত্তর গ্রন্থ আমাদের পাবলিশাররা প্রকাশ করে থাকেন। অতএব প্রকাশকদের বিতাড়িত করলে দেশের ও জাতির প্রভূত ক্ষতি হবে।

জানকীবাবুদের এই যুক্তিকে সমর্থন করা আমাদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব হত না, যদি প্রথমত, আমার নিজের চোখে কিশলয়-কেলেঙ্কারিটি দেখে না আসতাম এবং দ্বিতীয়ত আমাদের সমীক্ষা ও পরিক্রমার ফলে কয়েকজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা আরও কয়েকটা অদ্ভুত অদ্ভুত খবর না পেতাম।

কিশলয়-কেলেঙ্কারির বিষয়ে খাশমহলের বক্তব্য হলো যে, এখানকার স্কুলে হেডমাস্টার মশাইরা নাকি ঠিক করে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না। স্কুলের মারফত কিশলয় বিক্রির দায়িত্ব তাঁরা নাকি নিতে চান না। আর সরকারী কেন্দ্র থেকে বিক্রির পরিণতি হয়, লাইনে ভাড়াটে লোক লাগিয়ে পাঁউরুটি অথবা রেলের টিকিট কেনার শামিল। ভূশণ্ডির মাঠ থেকে শিবু আর নেত্যকালীরা লাইনে দাঁড়িয়ে স্টকের মাল আধ ঘণ্টার মধ্যে উঁপিয়ে দেন। তারপরে সেই মাল বই পাড়ার ফুটপাথে ভোজবাজির মত পুনরাবির্ভূত হয়। তা শিক্ষাধিকারের হুকুমবরদাররা আর কী করতে পারেন? সত্যিই বেচারীরা! তবুও এই তথ্যটুকুর জন্যে আবার তাঁদের রাজশেখরী 'ধন্য' জানাই।

এবারে কলকাতা থেকে পাঠককে একেবারে দিল্লী নিয়ে যাই। আপনারা বোধ হয় শুনেছেন যে, ১৯৫৭ সালে কেন্দ্র-সরকার একটি সংস্থার জন্মদান করেছিলেন—যার নাম হলো ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট। এই বালক-সংস্থাটির কর্মসূচী হচ্ছে উচ্চমার্গের সাহিত্য কর্ম প্রকাশ করে কম দামে গ্রন্থাগার, বিদ্যালয় ও জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া। এটি আবার শিক্ষাবিষয়ক, কৃষ্টি ও

সংস্কৃতি বিষয়ক, ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের, অনুবাদের ও বিজ্ঞানের পুস্তকাদিও প্রকাশের দিকে দৃষ্টি রাখেন। (লেখকের সাধ্যানুযায়ী হুবহু অনূদিত)। এর আবার অনেক টাকা। শুনলাম 'ইউনেসকো' এর মুরুব্বি। গম বিক্রির পি এল ৪৮০র টাকাও বোধ হয় পিছনে প্রচুর আছে। কিন্তু আলালের ঘরের দুলাল, তাই চলেন বিলম্বিত লয়ে। অতখানি অর্থবল নিয়েও ১৯৬৫ পর্যন্ত আট বছরে নাকি ১০৩টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এখন ১০ বছরে বোধ হয় ১২৫এ পৌঁছেছে। তা-ও যদি ইনি দীর্ঘমেয়াদী রচনা বা সংকলন নিয়েই কারবার করতেন তো বুঝতাম। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে বেশ কিছু বাজে বই ছাড়াও এই সংস্থার উৎসাহে এমন ইংরেজী বইও অনূদিত হয়েছে যাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কাঁচা গালিগালাজ আছে। সেই বইয়ের বাঙলা ট্রানস্লেশন কোনো এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অনুমোদন করতে দেওয়া হয়েছিল। তাতে ওই কটূক্তি ছাড়াও ভাষার ও তথ্যের অনেক ভুল থাকাতে সেই ভদ্রলোক সেটা অনুমোদন করলেন না। তখন তাঁকে নাকি বিষয়টা আবার 'রি-কনসিডার' করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হলো। ভদ্রলোকের কাছে ব্যাপারটা রহস্যজনক মনে হয়েছিল এবং তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করতে অক্ষমতা জানিয়েছিলেন। তাই বাঙলা অনুবাদটা বের হয়নি বটে, কিন্তু অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল, এত সত্ত্বেও।

এই তো গেল বালক-সংস্থা ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট সম্বন্ধে আমাদের যৎকিঞ্চিৎ মন্তব্য। এখন 'কিশোর'-এর অর্থাৎ সাহিত্য আকাদেমির কথা বলা যাক।

প্রথমেই বলে নিই যে, আকাদেমির প্রোডাকশনের দিকটা অনবদ্য। মহামূল্য সমস্ত মৌলিক রচনা, অনুবাদ এবং সংকলন নিয়ে ১৫ বছরে প্রায় ৪৭০টি গ্রন্থ ও পুস্তিকা আকাদেমি দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি : (১) দেবনাগরী, গুজরাতী প্রভৃতিতে লিপ্যন্তর করে রবীন্দ্রনাথের ১০১টি কবিতার বই 'একোত্তরশতী', (২) পন্ডিত নেহরুর ভূমিকা এবং হিন্দীতে অনুবাদ সহ বার্ষিক রচনার ভিত্তিতে সংকলিত কয়েক খণ্ড লিপ্যন্তরিত 'ভারতীয় কবিতা' (দেবনাগরীতে ছাপা), (৩) ইংরেজীতে দুই খণ্ডে 'দি ন্যাশন্যাল বিবলিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার', (৪) ইংরেজীতে অসমীয়া, বাঙলা, ওড়িয়া ও মালয়ালাম সাহিত্যের ইতিহাস, (৫) পায় সমস্ত আঞ্চলিক ভাষায় অনূদিত ধর্মানন্দ কোসাম্বির "ভগবান বুদ্ধ" এবং (৬) আমাদের বাঙালীদের কাছে অমূল্য, স্বর্গীয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' দুই খণ্ড। মাত্র ৫০৲ টাকা দামে আকাদেমি এই সদ্য প্রকাশিত 'শব্দকোষ' বিক্রি করছেন। যে-কোনো প্রকাশন-ব্যবসায়ী এই সুদৃশ্য বিরাট বিরাট বই দুটির দাম ১০০৲ টাকা না হোক, ৭০।৮০ টাকা নিশ্চয়ই ফেলতেন।

ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা আকাদেমির উপদেষ্টামণ্ডলীতে আছেন। কিন্তু এত সত্ত্বেও আকাদেমির বইয়ের বিক্রি খুব কম। অনুসন্ধান করে এর ১৯৬৭ সালের বার্ষিক রিপোর্টে কারণটা খুঁজে পেলাম। বিজ্ঞাপনের খাতে বরাদ্দ আছে মাত্র ৮০০০ টাকা এবং খরচ হয়েছে ৫০০৫ টাকা। তা হলে বই বিক্রি হবে কী করে? লোকে বইগুলির কথা জানতেই পারে না।

বিদেশী প্রকাশকেরা তো করেনই, আজকাল আমাদের দেশীয় প্রকাশকেরা এইসব গ্রন্থের বিক্রি বাড়াবার জন্যে ওই ৮০০০ টাকার কুড়ি গুণ না হোক দশ গুণ খরচ করতেন বিজ্ঞাপনের

খাতে। সংবাদ ও সাময়িকপত্রে ছাড়াও মেইলিং লিস্ট পাঠিয়ে এবং সেলস অরগ্যানাইজেশন যথাযথ করে এইসব বইয়ের বিক্রি ও প্রচার বিশ ত্রিশ গুণ বেড়ে যেতে পারত। আকাদেমির পরিচালকবর্গ হলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিকবৃন্দ। আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে তাঁদের আবার বেড়াজালে ঘিরে রেখেছেন আমাদের সেইসকল কাজের-কাজী আমলাতন্ত্র।

১৯৬২ সালে আকাদেমির গ্রন্থ প্রকাশের খরচ হয়েছিল প্রায় ৩ লক্ষ টাকা, বিক্রি হয়েছিল ৮৮০০০ টাকার। ১৯৬৭ সালে খরচ হয়েছে (শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের জন্য পুরস্কার বাবদ খরচ বাদ দিয়ে) ৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, আর বই বিক্রি হয়েছে মাত্র ১ লক্ষ ৬১ হাজার টাকার। ছবিটি মনোমুগ্ধকর নয় নিশ্চয়ই।

অবশ্য বই বিক্রি না হবার জন্যে কেবল সরকারী ও বেসরকারী প্রকাশককে দোষারোপ করলে বাজে কথা বলা হবে। আমাদের নিজেদেরও গুণে ঘাট নেই। আমরা বই কিনি না। গরীবের তো চালডালের সওদাতেই পুঁজি শেষ, বই কেনার বিলাসিতার স্থান নেই। অবস্থাপন্ন অথবা ধনীরাও এইসব বই কেনেন না। তাঁরা লোলিটা কেনেন, ট্রপিক অব ক্যান্সার কেনেন, জেমস বণ্ড কেনেন—কিন্তু সারা দিন অর্থোপার্জনের ক্লান্তির পরে তাঁদের মধ্যে খুবই অল্প কয়েকজন অবসর সময়টা আকাদেমি বা বুক ট্রাস্টের 'হেভি লিটারেচার' বা সায়ান্সের বই—তা-ও আবার অনেক হলো ভার্নাকুলারে—পড়ে মস্তিষ্ককে পীড়া দিতে চান।

আরও একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী সাহিত্যিক 'লেখক সমবায় সমিতি' নাম দিয়ে একটি প্রকাশন সংস্থা গড়েছেন। তাঁদের প্রকাশিত বাছাই-করা সব বইও নাকি বিক্রি হচ্ছে না। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এ যাবৎ নাকি একটিমাত্র বই বাংলায় লিখেছেন, 'বিজ্ঞানের সঙ্কট ও অন্যান্য প্রবন্ধ'; সেটা এই সমবায়ের প্রকাশিত অন্যান্য মূল্যবান প্রকাশনের অন্যতম। দামও খুব কম, মাত্র ৬·৭৫ পয়সা, সিনেমার 'সাউন্ড অব মিউজিক' ছবির তিনটি টিকিটের দামের চাইতেও কম।

আমাদের শিক্ষার প্রসার নির্ণয়ক পরিসংখ্যান ছোট করে এখানে উদ্ধৃত করে পাঠককে কিছুটা চিন্তার খোরাক জুটিয়ে দিই :—

স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা

প্রাইমারি

১৯৫০-৫১—১ কোটি ৮৩ লক্ষ
১৯৬০-৬১—২ কোটি ৬৬ লক্ষ

সেকেণ্ডারি

১৯৫০-৫১— ৫২ লক্ষ
১৯৬০-৬১—১ কোটি ৮০ লক্ষ

(১৯৬৬ সালে আমাদের কলেজের গ্র্যাজুয়েট ছিল ১০ লক্ষ আর এম এ পাস ছিল ২ লক্ষ ২০ হাজার)।

যে দেশে নিরক্ষরতা হলো শতকরা ৭৬ (বাংলা দেশে একটু কম—শতকরা ৭০) এবং শিক্ষিত লোকের রুচিও অমন, লোকশিক্ষা ও সংস্কৃতির নামে সরকারী তহবিল থেকে কতকগুলি টাকা দিয়ে সেই দেশের শাসকবর্গের বই ছাপাবার দরকারই বা কী, আর যদি ছাপলেনই তো সেগুলি সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণের সুব্যবস্থা না করবার মানেটাই বা কী?

অথচ এই মূলধন বা তার চেয়েও কম টাকা বিশ্বভারতী অথবা আমাদের কলকাতার এম সি সরকার, এ মুখার্জি, শিশু সাহিত্য সংসদ, মডার্ন বুক এজেন্সি, ফার্মা কে এল মুখার্জি, ওয়ার্লড প্রেস, বুকল্যান্ড, লেখক সমবায় সমিতি বা ওইরকম কেউ তাঁদের ব্যবসাতে খাটালে পাঠ্যপুস্তক বেচে তার লাভ থেকে এইসব পাঠ্যোত্তর গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারতেন। এবং তাঁরা যে সরকারী সংস্থাগুলির চেয়ে অনেক ভালো ফল দেখাতে পারতেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম।

মূলধনের একান্ত অভাব সত্ত্বেও কেমন করে একটা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দিয়ে বড় করা যায় এবারে তার একটা উদাহরণ দিই।

মডার্ন বুক এজেন্সির কথাটাই ধরা যাক।

ঢাকসাইটে টেররিস্ট অবিনাশ ভট্টাচার্য ছিলেন স্বর্গীয় বারীন ঘোষ মহাশয়ের দলের উপ-নেতাদের অন্যতম। তাঁর ছোট ভাই উপেনবাবুও এককালে সেই দলেরই একজন ছিলেন। পরে রাজনীতি ও সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে উপেনবাবু প্রকাশকের ব্যবসাতে নামলেন। ১৯২৯ সালে এই মডার্ন বুক এজেন্সি গঠন করে কয়েক বছর একাই কাজ চালাচ্ছিলেন। কিন্তু ভালো চলছিল না। মূলধনের এবং উপযুক্ত সহকর্মীর অভাবে ধার দেনা করে কোনোরকমে ব্যবসা চলছিল।

ওদিকে ভবিষ্যৎ সহকর্মীটি আগের থেকেই তৈরী হচ্ছিলেন আর একটি পুরনো প্রতিষ্ঠানে। প্রাচীন প্রতিষ্ঠান বলতে পাঠ্যপুস্তকের জগতে শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে কেষ্ট-বিষ্টুদের মধ্যে ছিল এস কে লাহিড়ী, চক্রবর্তী চ্যাটার্জি, বুক কম্পানি, কমলা বুক ডিপো, সেন রায় প্রভৃতি কয়েকটি প্রকাশন সংস্থা।

১৯১৩ সালে চব্বিশ পরগণার আড়বালিয়া থেকে ১২ বছরের একটি ছেলে রোজগারের সন্ধানে কলকাতায় এল। নাম দীনেশ বসু। কুলীন কায়স্থ, ভালো বংশের ছেলে, কিন্তু পারিবারিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাওয়াতে ওই কচি বয়সেই তাকে বাড়ি ছেড়ে বেরুতে হয়েছিল। কাজ একটা হল। প্রকাশক সেন রায় কম্পানিতে দৈনিক দু পয়সা জলপানি মাইনের কাজ। খাওয়া থাকা চলত এক আত্মীয়ের বাসায়। বই এগিয়ে দেওয়া, প্যাক করা, এই ছিল দীনেশের কাজ। কিন্তু দু পয়সা রোজে ক'দিন আর চলে! চেষ্টাচরিত্র করে ছ' মাস পরে চক্রবর্তী চ্যাটার্জিতে একটা কাজ জুটল। মাইনে মাসিক ৭৲ টাকা। এখানেই মনিবের নেক নজরে থেকে দীনেশ প্রায় ২৫ বছর কাজ করলেন। পদবৃদ্ধি হলো আর মাইনেও বাড়তে বাড়তে ১৯৩৮ সালে দাঁড়ালো ৬০ টাকায়।

দীনেশের স্বাধীন ব্যবসার সাধ মনে মনে বহুকাল ছিল। ১৯৩৮-এ একদিন উপেনবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ হলো। চাকরি ছেড়ে দীনেশ উপেনবাবুর মডার্ন বুক এজেন্সিতে হাফ-পার্টনার হয়ে ঢুকলেন। তার মানে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

দুই শরিক উঠে-পড়ে লাগলেন মৃতপ্রায় প্রতিষ্ঠানটিতে নতুন করে প্রাণসঞ্চার, শক্তিসঞ্চার করতে। সে কি সহজ কথা!

পাবলিশাররা তাঁদের এক একটি প্রকাশনকে এক এক 'টাইটেল' বলেন। ১৯২৯ সালে মডার্নের মাত্র ১৫।১৬টা টাইটেল ছিল। এত কমে ব্যবসা চালানো খুব শক্ত। ভিন্ন ভিন্ন স্কুল-কলেজের সিলেবাসে বেশ প্রভেদ থাকে। তার চাহিদা মেটানো দরকার। আর মূলধন তো নেই-ই, উল্টে বাজারে ১৪।১৫ হাজার টাকা দেনা। পুরনো ১৫।১৬টা টাইটেলের রিপ্রিন্ট চলে কষ্টেসৃষ্টে কিন্তু নতুন বইয়ের জন্যে লেখক থেকে আরম্ভ করে কাগজ কেনা, প্রেসের খরচ, বাঁধাই, এত সব খরচ করবার বা ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা মডার্নের মালিকদের নেই। আছে শুধু উপেনবাবুর অতি কষ্টে গড়ে তোলা সামান্য একটু গুড-উইল এবং বড় ফার্মে কাজ করে দীনেশবাবুর দীর্ঘতর অভিজ্ঞতা। কিন্তু আগে যে একটা প্রবন্ধে বলেছি যে, পর্ণকুটির থেকে প্রাসাদে প্রমোশন পেতে গেলে কেবল অধ্যবসায় ও পরিশ্রম যথেষ্ট নয়, ভাগ্যের আনুকূল্য চাই পরিমাণে আরও বেশী, তা দু'তিন বছর এঁদের দু'জনের সেই ভাগ্যের দিকের পাল্লা শূন্যেই উঠে রইল।

বৃহস্পতি তুঙ্গী হলেন যখন জাপানীরা ১৯৪১-এ কলকাতায় হাঁসের ডিমের সাইজের কয়েকটা বোমা ফেলল। দীনেশবাবুরা অযাচিতভাবে ধারে অনেক কাগজ কালি ইত্যাদি পেলেন। ধনী কাগজ কালি বিক্রেতারা কলকাতা ছেড়ে পালাবেন ইভ্যাকুয়েট করে। কালি কাগজ তো সংগে নিয়ে যাওয়া যায় না। ফেলে গেলে লুঠ হয়ে যেতে পারে কিংবা জাপানী বোমায় নষ্ট হয়ে যেতেও পারে। তার চেয়ে বিশ্বাসী প্রকাশককে সস্তায় আর ক্রেডিটে দিয়ে গেলে বাঁচে তো বাঁচবে। অর্ধত্যাগের পণ্ডিতী পলিসি আর কি!

দীনেশবাবুরা এই ক্রেডিটের পূর্ণ সুযোগ নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সেই সময়েই পেলেন ডাঃ কালিদাস নাগ, পণ্ডিত অশোক শাস্ত্রী, প্রিন্সিপ্যাল দেবপ্রসাদ ঘোষ, ডক্টর কে. বসু, প্রফেসর শশাংক বাগচী, ডঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জি, ডঃ কুদরত-এ-খুদা, ডঃ ডি. বি. সিংহ, ডঃ কিরণচন্দ্র চৌধুরী, অধ্যক্ষ শিবনাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক ডি. এন. ঘোষ, অধ্যাপক আর. পি. ঘোষ, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতদের অকৃত্রিম সহযোগিতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এ. বি. টি. এ এবং ভারত সরকারের সহায়তাও প্রচুর পেলেন মডার্ন বুক এজেন্সি।

জাপানী আক্রমণের ভয় কেটে গেলে মডার্নের প্রকাশনও এগিয়ে চললো। মিলিত বঙ্গের স্কুল-কলেজ ইউনিভারসিটিতে মডার্নের বই একের পর এক সিলেবাসে তালিকাভুক্ত হতে লাগলো। স্বাধীনতা এল, পাকিস্তান হলো। উভয় বঙ্গে এবং বর্মা, সিংহল ও আফ্রিকাতে মডার্ন বুক এজেন্সির বই-এর রপ্তানি হতে লাগলো দ্রুত বেগে।

১৯৪০-৪১ সালে দীনেশবাবুরা হাজার পঞ্চাশেক টাকার বই বিক্রি করতেন। ১৯৬৩তে সেই বিক্রি এসে দাঁড়ালো ২৮ লক্ষ টাকায়। তারপরে ধীরে ধীরে এল মন্দা ও সংকট। বর্মা ও সিংহল বিদেশী বই আমদানী বন্ধ করলো। পাকিস্তানে ১৯৬৫-র লড়াইয়ের আগে থেকেই পশ্চিম বাংলায় প্রকাশিত অনেক বইয়ের 'পাইরেট' এডিশন (মূল প্রকাশকের বিনা অনুমতিতে অন্যের দ্বারা প্রকাশিত সংস্করণ) বের হচ্ছিল, যার হাত থেকে এ টি দেব-এর অভিধানও বাদ

যায়নি। আইনসংগত পথে যেটুকু রপ্তানী হত তাও বন্ধ হলো লড়াইয়ের পর থেকে।

অনেক ভারতীয় বইয়ের মধ্যে মডার্নের দুটি বই—প্রফেসর আর পি ঘোষের 'গুড ইংলিশ' এবং ডি এন বোসের 'কলেজ এসেজ'—খুব বেশী সংখ্যায় আফ্রিকাতে চালান হত। ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারত ৭৮ লক্ষ টাকার বই রপ্তানি করেছিল। সেই মহাদেশে একটার পর একটা অঞ্চল যখন টুকরো টুকরো হয়ে স্বাধীন হতে লাগলো তখন উত্তেজনা ও উদ্দীপনার প্রাবল্যে চালানী বইয়ের বাক্সর কথা সেখানকার লোক ভুলে যেতে লাগলো। বাক্সগুলি বন্দরের গুদামে পচতে লাগলো। স্বাধীন আফ্রিকাও স্বাধীন ভারতের মত নিজেদের সংস্থা গড়ে তুলে অথবা বিদেশী প্রকাশকের সংগে যুক্ত হয়েও বই বের করা আরম্ভ করলো। ইতিমধ্যেই বিশ্বের পুস্তক প্রকাশন বাণিজ্যের পর পর দুটি সংস্থা মার্কিন ও ব্রিটিশ সরকারী সহায়তায় গঠিত হয়ে তাদের জাল বিস্তার করতে শুরু করেছিল। প্রথমটি হলো মার্কিন আই এম জি (ইনফরমেশন্যাল মিডিয়া গ্যারান্টি) প্রোগ্রাম। দ্বিতীয়টি ব্রিটিশ ই এল বি এস (ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি)। এই দুই অতিকায় প্রতিযোগী সংস্থা দেশে দেশে প্রসারিত হয়ে খুব সস্তায় বিখ্যাত লেখকদের ভালো ভালো বই বাজারে ছাড়লো। আফ্রিকার অথবা পাকিস্তানের সাময়িক রাজনীতিক উত্তেজনার ফলে আমাদের ভারতীয় বই রপ্তানি বাণিজ্য যতটা না আহত হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি হয়েছে এই ই এল বি এস এবং আই এম জির কল্যাণে।

ফলে 'বাঙালী ম্যাকমিলান' মডার্নের বিক্রি এখন নেমে এসেছে। ১৯৬৩-তে যে বিক্রি—ছিল ২৮ লক্ষেরও বেশি এখন তা হচ্ছে ১৯ লক্ষ টাকার। অবশ্য এতে বিশেষ ভয়ের কিছু নেই: দেশে শিক্ষার প্রসারের সংগে সংগে বিক্রি আবার বেড়ে যাওয়া উচিত।

মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড-এর টাইটেলের সংখ্যা এখন ৩৫০ আন্দাজ। সবই স্কুল কলেজ এবং পাঠ্যোত্তর গ্রন্থ। মোট মূলধন ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে পেড-আপ ক্যাপিট্যাল ৪ লক্ষ টাকা এবং শেয়ারহোল্ডারদের অর্থাৎ উপেনবাবু ও দীনেশবাবুর পরিবারের সকলের কম্পানিতে আরও ৪ লক্ষ টাকা আগাম দেওয়া আছে। বাজারে ক্রেডিট অপরিমেয় এবং দৈনিক বিক্রিও প্রচুর। কাজেই লক্ষ্মী এঁদের ঘরে স্থায়ীভাবেই বাস করবেন বলে মনে হয়।

মডার্নের কর্মিসংখ্যা ৫৬। তাঁদের পরিচালক হলেন উপেনবাবুর ছেলে শ্রীরবীন্দ্র ভট্টাচার্য।

উপেনবাবু ও দীনেশবাবুর ছেলেরা মিলিত হয়ে বি বি ব্রাদার্স নাম দিয়ে আর একটি প্রতিষ্ঠান কলকাতার শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটে এবং গৌহাটিতে স্থাপনা করেছেন। গৌহাটিতে তাঁদের ভালো কাজ হয়।

বহুকাল ধরে বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার সক্রিয় সভ্য থাকার পর দীনেশ-বাবু সেই সঙ্ঘের সভাপতিত্বও করেছেন।

মডার্ন, শিশু সাহিত্য সংসদ, এ মুখার্জিরা অসাধারণ: ব্যবসার সম্প্রসারণের জন্যে অন্যের কাছে অর্থসাহায্য তাঁদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই মন্দার বাজারে সাধারণ প্রকাশকদের কাজ চালাতে বেগ পেতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার রাস্তা আছে, কিন্তু সেদিকে আমাদের বাঙালী প্রকাশকরা অকর্মা। এম সি সরকার কম্পানির ভূতপূর্ব কর্তা স্বর্গীয় সুধীর-

চন্দ্র সরকার মহাশয় কিছুকাল আগে একটি প্রবন্ধে অবশ্য একটু অন্যরকমের ইশারা করে গেছেন: "দিল্লীতে যে শিক্ষা বিভাগ আছে তাঁদের হাতে প্রতি বৎসর কয়েক লক্ষ টাকা গচ্ছিত থাকে আঞ্চলিক ভাষার উন্নতিকল্পে। এই টাকার অধিকাংশ একটি ভাষার পুস্তক প্রকাশনে ব্যয়িত হয়, অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার উন্নতিকল্পে বেশি টাকা পাওয়া যায় না। তবে এক সময় শ্রীহুমায়ুন কবীর শিক্ষামন্ত্রী (?) থাকা কালীন রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীর সময় সকল স্থানের আঞ্চলিক ভাষার উন্নতিকল্পে সাহায্য পরিবেশিত হওয়ায় বাংলা ভাষারও কিছুটা শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।"

শিক্ষামন্ত্রকের এই বরাদ্দ ছাড়া আরও উপায় আছে। যেমন, পি এল ৪৮০র আমেরিকান গমের টাকা এবং রুশী সাহায়কও আছে। কিন্তু এইসব সাহায্যের অংশ পেতে গেলে বাঙালী প্রকাশকদের খাটতে হবে; মাঝে মাঝে দিল্লীতে গিয়ে ধরনা দিতে হবে।

এই পন্থা অবলম্বন না করলে ওই গমজাত বই প্রকাশ করে কেবল একটি কি দুটি আঞ্চলিক ভাষারই উন্নতি হবে। আর লাভবান হবে এখানকার কতকগুলি মার্কিন প্রকাশক ও তাদের পেটোয়া কয়েকটা ভারতীয় প্রকাশন সংস্থা। গত কয়েক বছরে গম কর্জ খাতের টাকা থেকে প্রায় আড়াই কোটি টাকা পুস্তক প্রকাশন ব্যবসাতে খাটছে। তা খাটুক, ক্ষতি নেই; কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে আর একটি দিক দিয়ে। এই টাকা থেকে যে সব বই প্রকাশিত হচ্ছে তার বহুলাংশই অ-ভারতীয়ের লেখা বই। বিদেশী লেখকের ইংরেজী বই অথবা তার ভারতীয় অনুবাদ আমাদের জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আর, ই এল বি এস এবং আই এম জি'র সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ছাপা এই পি এল ৪৮০র বইও রপ্তানি হয়ে খাঁটি ভারতীয় বইয়ের রপ্তানীর বাজার আরও খারাপ করে দিচ্ছে।

আপনাদের এতক্ষণ পাকিস্তান, বর্মা, ইংল্যান্ড, সিংহল, আফ্রিকা, সব দেশ ঘোরালাম। এখন আবার দেশের মাটিতে, বাংলা দেশে ফিরিয়ে আনি। শুধু তাই নয়, শুষ্ক পরিসংখ্যান দিয়ে আবার জর্জরিত করি।

১৯৫৭-৫৮ সালে ২১১৩টি বাঙলা বই প্রকাশিত হয়েছিল; আর অন্যান্য ভাষা নিয়ে মোট ৩৬৭৯ বই বাঙলা দেশে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই জায়গায় ১৯৬৪-৬৫তে হয়েছিল যথাক্রমে ১৩০২ এবং ২৪৫০টি বই। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একটি কথা শুনে বেশ অবাকই হলাম। তিনি বললেন যে, পঞ্চাশ বছর আগে চালু বাঙলা বইয়ের সংখ্যা যা ছিল তার থেকে এখন নাকি অল্পই বেড়েছে। শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যে চাহিদা বাড়ছে তা নাকি মেটানো হচ্ছে ইংরেজী বইয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে। চিত্তবাবু আরও একটি বেদনাদায়ক কথা বললেন। প্রায় ১০ বছর হতে চললো বি-এ পরীক্ষাতেও আমাদের ছেলেমেয়েরা বাঙলা মিডিয়মে বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারে। কিন্তু আমাদের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীরা তাঁদের মৌলিক রচনা এখনো ইংরেজীতে করে থাকেন। বাঙলাতে যেসব বই বেরোয় তার মধ্যে মৌলিকত্ব বলে কিছু থাকে না। সেগুলি নিছক অনুবাদ ও নোট বই জাতীয় গ্রন্থ। অতএব যে ছাত্রছাত্রী বাঙলায় পড়েন তাঁদের শিক্ষার মান অনেকটা

নীচু হয়ে যায়। আমাদের বাঙালী শিক্ষাব্রতীরা সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধে শিথিল হয়ে পড়েছেন বলে চিত্তবাবু মনে করেন।

পাঠক, প্রকাশন নিয়ে মাত্র এক কুইন্টল তথ্য আপনাদের স্কন্ধে চাপালাম। বহু বিদগ্ধ ব্যক্তির দ্বারে দ্বারে সকাল সন্ধ্যে ঘুরে যা সংগ্রহ করেছি তার ওজন কয়েক টন। তার ভারে আমি নুয়ে পড়েছি। এখন ভাবছি, আমাদের উপেন ভট্টাচার্য আর দীনেশ বসু মশায়দের লক্ষ্মীর কৃপালাভের কাহিনীটুকু দিয়েই সেরে দিলে হতো।

আমি সারাজীবন অনেক খেটেও দেবীর বাহনটির পুচ্ছের একটি পালকও খামচে নিতে পারলাম না। এখন সংকল্প করেছি যে, ইজ্জত যাবার ভয়ে গৃহিণী ও পুত্রকন্যা যতই আপত্তি করুন না কেন, ফজুল আর টাইম নষ্ট না করে নেক্সট সীজন থেকে (এ সীজনটা বরবাদ হয়ে গেল) গোলদীঘির কাছে ফুটপাথে বসে 'কিশলয়' আর 'পারিজাত রীডার' উইথ মিনিং বুক বিক্রি করে জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটিয়ে দেবো। আপনাদের মধ্যে যাঁর একটিও অপোগণ্ড পুত্রকন্যা নাতিনাতনী আছে তাঁর সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

গ্রন্থপ্রকাশন : দ্বিতীয় পর্ব

শিশুসাহিত্য ও কিশোরসাহিত্য

"বাংলাদেশে এত বড় দুর্ঘটনাও ঘটেছিল যে, 'আবোল-তাবোল' অনেক বছর ছাপা ছিল না। মাঝে কুলদারঞ্জন অবলুপ্তির প্রান্তে এসে ঠেকেছিলেন, সুখলতা রাওয়ের বই যোগাড় করতে প্রায় গোয়েন্দা লাগাবার প্রয়োজন হ'ত। এ-সব বইয়ের পুনঃপ্রকাশ তাই সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে মনে করি।"

বছর দশ-বারো আগে 'বাংলা শিশুসাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু এই উক্তিটি করেছিলেন। এই দামী কথাগুলি সেদিন আবার চোখে পড়ল বুদ্ধদেব বাবুর প্রবন্ধ সংকলন 'সাহিত্যচর্চা' বইটিতে। এই চোখে পড়াটা আমার পক্ষে দৈব হয়ে দাঁড়াল। কারণ, তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি চিন্তাকুল হয়েছিলাম যে, পাঠ্য ও পাঠ্যোত্তর পুস্তক প্রকাশনের মোহানা ছাড়িয়ে যখন সাহিত্যের প্রশান্ত মহাসাগরে পড়ব তখন আমার মত উঞ্ছবৃত্তিধারী কথক তার পালার গৌরচন্দ্রিকা কী দিয়ে আরম্ভ করবে। বুদ্ধদেব বাবুকে অশেষ ধন্যবাদ।

আর একজনকে আমার কৃতজ্ঞতা একটু বেশী করে জানাতে হয়—শ্রীমতী বাণী বসুকে। আমার প্রয়োজন তথ্যের; তিনিই আমাকে তা জুটিয়ে দিলেন। তাঁর সংকলিত 'বাংলা শিশুসাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী' পড়েই বাংলা শিশুসাহিত্যের বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বোধোদয় হ'ল। ১৮১৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৫০ বছরের বাংলা শিশুসাহিত্যের এই মূল্যবান গ্রন্থপঞ্জীটির ভূমিকাতেও অনেক সুন্দর সুন্দর জানবার কথা পেলাম।

এই পঞ্জী থেকেই পেলাম ১৮১৮ সালে বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত শ্রীরামপুরের ছাপা জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদিত সচিত্র কিশোর পত্রিকা 'দিগদর্শন'-এর জন্মকথা। বাণী দেবীর পঞ্জীতে অবশ্য আছে যে, ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'র উদ্যমে রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন ও তারিণীচরণ মিত্রের প্রচেষ্টায় রচিত 'নীতিকথা' দিয়ে এর শুরু, কিন্তু বোধহয় 'দিগদর্শন'-এ ১৮২২ সালে প্রকাশিত 'গন্ডারের বৃত্তান্ত'ই কিশোরদের জন্য প্রথম সচিত্র বাংলা গল্প। আবার আমরা পাচ্ছি ১৮৫১ সালের 'দিগদর্শন'-এ আর এক সংস্করণে মুদ্রিত (সচিত্র) 'ঠাকুরদাদার হস্তিবিষয়ক ইতিহাস'।

দ্বিতীয় পর্যায় বিদ্যাসাগর-যুগ দিল 'কথামালা', অক্ষয় দত্তের 'চারুপাঠ' ও রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'গল্পসল্প'। তৃতীয় পর্যায়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর প্রমুখ সাহিত্যগুরু ও পথিকৃতেরা কয়েকজন একই সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের কথা আর সকলকে নতুন করে কি বলব! উপেন্দ্রকিশোর দিলেন 'টুনটুনির বই', 'ছোট্ট রামায়ণ', 'ছোটদের রামায়ণ' ও 'মহাভারত', 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন', আর দিলেন আমাদের ছেলেবেলার সেই 'সন্দেশ' পত্রিকা, যা বুদ্ধদেববাবুর ভাষায় "ছোটোদের আশার হরিণকে দিগন্তের দিকে ছুটিয়ে দিয়ে মাসে মাসে আসতো।"

বাণী বসু লিখেছেন : "উপেন্দ্রকিশোরের পূর্বে শিশুসাহিত্যে যেসব ছবি আমরা দেখেছি সেগুলি বক্তব্য বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার সহায়ক মাত্র। রঙ বেরঙের ছবি দিয়ে......সমস্ত বইটি অপরিণত বয়সের পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার তাৎপর্য উপেন্দ্রকিশোর বুঝেছিলেন।" দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র রাজপুত্রের সঙ্গে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে আজকের ঠাকুর্দা আর দাদামশায়রা ব্যাঙ্গমাব্যাঙ্গমীর কাছ থেকে হদিস নিয়ে কত যোজন উড়ে গিয়ে আজকের ঠাকুরমা আর দিদিমাদের খুঁজে পেয়েছিলেন তার কোনো হিসেব কিন্তু বুদ্ধদেব-বাবু তাঁর প্রবন্ধে ঠিক করে দেননি।

যোগীন্দ্রনাথ দিলেন 'হাসিখুশি', 'খুকুমণির ছড়া'। আমরা যে ছড়া কাটতাম 'কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি/খেঁকশেয়ালি পালায় ছুটি/গরুবাছুর দাঁড়িয়ে আছে/ঘুঘুপাখি ডাকছে গাছে, সেই ছড়া বুদ্ধদেব বাবু মনে করিয়ে দেওয়াতে মনটা যেন কেমন করে উঠল। যেন আমার হারানো মায়ের সান্নিধ্য উপলব্ধি করলাম এই ছড়ার সুরের রেশের মধ্য দিয়ে।

তারপরে এলেন 'বাংলা গদ্যের চিত্ররথ গন্ধর্ব' অবনীন্দ্রনাথ, যিনি আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "কোন্ ঠাকুর?—ওবিন ঠাকুর; ছবি লেখে।" তিনি দিলেন 'বুড়ো আংলা', 'ক্ষীরের পুতুল', 'ভূত-পত্‌রীর দেশ', 'নালক', 'রাজকাহিনী'। জগদানন্দ রায় দিলেন তাঁর 'গ্রহনক্ষত্র' 'মাছব্যাঙসাপ', আরও কত কি। কুলদারঞ্জন রায় দিলেন 'বত্রিশ সিংহাসন', 'রবিন হুড'। যোগেন্দ্র-নাথ গুপ্তও ছিলেন সেই দলের।

'সন্দেশ' ছাড়াও তখনকার নামকরা কিশোর পত্রিকা ছিল পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় 'মুকুল', নগেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পার্বণী', সুধীরচন্দ্র সরকারের 'মৌচাক', আশুতোষ ধরের 'শিশুসাথী', হেমেন্দ্রনাথ দত্তের (ঢাকায় প্রকাশিত) 'সোপান' প্রভৃতি। কামাক্ষীপ্রসাদ

চট্টোপাধ্যায়ের 'রংমশাল' এবং দেব সাহিত্য কুটীরের 'শুকতারা' প্রভৃতি পত্রিকা তো অনেক পরের কথা।

এই সমস্ত শিশুগ্রন্থ ও পত্রিকায় প্রকাশকদের নামের উল্লেখ এই প্রবন্ধে অনাবশ্যক মনে করি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ নেই—যেমন, ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর প্রকাশক।

সুকুমার রায়ের কথাও আমাদের নতুন করে এখানে বলবার দরকার নেই। তাঁর ভগ্নী সুখলতা রাওয়ের বিষয়েও একই বক্তব্য।

তারপরে একে একে এলেন চতুর্থ পর্যায়ের সকলে, যাঁরা কেউ কেউ চলেও গেছেন। শান্তা দেবী, সীতা দেবী, অমিতাকুমারী বসু, লীলা মজুমদার, হেমেন্দ্রকুমার রায় (যখের ধন), সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম (ঘুম জাগানো পাখি) সুনির্মল বসু, সুকুমার দে সরকার, ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধ সান্যাল, অমিয় চক্রবর্তী, শৈল চক্রবর্তী, অন্নদাশংকর রায়, শৈলেন ঘোষ, শংকরীপ্রসাদ বসু, 'স্বপন বুড়ো' ও আমাদের 'মৌমাছি' এবং আরও কত বাঙালী গ্রিম, ল্যুইস ক্যারল আর হ্যানস ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসেনরা।

একটু দেরী করে হলেও শিশুসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা ভারত সরকার বুঝলেন এবং ১৯৫৪ সাল থেকে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া শুরু হ'ল। প্রথম বছরেই প্রথম হ'ল 'সিগনেট'-এর প্রকাশিত সুকুমার রায়ের "পাগলা দাশু"। বিখ্যাত কার্টুনিস্ট ও সাময়িকপত্রের সম্পাদক শংকরের উদ্যোগে 'চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্ট' নামে একটি সংস্থাও সংগঠিত হল।

শিশুসাহিত্য গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ করে সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কোন্ প্রকাশকেরা ঘটালেন তাই খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। বইপাড়ায় গিয়ে দেখলাম, এ বিষয়ে সকলের পুরোভাগে এখনো রয়েছেন 'সিগনেট প্রেস'। তাঁদের বুক-লিস্টে পেলাম 'ছোটদের মনের মত বই (প্রত্যেকটি সচিত্র)—পাগলা দাশু, আবোলতাবোল, খাই খাই, বুড়ো আংলা, টুনটুনির বই, আর শান্তা দেবীর হুক্কাহুয়ার মত সব হারিয়ে যাওয়া বইয়ের নতুন সংস্করণ। লিস্টে অনেক নতুন বইয়ের নামও আছে।

আরও দেখলাম, শ্রীপ্রকাশ ভবনের 'শ্রেষ্ঠ শিশু ও কিশোর সাহিত্যের গ্রন্থ তালিকা', যাতে ৭০।৮০টা টাইটেলের প্রত্যেকটাই হল ছেলেমেয়েদের বই। (প্রকাশকদের পরিভাষায় প্রকাশিত এক একটি গ্রন্থ হল এক এক টাইটেল)।

এখনকার ছেলেমেয়েদের নির্বিশেষে সকলের প্রিয় কার্টুনের বই আর ছবিতে-গল্পের বই খুঁজছিলাম। আনন্দ পাবলিশার্স এবং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের পরিচালক শ্রীফণীভূষণ দেব-এর টেবিলে বসে বুক-লিস্ট দেখেই আমার অন্বেষণ চলছিল। ফণীবাবু পরামর্শ দিলেন 'শিশুসাহিত্য সংসদ'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহেন্দ্রনাথ দত্ত মশায়ের কাছে যেতে।

সেখানে রঙীন বইয়ের ছড়াছড়ি। ছোট্ট ছেলেমেয়েদের জন্যে 'ছড়ার ছবি' থেকে একটু বড়দের মত করে লেখা ছবিতে রামায়ণ মহাভারত জানোয়ার পৃথিবী, সুখলতা রাওয়ের 'নিজে

পড়', আর আরও বড়দের জন্যে 'আমরা বাঙালী'-তে বাংলার মহাপুরুষদের এক একজনের সচিত্র জীবনী এক এক পাতায়। অবশ্য কোনো কোনো বইয়ের ভাষা ছোটদের পক্ষে একটু শক্ত মনে হল, এবং সব দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে হয়তো ছোটদের বিলিতী রঙীন বইয়ের সমান হতে এখনো কিছু দেরি আছে। কিন্তু যতটা হয়েছে তাতেই বাহবা দিতে ইচ্ছে করে।

মহেন্দ্রবাবুর কাছে এই শিশুসাহিত্য সংসদের জন্মবৃত্তান্ত শুনতে চাইলাম। মহেন্দ্রবাবু বললেন, "প্রতিষ্ঠানের নামটা রেখেছি শিশুদেরই প্রাধান্য দিয়ে। শিশুদের জন্যে বই প্রকাশ করার কথাটা কি করে মাথায় এল তা বলছি। সম্ভবত সালটা উনপঞ্চাশ। প্রেসের (শ্রীসরস্বতী প্রেস) কাজ সেরে বাড়ি ফিরে জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবুলকে নিয়ে বসি। মনোলোভা রঙীন ইংরেজী ছড়ার বই ওকে কিনে দিই। খুব আগ্রহ করে বারবার ছড়াগুলো সে আমাকে পড়তে বলত। মানে কিছু না বুঝলেও ছড়ার ছন্দগুলি ওর শিশু মনে যে ঝংকার তুলত, তাতেই সে ছড়াগুলি বারবার শুনতে চাইত। অথচ বাংলায় আমাদের ছড়ার তেমন কোন আকর্ষণীয় রঙীন বই নেই। আমার মনে হল, দিশী ছড়া দিয়ে, দিশী পরিবেশের রঙীন ছড়ার বই হতে বাধা কি?"

ঘেঁটে ঘেঁটে মহেন্দ্রবাবু নিজেই কতকগুলি ছড়া নির্বাচন করলেন। ছবির জন্যে প্রথমে নরেন দত্ত ও প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরে পূর্ণ চক্রবর্তী, সূর্য রায়, সমর দে প্রমুখ কয়েকজনের সাহায্য নিলেন। 'শিশুসাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড' গড়ে উঠল এবং ১৯৫০ থেকে এখন অবধি অনেক রঙীন শিশু ও কিশোর গ্রন্থ মহেন্দ্রবাবুরা প্রকাশ করলেন। কিন্ডারগার্টেন ক্লাসের জন্যে যে সমস্ত বই আছে তার বিক্রি এখন লক্ষ লক্ষ। এক 'নিজে পড়' বইটাই এখন পর্যন্ত ১১ লক্ষ বিক্রি হয়েছে। মহেন্দ্রবাবুরা হিন্দী এবং ওড়িয়াতেও রঙীন শিশুগ্রন্থ প্রকাশনার দিকে এগিয়েছিলেন, কিন্তু তা চলল না। প্রকাশনের জন্যে এ পর্যন্ত মহেন্দ্রবাবুদের সাতজন লেখককে ভারত সরকার পুরস্কৃত করেছেন আর প্রকাশনা-সৌষ্ঠবের জন্যে 'সংসদ' পুরস্কার পেয়েছেন চোদ্দবার। 'সাহিত্য সংসদ' নাম দিয়ে বড়দের বই প্রকাশনার একটি বিভাগও তাঁদের আছে। তাঁদের প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, মাইকেলের গ্রন্থাবলী (ইংরেজী রচনা সহ), রমেশচন্দ্র দত্তের ও দীনবন্ধু মিত্রের সমস্ত রচনা, এবং অভিধান সিরিজের কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এখানে একজনের নামের উল্লেখ না করলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি হলেন শিশুসাহিত্য ও সাহিত্য সংসদের পরিচালক শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ।

ছোটদের বইয়ের কথা বলতে বলতে বড়দের বইয়ের কথা উঠেই যখন গেল তখন সেটাই এবার শুরু করি।

সাহিত্য-নাটক-নভেল

দু-একজন ছাড়া বইপাড়ার নামকরা প্রকাশকদের মধ্যে আর সকলেই বললেন যে, ১৯৬২-৬৪ সালে নাটক নভেলের বিক্রি যা ছিল, কমতে কমতে এখন তার শতকরা ২৫/৩০ ভাগে এসে নেমেছে। সাহিত্যগ্রন্থ প্রকাশকদের এটা হল চরম দুর্দিন। 'বঙ্গীয় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সভা'র সম্পাদক জানকীনাথ বসু এর কয়েকটা কারণ বলেছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ

হল রাজনৈতিক। সর্বদা একটা উদ্বেগ উত্তেজনার মধ্যে থেকে গৃহী, সে ধনীই হোক বা মধ্যবিত্ত হোক, গল্প উপন্যাস পড়বার মত স্থৈর্য মনে আনতে পারে না। ছাত্ররা এই পাঠকসমাজের বড় খুঁটি—ছাত্র আন্দোলন তাদের রাজনীতিতে মগ্ন করে রেখেছে। তারা বই পড়বে কখন? বই বিক্রির আরও নাকি একটা প্রতিবন্ধক হল এখনকার বিবাহের বরকনেকে বইয়ের বদলে কাজের জিনিস উপহার দেওয়ার রেওয়াজ। জনে জনে চার পাঁচ টাকার বই উপহার না দিয়ে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনেরা মিলিত হয়ে দামী একটা প্রেসার কুকার, ইন্ডেন চুল্লি, ইস্ত্রি অথবা ট্রানজিস্টার উপহার দেওয়ার রীতির প্রচলন হওয়াতে এটা ঘটেছে। ব্যক্তিগতভাবেও লোকে এখন গ্রন্থ উপহার করাকে দৈন্যের লক্ষণ প্রকাশ বলে মনে করে। তার চেয়ে চাকচিক্য সংবলিত কোনো প্লাস্টিকের বা কাঁচের জিনিস বড় বাক্স করে উপহার দিয়ে আমরা মনে করি, খুব একটা দিলাম। গ্রন্থ উপহার লোকে যেটুকু দেয় তার মধ্যে বেশীর ভাগই রবীন্দ্রনাথের বই থাকে।

জ্যেষ্ঠদের জন্য ধর্মগ্রন্থ, নাটক-নভেল, অভিধান থেকে আরম্ভ করে কনিষ্ঠদের উপযোগী কিশোর ও শিশুসাহিত্যের প্রকাশনায় বহুকাল ধরে বইপাড়ার চূড়ামণি হয়ে বিরাজ করছেন দেব সাহিত্য কুটির। তারপরে স্তরে স্তরে আছেন অসংখ্য প্রকাশক সংস্থা, জনে জনে যাঁদের নাম করা এ প্রবন্ধে অনাবশ্যক। প্রাচীনদের মধ্যে বসুমতী সাহিত্য মন্দির তাঁদের চীপ এডিশনে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করে চলেছেন এবং সেই সমস্ত বইয়ের বিক্রি কম নয়।

অন্যান্য বেস্ট-সেলার বইয়ের খোঁজ করতে গিয়ে জানলাম যে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি ধর্মপুস্তক এবং চলন্তিকা, সংসদ ও এ. টি. দেবের বিভিন্ন অভিধানের বিক্রিই সর্বাধিক। শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্তের পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং মহাভারত অবলম্বনে রচিত শ্রীসুবোধ ঘোষের 'ভারত প্রেমকথা'র প্রচণ্ড বিক্রি। কবিতার বইয়ের মধ্যে বিক্রিতে এক রেকর্ড করেছে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর থেকে ফেরা'।

বেস্ট-সেলার গল্প উপন্যাসের মধ্যে শংকর, সমরেশ বসু, বিমল মিত্র, বিমল কর, জরাসন্ধ, সৈয়দ মুজতবা আলী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অবধূত, আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু প্রমুখ লেখক লেখিকার নামই বেশি শোনা যায়।

দেবসাহিত্য কুটিরের পরে যাঁরা আছেন সেইসব লক্ষ্মীদেবীর কৃপালব্ধ প্রকাশকদের বার্ষিক বিক্রি নাকি দুই থেকে পাঁচ লক্ষ টাকার। তাঁরা অবশ্য দেব সাহিত্য কুটিরের ধারে কাছেও পৌঁছন না।

একটা বিশেষ সমস্যার কথা শুনলাম—বইয়ের বিক্রি কমে যাওয়াতে গুদামে বই মজুত রাখার ভীষণ মুশকিলের কথা। স্থানাভাবে আগেকার মত তাঁদের গুদামে বই রাখতে পারেন না, আর প্রকাশকদের বইপাড়ার স্থান সঙ্কীর্ণতার কথা কারও অজানা নয়। উইয়ের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে এই গাদা গাদা অবিক্রীত বই সামলানো হয়ে উঠেছে এক প্রবলেম।

পুস্তক প্রকাশক সভার সম্পাদক জানকীবাবু অনুযোগ করেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের শিক্ষা অধিকার থেকে বাংলা দেশের ৪০০০ গ্রন্থাগারকে নতুন বই কেনবার জন্যে বার্ষিক বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে সাহিত্যের বই, নাটক, নভেল ইত্যাদির বিক্রি বিঘ্নিত হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা সরাসরি শিক্ষা অধিকারের সমাজশিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীঅমিয় সেনকে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি কিন্তু বললেন যে, কথাটা ঠিক নয়। জেলাপিছু বরাদ্দ যা ছিল তাই-ই আছে, কিন্তু সব জেলাতেই লাইব্রেরির সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এখন ৩৯৮১টিতে দাঁড়িয়েছে। মোট সাহায্যের পরিমাণ এই দুর্দিনে বাড়ানো সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়; তাই লাইব্রেরিপিছু বরাদ্দ কমিয়ে দিতে হয়েছে বলে লোকে ভাবছে যে, সরকারী সাহায্য কমে গেছে। বাংলা দেশের এখন 'এডেড' লাইব্রেরি গ্রামাঞ্চলে আছে ৫২৯টি, টাউন (মহকুমা) লাইব্রেরি আছে ২০টি, ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি ১৯টি 'এরিয়া' (অঞ্চল) লাইব্রেরি আছে ২৪টি। অমিয়বাবু বললেন যে, এ ছাড়াও স্পেশাল লাইব্রেরি আছে, যেমন ১০০ বছরের পুরনো উত্তরপাড়া গ্রন্থাগার, যার মূল্যবান সংগ্রহের জন্যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার বিশেষ দাবি রাখে; এবং টাকি শহরের লাইব্রেরি।

পরিসংখ্যান যখন একবার শুরু করেছি তখন আরও খানিকটা এইখানেই পুরে দেওয়া যাক। কেরলের সঙ্গে বাংলার কয়েকটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান এখানে দেওয়া হলো :—

১৯৬৫ সালের ভিত্তিতে।

	দেশীয় ভাষায় দৈনিক পত্রিকা	সারকুলেশন	সাময়িকপত্র	সারকুলেশন
কেরল	৪০ (এখন ৩২)	৬·৯১ লক্ষ	২০৮	৯ লক্ষ
বাংলা	৮ (এখন ৬)	৩·৮৭ লক্ষ	৪৮৩	৭·৭ লক্ষ

দিল্লি এলাকার পরিসংখ্যান এই প্রসঙ্গে ধরা উচিত নয়; কারণ, চাকরি ও রাজনীতিক কারণে দিল্লিতে জমায়েত শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা নিশ্চয়ই দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হবে। দিল্লি ব্যতীত ভারতের মধ্যে কেরল রাজ্য হল শিক্ষায় অগ্রণী। সেখানে শিক্ষিত লোক শতকরা ৪৭ জন (বাংলায় ৩০ জন)। জনসংখ্যা ১৯৬১-র হিসেবে কেরলে ১ কোটি ৬৯ লক্ষ (বাংলায় ছিল ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ)।

তা ছাড়া কেরলের লোক প্রায় সকলেই নাকি নিজের নিজের পত্র-পত্রিকা ও বই কিনে পড়েন আর আমরা বাঙালীরা এক একটি খুদে 'মার্ক টোয়েন'—পারতপক্ষে কিনে পড়ি না। অথচ একই মৌসুমী হাওয়া কেরল ও বাংলা দেশের ওপর দিয়ে বয়ে যায়, আর বামপন্থীদের প্রতিপত্তি দুটি রাজ্যেই বেশ আছে। তবু শিক্ষা ও রুচিতে এত প্রভেদ কেন?

আর একটি পরিসংখ্যান :—কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা ১৩ লক্ষ আন্দাজ।

নীচে আরও দু'টি পরিসংখ্যান ১৯৫৭-৫৮ এবং ৬৪-৬৫-র ভিত্তিতে আংশিকভাবে তুলে দিচ্ছি। এর থেকে দেশের প্রকাশন ব্যবসার মোটামুটি একটা ছবি পাঠক দেখতে পাবেন।

যে সমস্ত ভাষা এবং অঞ্চলের প্রকাশন সংখ্যা এক হাজারের নীচের দিকেই থাকে তাদের বিষয়ে এখানে কিছু দেওয়া হল না :—

ভাষাভিত্তিক পরিসংখ্যান

ভাষা	১৯৫৭-৫৮	১৯৬১-৬২	১৯৬৪-৬৫
বাঙলা	২১১৩	২০৪৩	১৩০২
হিন্দী	৫১৫১	২৮০৫	২৬৩৩
মারাঠী	১৬৮১	১০৩৮	১৫১৪
ইংরেজী	১২০৩০	৯৩৬১	১০৪৩৮
তামিল	১৮৭৪	৮৮৬	৯১০
তেলুগু	১৩৬৭	৯২৪	৮১৭
মালয়ালম	১০৮৭	৬৯৬	৫৯৫

আঞ্চলিক পরিসংখ্যান

পশ্চিমবঙ্গ	৩৬৭৯	৩০২১	২৪৫০
দিল্লি	৬৪৭৭	৩৮২৮	৫০৪৮
মাদ্রাজ	৩৬৮১	২৮৬১	২৫৬৮
মহারাষ্ট্র	—	৩১৫১	৩৫৬৩
কেরল	১২৪৬	৮৮৮	৭৫০

এইসব বিষয়ে আরও অনেক কিছু জানবার ও বলবার আছে, কিন্তু স্থানাভাবে তা অকথিত থেকে যাবে।

বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতীর কথা উঠলে প্রথমেই কয়েকটি নাম আমাদের মনে জাগে। রথীন্দ্রনাথের পরে অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও কিশোরীমোহন সাঁতরা, যাঁদের কেউই আজ জীবিত নেই, তাঁদের কথা মনে পড়ে। এ'দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এবং সর্বময় কর্তা হিসেবেও বহুকাল কাজ করেছিলেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন। বিশ্বভারতীর প্রকাশনার আভিজাত্যের মূলে ছিলেন এই কয়েকজন ব্যক্তি। আদিকালে অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ মহাশয়ও এর পিছনে ছিলেন।

অবশ্য বিশ্বভারতী একটি মনোপলি প্রকাশন সংস্থা। একটি বিশাল বটবৃক্ষ। হাজার

মন্দার তুফান এলেও তার কিছুই প্রায় হয় না, কেবল ডালগুলি একটু দুলে ওঠে আর পাতা নড়ে। ১৯৪৮-এ বিশ্বভারতীর বিক্রি ছিল ১ লক্ষ টাকারও কম। এখন তা হয়েছে ১৫ লক্ষ টাকার। ১৯৬৭-র দুর্বৎসরের একমাত্র নিদর্শন হল যে, বিক্রির ক্রমিক বর্ধন হয়নি, কিন্তু কমেনি একটুকুও। তার কারণ অনেক।

প্রতি বছর কবিপক্ষ ৫ লাখ টাকার বিক্রি পায় ধরাবাঁধা। পাঠ্যপুস্তকের বিক্রিও চলতেই থাকে। কতকগুলি ইংরেজী বই আছে যার মন্দ রপ্তানি হয় না। গীতবিতান ও স্বরবিতানের একটা মোটা অঙ্কের বিক্রি আছে সংগীতপ্রিয় বাঙালীর ঘরে ঘরে।

আর আছেন এক জাতীয় শৌখিন ধনী, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের বই কেনাটাকে নিজেদের কৃষ্টিবান বলে পরিচয় দেবার একটা অঙ্গ বলে ধরে নিয়েছেন। সেই ভাগ্যবন্তদের পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদে মেহগিনির মঞ্চ জুড়ে

'সোনার জলে দাগ পড়ে না,
খোলে না কেউ পাতা
অস্বাদিতমধু যেমন যূথী অনাঘ্রাতা'—

সব রবীন্দ্র-সাহিত্য, কাব্যের গ্রন্থগুলি কেবল ঝলমলই করে।

সব শেষে আছে 'শেষের কবিতা'র বিক্রি, বিবাহের উপহার হিসেবে। সখাসখীরা কেউ হাসিমুখে আর কেউ বা বিচ্ছেদের কান্না রুদ্ধ করে বধূকে কিংবা কখনও কখনও বরকেও বলতে চায়—'হে বন্ধু বিদায়!'

কাব্যগ্রন্থ

সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে আধুনিক কবিদের বই জাতে তুললেন 'সিগনেট প্রেস'। তাঁদের উত্তরসূরী হলেন 'নাভানা'। সেখানে বিরাম মুখোপাধ্যায়ের সযত্ন তত্ত্বাবধানে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হ'ল জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে প্রমুখ বিদগ্ধ বাঙালীর আদরের কবিদের কবিতার বিভিন্ন সংস্করণে।

এ কথা অবশ্য বলে রাখা ভালো যে, কেবল কবিতার বই বিক্রি করে প্রকাশকের লক্ষ্মীলাভ হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে, এতে একটা আভিজাত্য এনে দেয়, যার জোরে প্রকাশক যশস্বী লেখকের রচনা প্রকাশের সুযোগ পেয়ে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করে নিতে পারেন।

কবিদের কবিত্বের উৎকর্ষের সঙ্গে যদি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে রুচিবান প্রকাশকেব কৃতিত্ব না থাকত, তা হলে অনেক কবির বই হয়ত আশানুরূপ বিক্রিই হ'ত না। বহু লোক কৌতূহলবশতও কবিতার বই কেনে, কিনে পড়ে, পড়ে তাদের চমক লাগে যে, রবীন্দ্রনাথের পরেও আরও কবি আছেন যাঁদের কবিতা তরফদারী সেতারের অনুরণনের মতো তাদের প্রক্ষোভের, তাদের আবেগের সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে।

এই শুনুন না আমার কথা—মেশিন, অঙ্ক আর পরিসংখ্যান নিয়ে পর্যুদস্ত পক্ককেশ আমি—কী তৃপ্তিই না আমি পেয়েছি সিগনেটের বই 'সমর সেনের কবিতা'র দু'টি লাইন থেকে। তাঁর দু'টি ছত্রে রূপ পেয়েছে আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে যে ব্যথাটা প্রায়ই গুমরে গুমরে ওঠে, তারই ফটো-অফসেট :

"যৌবনের প্রেম শেষ প্রবীণের কামে
বছর দশেক পরে যাবো কাশীধামে।"

৯ই মার্চ, ১৯৬৮





আট

আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে সুদর্শনা **মাধুরী দেবীর** মতো কোনো মহিলার কথা কানে এলে তাঁকে আমরা 'অর্ধনারীশ্বর' বা তেমন কোনো বাচনিক অলংকারে ভূষিত করে এক কাব্যগন্ধী প্রবন্ধ রচনা করে ফেলতাম। কিন্তু আজকের দিনে এই বিশেষণ বাহুল্যের পর্যায়ে পড়ে যাবে। যে দেশের মেয়েরা এত দূর এগিয়ে গেছেন যে, তাঁদের একজন আজ এই বিচিত্র দেশের প্রধানমন্ত্রিত্বও করতে পারছেন, সে দেশে কোনো বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্রী হওয়াটা নিয়ে নাটকীয় উক্তি আর চলে না।

মাধুরী দেবী অবশ্য বিশেষ করে আমাকে বারণ করেছিলেন যে, আমার প্রবন্ধে তাঁর উল্লেখ যেন 'আনুষঙ্গিক' হিসেবেই থাকে। যতোটা লেখবার তা যেন লিখি তাঁর স্বামী ও তরুণ পুত্রকে নিয়ে। তাঁদের সাহায্য করবার জন্যেই তিনি আজ ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে পুরুষের দুরূহ কাজ করতে প্রকাশ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু তাঁর মতো স্ত্রী না থাকলে স্বামী রেল-রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপরিমল ঘোষ তাঁর শিল্পোদ্যোগের গুরুভার ছেলে শ্রীমান দীপ্তিমানের ওপরে দিয়ে দিল্লীতে রাষ্ট্রতাত্ত্বিকতা করতে পারতেন না। তাই আমিও মাধুরী দেবীর কথা রাখতে পারলাম না।

'হিমালয় পেপার অ্যান্ড বোর্ড মিলস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীদীপ্তিমান ঘোষ বুদ্ধিমান ছেলে—ইংরেজীতে যাকে বলে 'কীন অ্যান্ড থরো', তাই; সাত আট মাসেই তাঁদের পারিবারিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অন্ধিসন্ধি জেনে নিয়ে পারদর্শী হয়ে উঠেছেন বলেই মনে হলো। কিন্তু তাঁর বয়স এখন বাইশ বছরও পেরোয়নি। সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পোলিটিক্যাল সায়ান্সে হাই সেকেণ্ড ক্লাসে বি-এ পাসের পর এম-এ পড়ছিলেন। এমন সময়ে প্রায় বিনা নোটিসে রাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়ে তাঁর বাবাকে দিল্লী চলে যেতে হলো। আর দীপ্তিমানেরও হঠাৎ কলেজ ছেড়ে ব্যবসাতে ঢুকতে হল।

হিমালয় পেপার অ্যান্ড বোর্ড মিলস প্রাঃ লিমিটেড
২০ সেভেন ট্যাংকস লেন
কলিকাতা—৩০

বয়সে এত ছোট, কলেজ থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা ছেলেটির সংসারকে চিনে, জটিল বাণিজ্যজগৎকে চিনে অভিজ্ঞতা লাভের কোনো সুযোগই এর আগে হয়নি। বিশেষ শিল্পটিতে অভিজ্ঞতা আছে এমন মানুষ তো ভালো মাইনে দিলেই পাওয়া যায় এবং এঁদের তা আছেও, কিন্তু স্থিরবুদ্ধি, সমস্যা সমাধানে ক্ষিপ্র কারও থাকা দরকার ছিল যে দীপ্তিমানের ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং-এর সময়ে তার অভিভাবকত্ব করতে পারে। সেই ভারটি নিলেন তার মা শ্রীমতী মাধুরী ঘোষ। মাধুরী দেবী সেই জাতের মেয়ে, যিনি অশিক্ষিতপটুত্ব বা ইনস্টিংক্টের ওপরে উঠে পুরুষের মতো কাজ শিখে নিয়ে ছেলে দীপ্তিমানকে খুব অল্প দিনের মধ্যে হাল ধরতে শিখিয়ে নিলেন। শুধু তাই নয়, নিজে তিনি রাশ ধরলেন স্বামীর অন্য প্রতিষ্ঠান 'হিমালয় পেপার (মেশিনারি) প্রাইভেট লিমিটেড'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে হিমালয় বোর্ড মিলেরও তিনি ডিরেক্টর।

ভূমিকাটা একটু বড়ো হয়ে গেল। তার কৈফিয়ত এই যে, ৭০।৮০ লক্ষ টাকার যন্ত্র ও পণ্য উৎপাদন করতে পারে এমন শিল্প দুটির পরিচালনায় আমরা পেয়েছি একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালী মহিলাকে। এ পর্যন্ত এইরকম কঠিন কাজে বাঙালী কেন, এ অঞ্চলে কোনো মহিলাকেই আমি অন্তত দেখিনি। শুনেছি, বোম্বাইয়ে নাকি মাধুরী দেবীর মতো দু'-একজন শেঠানী আছেন।

মাধুরী ঘোষ বললেন, "ঘটনাটা হঠাৎ ঘটে গেল। অতুল্যদা (শ্রীঅতুল্য ঘোষ) আমাদের বহুকালের চেনা লোক। শ্বশুরমশাই* শ্রীনলিনীরঞ্জন ঘোষ গত ইলেকশনের আগে দু' টার্ম জলপাইগুড়ি থেকে কংগ্রেস এম পি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই সূত্রেই আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। লাস্ট ইলেকশনের আগে তিনি আমার স্বামীকে ঘাটাল থেকে লোকসভায় দাঁড়াবার নির্দেশ দিলেন। ছেলে নাবালক, ব্যবসা কি করে চলবে, এইসব ভেবে তিনি ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু অতুল্যদা জোর করতে লাগলেন। শ্বশুরমশাইও সায় দিলেন। তা ছাড়া উনি ভেবেছিলেন যে, প্রভাতবাবুর (প্রাক্তন বামপন্থী এম পি শ্রীপ্রভাত কর) সঙ্গে ভোটযুদ্ধে কংগ্রেসের জেতবার তো তেমন কোনো আশাই নেই, বিশেষ করে অজয়বাবুর মেদিনীপুরে—যাক, অতুল্যদা যখন বলছেন তখন ইলেকশনটা পর্যন্ত না-হয় ব্যবসার একটু ক্ষতিই হলো! হেরে গিয়ে ঘরে ফিরে আসা যাবে নতুন একটা অভিজ্ঞতা লাভ করে।"

সকলকে অবাক করে প্রভাতবাবুকে ২৯৭০০ ভোটে হারিয়ে পরিমল ঘোষ মশায় ওই ঘাটাল থেকেই নির্বাচিত হয়ে গেলেন। তাতেও বিশেষ ভাবনার কথা ছিল না; লোকসভার অধিবেশনের মধ্যে মধ্যেও ব্যবসা চালানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব হতো না। কিন্তু ঘোষ পরিবারের জন্যে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। ১৯৬৭-র ১৩ই মার্চ সকালবেলাতেও পরিমলবাবু জানতেন না যে, তাঁকে রাষ্ট্রমন্ত্রী করা হবে, মাধুরী দেবী তো নয়ই।

"সেদিন একটু বেলা বাড়তে শ্বশুরমশাই দিল্লীর সাউথ অ্যাভিনিউয়ের এম পি কোয়ার্টার্স

* নলিনীরঞ্জন ঊনসত্তর সালের প্রথম দিকে পরলোকগমন করেন।

থেকে লোদী হোটেলে আমার স্বামীকে ফোনে জানালেন যে, উনি রাষ্ট্রমন্ত্রী হচ্ছেন একটু পরেই—'ওথ' (শপথ) নেবার জন্যে ওঁকে তৈরী হয়ে থাকতে বললেন। আর আমাকেও দুপুর-বেলা ট্রাংক কল করে জানালেন। সবটা যেন কীরকম ভোজবাজির মতো ঘটে গেল!"

১৯৪০ সালে 'মডার্ন হিস্ট্রি' নিয়ে কলকাতা থেকে এম-এ পাস করে শ্রীপরিমল ঘোষ ঠিক করলেন যে, অধ্যাপনা বা পৈতৃক ব্যবসা না করে স্বাধীন ব্যবসা করবেন। তিনি হিমালয়ের তরাইয়ের সবচেয়ে বড় ১০০০ একরের (থানঝোড়া) চা-বাগিচার অর্থাৎ জলপাইগুড়ি ডুয়াস টি কম্পানির অধিকাংশ শেয়ারের মালিক শ্রীনলিনীরঞ্জন ঘোষ মশায়ের চার ছেলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। পরিমলবাবু স্বাধীন ব্যবসা করবার উদ্দেশ্যে সেই তেইশ বছর বয়সে বেরিয়ে পড়লেন লড়াইয়ের সময়ে মিলিটারি রোড ও বিল্ডিং কন্ট্রাক্ট করবেন বলে। তিন চার বছর ধরে কাজ করে মণিপুরে ইম্ফল পর্যন্ত কন্ট্রাক্টরি করে এলেন। কিন্তু অনেকে যেমন লাখপতি হয়ে ফিরেছিলেন, পরিমলবাবুর তা হলো না। কেবল খানিকটা অভিজ্ঞতাই অর্জন করলেন। কিন্তু এখন যেমন দিল্লীর সকলে জানে যে, বসে থাকবার মতো লোক পরিমলবাবু নন, সেইভাবে তখনও তিনি আবার উঠে পড়ে লাগলেন নতুন কিছু করবার সংকল্প নিয়ে। বাবার মত নিয়ে বন্ধুদের পরামর্শে 'বরানগর ব্রাস ফাউন্ড্রী' নামে এক বাঙালী প্রতিষ্ঠান থেকে ছোট একটা 'ইণ্টারমিটেন্ট' টাইপ মিলবোর্ড (পুরু পিসবোর্ড) তৈরির মেশিন কিনলেন। কাশীপুরে ২০ বিঘা জমি লম্বা লীজ নিয়ে কারখানা বসালেন। নাম দিলেন 'হিমালয় পেপার অ্যাণ্ড বোর্ড মিলস'। কারণ, হিমালয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ শৈশব থেকেই ছিল।

'ইণ্টারমিটেন্ট' বা সান-ড্রায়িং প্রণালীতে ভিজে বোর্ডকে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। উৎপাদন হয় খুব ধীরে। পরিমলবাবুর সেই ছোট্ট মেশিনে সারা বছরে তখন বোর্ড তৈরী হতো মাত্র ৬০০ টন।

বছরের পর বছর আস্তে আস্তে পরিমল ঘোষ এগোতে লাগলেন। বাইরে থেকে আর নতুন মেশিন কিনবেন না ঠিক করে পেপার মেশিনারি তৈরির এক কারখানা খুলে বসলেন ১৯৫৮।৫৯ সালে। আজ তাঁর মিলে নিজের মেশিন-শপে তৈরী অটোম্যাটিক মেশিনে দিনে ১৫ টন, মানে বছরে প্রায় ৫০০০ টন স্ট্রবোর্ড, মিলবোর্ড, টিকেটবোর্ড, ম্যানিলা বোর্ড প্রভৃতি নানা-রকমের পিস বোর্ড তৈরী হচ্ছে। অবশ্য এই মেশিনগুলোর দু'একটা অংশ আছে, যা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। পরিমলবাবু তা আনিয়েছেন জাপান থেকে। আর পুরোপুরি একটা সম্পূর্ণ মেশিন জাপান থেকে ১৯৬৪ সালে আমদানি করে তিনি হিমালয় বোর্ড মিলের সম্প্রসারণ করেছেন। সেই বিভাগটা চালু হবে আর মাস কয়েকের মধ্যেই। কিন্তু সেটাতে পিসবোর্ড তৈরী হবে না। তৈরী হবে প্যাকিং-এর ক্রাফট, পোস্টার, টিসু প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ কোয়ালিটির কাগজ দিনে ৫ টন করে। এই কাগজগুলি সবই প্রায় সরকারী মূল্যনিয়ন্ত্রণের আওতার বাইরে। বাঙালীদের ছোট ছোট মিলগুলি এইসব কাগজ তৈরি করলে বড় মিলদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার অসম দ্বন্দ্বে পড়বে না, সে কথা রঘুনাথ দত্ত অ্যাণ্ড সন্সের মানিকলাল দত্ত মশায়ও আমাকে বলেছিলেন।

হিমালয়ের তৈরী বিভিন্ন কোয়ালিটির পিসবোর্ডের দাম গড়ে ১৩০০ থেকে ১৪০০ টাকা টন। অতএব তার পিসবোর্ড বিভাগের বিক্রি এখনই ৩৫।৪০ লক্ষ টাকার মতো। নতুন বিভাগটা চালু হলে শুনছি বিক্রি আরও লাখ বিশেক বাড়বে।

উপরন্তু ১৯৫৮।৫৯-এ প্রতিষ্ঠিত হিমালয় পেপার (মেশিনারি) কম্পানির মেশিন বিক্রিও এখন মাধুরী দেবীর পরিচালনায় ২০ লক্ষ টাকার মতো দাঁড়িয়েছে। মন্দা না এলে আরও বেশী হতে পারতো। এই বিভাগে মাধুরী দেবীদের আবার কোলাবোরেশন আছে জাপানীদের সঙ্গে।

ডিরেক্টর মাধুরী দেবী বললেন, "আমাদের বোর্ড ইন্ডাস্ট্রির এখন 'বুম' পিরিয়ড চলছে। গত বছরে......লক্ষ টাকার বিক্রি হয়েছে।"

ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপ্তিমান সজোরে মাথা নেড়ে বললেন, "না মা, ওর থেকে কম হয়েছে।......লক্ষ টাকা কম।"

মায়ে-পোয়ে সালিশী মানলেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট সেনবাবুর। তাঁর পুরো নামটা কিছুতেই ভুল হবার নয়—প্রফুল্ল সেন।

শুধু সেনবাবু নয়, সেলস ম্যানেজার নৃপেন চক্রবর্তী, মেশিন বিভাগের প্রোজেক্ট ইঞ্জিনীয়ার মধ্যপ্রদেশীয় হরিসিং শোলাংকি, সকলেই দেখলাম ঘোষদের ঘরের লোকেরই মতো।

তা প্রফুল্ল সেন মশায় রায় দিলেন ছেলের পক্ষে। মাধুরী দেবী কিন্তু একটুও না দমে সগর্বে আমার দিকে তাকালেন—পুত্রের কাছে পরাজয়ে গর্বিতা জননী! বেশ ভালো লাগলো মাতাপুত্রের এই তর্কাতর্কিটা।

আমার প্রশ্নের উত্তরে দীপ্তিমান বললেন যে, তাঁদের সমস্ত মালই প্রায় নগদ বিক্রি হয়। এই-সব বোর্ডের ব্যবহার করে বাটা কম্পানির মতো জুতোর কারখানা, শাড়ির বাক্সের জন্যে বড়বাজার, বিস্ফোরক দ্রব্যের জন্যে সরকারী অর্ডনান্স বিভাগ, রেল-টিকিট বোর্ডের জন্যে ইন্ডিয়ান রেল-ওয়েস (অবশ্য ১৯৬৭-র আগে থেকেই)। ক্রেতাদের মধ্যে একজন আছেন পরিমলবাবুর এক আপন ভাই শ্রীকমল ঘোষ, যিনি জার্ডিন হেন্ডারসনের সঙ্গে অংশীদার হয়ে 'কার্ডবোর্ড প্রিন্টিং অ্যান্ড প্রোসেসিং কম্পানি' নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। কার্টন, বাক্স ইত্যাদি ছাড়াও তাঁরা কটন ও জুট মিলের সুতোর নলির জন্যে স্পাইর‍্যাল টিউবও তৈরি করেন।

প্রসঙ্গত, সকলকে বলবার মতো একটা ইতিহাস ছোট করে এখানে বলি।

১৭৯৮ সালে ফ্রান্সে 'ফুরড্রিনিয়ার' টাইপের কাগজ তৈরি মেশিনের আবিষ্কার হয়েছিল আর ১৮০৯ সালে ইংল্যান্ডে আবিষ্কৃত হয়েছিল 'সিলিন্ডার-মোল্ড' পেপার মেশিন। ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ড, জাপান, জার্মেনি সকলেই একে একে এই দুই টাইপের মেশিন দেশে দেশে তৈরি করছিল। এখন থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে ১৯৩১-৩২ সালে কলকাতার এক উদ্যোগী ব্রাহ্ম ভদ্রলোক স্বর্গীয় দেবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সিটি পেপার অ্যান্ড বোর্ড ইন্ডাস্ট্রিজ' নাম দিয়ে একটি কম্পানি গড়লেন। সেই প্রতিষ্ঠান ভারতে প্রথম 'ইন্টারমিটেন্ট' (ফুরড্রিনিয়ার টাইপ)

মেশিন তৈরি করে বিক্রি করতে লাগলেন। কাগজ শিল্প সম্বন্ধে দেবজীবনবাবু নাকি ভালো একটা টেকনিক্যাল বই-ও লিখেছিলেন। দুঃখের কথা যে, এই প্রতিষ্ঠান পরে আর তাঁর হাতে রইলো না।

দেবজীবনবাবু পথ দেখিয়ে গিয়েছিলেন বলেই আজ আমরা বাঙালীরা এইসব যন্ত্র নিজেরা তৈরি করতে পারছি। এর জন্যে আমাদের ইংল্যাণ্ড-জার্মেনিতে অথবা লুধিয়ানা-অমৃতসরে যেতে হচ্ছে না। উল্টে অন্য জায়গার লোকেরা আমাদের কাছে আসছে।

'স্মল স্কেল বোর্ড মিলস অ্যাসোসিয়েশন' নামে ৭০টা ছোট ছোট ভারতীয় বোর্ড মিলের একটা সংঘ আছে। সত্তরটা মিলের উৎপাদন বছরে মোট ৩০০০০ টন। এই মিলগুলির অর্ধেকই হলো বাংলা দেশে আর তাদের আনুমানিক উৎপাদন ১৫০০০ টন।

নীচে তাদের নাম এবং বর্তমান বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণের সঙ্গে ব্র্যাকেটে মিল-গুলির মোট উৎপাদনের আনুমানিক ক্ষমতা টন হিসেবে দিচ্ছি। তা থেকে বোঝা যাবে যে, এদের শক্তির কতটা অব্যবহৃত পড়ে থাকছে।

হিমালয়—৪৫০০ টন (৫০০০), ডায়মণ্ড—৮০০ টন (৯০০), ক্যালকাটা—২০০ টন (৩০০), নৈহাটি—৩০০ টন (৫০০), নালন্দা—৩০০ টন (৬০০), মণীন্দ্র—৫০০ টন (৮০০), পাইওনীয়ার—৭০০ টন (১৫০০), এশিয়াটিক—৫০০ টন (১০০০), ইস্টার্ন—৯০০ টন (১৫০০), অরবিন্দ—৫০০ টন (৮০০), শ্রীদুর্গা (পাণ্ডুয়া)—৯০০ টন (১৫০০), ইস্ট ইণ্ডিয়া (দেগঙ্গা)—৮০০ টন (১২০০), আর সি দে—৫০০ টন (১০০০), বরানগর—৫০০ টন (১০০০), হিন্দুস্থান—৫০০ টন (৭০০), লক্ষ্মীনারায়ণ ৪০০ টন (১০০০)।

এই ক'টি ছাড়াও গোপীনাথ পেপার মিল নামে একটি মিলের কথা শুনলাম। তাঁরা বছরে প্রায় ১০০০ টন প্যাকিং পেপার ইত্যাদি তৈরি করেন। এদের মধ্যে কিন্তু হিমালয় এবং ডায়মণ্ডই কেবল সম্পূর্ণভাবে অটোমেটিক মেশিন ব্যবহার করে। অন্য সকলে ইণ্টারমিটেণ্ট অর্থাৎ সান-ড্রাইং প্রণালীতে মিলবোর্ড তৈরি করে। তাতে বর্ষাকালে উৎপাদন বেশ কমে যায়।

মিলবোর্ডের দাম ৭০০৲ থেকে ৮০০৲ টাকা টন এবং এর একমাত্র কাঁচামাল নাকি 'ওয়েস্ট পেপার'। ম্যানিলা ইত্যাদির কাঁচামাল হলো খড়, আখের ছিবড়ে, সাদা কাগজের টুকরো প্রভৃতি।

সানলাইট সাবানের পেটির মতো সব ভারী মালের বাক্সে নাকি মিলবোর্ডই লাগে, আর ভালো মিলবোর্ড কেবল ওই 'ইণ্টারমিটেণ্ট', রোদে শুকনো প্রণালীতেই হয় বলে শুনলাম।

কয়েক বছর ধরে কাঠের দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়াতে বাজারে এখন মিলবোর্ডের বাক্সের চাহিদা খুব বেড়েছে। তা ছাড়া হালকা এবং নমনীয় বলেও শিশি বোতলের মতো ভঙ্গুর জিনিসের পক্ষে কাঠের চাইতে বোর্ডের বাক্সের বেশী আদর। অতএব কোনো মিলেরই মাল স্টকে পড়ে থাকে না, বাজারে মালের ঘাটতিই আছে অনেক।

সবই শ্রুতিমধুর তথ্য। কিন্তু ঘুরে-ফিরে সব শিল্পপতিই একবার সরকারী জুলুম আর

শিল্পের হয়রানির কথা বলেন। এ ক্ষেত্রে পিসবোর্ডের ওপর বে-আন্দাজী শুল্কের হারের কথা উল্লেখ করা যায়।

হায়, শুল্কে প্রাণহীন পিসবোর্ড কী-ই বা বুঝবে একস্‌সাইজের নির্যাতন! আমরা রস-পিপাসুরা যে তার চেয়েও কত বেশী জেরবার হচ্ছি সুধী পাঠকেরা অনেকেই নিশ্চয় তা বুঝছেন! আবার তো বাজেট আসছে, কে জানে নীতিবাগীশ মোরারজীভাই আরও শুল্ক চাপিয়ে সুধারসের দাম আরও কত বাড়াবেন!

যাক গে রসের কথা—বোর্ডের ওপরে বেআক্কেলী শুল্কের হারের কথা হচ্ছিল। বাৎসরিক ৫০০ টন যে প্রতিষ্ঠান তৈরি করে তাকে টন পিছু ১০০৲ টাকা করে শুল্ক দিতে হয়, কিন্তু যেই সেই উৎপাদন ৫০১ টন হবে, সঙ্গে সঙ্গে পুরো ৫০১ টনের ওপরেই (১০০০ টন পর্যন্ত) ১৮০৲ টাকা টন পিছু দিতে হবে। ওইভাবে ১০০১ টন থেকে ১৫০০ টন পর্যন্ত ২৮০৲ টাকা এবং ১৫০০ টনের বেশী যতই উৎপাদন হোক না কেন, শুল্ক লাগবে ৩১০৲ টাকা করে টন।

এই শুল্ক কড়ায় ক্রান্তিতে আদায় করবার জন্যে একস্‌সাইজ বিভাগের লোক প্রত্যেকটি মিলে অফিস খুলে সর্বক্ষণ মোতায়েন আছেন।

১৫০০ টনের বেশী উৎপাদনক্ষম মিলগুলির 'ওভারহেড' (উপরি ব্যয়) ছোট মিলের চেয়ে টন পিছু অনেক কম। মানে, বড় মিলের পড়তা স্বভাবতই অনেক কম। সেইজন্যে তাদের ওই ২১০৲ টাকা শুল্ক দিয়েও প্রচুর লাভ থাকে। কিন্তু ছোটদের ১০০৲ টাকার বেশী দিতেই প্রাণান্ত হয়। তাই ছোটরা তাদের পূর্ণ কেপাসিটি (শক্তি) দিয়ে উৎপাদন বাড়াতে কোনো উৎসাহ পাচ্ছে না।

কেন্দ্র সরকারের কাছে সঙ্ঘের তরফ থেকে মোট ন'বার দরবার করা হয়েছে। তার মধ্যে চার বার খোদ মোরারজী দেশাই মশায়ের কাছে।

সঙ্ঘ হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, ৭০টা ভারতীয় ছোট বোর্ড মিল সরাসরি ১০০০০ লোকের কর্মসংস্থান করে এবং পরোক্ষে সংস্থান হয় খুব গরিব আরও ৩০০০০ কাগজ কুড়ুনে হরিজনদের এবং পুরনো কাগজের ব্যাপারীদের। উপরন্তু, এই ময়লা কাগজ ঝেঁটিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে শহরাঞ্চলের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির আবর্জনা পরিষ্কার খাতের অনেক টাকা বেঁচে যায়। অতএব ছোট মিলগুলির জন্যে পুরস্কার হিসেবেও শুল্কের হার কমানো হোক। কিন্তু হরিজন পরিত্রাতা ক্ষুদ্র শিল্পের মহান সমর্থক গান্ধীজীর কট্টর শিষ্য হয়েও মোরারজী দেশাই মহাশয় যেন এইসব কথায় ভালো করে কর্ণপাত করতে চান না। স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ ডেভেলাপমেণ্ট কমিশনার' শ্রীমালাপ্পাও নাকি সঙ্ঘের হয়ে চেষ্টা করে অর্থ দফতরের কাছে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছেন।

অবশ্য ১৮৬৭ সালে সরকার এই শুল্কের হার ছোট্ট করে একটু কমিয়ে দিয়েছিলেন। ৫০০ টন-ওয়ালাদের ১২০৲ টাকা থেকে ১০০৲ টাকা করলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বড়দের জন্যে ৪২০৲ টাকা থেকে ৩১০৲ টাকা করলেন। হিতে বিপরীত হলো। বড়দের পড়তা ১১০৲ টাকা করে কমে গিয়ে অসম প্রতিযোগিতার ক্ষমতা আরও বেড়ে গেল। শেষবার দরবার করতে গিয়ে

মোরারজীকে সেটা বলাতে তিনি নাকি রাগ করে বলেছিলেন যে আগামী বাজেটের আগে তিনি এই সঙ্ঘের আর কোনো কথাই শুনবেন না।

সঙ্ঘের অনুরোধ ছিল যে, ১০০০ টন পর্যন্ত সমান ১০০্ টাকা করে শুল্ক ধার্য করতে। তার সুফল হতো ত্রিবিধ : (১) কেপাসিটি থাকা সত্ত্বেও ভারতের যে ৭০টি ক্ষুদ্রায়তন বোর্ড মিল আজ উৎপাদন অর্ধেক করছেন, তাঁরা আরও ৩০০০০ টন মাল তৈরি করতে পারতেন; (২) আরও ১০০০০+৩০০০০, মোট ৪০ হাজার আন্দাজ হরিজন ও দুস্থ স্ত্রী-পুরুষের অন্নসংস্থান হতে পারতো; এবং (৩) সরকার এখন প্যাকিং-এর বোর্ড ইত্যাদির উৎপাদনে ঘাটতি পূরণের জন্যে প্রায় ২৫০০০ টন পাল্প (মণ্ড) ইমপোর্ট করবার লাইসেন্স দিচ্ছেন, যার দাম ১৪০০্ টাকা করে টন হিসেবে ফরেন এক্সচেঞ্জে প্রায় ৪ কোটি টাকা, সেই পাল্প আমদানি না করলেও চলতো। (তা হলে এই ৪ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা মোরারজীভাইয়ের ভিক্ষার ঝুলিতে কম নিলে দেশের সামান্য একটু মঙ্গলই হতো)।

বাধাবিপত্তি লঙ্ঘন করে বাঙালীরা এই শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখুন, নিজেদের হাতে রাখুন এই-ই চাই। আর বেশী করে তাঁদের মালই সরগরম করে রাখুক ভারতের, তথা এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ (একটি পল্লীর মধ্যে সংস্থিত) বোর্ডের বাজার, আমাদের কলকাতার বৈঠকখানা দপ্তরীপাড়ায় যার স্থিতি!

মাধুরী দেবীর কিন্তু উৎপাদন বাড়ানোতে খুব উৎসাহ। কারণ হিমালয় বোর্ড মিল আর স্মল-স্কেল ইণ্ডাস্ট্রি নেই। এখন মিডিয়ম (মাঝারি) স্কেল হয়েছেন আর মাধুরী দেবী ও দীপ্তিমান ৩১০্ ডিউটি দিয়েও সেটাকে 'লার্জ স্কেলে' পরিণত করতে বদ্ধপরিকর।

স্বামীর সঙ্গে সারা য়ুরোপ, মধ্য ও দূর প্রাচ্য পর্যটন করে শ্রীমতী ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। তাছাড়া অর্থবলও তো প্রচুর! তাই তিনি ছোটতে আর সন্তুষ্ট নন।

বললেন, "পেপার সেকশনটা আসছে পুজোর আগেই চালু করবো। আর ডিউটি যদি না কমে তো বাধ্য হয়ে বোর্ডের দাম কিছু বাড়াতে হবে।" দীপ্তিমান সায় দিলেন।

এই আত্মপ্রত্যয়ের পিছনে মাধুরী দেবীর কুমারী জীবনের সার্থকতাও যে আছে সেটা সকলকে বলতে হয়।

মাধুরী গুহ ঢাকার অধুনালুপ্ত ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ইস্ট বেঙ্গল টাইমস'-এর সম্পাদক ও প্রকাশক স্বর্গীয় চারুচন্দ্র গুহ মহাশয়ের মেয়ে। কাগজটি ছাড়া চারুবাবুর অন্যান্য প্রকাশনাও ছিল। তার মধ্যে চারুবাবুর নিজের সংকলিত 'অ্যাংলো-বেঙ্গলি' অভিধানের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জীবনে তিনি প্রভূত উপার্জন করে গিয়েছেন। আজ কলকাতার অফিস-পাড়ার গণেশ অ্যাভিনিউয়ের 'গুহ বিল্ডিংস' তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সুখে লালিত মেয়েটি প্রথমে কিছু দিন ঢাকা কনভেণ্টে পড়ে তারপরে বাড়িতেই পড়াশোনা করেছিল। কিন্তু নাচ গান খেলাধুলোতে মাধুরী বেশী আনন্দ পেত। প্রতিভার উন্মেষ হলো

সেই সবেতেই। কলকাতায় এসে দেবব্রত বিশ্বাস মশায়ের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত আর মণিপুরী শিক্ষকের কাছে নাচ শিখে সুন্দর দেখতে ছোট মেয়েটি যখন একটু বড়ো হলো তখন নিশ্চয়ই (এটা যদিও আমার মানসচক্ষে এবং দীপ্তিমানের দেওয়া ছবিতে দেখা) তার দিক থেকে চোখ ফেরানো যেত না। আজকের দিন হলে নাচ গান সাঁতারে দৌড়ে পটু, খুশিতে উচ্ছল মেয়েটি 'টীন প্রিন্সেস' হতে পারতো বোধ হয়।

কিন্তু মাধুরী দেবীর কলাচর্চা স্বাস্থ্যচর্চা সাময়িকভাবে খর্ব হলো কৈশোরে পেঁছতে না পেঁছতেই। পরিমলবাবুর সঙ্গে তাঁর শুভবিবাহ অনুষ্ঠিত হলো। ভয় ছিল পাছে সম্ভ্রান্ত পরিবারের বালিকা বধূর নাচগান দৌড়ঝাঁপ শ্বশুরবাড়ির সকলের অপছন্দ হয়, কিন্তু সেদিক দিয়ে তাঁর শ্বশুরমশায় নলিনীবাবু খুব উদার ছিলেন।

এখন মাধুরী দেবীর গান গাইবার অবসর মেলে যখন তিনি অফিসের কাজ সেরে দিনান্তে নিজের ঘরে একাকিত্বের মধ্যে গিয়ে পড়েন। আর তাঁর অবসরবিনোদন হয় রান্না করে। দীপ্তিমান বললেন যে, তাঁর মা নাকি দেশী বিলিতী চীনে নানারকমের সুখাদ্য রাঁধতে পারেন। (এ বিষয়ে আমি কোনো সঠিক খবর দিতে পারছি না; কারণ, আমি তাঁর নিজের তৈরী উপাদেয় কয়েকটা ছানার জিলিপি ছাড়া এখনো আর কিছু চেখে দেখবার সুযোগ পাইনি)।

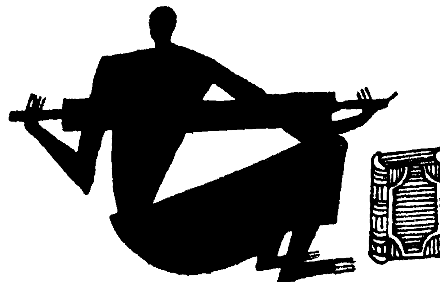
আমার ইণ্টারভিউ শেষ হয়ে আসছিল। এমন সময়ে টেলিফোন বেজে উঠলো। দীপ্তিমান ধরেই বললেন, "দিল্লী থেকে বাবা—" ফোনটা মাকে দিলেন।

আগের রাত্রে রাজকার্যে বেরিয়ে পরিমলবাবু বিশ্রী একটা জীপ অ্যাকসিডেণ্ট থেকে প্রায় অক্ষত দেহেই বেঁচে গেছেন।

মাধুরী ঘোষের গলার স্বরে আকুতি, চোখে মমতা। বার তিন চার স্বামীকে খুব মন্দ বললেন, আর স্বামীকে আদেশ করলেন যে, তাঁর সরকারি ড্রাইভারদের যেন কিছুতেই তিনি পঁয়ত্রিশ চল্লিশ মাইলের বেশী স্পীডে গাড়ি চালাতে না দেন।

আর বার পাঁচেক জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার লাগেনি তো?"

১৬ মার্চ, ১৯৬৮





নয়

বছর ছয়েক আগে ধর্মতলায় কমলালয় স্টোর্সের পাশে ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। লক্ষ্য করলাম পথচারীরা প্রত্যেকেই একবার করে থমকে দাঁড়িয়ে দেয়ালের বিশেষ একটা পোস্টার ভালো করে এক নজর দেখে নিয়ে আবার পথ চলতে শুরু করছে। অন্যগুলো অবহেলিত। কাছে গিয়ে দেখলাম। কড়ির মালা জড়ানো একটি হাত সরু কোমরে রেখে পদ্মাপয়োধরা একটি গ্রাম্য মেয়ে মাথায় একটা ঝাঁপি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছবির প্রতিটি রেখা সুস্পষ্ট—তারাশংকরের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'-র সিনেমা পোস্টার। এমন উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য পোস্টার আগে কখনো আমার চোখে পড়েনি। পরে ফিল্ম জগতের এক বিশারদকে জিগ্যেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন শিল্পী ও সি গাঙ্গুলির ডিজাইনের ওই পোস্টারটা সিল্কস্ক্রীন প্রোসেসে (হাজরা রোডের সিলক্রীনা কম্পানির) ছাপা। সিল্কস্ক্রীন বলেই অমন সুন্দর।

শুধু ওই পোস্টারটার জন্যেই নয়, আরও কয়েকটা কারণে স্ক্রীন প্রোসেস (বা সিল্কস্ক্রীন) মুদ্রণ সম্বন্ধে আপনাদের কিছু জানাতে উৎসাহ হলো। শুনেছিলাম যে বাটা কম্পানি বাচ্চাদের ও মেয়েদের জন্যে যে সমস্ত ফুলতোলা এবং ছবিওয়ালা জুতো বেচেন তা সিল্কস্ক্রীনে ছাপা। ট্যাপেস্ট্রি অর্থাৎ সচিত্র পরদার কাপড়, কুশন কভারের কাপড় এমন কি রঙীন শাড়ী ইত্যাদিও নাকি আজকাল বোম্বাই ও আহমেদাবাদের বড় বড় কাপড়ের কলে ছাপা হচ্ছে সিল্কস্ক্রীন পদ্ধতিতে। কলকাতার স্টেটবাসের রুট নম্বরগুলিও কাপড়ের ওপরে সিল্কস্ক্রীনে ছাপা; আর রেডিওর ডায়ালও এই প্রণালীর সাহায্যেই তৈরী হয়ে থাকে। ভাসা ভাসা একটা ধারণা ছাড়া এই সাধারণের অপরিচিত শিল্পটির সম্বন্ধে আমি নিজেও অজ্ঞই ছিলাম।

সিলক্রীনা কম্পানির সত্যেন রায় বললেন যে, স্ক্রীন প্রোসেস প্রিন্টিং-এর বিশেষত্ব হলো এই যে, সমান অসমান গোল বাঁকাচোরা যে-কোনো বস্তুর ওপরে এই প্রণালীতে ছাপা যায়। তাঁর গুরু চেকোস্লভাকিয়া দেশীয় লুবুচেক সাহেব নাকি সত্যেনবাবুদের কাজ শেখাবার সময়ে হাসতে হাসতে বলতেন, "জল বাতাস আর আগুন এই তিনটি ছাড়া আমাকে যা-কিছু দাও, আমি তার ওপরে স্ক্রীন প্রোসেসে ছেপে দেবো।"

স্ক্রীন প্রোসেস মুদ্রণকে আমরা চলতি কথায় সিল্কস্ক্রীন প্রিন্টিং বলি। কিন্তু এই আখ্যাটা ঠিক নয়।

'স্ক্রীন' হচ্ছে ফ্রেমে আঁটা বিভিন্ন জিনিসের তৈরী পাতলা জাল, যার সূক্ষ্ম ছেঁদা দিয়ে তরল অথবা চটচটে রঙ একটা বেলনের মতো রোলারের চাপ দিয়ে সমানভাবে মুদ্রিতব্য বস্তুর ওপরে লেপে দেওয়া হয়।

ওই স্ক্রীনের সঙ্গে সাঁটা থাকে মোম মাখানো বর্ণরোধক স্টেন্সিল। ডিজাইনের যে অংশ যে রঙে ছাপাতে হবে তদনুযায়ী সেই অংশটুকু খোলা থাকে। এইভাবে আলাদা আলাদা স্টেন্সিল কেটে নিতে হয়—তিন রঙা হলে তিনটে স্টেন্সিল, পাঁচ রঙা হলে পাঁচটা। মোম মাখানো কাগজের এক একটা শীট থেকে সেই স্টেন্সিলগুলিকে কেটে পর্যায়ক্রমে বারে বারে এক একটা স্টেন্সিল স্ক্রীনের নীচে লাগাবার পরে স্ক্রীনের ওপরে ঢেলে দিতে হয় যে রঙে ডিজাইনের সেই অংশটা ছাপতে হবে সেই রঙের কালি অথবা রঙ।

স্ক্রীনটা হলো সিল্ক, সুতি, নাইলন, অর্গ্যান্ডি প্রভৃতি পাতলা কাপড় অথবা তামা, পেতল, ব্রোঞ্জ, স্টেনলেস স্টীলের জাল। সিল্ক হচ্ছে নানারকম স্ক্রীনের অন্যতম; কাজেই একে সাধারণ-ভাবে 'সিল্কস্ক্রীন' আখ্যা দেওয়াটা শাস্ত্রমতে অসিদ্ধ।

এখানে আরও একটা কথা পরিষ্কার করে বলা ভালো। কাগজ কিংবা পিসবোর্ডের ওপরে স্ক্রীন প্রোসেসে ছাপার উপযোগিতা কেবল সেইসব ক্ষেত্রেই যেখানে পোস্টার, কার্টন (পিসবোর্ডের প্যাকিং বাক্স) বা দোকানে বিজ্ঞাপনের জন্যে শো-কার্ড সংখ্যায় বেশি না ছাপলে চলে। কিন্তু ওই জিনিসই একসঙ্গে দশ বিশ হাজার ছাপাতে গেলে সাহায্য লাগবে 'অফসেট' অথবা লেটার প্রেসের কালার-প্রিন্টার মেশিনের। না হলে পড়তায় পোষাবে না। কিন্তু স্ক্রীন প্রোসেসের বর্ণ সৌষ্ঠব অফসেট ইত্যাদিতে আনা সম্ভব নয়, কারণ এতে রঙের ঘনত্ব যতটা প্রয়োগ করা যায় অফসেটে বা কালার-প্রিন্টার মেশিনে তা যায় না—রঙ অনেক হাল্কা থেকে যায়।

একভাবে স্ক্রীন প্রোসেস প্রিন্টিং কিন্তু একমেবাদ্বিতীয়ম্। রেডিওর কাঁচের বা প্ল্যাস্টিকের ডায়াল ছাপা কিংবা স্ফুরজ্যোতির্ময় (ফ্লুঅরোসেন্ট) লেখা ও ছবির কাজে এবং যে কোনো ধাতুর ওপরে ছাপবার বেলায়।

স্ক্রীন প্রোসেস মুদ্রণের জন্মের স্থান ও কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অ্যালবার্ট কসলফ নামে এক আমেরিকান পণ্ডিতের 'স্ক্রীন প্রোসেস প্রিন্টিং' বইটিতে আছে যে, এর জন্ম, হয় জাপানে নয় ইংল্যান্ডে। কিন্তু ১৯১০ সালে আমেরিকাতে এর প্রচলনের পর থেকে সেই দেশেই ধীরে ধীরে এর উন্নতি হয়েছে।

কলকাতার প্রথম স্ক্রীন প্রিন্টারদের অন্যতম মিঃ আলী নামে এক অবাঙালী মুসলমান ভদ্রলোকের মতে এখানে এই শিল্পের প্রবর্তক হলেন ক্যালকাটা ক্রোমোটাইপ কম্পানির এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক মিঃ বুথ রয়েড। মিঃ আলীর নিজের প্রতিষ্ঠান 'ন্যাশান্যাল আর্ট স্টুডিও' স্থাপিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। তারপরেই উল্লেখ্য হলো সি এইচ মিলার কম্পানি। 'সিলক্রীনা'র সত্যেনবাবু বললেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই বাটা কম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জে লুবুচেক নামে এক চেকোস্লোভাক ভদ্রলোক এই কম্পানির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাটার

জুতোর জন্যে ছবিওয়ালা কাপড়ে, ক্যানভাসে ছাপানো আর রেডিওর ডায়ালের মতো প্লাস্টিক বা কাঁচের ওপরে স্ক্রীন প্রোসেসে ছাপানোই নাকি তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। লুবুচেক ভারত ছেড়ে যাবার আগে এই প্রতিষ্ঠানটি এক রাজস্থানী ভদ্রলোককে বিক্রি করে দিয়ে যান। এখন তার নাম পালটে হয়েছে 'ওয়েস্টার্ন প্ল্যাস্টিক'।

কলকাতায় এখন ছোট বড় অনেক বাঙালী ও অবাঙালী স্ক্রীন প্রোসেস প্রিন্টার আছেন। এই শিল্পের একটা সুবিধা হলো যে, শিল্পী-মনোভাবাপন্ন যে কোনো মধ্যবিত্ত ব্যক্তি কম মূলধন নিয়ে (১০।১৫০০০ হাজার টাকাতেও নাকি সম্ভব) ছোট করে এতে নামতে পারেন। অন্য প্রতিযোগিতা কিছুটা আছে এবং তার চাইতেও বড় সমস্যা আছে নিপুণ স্ক্রীন প্রিণ্টিং জানা কর্মী যোগাড় করা। অপটু লোক নিয়ে শিখিয়ে নিতে হয় অধিকাংশ মালিককেই। কাঁচামাল দুর্মূল্য হলেও পাওয়া যায়, কিন্তু ইদানীং স্পিরিট ও কেরোসিন তেলের অভাবে প্রিন্টারদের বেশ অসুবিধা হচ্ছে। আশা করি তা সাময়িক।

বাঙালীর মালিকানায় উল্লেখযোগ্য যে ক'টি প্রতিষ্ঠান আছে, তার মধ্যে 'স্টুডিও প্রিন্টল'-এর জ্যোতি ঘোষ, রাবারের লেবেল ছাপায় বিশেষজ্ঞ নৃপেন ব্যানার্জি এবং 'স্টুডিও গ্র্যাফিকে'র প্রাক্তন স্পেশালিস্ট অমল দাস বিশ্বাস, সকলেই নাকি লুবুচেক সাহেবের সাকরেদ ছিলেন। এ কথা আমাকে বললেন সত্যেন রায় মশায়, যিনি নিজেও সেই শিষ্যদের একজন। তিনি সিনেমা পোস্টার লাইনে খ্যাতিলাভ করেছেন। কমার্সিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে তিনি স্বয়ং অনেক পোস্টারের ডিজাইন আঁকেন। তাঁর মতে স্ক্রীন প্রিন্টার হতে হলে প্রতিষ্ঠানের মালিক বা পরিচালকের কমার্সিয়াল আর্ট, টাইপোগ্রাফি ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তি থাকা দরকার।

সত্যেনবাবুর সঙ্গে কেবল হাতে আঁকা ডিজাইন থেকে সরাসরি স্টেন্সিল কেটে স্ক্রীন প্রিণ্টিং-এর আলাপ-আলোচনাই হয়েছিল। প্রোসেস ক্যামেরা ইত্যাদির ব্যবহার নিয়ে হয়নি; কারণ, সত্যেনবাবুর সিনেমা পোস্টারের কাজে ক্যামেরা অনাবশ্যক। সূক্ষ্ম কাজে ক্যামেরা অপরিহার্য। সে বিষয়ে জানবার জন্যে আমাকে 'স্টুডিও গ্রাফিকের' স্বত্বাধিকারী সুনীল দাস মশায়ের শরণ নিতে হলো।

স্টুডিও গ্রাফিক বাঙালীর এবং বাংলাদেশের বৃহৎ স্ক্রীন প্রোসেস প্রিন্টারদের অন্যতম। আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে এবং রেডিও ডায়াল তৈরি ইত্যাদি কয়েকটা লাইনে এঁরা অগ্রগণ্য। মালিক সুনীল দাস হলেন ঈগল লিথো-র হৃষীবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ইংল্যাণ্ডে শিক্ষিত।

১৯৫২ সালে ভর্তি হয়ে সুনীলবাবু লীডস্ কলেজ অফ টেকনোলজিতে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে মুদ্রণ শিল্প শিখে এসেছিলেন।

১৯৫৭ সালে মিশন রো-তে 'মিশন কোর্ট' ম্যানসনে মাসিক ৬৫ টাকা ভাড়াতে একটা ঘর নিয়ে সুনীল দাস তাঁর প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই আরও দুটি যুবক সুনীলবাবুর সঙ্গে কর্মী হিসেবে যোগ দিলেন। অমল দাস বিশ্বাসের নাম আমি আগেই করেছি।

লুবুচেকের শিক্ষাধীনে কাজ করে অমলবাবুর স্ক্রীন প্রোসেস প্রিণ্টিংএ ইতিপূর্বেই বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আর একজন হলেন সুনীলবাবুর লীডস কলেজের এক সতীর্থ তড়িৎমোহন রায়।

তিনজন শিক্ষিত যুবকের সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টায় স্টুডিও গ্র্যাফিকের কাজের কোয়ালিটি এত ভালো হতে লাগলো যে, প্রথম বছর ১৯৫৭-তে যেখানে কাজ হয়েছিল মাত্র ৫৭১৩্ টাকার, আজ সেখানে বাৎসরিক বিক্রি এসে দাঁড়িয়েছে ৬।৭ লক্ষে। সুনীলবাবু মিশন কোর্টে দুটি মাত্র শ্রমিক নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, আর এখন প্রায় সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিকীকরণ সত্ত্বেও কর্মী সংখ্যা ৫০জনে পেঁাছেছে। ৬৫্ টাকা ভাড়ায় মিশন কোর্টের ছোট ঘর থেকে উঠে এসে এখন স্টুডিও গ্র্যাফিকের বড় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ-এর ব্যাডমিণ্টন কোর্ট শোভিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণযুক্ত নতুন দোতলা বাড়িতে। বাড়িটা যদিও সুনীলবাবুদের পারিবারিক সম্পত্তি, কিন্তু স্টুডিও গ্র্যাফিক এখন এর ভাড়া দেয় মাসে ১৫০০্ টাকা। কর্মীদের মাইনে সমপর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের চাইতে বেশী, উপরন্তু বছরে ২২।৩ মাসের বোনাস এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও সেই অনুপাতে বেশী। সেলস্ ম্যানেজার তুষার চক্রবর্তীর সঙ্গে পরে আমার এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল; তাঁর মতে শ্রমিক ও সহকর্মীদের প্রতি সুনীলবাবুর মধুর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়।

অমল দাস বিশ্বাসের বরাবরই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাঁর কতকগুলি গবেষণার ফলেই স্টুডিও গ্র্যাফিকের কাজের কোয়ালিটি ও মানের উন্নতি হয়েছিল এবং কয়েকটা বিশেষ বিশেষ লাইনে এঁরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পেরেছেন। এখানে কয়েক বছর কাজ করবার পরে তিনি আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করবার জন্যে বিদেশ গিয়েছিলেন। জার্মেনী, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা পরিক্রমা করে কোডাক ফিল্ম কারখানাতেও কাজ শিখে এসেছিলেন। ১৯৬২-৬৩ সালে দেশে ফিরে আসবার পরে কিন্তু সুনীলবাবু ও অমলবাবুর বিচ্ছেদ ঘটলো এক মিলনের মধ্য দিয়ে। সুনীলবাবুর চেষ্টায় তাঁরই এক ছোট বোনের সঙ্গে অমলবাবু বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হলেন। অমলবাবু এখন স্বাধীন ব্যবসায়ী। ব্লকমেকিং ও মুদ্রণ শিল্পে প্রয়োজনীয় কয়েকটা কেমিক্যাল তিনি তাঁর নব প্রতিষ্ঠিত কারখানায় তৈরি করেন।

স্টুডিও গ্র্যাফিকের পরিচালকেরা কেউই চল্লিশোত্তর ন'ন। কর্তা সুনীলবাবুর বয়স ৩৭, তড়িৎবাবু তাঁর সমবয়সী আর তুষারবাবুর বয়স ৩৪।৩৫। অ্যানোডাইজিং বিভাগের পরিচালক দক্ষিণ ভারতীয় মিঃ রামচন্দ্রনও তরুণ।

সুনীলবাবুর অফিসের সর্বত্রই একটা ঝকঝকে চকচকে ভাব। এই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সুন্দরভাবে মানিয়ে গিয়েছে সুনীলবাবুর চালচলন, কথাবার্তা—ঘনকৃষ্ণ জোড়াভুরুর নীচে বুদ্ধি-দীপ্ত দুটি চোখ আর দ্রুত অথচ পরিষ্কার কথা বলার ভঙ্গিটি যেন এইরকম একটি স্মার্ট অর্গ্যানাইজেশনেরই উপযুক্ত।

দেরী না করে তিনি আমাকে কারখানা দেখাতে নিয়ে গেলেন। স্ক্রীন বিভাগটি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত; কারণ, ল্যাবোরেটরিও ওই একই ঘরের এক দিকে এবং সুনীলবাবু বললেন যে, এয়ারকন্ডিশণ্ড স্থানে থাকলে স্ক্রীনগুলিও ভালো থাকে। অনেকগুলি স্ক্রীন দেখলাম—

টেলিফ্যুংকেন ও জি ই সি রেডিওর ডায়ালের, নেসকাফের লাল সিল্কের ব্যানারের, হরলিক্সের কার্টনের এবং আরও কয়েকটা। শুনলাম এঁরা সিনেমা পোস্টারের কাজ প্রায় করেনই না। ডিজাইনের নেগেটিভ প্রধানত ক্যামেরার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আগেই বলেছি যে স্ক্রীন বিভাগের সঙ্গেই সাজানো ল্যাবোরেটরি। এখানে বহুবিধ রাসায়নিক পরীক্ষা সমস্তক্ষণই হচ্ছে। এই বিভাগগুলি সব বাড়ির দোতলায় অফিসের সংলগ্ন।

একতলায় ছাপাখানা বাদেও একটি বিভাগ আমার কাছে নতুন ও কৌতূহলোদ্দীপক মনে হলো—অ্যানোডাইজিং সেকশন। এই বিভাগটি নতুন খোলা হয়েছে। বাজারে অ্যানোডাইজিড্ লেবেলের খুব চাহিদা। এগুলো লোহার আসবাবপত্রে ও মেশিনের গায়ে লাগানো হয়। স্টীল ফার্নিচার ও মেশিন মেকিং-এর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই অ্যানোডাইজড্ লেবেলের প্রয়োজনও খুব বেড়ে চলেছে। আগে বোম্বাইয়ের 'এক্সেল প্রোসেস' ও কলকাতার একটি বাঙালী প্রতিষ্ঠান 'রেনবো মেটাল কম্পানি' প্রায় একচেটিয়া কারবার করতেন এই লেবেল তৈরির ব্যাপারে। এখন স্টুডিও গ্রাফিকও তা আরম্ভ করলো।

সুনীলবাবুর আধুনিকতা, যান্ত্রিকীকরণ, পরিচ্ছন্নতা সবই খুব ভালো লাগলো, কিন্তু তার চেয়েও যেন বেশী ভালো লাগলো পরিচালক ও কর্মীদের তারুণ্য ও ক্ষিপ্রতা। ভালো লাগলো সুনীলবাবু তুষারবাবুদের শাণিত মুখচ্ছটা, মালাক্কা বেতের মতো সতেজ নবীনতা।

ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করে ক্যামেরার ঘরে এসে প্রকাণ্ড প্রোসেস ক্যামেরাটিও দেখে নিলাম। ক্যামেরাটাকে নাড়াচাড়া করবার জন্যে মেঝে থেকে ফুট দেড়েক উঁচু দুটি লোহার রেল ফিট করা রয়েছে; পাশেই সুনীলবাবুর চেম্বারে ঢোকবার দরজার পথটি জুড়ে রয়েছে। সুনীল দাস একটা ফ্লাইং জাম্প দিয়ে টপকে চলে গেলেন।

আমার কোমরে একটা চিনচিনে ব্যথা—করুণভাবে সুনীল দাসের ক্ষিপ্রতা দেখলাম; তারপরে ওই রেলের বেড়ার পাশ দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সুনীলবাবুর অনুসরণ করলাম।

ভাবছি, মোরারজীভাইয়ের কাছে যাবো। মন্দা নামক জরার কবল থেকে দেশের শিল্প বাণিজ্যকে বাঁচাবার যে উৎকৃষ্ট সালসাটি—ব্যাংক রেট কমানো—দেরী করে হলেও তিনি প্রয়োগ করেছেন এবং যার ফলে তিনি লোকের ভাঙা মনে এবং মৃতপ্রায় শেয়ারবাজারে চট করে 'তেজী' এনে দিয়েছেন, আমাকেও তিনি যদি সেইরকমের অশ্বান কিংবা দ্রাক্ষারিষ্ট দিয়ে যৌবন পুনরুদ্ধারের হদিসটা বাতলে দেন।

যৌবনের প্রতীক স্টুডিও গ্রাফিকের সুনীল দাস, তড়িৎ রায় আর তুষার চক্রবর্তীরা কিন্তু ততদিনে এগিয়েই যাবেন অনেকখানি, তাঁদের প্রবল গতিবেগে।

২৩ মার্চ, ১৯৬৮



দশ

আমাদের মধ্যে যারা অগ্নিযুগ থেকে ব্রিটিশের ভারত ত্যাগ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলাম তাঁদের কাছে বিদেশী সরকারের অধীনে চাকরি করাটা ঘৃণ্য বৃত্তি ছিল। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর যোদ্ধাদের মধ্যে অনেকের কাছে সরকারি চাকুরেরা ছিলেন অচ্ছুত, পারিয়া, পঞ্চমা—তা তাঁরা নিজের বাবা কাকা পরমাত্মীয় যাই হোন না কেন।

কিন্তু সেই রাজকর্মচারীদের মধ্যে এক জাতের মানুষ ছিলেন যাঁরা এই যোদ্ধাদের চাইতে কম স্বাধীনতাকামী ছিলেন না। চাকরিটা তাঁদের কাছে ছিল নিছক পরিবার প্রতিপালনের উপজীবিকা। মনে মনে তাঁরা কেবল ছটফট করতেন কেমন করে নিজের পুত্রপৌত্রকে তৈরি করবেন যাতে ভবিষ্যতে তাদেরও আবার দাসত্ব করতে না হয়—না বিদেশীর, না স্বদেশী প্রভুর।

রাজশাহীর অম্বিকাচরণ মৈত্র মহাশয় এই জাতের মানুষ ছিলেন। আজ মসীজীবী বাঙালীর বুকে রাখা ফাউন্টেন পেনের কালি 'সুলেখা'-কাহিনীর মুখবন্ধে তাঁর নাম সর্বপ্রথমে উচ্চারিত হওয়া উচিত।

সাধারণ চাকরিজীবী মানুষ জীবনভর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সন্তানসন্ততিকে মানুষ করে কর্মাবসানে চায় স্বস্তি। সারা জীবনের সঞ্চয় আর পেনসনকে সে আঁকড়ে ধরে থাকে যাতে বার্ধক্যে কারও গলগ্রহ হতে না হয়। কিন্তু সুলেখা পার্কে সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড-এর যুগ্ম ম্যানেজিং ডিরেক্টর শংকরাচার্য ও ননীগোপাল মৈত্র মহাশয়দের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভাবছিলাম যে, তাঁদের স্বর্গীয় পিতৃদেব যদি তাঁর পেনসন ও আনুতোষিকের শেষ কণাটুকু পর্যন্ত ছেলেদের অতি ছোট শিল্প প্রচেষ্টাতে নির্ভীক অকুণ্ঠিত চিত্তে ঢেলে না দিতেন তা হলে কী হতো? বৃদ্ধ বয়সে তিনি যদি স্ত্রী আর বাড়ির মেয়েদের নিয়ে শ্রমিকের মতো কালি তৈরির কাজ না করতেন, আর পুলিসের লাঠি ও কারাবরণকে তুচ্ছ করে তাঁর যে ছেলেরা লড়াই করে চলেছিল তাদের প্রেরণা না যোগাতেন তা হলে আজ শুধু ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে কেন, সাগরপারেও 'সুলেখা' নামে বাঙালীর তৈরী একটি বিশেষ কালির এত সমাদর হতো কী?

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
সুলেখা পার্ক
কলকাতা ৩২

সুলেখার হয়তো অকালমৃত্যুই ঘটতো, যতই তার ওপরে মহাত্মা গান্ধী আর আচার্য রায়ের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়ে থাকুক না কেন, আর তা হলে শংকরাচার্যবাবু আজ হয়তো মন্ত্রিত্ব করতেন আর ননীগোপালবাবু হতেন কোনো কলেজের প্রিন্সিপ্যাল (যদিও দুই ভাইয়েরই বেশ মন্ত্রী মন্ত্রী চেহারা)। আজ যে সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের যাদবপুর আর সোদপুরের দুই কারখানাতে ছ' শো বাঙালী স্ত্রী ও পুরুষ কর্মী এবং তাঁদের পরিবারবর্গের অন্নসংস্থান হচ্ছে তারই বা কী হতো কে জানে।

এই কথাগুলি বলে আমি আবার মৈত্রভ্রাতৃদ্বয়ের আপনাপন ব্যক্তিত্বকে ক্ষুন্ন করছি কিনা জানি না। কারণ, তাঁদের ব্যক্তিগত ইতিহাস শুনে এবং এখন দু'জনেরই ষাট বছরের কাছাকাছি বয়স হওয়া সত্ত্বেও কর্মশক্তির প্রাচুর্য দেখে মনে হয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়াসে কোনো কিছুই হয়তো তাঁদের দমিয়ে রাখতে পারত না, হয়তো তাঁরা স্বয়ংসিদ্ধই হতেন।

১৯৩০ সালের লবণ-আইনভঙ্গ আন্দোলন থেকেই ইতিহাসটা শুরু করা যাক। শংকরাচার্যবাবু স্বর্গত ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত ও শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত পরিচালিত মহিষবাথান লবণ সত্যাগ্রহে বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জঘাটে লবণ তৈরি করে ধরা পড়লেন। তিনি ছিলেন আদর্শ গান্ধীবাদী, সন্ত্রাসবাদ তাঁর কাছে ছিল অধর্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সে (ফলিত পদার্থবিদ্যায়) এম এস-সি, ননীগোপালবাবু ছিলেন অনুশীলন পার্টির মেম্বার, রাজশাহী স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। পারিবারিক কারণে তিনি লবণ সত্যাগ্রহে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেননি। শংকরাচার্যবাবু জেল থেকে ছাড়া পেতে না পেতেই আবার রাজশাহীর বীরকুৎসা অঞ্চলে নো-ট্যাক্স ক্যাম্পেনে সত্যাগ্রহ করে গ্রেপ্তার হলেন। আবার জেল হলো।

১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে নতুন করে এঁরা দুই ভাই-ই কারাবরণ করে বন্দী হয়ে রইলেন। ননীবাবু প্রায় দু'বছর কারাবাসের পরেও মুক্তি পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে এম এস-সি পাস করলেন।

শংকরাচার্যবাবুর মা সত্যবতী দেবীও জাতির সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন রাজশাহী মহিলা সমিতির সভানেত্রী।

গান্ধী-আরউইন চুক্তির পরে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে শংকরাচার্যবাবু গান্ধীজীর অন্যতম প্রধান শিষ্য 'খাদি প্রতিষ্ঠানে'র প্রাণপুরুষ সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের উৎসাহে খাদি প্রতিষ্ঠানের রাজশাহী শাখাতে কাজ নিলেন। ননীগোপালবাবু নিলেন রাজশাহী কলেজে লেকচারারশিপ আর এঁদের বড় ভাই স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ মৈত্র আরম্ভ করে দিলেন আদা আর কমলালেবুর ব্যবসা। ব্রাহ্মণ্য ভুলে তিনি হাটেবাজারে সিলেটি কমলা আর আদার ব্যাপারী হয়ে বসলেন। মেজ ভাই শংকরাচার্য দাদাকে সাহায্য করা বাদেও আনন্দবাজার পত্রিকার এজেন্সি নিলেন। এঁরা সকলেই ছিলেন স্থানীয় সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান চরকা সমিতির সক্রিয় সভ্য। সমিতির কাজে অর্থের প্রয়োজন হত। ভিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহ না করে তাঁরা শতকরা ১৫ টাকা কমিশনে খাদি প্রতিষ্ঠানের খদ্দরের কাপড় বেচতেন। তা ছাড়াও সকলে মিলে এক বেস্ট-সেলার একসারসাইজ বুক অর্থাৎ খাতা

বিক্রি শুরু করলেন। 'বন্দেমাতরম' খাতা, যার মলাটে টাকা আনা পাই, মণ সের ছটাক ইত্যাদি বহুবিধ জ্ঞাতব্য তালিকা ছাপানো থাকত। ভাইয়েরা সেগুলো ফেরি করতেন। বিক্রি হত মেলা-তলার পাঁপরভাজা আর কদমার মত।

ওদিকে দিনে রাতে অবিরত লেখাপড়ার কাজে গান্ধীজীর প্রচুর ফাউণ্টেন পেনের কালির প্রয়োজন হত। সেই কাজে দেশী কালি প্রায় অব্যবহার্য ছিল বলে গান্ধীজী বাধ্য হয়ে বিলিতী কালিতে লিখতেন। সতীশ দাশগুপ্ত মশায় কেমিস্ট ছিলেন; এককালে বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। গান্ধীজী তাঁকে অনুরোধ করলেন চেষ্টা করে ভালো একটা দেশী ফাউণ্টেন-পেন কালি তৈরি করতে।

সতীশবাবু নিজের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষানিরীক্ষা করে 'কৃষ্ণধারা' নাম দিয়ে খাদি প্রতিষ্ঠানের মারফত বিক্রির জন্যে বেশ ভালো একটা কালির ফরমুলা বের করলেন। এ বিষয়ে তিনি নাকি একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেছিলেন। ততদিনে সত্যাগ্রহের দরুন কারাবাস করে মৈত্র ভ্রাতারা বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। স্নেহের পাত্র শংকরাচার্য ও তাঁর ভাই ননীগোপালের উদ্যম ও কর্মোৎসাহের ওপর সতীশবাবুর অগাধ ভরসা ছিল। তাঁদের দুই ভাইকে ডেকে সতীশ-বাবু সেই রেসিপি হাতে তুলে দিলেন এবং বলে দিলেন যে, তাঁরা যে কালি তৈরি করবেন তার নাম যেন দেওয়া হয় 'সুলেখা'। সেটা ১৯৩৪ সাল।

মৈত্ররা সেই রেসিপি নিয়ে ব্যারাকপুরে তাঁদের পিসতুতো দাদা শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের বাড়িতে ছোট্ট একটা কারখানা খুললেন। উদ্দেশ্য একটু একটু কালি তৈরি করা এবং কালির মানোন্নয়নের জন্যে আরও রিসার্চ করা। তাঁদের আশুদা একাই নয়, তাঁর স্ত্রী, এঁদের ভদ্রা বৌদিও শংকরাচার্যবাবুদের অপরিসীম সহায়তা করলেন। ভদ্রাবৌদি আজ পরলোকে। তাঁর ছেলে শ্রীঅসীম ভট্টাচার্য এখন সুলেখার শেয়ার বিভাগের ভার নিয়ে আছেন।

'সুলেখা' বা 'কৃষ্ণধারা' কিন্তু বাংলায়, তথা ভারতে, প্রথম ফাউণ্টেন-পেন কালি নয়। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীহিতেন নন্দী ও শ্রীতরুণ রায় এবং শ্রীশিশির সেন নামে তিনটি ব্রাহ্ম যুবক ইতিপূর্বে ১৯২৪ সালে 'কাজল কালি' নাম দিয়ে একটি কালি তৈরি করে ভারতের পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণের বাজারে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "কাজল কালি ব্যবহার করে সন্তোষ লাভ করেছি। এর কালিমা বিদেশী কালির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।"

ওই একই বছরে (১৯২৪) মাদ্রাজে তৈরি হল 'কৃষ্ণাবেণী' কালি। যদিও বাঙালী পি এম বাগচির তরল কালি ও জে বি ডি-র কালির বড়ির যথেষ্ট সুনাম ও ব্যবহার বাংলায় ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও আগে থেকেই ছিল, কিন্তু তাঁদের ফাউণ্টেনপেন কালি তৈরির প্রচেষ্টা সে যুগে সফল হয়নি। অতএব ভারতীয়দের প্রস্তুত প্রথম ফাউণ্টেন-পেন ইংক হিসেবে কাজল কালি ও কৃষ্ণাবেণীর নামই উল্লেখযোগ্য।

কাজল কালি আর কৃষ্ণাবেণী—সুন্দর নাম দুটি 'কালি' শব্দটার সঙ্গে এত সমঞ্জস! বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র 'কালিয়া' শব্দটি, কবিকঙ্কণ চণ্ডীর 'মুখে দেয় চুনকালি' পদটি আর

'কালি কলম মন। লিখে তিনজন' এই যথার্থ প্রবচনটিও হরিবাবুর 'বিশ্বকোষে' কালির নানা অর্থ ও ব্যাখ্যার মধ্যে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

তবে আমার কথা আলাদা। আমি মশাই, কালীসাধক। কালির সংস্কৃত বানান 'কালী'ই আমার বেশী প্রিয়।

দুঃখের বিষয় যে, কাজল কালি নানা ঘাত-প্রতিঘাতে আজ অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে। আমাদের এক বন্ধু শ্রীঅসিত গুপ্ত প্রতিষ্ঠানটিকে পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা করছেন। আমরা তাঁর সফলতা কামনা করি।

মৈত্রদের পক্ষে ব্যারাকপুরে বেশী দিন কাজ চালানোর অসুবিধা হচ্ছিল। জল্পনাকল্পনা করে তখন তাঁরা 'সুলেখা'র অপেক্ষাকৃত বড় কারখানা রাজশাহীতে খোলা স্থির করলেন। সেখানে যাবার পরেই শংকরাচার্যবাবুর খাদি প্রতিষ্ঠানের চাকরি ও দাদা চন্দ্রনাথবাবুর আদা ও কমলার ব্যবসা করা এবং ননীগোপালবাবুর অধ্যাপনা—ঘটনার পারম্পর্য ভেঙে সে কাহিনী গোড়াতেই বলে ফেলেছি।

কর্তা অম্বিকাবাবু, কর্ত্রী সত্যবতী দেবী এবং পরিবারের মেয়ে-বৌরা সারাদিন সংসারের কাজের মধ্যেই বাড়িতে কালি তৈরি করতেন। ছোট ছেলে ননীবাবু দিনের বেলায় কলেজে পদার্থ-বিদ্যায় অধ্যাপনা সেরে সন্ধ্যায় আরম্ভ করতেন রাসায়নিকের কাজ। তাঁর ব্রত ছিল সতীশবাবুর রেসিপিকে আরও উন্নত করা।

এইখানে আমাকে (আমার বদভ্যাসমত) নিজের আহুতে যৎসামান্য টেকনিক্যাল ও হিস্টোরিক্যাল জ্ঞান আপনাদের বিতরণ করতে হয়।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত জয়দেবের কালে আমাদের বাংলা দেশ। যতটা জানতে পারলাম তাতে মনে হয় তখন একদিকে আমলকি, হরতুকী আর বয়রা এবং অন্যদিকে হিরাকস জ্বাল দিয়ে ক্বাথ তৈরি হত। প্রথমোক্ত ফল তিনটির নির্যাস হল 'ট্যানিন'। (কোনো পণ্ডিতমশাই বোধ হয় কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য ত্রিফলার জল খেতে গিয়ে হঠাৎ এটা আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন)। তার সঙ্গে হিরাকসের নির্যাস অর্থাৎ আয়রন (ফেরাস্ সালফেট) মিশিয়ে যা দাঁড়াত তাতে দেওয়া হত লোহার কড়াইয়ে চাল পুড়িয়ে কার্বন এবং গাম্ হিসেবে সেই চাল-পোড়া বাটা। এই প্রণালীতেই নাকি তখন একরকমের কালি তৈরি হত।

সেই ঈষৎ বাদামী রঙের কালি দিয়েই সম্ভবত অজয় নদের তীরে কেন্দুলিতে বসে পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী কবি জয়দেব গান গেয়ে গেয়ে রচনা করেছিলেন :

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং ধেহি পদপল্লবমুদারং।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো হরতু তদুপাহিত বিকারম্॥

আর তার কয়েক শো বছর পরে নান্নুরে বসে রজকিনীবল্লভ ছোট চণ্ডীদাস লিখেছিলেন :

শতেক বরষ পরে, বঁধুয়া মিলল ঘরে,
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইনু বলি, লইয়া হৃদয়ে তুলি,
রাখিতে না সহে অবকাশ॥

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, মনে হয়, এই আদি প্রণালীতে তৈরি ভুসো কালি চলেছিল। তারপরে যুগ পরিবর্তন হল। বাংলাদেশে ইংরেজ নীলের চাষ করল। ইন্ডিগো (নীল) সালফোনিক অ্যাসিড মিশ্রিত হয়ে কালির বর্ণভেদ ও উন্নতি দুই-ই হল।

বেশ চলছিল, হঠাৎ জার্মান রসায়ন বিশারদেরা কৃত্রিম নীল (অ্যানিলিন ইত্যাদি) আবিষ্কার করে আমাদের দেশের নীলের চাষকে নস্যাৎ করে দিলেন।

এইভাবে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ও যুদ্ধকালে ধ্বংসের মধ্য দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করল অনেক কিছু। আই জি ফারবেনইন্ডাস্ট্রিজের মত অর্বুদ 'মার্ক'-এর অতুলনীয় শিল্প 'কমপ্লেক্স' আলকাতরা থেকে তৈরী জৈব রঞ্জক (অরগানিক কোল টার ডাইস্টাফস), ওষুধ, সেন্ট এসেন্স, সব কিছুই আবিষ্কার করে বাজারে বের করল। যুদ্ধে জার্মেনির পরাজয়ের পরে আসরে নামল ইংরেজের ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, পৃথিবীর বৃহত্তম কেমিক্যাল কম্পানি। ১৯৩৯ অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এই দুটি অতিকায় প্রতিযোগীর রাজত্ব চললো রসায়ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যে আমেরিকার ডুপণ্ট কম্পানিও কলেবরে বেড়ে বেড়ে এদের কাছে পেঁছে গেল।

মৌল দ্রব্যের উৎকর্ষের জোরে লেখবার কালির উন্নতির পথও প্রশস্ত হয়ে গেল। সে ক্ষেত্রে শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই আমরা দেখলাম সোয়ান ও ওয়াটারম্যান এবং পরে পার্কার কুইঙ্ক, স্কিপ, স্টিফেনস প্রভৃতি বিলিতী ও মার্কিন কালি ও সর্বশেষে জাপানী পাইলট কালি। সবই ভালো ভালো ফাউণ্টেন-পেন কালি।

ননীগোপালবাবু ল্যাবোরেটরিতে এই বিদেশী কালিগুলিকে পরীক্ষা (অ্যানালিসিস) করতে লাগলেন। দেখলেন, আদিকালের জনপ্রিয় সোয়ান কালিতে লোহার পরিমাণ বেশী। তাতে লেখার দীর্ঘস্থায়িতা দিত বটে, কিন্তু কলমের নিব তাড়াতাড়ি ক্ষয় পেত; শিশিগুলির তলায় সেডিমেণ্ট জমে যেত খুব শীঘ্র; আর কাপড়ে তার দাগ লাগলে কিছুতেই উঠতে চাইত না। 'কুইঙ্ক'-এ তিনি পেলেন 'আয়রনে'র পরিমাণ কম; কিন্তু এতে কালির রঙের অপরিবর্তনীয়তা (স্টেবিলিটি), এবং সেডিমেণ্ট না পড়াতে লেখার সাবলীলতা ও নিবের স্থায়িত্ব—সবই তখনকার 'সোয়ানে'র চেয়ে যে অনেক বেশী, ননীবাবু পরীক্ষার সময়ে তা দেখলেন। তা ছাড়া কুইঙ্ক কালিতে এক জাতীয় সলভেণ্ট (দ্রাবক) পেলেন যাতে সেটা দিয়ে লিখতে লিখতে কলম পরিষ্কার রাখার কাজও হত—ওয়াশেস্ অ্যাজ ইট রাইট্স।

সেই সব গুণাগুণ বিচার করে ননীবাবু কুইঙ্ক কালির অনুকরণের দিকেই এগোলেন। সেই

গবেষণার ফলে আজকের সুলেখা স্পেশাল নাকি কোনো অংশে কুইঙ্ক-এর চাইতে খাটো নয়, আর সুলেখার বিদেশে রপ্তানির মাল 'একর্জিকিউটিভ' কালি অধিকতর গুণ সংবলিত। এখন সুলেখা ওয়ার্কসের ল্যাবোরেটরিতে ননীবাবু নিজে, কম্পানির অন্যতম ডিরেক্টর অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রিতে এম এস-সি প্রেমনীহার নন্দী মশায় এবং ননীবাবুর কানাডায় শিক্ষিত জ্যেষ্ঠ পুত্র (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক) শ্রীকল্যাণ মৈত্র সুলেখার প্রতিটি শিশি কালির মান বজায় রাখবার জন্যে একটানা পরীক্ষানিরীক্ষা করে চলেছেন। তাঁদের সাহায্য করেন শ্রীনরেন ভাদুড়ি প্রমুখ আরও কয়েকজন বাঙালী কেমিস্ট। এই পরীক্ষার কাজে তাঁদের সুবিন্যস্ত ও সুবিস্তৃত ল্যাবোরেটরিতে দামী দামী 'কালারিমিটার', 'টিণ্টোমিটার' প্রভৃতি ইমপোর্টেড যন্ত্রপাতি সর্বক্ষণ ব্যবহৃত হচ্ছে।

শিল্পের প্রযুক্তিগত তথ্যের বিবরণ দিতে গিয়ে সুলেখার পুরো ইতিহাসটা আপনাদের কাছে বলা ব্যাহত হয়েছে।

১৯৩৪ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত সময়টুকুর ইতিবৃত্ত হলো বাড়িতে অম্বিকাবাবু, সত্যবতী দেবী এবং তাঁদের বধূমাতারা দিনের বেলা কালি তৈরি করে বাজারে তা চালু করবার জন্যে শংকরাচার্যবাবুর হাতে তুলে দিচ্ছেন। সামান্য বিক্রি হচ্ছে আর দেশী কালির প্রতি বীতশ্রদ্ধ খরিদ্দারকে দীক্ষিত করবার প্রয়াসে ক্রমাগত ফ্রী-স্যাম্পেল বিলি করা হচ্ছে; আর অধ্যাপনা সেরে এসে ননীবাবু ঝুঁকে পড়ছেন ভাঙাচোরা টেবিলের টেস্ট-টিউব আর ফাইন-ব্যালেন্সের মধ্যে মাথা গুঁজে।

অল্প কিছু দিনের মধ্যেই অম্বিকাবাবুর সর্বস্ব নিঃশেষিত হয়ে এলো লোকসান দিতে দিতে। কিন্তু তাতে দমবার পাত্র এ'রা ছিলেন না।

বিপদ একলা আসে না। ১৯৩৬-এ রাজনৈতিক কারণে ননীবাবুর রাজশাহী কলেজের কাজটিও গেল। সৌভাগ্যবশত তিনি কিছুদিন পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার কাজ পেয়ে গেলেন।

কলকাতায় এসে অনমনীয় উৎসাহে ননীবাবু তাঁর রিসার্চ চালাতে লাগলেন এবং প্রচারের জন্যে শেয়ালদা হ্যারিসন রোডে (অধুনা মহাত্মা গান্ধী রোডে) সুলেখা কালির একটা শো-রুম খুললেন।

১৯৩৮ সালে শংকরাচার্যবাবুও কলকাতায় চলে এলেন এবং বউবাজারে ১৬নং মদন দত্ত লেনে কারখানা খুললেন। এই সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকার মাখন সেন মশায় ও সুধীন দাশগুপ্ত তাঁদের যেভাবে সাহায্য করেছিলেন, মৈত্র ভ্রাতারা সশ্রদ্ধভাবে তার উল্লেখ করলেন। খুব কম রেটে সপ্তাহে একাধিকবার সম্পাদকীয়ের ওপরের জায়গায় সুলেখা কালির বিজ্ঞাপন ছাপাবার ব্যবস্থা তো করে দিলেনই, উপরন্তু বিলের টাকা দেবার সময় সম্বন্ধেও কোনো বাধ্যতামূলক শর্ত চাপালেন না। আর এ'দের আর্থিক অসচ্ছলতার কিছুটা সুরাহা করে দেবার জন্যে সুধীন দাশগুপ্ত মশায় শংকরাচার্যবাবুকে সঙ্গে করে হুগলী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্বর্গীয় ধীরেন মুখোপাধ্যায় মশায়ের কাছে নিজে সুপারিশ করে বিল-ডিসকাউণ্টের ব্যবস্থা করে দিলেন। মদন দত্ত লেনের বাড়িওয়ালা শ্রীভূতনাথ দত্ত-ও এ'দের নানাভাবে সাহায্য করতেন। আর সাহায্য

করেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মশায়।

বিক্রি বাড়তে লাগলো। ওদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেল। বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁরই উপদেশে ননীবাবু এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটি ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে সুলেখার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কাজ বেড়ে যাওয়াতে স্থানাভাব হচ্ছিল, তাই ১৯৩৯ সালে বালিগঞ্জের কসবা অঞ্চলে দুটো বাড়ি ভাড়া করে মৈত্ররা সুলেখা কারখানাকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে কাটলো প্রায় সাত বছর। তারপরে আবার স্থানের অকুলান। যুদ্ধের বাজারে সুলেখার বিক্রির অভাবনীয় উন্নতি হল। তখন ১৯৪৬-এ তাঁরা তাঁদের পরিচিত এক মুসলমান ভদ্রলোকের কাছ থেকে যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের দক্ষিণে ২২ বিঘা জমি লম্বা লীজে নিয়ে কসবা থেকে উঠে গেলেন। পরে অর্থানুকূল্য হওয়াতে জমিটা তাঁরা কিনেই নিলেন। সেই থেকে সুলেখা-কে আর বাসাবদল করতে হয়নি। উপরন্তু সোদপুরে ১৬ বিঘার একটা বাগানবাড়ি কিনে সুলেখা এখন রীতিমতো বিত্তশালিনী হয়ে উঠেছেন। তার কথা পরে আবার বলা যাবে।

সেই বছরে মৈত্রদের পরিবারে একটা পরম দুর্ঘটনা ঘটলো। বৃদ্ধ পিতা অম্বিকাবাবু ও মাতা সত্যবতী দেবীর মৃত্যু হয়েছিল ইতিপূর্বেই ১৯৪৪ ও ৪৫ সালে। ১৯৪৬-এ অপরিণত বয়সে এঁদের বড়ো ভাই চন্দ্রনাথবাবুও পরলোকগমন করলেন। (এখন তাঁর তরুণ পুত্র শ্রীমান মিহির মৈত্র কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় সুলেখাতে শিক্ষানবিসি করছেন)।

১৯৪৬ সালেই সুলেখা আরও এক ধাপ এগোলো। শংকরাচার্যবাবুরা সুলেখা ওয়ার্কসকে পাবলিক লিমিটেড কম্পানিতে পরিণত করলেন। এর আগে যে মৈত্র ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড সুলেখার মালিক কম্পানি ছিল সেইটা হল সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড-এর ম্যানেজিং এজেন্টস।

১৯৪৮-এ মৈত্ররা ফাউন্টেন-পেনের জন্য ছাড়াও অন্য অনেকরকম কালি তৈরি করতে লাগলেন এবং সেই বছরে মোট বিক্রি হল প্রায় ১ লক্ষ টাকার। তখনকার সুলেখার পক্ষে সেটা বেশ মোটা অংকই ছিল। মৈত্ররা ভাবলেন, বাণিজ্যতরী এবার ভরা পালে ধেয়ে চলবে। কিন্তু সাধুভাষায় বলতে হয়, "পরিহাসপ্রিয় বিধাতা অলক্ষ্যে হাসিলেন।"

শংকরাচার্যবাবু বললেন যে, তখন আমাদের ক্ষিতীশ নিয়োগী মহাশয় কেন্দ্রীয় বাণিজ্য-মন্ত্রীর পদে ছিলেন। আমাদের স্টার্লিং ব্যালেন্স অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্গতিও তখন অপর্যাপ্ত। দেশী শিল্পের সংরক্ষণ সর্বদাই মন্ত্রীমণ্ডলীর একান্ত আবশ্যিক কর্তব্য। কিন্তু তা করতে গিয়ে পাছে দ্রব্যমূল্যস্ফীতি বা ইনফ্লেশন হয় সেই ভয়ে নিয়োগী মশায় ঠেলে ভোগ্য-পণ্যের 'ওপন জেনারেল লাইসেন্স' ইসু করলেন। লেখবার কালি, স্নো-ক্রীম-এসেন্স সবই হুড়হুড় করে আমদানি হল। আমরা তখন 'স্বাধীন' হয়ে গিয়েছি, কাজেই বিলিতী বয়কটের আর কোনো প্রয়োজন নেই। অতএব, কুইংক-সোয়ানের মতো অভিজাত কালি সহজলভ্য হলে কেন আমরা কান্ট্রিমেড সুলেখা বা সুপ্রা কিংবা কাজল কালি কিনবো?

ফলে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান অনেকে উঠেই গেল আর সুলেখার বার্ষিক বিক্রির অংক পড়তে পড়তে ৫০।৫৫ হাজার টাকাতে নেমে এলো। মৈত্রভ্রাতৃদ্বয়ের আবার সংগ্রাম শুরু হলো। এবার

তাঁদের লড়াই চললো টারিফ কমিশনের মাধ্যমে। গভর্নমেন্টের বক্তব্য ছিল যে দেশে ভালো ফাউন্টেন পেনের কালি তৈরী হয় না, তাই ইমপোর্ট দরকার। তখন দেশীয় প্রতিষ্ঠানদের ত্রাতা হয়ে দাঁড়ালেন টারিফ কমিশনের এক বাঙালী সভ্য শ্রীবিনয়েন্দ্র দাশগুপ্ত। তিনি তাঁর জোরালো রিপোর্টে লিখলেন যে, দেশে যখন 'কাজল কালি', 'সুলেখা', 'সুপ্রা' প্রভৃতি ভালো ফাউন্টেন পেনের কালি তৈরী হচ্ছে, এবং তাদের উৎপাদন বাড়ানোতেও কোনো অসুবিধা নেই তখন বিদেশী কালির আমদানি বন্ধ হোক। এর পর থেকে (১৯৫০) ও জি এল-এ কালির লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ হলো। উপর্যুক্ত কালিগুলি ছাড়া বাঙালীর তৈরী 'থ্রি-আর' ও 'পি এম বাগচী'র 'আইডিয়াল'ও তখন বেশ চালু হয়েছে।

১৯৫২-তে আবার এক বিপত্তি হলো। ননীবাবু বললেন যে, তখন কুইঙ্ক, ওয়াটার-ম্যান প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী কম্পানিকে ভারতে কালি তৈরির অনুমতি দেওয়া হল। সরকারি একটা নীতি ছিল এবং এখনো নাকি আছে যে, কেবল যেসব ক্ষেত্রে বৈদেশিক অর্থসাহায্য বা টেকনিক্যাল নো-হাউ দরকার সেইখানেই ভারতীয়দের সহযোগিতায় বিদেশীদের এদেশে শিল্পোদ্যোগ করতে দেওয়া হবে এবং তা হলে সেইসব যৌথ প্রচেষ্টায় ভারতীয়দের শেয়ার থাকবে কমপক্ষে ৫১%। ফাউন্টেন-পেন কালির বিষয়ে এই টারিফ প্রোটেকশন থাকা সত্ত্বেও এবং পুনার সরকারি কেমিক্যাল ল্যাবোরেটরির টেকনিক্যাল সাহায্যের কোনো প্রয়োজন যে কালিওয়ালাদের নেই সে কথা জোর দিয়ে বলা সত্ত্বেও কুইঙ্ক প্রভৃতিদের অনুমতি দেওয়া হল। শুধু তাই নয়, কুইঙ্কের আমেরিকান কর্তাদের নাকি ৪৯ পারসেন্টের জায়গায় ৬৬⅓ পারসেন্ট অংশীদার হতেও দেওয়া হল। আমাদের অর্থমন্ত্রী তখন শ্রী টি টি (ধনী ভারতীয়ের পরিভাষায় 'ট্যাক্স-ট্যাক্স') কৃষ্ণমাচারী। ননীগোপাল মৈত্র বললেন যে, কৃষ্ণমাচারী মশায়ের ছেলেদের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান টি টি কৃষ্ণমাচারী কম্পানি 'ওয়াটারম্যান'-এর সঙ্গে ১৯৫২-৫৩ সালেই হাত মিলিয়েছিলেন। 'সোয়ান', 'পাইলট' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও তখন এখানে কারখানা খুললেন। এ কথা যদি ঠিক হয় তা হলে ওইসব সরকারি নীতির প্রবর্তকদের 'ভারতরত্ন' খেতাব দেওয়া উচিত।

এত বিরাট বিরাট প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও ১৯৫৩-৫৪ সালে এ দেশের অন্য সমস্ত ফাউন্টেন-পেন কালির সমষ্টিগতভাবে যত বিক্রি হয়েছিল, একা সুলেখার বিক্রির অঙ্ক তার চাইতে বেশী হয়েছিল। তা সম্ভব হয়েছিল মৈত্র মহাশয়দের অক্লান্ত সংগ্রাম এবং কালির মান বজায় রাখবার সাধু প্রচেষ্টার জন্যে।

মৈত্রদের সঙ্গে কাঁধ দিয়ে লড়েছিলেন একদল পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান সহকর্মী, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার স্বাধীনতা আন্দোলনেও মৈত্রদের সাথী ছিলেন। ফ্যাক্টরি ম্যানেজার শ্রীব্যোমকেশ লাহিড়ী, সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীশচীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীঅসীম ভট্টাচার্য, ক্যাশিয়ার শ্রীঅনিল চন্দ, অ্যাকাউন্ট্যান্ট যুগল শ্রীহিরণ্য চক্রবর্তী ও শ্রীপ্রভাস চক্রবর্তী এবং অন্যান্য পদে বহাল শ্রীঅজিত গোস্বামী, শ্রীগণেশ মৈত্র, শ্রীনিশীথ মৈত্র মহাশয়রা এবং ডিরেক্টর বোর্ডের শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভাদুড়ি ও শ্রীপ্রেমনীহার নন্দী এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনান্শিয়াল করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীমানস রায়।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলি। সুলেখার প্রচার সচিব শ্রীশিশির চ্যাটার্জিকে আমি আড়ালে

দুটো প্রশ্ন করেছিলাম : "এইসব বারেন্দ্রশ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রেমনীহারবাবু, আপনি বা সেলস্ ম্যানেজার সুধাংশু মুখার্জি মশায় ঢুকে সমস্ত কাঠামোটাকে এমন ভেজাল করে দিলেন কী করে?"—আর দু' নম্বর, "এই কালি তৈরির সঙ্গে বারেন্দ্রদের কোনো আত্মিক যোগ আছে কিনা? পুরনো পি এম বাগচীরা বাদেও ছাপাখানার কালির সান্যাল লাহিড়ীরাও তো দেখলাম আগাপাশতলা বারেন্দ্র।"

শিশির চ্যাটার্জি ভাবলেন আমি রসিকতা করছি; তাই তিনি জোরে একবার রাঢ়ী অট্টহাস্য হাসলেন।

সুলেখা ওয়ার্কসের ১৯৬৭-র বিক্রি ১ কোটির ঘরে ছুঁই ছুঁই করেছে। মৈত্র পরিবারের সাধনার সিদ্ধি হয়েছে। ফাউন্টেন পেনের কালি থেকে শুরু করে চেক-রাইটিং, ডুপ্লিকেটিং, রাবার স্ট্যাম্পের, স্টেন্সিলের, ড্রয়িং-এর এবং আরও অনেক কাজের কালি বাদেও গঁদ, আঠা, সীলিং ওয়াক্স (গালা), এমন কি ফিনাইলও এখন সুলেখাতে তৈরী হয়। মাল রপ্তানির ব্যাপারেও এঁরা তৎপর। দূর ও মধ্যপ্রাচ্য তো আছেই, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াতেও সুলেখা সমাদৃত। সম্প্রতি ব্রহ্ম সরকার বিলিতী, মার্কিন ও চীনে কালির টেন্ডার নামঞ্জুর করে 'গ্লোবাল টেন্ডারে' সুলেখাকে পছন্দ করে একসঙ্গে প্রায় ১৩০ টন কালি কিনেছেন। শংকরাচার্যবাবুও হিমালয় বোর্ড মিলের মাধুরী দেবীর মতো প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন যে, সুলেখার এখন 'বিজনেসে বুম' চলেছে, যদিও সরকারি নীতির ফলে দেশে দুষ্প্রাপ্য কোনো কোনো অবশ্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের আমদানি বন্ধ হওয়াতে উৎপাদনের বেশ অসুবিধা হচ্ছে। সুলেখা কালির মতো যেসব জিনিস রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন সম্ভব তার উৎপাদনে এভাবে ব্যাঘাত ঘটানো সরকারের পক্ষে নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়।

সুলেখা পার্কে এঁদের কারখানাটা পরিচ্ছন্ন নয়। শংকরাচার্যবাবুর মতে, তার কারণ হল অনটনের মধ্য দিয়ে সুলেখার ধাপে ধাপে বেড়ে ওঠা। আগের থেকে যথাযথ পরিকল্পনা করবার সুযোগ এঁরা পাননি। প্রয়োজনের তাগিদে আজ এখানে একটা শেড, কাল ওখানে একটা গ্যারেজ তুলতে গিয়ে কেমন যেন প্রথম যুগের উদ্বাস্তু কলোনির মতো একটা পরিবেশ হয়ে গেছে বলে তিনি দুঃখ করলেন। এখন তাঁদের সোদপুরের ১৬ বিঘা নিজস্ব জমির ওপরে সুপরিকল্পিত নতুন দু' নম্বর ফ্যাক্টরি চালু করেছেন। আপাতত সেখানে রাইটিং ইংক, ইংক ট্যাবলেট ও পাউডার, সীলিং ওয়াক্স ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে।

বাইরেটা ও কারখানার শেডগুলি অপরিচ্ছন্ন দেখতে হলে কি হবে, ল্যাবোরেটরির কথা তো তো আগেই বলেছি আর ফ্যাক্টরির ভেতরের ওয়াশিং (শিশিগুলিকে অ্যালকালি-মুক্ত করবার জন্যে ধোলাই) বিভাগ, স্টেনলেস স্টীলের ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার প্লান্ট, ডি-মিনারা্যালাইজেশন প্লান্ট, ফিলট্রেশন প্লান্ট, আঠা তৈরির যন্ত্রাদি, অটোম্যাটিক ভ্যাকুয়াম ফিলিং প্লান্ট, হাইস্পীড সেন্ট্রি-ফিউজ—সমস্তই সর্বাধুনিক মেশিনারি—যেন খোলার চালের বস্তিতে সব মিস্ ক্যালকাটা আর মিস্ ইন্ডিয়াদের থাকতে দেওয়া হয়েছে।

উৎপাদনের এই তৎপরতা প্রথমত ননীবাবুরই অধ্যবসায়ের ও টেকনিক্যাল জ্ঞানের ফল। শিল্প ও বাণিজ্য এবং সরকারি মহলে এই সব কারণেই তিনি এখন সুপরিচিত। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল

চেম্বারের কর্ম সমিতির সভ্যপদ ছাড়াও সরকারি মানক সংস্থার তিনি একজন উপদেষ্টা। স্টেশনারি ও অফিস ইকুইপমেন্টের সর্বভারতীয় সমিতির সভাপতিত্বও ননীগোপালবাবু দু' দফা করে এসেছেন। গতবারে তিনি দক্ষিণ কলকাতা রোটারি ক্লাবের সভাপতিত্বও করেছেন। এর পরেও সরকারি 'টালিগঞ্জ আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টে' তাঁর উপদেষ্টা হিসেবে থাকা এবং 'রামকৃষ্ণ পল্লীমঙ্গল সমিতি' ও 'বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে'র সভাপতিত্বও উল্লেখযোগ্য। তাঁর ছেলে অধ্যাপক কল্যাণ মৈত্র এখন ফ্যাক্টরি ও ল্যাবোরেটরির প্রযুক্তিগত উন্নতিসাধনে ব্যস্ত। সুলেখার সাম্প্রতিক উৎপাদন পরিকল্পনার উন্নতি কল্যাণবাবুরই অবদান।

মেজদাদা শংকরাচার্যবাবু একান্তভাবে সুলেখার বাণিজ্যিক দিকটারই পরিচালনা করেন। প্রথম জীবনে স্বাধীনতা সংগ্রামে বড় বেশী লিপ্ত ছিলেন বলে এখন বোধ হয় মিটিং, কমিটি আর সভাপতিত্ব থেকে দূরে দূরেই থাকেন। ঘরোয়া ব্যাপার, মানে সুলেখার কর্মীদের নিয়েই তিনি ব্যস্ত।

উৎপাদনের কথা থেকে অন্য দিকে চলে গিয়েছিলাম। ননীবাবুর একটা কথা শুনে আশ্চর্য হলাম যে, বিজ্ঞানের এত প্রগতি সত্ত্বেও ব্লু-ব্ল্যাক কালি তৈরির রাসায়নিক মৌল উপাদান বহু যুগ আগেও যা ছিল তাই রয়ে গেছে। এখন কালি তৈরির আগে ট্যানিক অ্যাসিড, গ্যালিক অ্যাসিড, আয়রন ছয় থেকে ন' মাস বড় বড় কাঠের পিপেতে থিতিয়ে নেবার পরে নানা যন্ত্রের মাধ্যমে রঙ করে পরিস্রুত করে এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সেডিমেন্ট মুক্ত করে কালি তৈরি হচ্ছে।

সুলেখার গেট-আপ ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে অভিনব লাগলো। যান্ত্রিক উপায়ে মেইন শেড থেকে রবারের পাইপ দিয়ে কালি পাঠিয়ে দু' দিকে দুটো গেট-আপ বিভাগে মেশিন দিয়ে শিশিতে কালি ভরা ও ছিপি আঁটা, আবার মেশিন দিয়েই লেবেল মারা এবং তারপরে হাতে করে বাক্সে প্যাক করার কাজগুলির অভিনবত্বের কথা বলছি। গেট-আপের দুটি বিভাগের একটিতে কাজ করেন পুরুষ শ্রমিকেরা। তাঁদের দিনে ৮ ঘণ্টার ডিউটি। আর একটি বিভাগ হল প্রধানত নারী কর্মীদের দ্বারা চালিত। এটা কারখানার একেবারে পিছন দিকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি বিভাগ। এখানে বিভাগীয় কর্মী ছাড়া বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ। তাছাড়া মেয়েদের এই গেট-আপ বিভাগের একটা আলাদা সত্তা আছে। মৈত্র মহাশয়দের উৎসাহে স্থানীয় উদ্বাস্তু মহিলাদের নিয়ে গঠিত 'যাদবপুর শ্রমকল্যাণ সমবায় সমিতি' নাম দিয়ে একটি সংস্থা কো-অপারেটিভ পদ্ধতিতে এর কাজ চালান। সুলেখার পরিবহণ বিভাগের পরিচালক শ্রীনিশীথ মৈত্র এই সমবায়ের সভাপতি ও শ্রীমতী নমিতা দাশগুপ্ত এর সম্পাদিকা। আমি যখন গেলাম তখন প্রায় ২৫।৩০জন মহিলা সেখানে দ্রুতগতিতে নিপুণভাবে গেট-আপের কাজ করছিলেন। শ্রীমতী দাশগুপ্ত বললেন যে, মেয়েরা গৃহকর্ম সেরে এসে এখানে দিনে ৪ ঘণ্টা করে কাজ করেন। অংশীদার হিসেবে শেয়ারের ডিভিডেন্ড বাদেও এ'রা জনপ্রতি মাসে ৪০।৫০ টাকা করে উপার্জন করেন। সধবা, বিধবা ছাড়াও এখানে কয়েকটি সুশ্রী অবিবাহিতা মেয়েকে কাজ করতে দেখলাম।

আমি নিশীথবাবুকে নীচু গলায় বললাম, দেয়ালের ওদিকে সব কর্মঠ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল যুবকেরা কাজ করছেন আর এদিকে এ'রা—তা মাঝে মাঝে পুষ্পধনুর শরনিক্ষেপের উৎপাত হয় কিনা। নিশীথবাবু মধ্যবয়সী ব্যাচেলার, তাই বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক; বললেন, "না, তেমন

আর কোথায়!" বলেই হঠাৎ যেন তাঁর খেয়াল হলো। তিনি আমার পাশে দাঁড়ানো একটি ২৮।২৯ বছরের যুবকের দিকে তাকিয়েই তাড়াতাড়ি আমাকে একটু আড়ালে নিয়ে গেলেন। ছেলেটি, নাম সুবিমল ঘোষ, কিন্তু আমার কথা শুনে ফেলেছে; মৃদু মৃদু হাসছে। নিশীথবাবু বললেন, "ওই সুবিমল—ও-ই তো শোভা দাস নামে তার সহকর্মিণীকে বিয়ে করে সংসার পেতেছে। আরও দু একটা এইরকম ঘটবার সম্ভাবনা যে একেবারে নেই তা নয়। আমি একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। এরা কিন্তু সব সৎ ছেলে মেয়ে।" খবরটা আমার কাছে খুব স্বাভাবিক আর ভারী মধুর লাগলো।

শ্রমকল্যাণ সমবায়ের কর্মীদের বাদ দিয়ে সুলেখার দুই ফ্যাক্টরির বর্তমান কর্মিসংখ্যা আন্দাজ ৬০০।

নিশীথবাবুর নিজের ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টটি বেশ বড়ো। সবসুদ্ধ ২৩টা লরি, ভ্যান, স্টেশন ওয়াগন ও প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে সুলেখার দুই কারখানার দৈনন্দিন মাল ডেলিভারি ও কাঁচামাল আনার কাজ চলে। এদিকেও সুলেখা স্বয়ংসম্পূর্ণ।

পরিচালকদের উদ্‌যোগে আরও একটি সমবায় গঠিত হয়েছে—সুলেখা সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি লিমিটেড। সেখানে সস্তায় নিত্যপ্রয়োজনের জিনিস সরবরাহ ছাড়া কর্মীদের বিপদ-আপদে ঋণ দেওয়াও হয়। ভোটের মাধ্যমে কর্মীদের মধ্য থেকে এই সমবায়ের পরিচালক নির্বাচিত হন।

শংকরাচার্যবাবুর কাছে সুলেখা কর্তৃপক্ষের গঠিত 'সুলেখা সাংস্কৃতিক সংসদ'-এর কর্মসূচীর বিবরণ শুনলাম। কর্মীরা খেলাধুলা, মঞ্চাভিনয় ইত্যাদির প্রযোজনা করেন; ভালো একটা গ্রন্থাগারও আছে। সুলেখা কর্তৃপক্ষের আয়োজিত সর্বসাধারণের জন্য বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় ছোটগল্প প্রতিযোগিতাতে এক একবারে ৬ থেকে ৮০০০ প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। আমাদের ছেলেবেলাকার এইচ. বোসের 'কুন্তলীন পুরস্কারে'র কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সুলেখার প্রযোজিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতা, তর্কসভা ও শিশু হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতাও খুবই জনপ্রিয়। বর্তমানে একটি রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হচ্ছে। কাগজে বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে।

তারপরেও আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সুলেখার উদ্‌যোগে গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'সুলেখা শিশু বিশ্বকোষ' প্রকাশের আয়োজন। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রকাশনার ভার নিয়েছেন।

সুলেখার একটি সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান আছে—'দপ্তর শিল্প প্রতিষ্ঠান লিমিটেড'। এর কাজ হলো কালির শিশি ভরবার পিসবোর্ডের বাক্স, শিশির ছিপি ইত্যাদি সুলেখাকেই সরবরাহ করা। ব্যালেন্স শীটে দেখলাম এই ছোট্ট প্রতিষ্ঠানটিরও বেশ লাভ হচ্ছে।

ব্যালেন্স শীট প্রসঙ্গে এখানে একটা মন্তব্য করি। সুলেখার ১৯৬৬ সালের ব্যালেন্স শীট দেখলাম। মনে হয় এর মূলধনের কাঠামোর পরিবর্তন দরকার। বাজারে এঁদের যে রকম সুনাম আছে বলে জানি তাতে এঁদের আরও শেয়ার বিক্রি করে মূলধন বাড়াতে কোনো অসুবিধা না হওয়াই উচিত; তাহলে একদিকে এঁদের বর্তমান 'আন্ডারক্যাপিট্যালাইজড' (প্রয়োজনের চেয়ে কম

মূলধন সম্পন্ন) অবস্থাটা দূর হয় এবং অন্যদিকে ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (পশ্চিমবঙ্গ ফিনান্সিয়াল করপোরেশন) থেকে যেসব ঋণ নেওয়া আছে স্বচ্ছন্দে তা শোধ করে বাৎসরিক অন্তত ১ লক্ষ টাকার সুদ বাঁচাতে পারেন। সাধারণত সুলেখার মতো প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের ভয় থাকে যে, বাজারে বেশী শেয়ার ছাড়লে অধিকতর ধনবানরা তাঁদের তৈরী জমি বেদখল করে নেবে। সে ভয় হওয়া স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে তাঁদের উচিত রাজ্যের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন, ফিনানসিয়াল করপোরেশন অথবা এল আই সি, ইউনিট ট্রাস্টের মতো আধা-সরকারী সংস্থার কাছে তাঁদের শেয়ার বিক্রি করবার চেষ্টা করা। যত দূর জানি, এই সমস্ত সংস্থা তাদের লগ্নীর ওপরে ৭।৮ পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড নিয়মিত পেলেই সন্তুষ্ট হয়, কারণ তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো দেশের শিল্পোন্নয়ন।

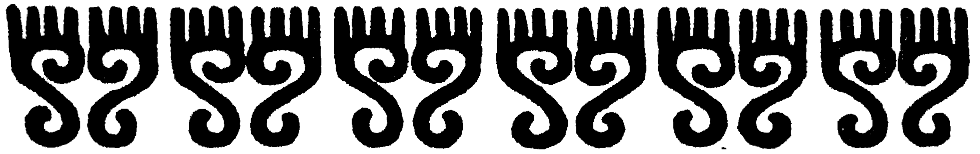
প্রবন্ধ দীর্ঘাকার ধারণ করেছে, তাই সুলেখার সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও আর বেশী এগোনো যাবে না।

দাঁড়ি টানবার আগে কেবল আর কয়েকটা কথা বলবো। 'বয়কট ব্রিটিশ' আন্দোলনের কিছু পরেই মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বোম্বাইয়ের কোনো বস্ত্রশিল্পপতির এক আলোচনা হয়। আন্দোলনের সুযোগে দেশপ্রেমী বাঙালীর কাছে ন্যায্যমূল্যের চেয়ে অনেক চড়া দামে বোম্বাই মিলের কাপড় বেচে প্রভূত লাভ করবার জন্যে গান্ধীজী অনুযোগ করছিলেন। উত্তরে সেই শিল্পপতি বললেন যে, তাঁরা তো জনকল্যাণের জন্য ব্যবসা করতে বসেননি, তাঁদের কর্তব্য প্রচুর লাভ করে ভালো ডিভিডেন্ড দিয়ে শেয়ার-হোল্ডারদের খুশী রাখা। চাহিদার ওপরে পণ্যের দাম ওঠা-পড়া করে। বাঙালীদের সেটা বুঝে দেশী মিলের কাপড়ের পিছনে ছোটা উচিত ছিল—মহাত্মার বেদনাবোধের কোনো মর্যাদা না দিয়েই বোম্বাইয়ের সেই মুনাফা লোলুপ শিল্পপতি অতি সহজভাবে গান্ধীজীকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

আমরা দেখেছি যে, বাঙালী শিল্পপতিরাও সুবিধা পেলে অনুরূপ লাভের সুযোগ ছাড়েন না। তখন শিল্পপতি শিল্পপতিই, তার অন্য কোনো জাতি বিচার থাকে না।

কিন্তু আমরা আশা রাখবো যে, মহাত্মা গান্ধী, সতীশবাবু ও অম্বিকাবাবুর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত শংকরাচার্য ও ননীগোপাল মৈত্র মহাশয় এবং তাঁদের উত্তরসাধকেরা যেন তাঁদের আদর্শ ভুলে কোনো দিন ওই পশ্চিমাঞ্চলের শিল্পপতির সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তিতে বসে না পড়েন; কারণ, সুলেখাও তো এখন ক্ষুদ্রত্বের সীমানা অনেকখানি ছাড়িয়ে বৃহতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। এখন ১২½ পার্সেন্ট লভ্যাংশ বিতরণ করছেন, অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো ২৫ পার্সেন্ট করবার মতো সামর্থ্য হতে পারে। বিশেষ করে বলছি এইজন্যে যে, প্রধানত সুলেখা কালি দিয়ে লিখেই বোধ হয় আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে বড় হবে।

৩০ মার্চ, ১৯৬৮



এগারো

একটি সালতামামি হিসেব অর্থাৎ ব্যালেন্সশীট থেকে উদ্ধৃত কয়েকটি তথ্য এই প্রবন্ধের মুখবন্ধ রূপে ব্যবহার করছি।

মূলধন

৫,৩৫,৭০০ টাকা প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারদের ফেরত দেবার
পর পেডআপ ক্যাপিট্যাল ... ... ১৩,৭৫,২২১ টাকা

সংরক্ষিত তহবিল

মেশিনারি রিনিউয়্যাল রিজার্ভ	৩৬,৪৬,৫৫৫ টাকা
সাধারণ অর্থাৎ জেনারেল রিজার্ভ	৬৩,০০,০০০ টাকা
ডেভেলপমেণ্ট রিজার্ভ	১১,০৩,১৪৬ টাকা

বাজার দেনা

মোট অংক ১৭,৩১,৮৯৮ টাকা

সক্রিয় (হোলটাইম) ডিরেক্টরদের পাওনা

মোট অংক ২,৫৮,৪৬০ টাকা

আয়কর (ইনকাম ট্যাক্স) রিজার্ভ

মোট অংক ৮৯,০৭,০৮৫ টাকা

প্রস্তাবিত ডিভিডেণ্ড

মোট অংক ৩,৭২,৪৪৪ টাকা

শ্রীঅন্নপূর্ণা কটন মিলস লিমিটেড
পি-১০ নিউ হাওড়া ব্রিজ অ্যাপ্রোচ রোড
কলিকাতা-১

উপরিলিখিত হিসেব ছাড়াও কম্পানির অন্যান্য দেনা (লায়াবিলিটিজ) যা আছে তার হিসেব এখানে দিলাম না। সেইভাবে উপরের প্রধান প্রধান দেনার বিপরীতে কম্পানির সম্পত্তির মূল্য ও নগদের (অ্যাসেটস) বিশেষ কয়েকটি হিসেব নীচে লিপিবদ্ধ করছি।

অবক্ষয় অর্থাৎ ডেপ্রিসিয়েশনের পরে সম্পত্তির দাম	...	২৬,৬৫,৭১০ টাকা
বৎসরান্তে স্টকে কাঁচা ও তৈরী মালের পড়তা দাম	...	৪২,৮২,৪৯৩ টাকা
বৃহৎ বৃহৎ ব্যাঙ্কে স্বল্পমেয়াদী ও চলতি আমানত	...	৮৬,৭৬,৬১১ টাকা
অ্যাডভান্স পেমেন্ট অব ইনকাম ট্যাক্স ...	...	৭০,৮৭,৫৫৩ টাকা

কম্পানি ১৯৬৬ সালে মাল বিক্রি করেছে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ ২০ হাজার ১৫ টাকার। ১৯৬৬তে নীট লাভ হয়েছিল ৩৬ লক্ষ ৩১ হাজার ৯২ টাকা।

১৯৬৬ সালের বার্ষিক রিপোর্টে ডিরেক্টরবৃন্দ অংশীদারদের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তার মর্ম হলো : চলতি বছরের উপযুক্ত নীট লাভ থেকে সরকারকে দেয় ইনকাম-ট্যাক্সের জন্যে রক্ষিত ২২ লক্ষ টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের জন্যে পর্যাপ্ত টাকা পৃথক করে রেখে অর্ডিনারি শেয়ারের ওপর আয়কর সাপেক্ষ ৩০ পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড দেবার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

মাত্র ২৭০০০ টাকু অর্থাৎ স্পিন্ডল এবং ৩০০ তাঁত-বিশিষ্ট শ্যামনগরের শ্রীঅন্নপূর্ণা কটন মিলস লিমিটেড তার জন্মের ২২ বছরের মধ্যে ৫।৬ বছর ধরে একাদিক্রমে এই ৩০ পাঃ ডিভিডেন্ড দিয়ে চলেছে। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের পুরনো শিল্প ও বাণিজ্যের স্বর্ণযুগের কোনো প্রতিষ্ঠান হলে এক কথা ছিল। ১৯৪৫ সালে কম্পানি রেজিস্ট্রি হয়ে ১৯৫১।৫২ সালে, মানে এই সেদিন যে মিল চালু হলো এবং যে মিলকে বোম্বাই আহমেদাবাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে চলতে হয়, এবং যে মিলকে মন্দা, সঙ্কট ও চূড়ান্ত শ্রমিক সমস্যায় পরিপ্লুত কলকাতায় কাজ করতে হয়েছে সেই 'একশ্চন্দ্র তমো হন্তি' বাঙালীর কটন মিল শ্রীঅন্নপূর্ণা কেমন করে এমন একটি ব্যালেন্স শীট পেশ করতে পারলো তাই ভেবে অবাক লাগে। 'কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ ইয়ার-বুকটি' ঘেঁটে কদাচিৎ এর মতো একটি ব্যালেন্স-শীট খুঁজে পাওয়া যায়। কেমন করে তা সম্ভব হলো সেই প্রশ্নটির উত্তর নিহিত আছে একটি পরিবারের ঐতিহ্যের মধ্যে।

ছত্রিশ বছর আগের এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'বাঙালীর কাপড়ের কারখানা' সম্বন্ধে লিখেছেন : "...শুক্রাচার্যের কাছে পাঠ নিতে আমরা অবজ্ঞা করেছি—সে হলো হাতিয়ার-বিদ্যার পাঠ। এইজন্যে পদে পদে হেরেছি।...যাই হোক বাংলাদেশেও একদিন বিষম ব্যর্থতার তাড়নায় 'বঙ্গলক্ষ্মী' নাম দিয়ে কাপড়ের কল দেখা দিয়েছিল। সাংঘাতিক মার খেয়েও আজও সে বেঁচে আছে। তারপর দেখা দিল 'মোহিনী মিল'।..."

আমি কিন্তু বঙ্গলক্ষ্মী মিলের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে বসিনি। মোহিনী মিলের সম্বন্ধেও কিছুদূর বলে আমাকে থামতে হবে। শ্রীঅন্নপূর্ণা কটন মিলের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তী এবং তাঁর ছেলেদের কথাই আজ বিশেষ করে লিখবো। কিন্তু আমায় আরম্ভ করতে হবে মোহিনী মিলের গোড়াপত্তনের ইতিহাস দিয়ে।

গিরিজাপ্রসন্নের পিতা মোহিনীমোহন চক্রবর্তী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক। একই সময়ে নদীয়া জেলার একই অঞ্চলে দুজনের জন্ম। দুজনেই আবার সরকারি চাকরিতে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

মোহিনীবাবুর জন্ম হয়েছিল ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কুমারখালির কাছে এলাঙ্গি গ্রামে। মেধাবী ছাত্র হিসেবে সেকালের সর্বোচ্চ পরীক্ষা সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন। বাইশ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর মোহিনীবাবুর উপর বৃহৎ পরিবারের ভার এসে পড়লো, কারণ তিনিই ছিলেন পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ভালো চাকরি পাওয়ার অপেক্ষা করতে না পেরে মোহিনীবাবু প্রথমে কুষ্ঠিয়াতে ১৮ টাকা মাইনেতে কেরানীর কাজ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে সুযোগ পেয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটশিপ পরীক্ষা পাস করে বিচারক হয়েছিলেন। পেনসন নেবার সময়ে ভাগলপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি বিচারে ন্যায়পরায়ণতার জন্যে প্রভূত সুনাম অর্জন করেছিলেন।

কিন্তু সদ্‌ব্রাহ্মণ ন্যায়নিষ্ঠ সুবিচারক বলে পরিচয় দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এরকম সত্যনিষ্ঠ ভালো লোকের কথা বইয়ে আমরা পড়েছি। আমাদের কাছে মোহিনীমোহনের আসল যে পরিচয় তা হলো বাঙালী হিসেবে বাংলার বস্ত্রশিল্পে তাঁর এবং তাঁর পুত্র-পৌত্রদের অবদান।

রিটায়ার করবার পর ২৫০্ টাকা পেনসনে মোহিনীবাবু সপরিবার সুখে থেকে বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব করেও বাকী জীবন স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারতেন। নিজের মোটা পেনসন তো ছিলই উপরন্তু তখনই মোহিনীবাবুর এক ছেলে গিরিজাপ্রসন্ন উচ্চবেতনের সরকারি চাকরি পেয়েছিলেন এবং আর এক ছেলে রমাপ্রসন্ন সে যুগের পাস-করা এঞ্জিনীয়ার হয়েছিলেন। সুতরাং উচ্চ মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের মতো বাপ-ব্যাটা স্বস্তিতে জীবন নির্বাহ করতে পারতেন।

কিন্তু যত বড় চাকরিই হোক না কেন দাসত্ব যে দাসত্বই—এই বোধ মোহিনীবাবুর অবচেতনে নিশ্চয়ই অনেক আগের থেকেই ছিল। বোঝা যায় স্বাধীন বৃত্তির মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিই তাঁর ঝোঁক ছিল।

একদিকে চিরকাল তাঁর নিজের দেশ কুমারখালির প্রসিদ্ধ হাতের তাঁতের কাপড় বোনা দেখে এসেছিলেন; অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বাঙালীর দেশাত্মবোধের সুযোগ নিয়ে বোম্বাই আহমেদাবাদের ধনকুবের কটন মিল-মালিকদের নির্লজ্জ মুনাফাবাজি দেখে বস্ত্রশিল্প তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। দেখলেন, সস্তায় দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা দিয়ে মিল চালিয়ে বোম্বাই মিলের কাপড় তৈরি করলে দেশের মানুষ সেটাকে মাথায় তুলে নিচ্ছে, অথচ বাংলার তাঁতী বিলিতী সুতোয় কাপড় বুনছে বলে সেই কাপড় বর্জিত হচ্ছে।

সব দিক বিচার করে মোহিনীবাবু ১৯০৫।৬ সালে নিজের সামান্য পুঁজি নিয়ে কুষ্ঠিয়ার বাড়ির উঠানেই চালাঘর তুলে মিল বসালেন। সেটা বড় কথা নয়; কারণ, বম্বেওয়ালাদের লাভের নমুনা দেখে তার থেকে কিছুটা খসিয়ে নেবার জন্যে সে সময়ে আপনি আমিও এই কাজে নেমে পড়তে পারতাম—অবশ্য সঙ্গতিতে কুলোলে। কিন্তু মোহিনীবাবুর ক্ষেত্রে সেকথা প্রযোজ্য ছিল

না। তিনি সংগঠনবাদী মানুষ ছিলেন। তাঁর দেশাত্মবোধে জ্বালা ছিল না। বাস্তববাদীর নীরব কর্মতৎপরতা ছিল। মুনাফা করারও তাঁর কোনো প্রয়োজন ছিল না; কারণ, সে সময়ের ২৫০ টাকা এখনকার ৫০০০ টাকার সমান ছিল। মিহি চালের মন ছিল দু-তিন টাকা আর এক জোড়া র‍্যালি ব্রাদার্সের ফাইন ধুতির দাম ছিল পাঁচ সিকে দেড় টাকা। তাঁর আদর্শে তিনি ছেলেদেরও দীক্ষা দিলেন। বাবার আদর্শে গিরিজাবাবু ভালো সরকারি চাকরিটি ছাড়লেন আর রমাপ্রসন্ন ছাড়লেন এঞ্জিনীয়ারিং। সকলেই লেগে গেলেন শিল্পোদ্যোগে।

চালাঘরে ৮ খানা তাঁত নিয়ে চক্রবর্তী ব্রাদার্সের মিলের উৎপত্তি। অয়েল এঞ্জিন দিয়ে এই তাঁতগুলি চলতো। সুতো কেনা হতো বাজার থেকে। তখন নাকি এই রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির মহিলারাও কর্তা আর ছেলেদের কাপড় বোনবার নানা কাজে সাহায্য করতেন। সূচনায় তাঁদের কল্যাণহস্তের স্পর্শ ছিল বলেই হয়তো সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে দিনে দিনে মিল বড় হতে লাগলো। স্থানীয় অবস্থাপন্ন বাসিন্দারা এই সময়ে মোহিনীবাবুকে অনুরোধ করলেন যে লিমিটেড কম্পানি করে তাঁদেরও এই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার করে নেওয়া হোক। মোহিনীবাবু রাজী হলেন। ১৯০৮ সালে কম্পানি রেজিস্ট্রি হলো। আগে নাম ছিল চক্রবর্তী ব্রাদার্স, এখন মোহিনীবাবুর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে তার নাম হলো মোহিনী মিলস লিমিটেড। যেটাকে লোকে ভেবেছিল এক পেনসনারের মতিভ্রম, তাকেই তারা এগিয়ে এসে বরণ করে নিলো।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে মিলের কাজ চালানো শিক্ষার জন্যে মোহিনীবাবুর নির্দেশে গিরিজাবাবু ও রমাপ্রসন্নবাবু কিছু দিনের জন্যে বম্বে আহমেদাবাদের মিলগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে আসতে গেলেন। সেখানে তাঁদের সঙ্গে কেশবলালজী মেটা নামে এক বিশিষ্ট টেক্সটাইল এক্সপার্টের পরিচয় হলো। এই কেশবলালজী ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত বাঙালী উইভিং মাস্টার আর স্পিনিং মাস্টারদের গুরু। তাঁর বাঙালী শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন প্রধান—শ্রীরামপুরের স্বর্গীয় ললিতমোহন ঘোষাল, ঢাকেশ্বরী কটন মিলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সূর্যকুমার বসু, এবং আরও পাঁচজন যাঁরা কে কোথায় আছেন সে তথ্য সংগ্রহ করতে পারলাম না। তাঁদের নাম যতীন মজুমদার, মহেন্দ্র চক্রবর্তী এবং প্রভাত ব্যানার্জি, শ্রীশ রায় ও উপেন গুপ্ত। গিরিজাবাবুরা ঠিক এই প্রথম শ্রেণীর শিষ্য ছিলেন না বটে, কিন্তু কেশবলালজী তাঁদের কাছেও ছিলেন আচার্য।

গিরিজাপ্রসন্ন ও রমাপ্রসন্নের পরিচালনায় মোহিনী মিলের মাঝারি ও মিহি ধুতি শাড়ি বাঙালীর সমাদর পেলো।

চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মোহিনীর কাপড় বিক্রির ব্যবস্থারও উন্নতি করার দরকার পড়েছিল। তখন নাকি কেশবলালজী আহমেদাবাদ থেকে পরামর্শ দিলেন যে ওয়াদিলাল শাহ নামে মার্কেটিং বিষয়ে দক্ষ এক গুজরাটী ব্যবসায়ীকে কুষ্ঠিয়াতে নিয়ে গিয়ে বিক্রির ভার তার ওপর দিতে। মোহিনীবাবু কেশবলালজীর কথা মেনে নিলেন। ওয়াদিলালজী বছর দুই-তিন চমৎকার কাজ দেখাবার পর মোহিনীবাবু খুশী হয়ে তাঁকে মোহিনী মিলস লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেন্টস চক্রবর্তী ব্রাদার্সের সামান্য অংশীদার করে নিলেন।

হয়তো মোহিনী মিলের এতে ভালোই হলো, কিন্তু মিলের শেয়ারহোল্ডার সম্পূর্ণ বাঙালী হলেও পরিচালক কম্পানি আর পুরোপুরি বাঙালী রইলো না। অতএব, কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক দু একটা কথা বাদে এর পর থেকে এই প্রবন্ধে মোহিনীর কথা আমি আর বলতে পারবো না।

১৯২১ সালে প্রায় ৮৪ বছর বয়সে মোহিনীবাবুর মৃত্যু হলো। এবার শুরু হলো গিরিজাবাবুর যুগ।

শ্রদ্ধেয় গিরিজাবাবুকে আমি চক্রবর্তী পরিবারে সকলের আগে দেখেছিলাম। বস্ত্রশিল্পের জগতে তখন তাঁর বিশিষ্ট আসন। কিন্তু তাঁর সরল অনাড়ম্বর ব্যবহার দেখে মনে হতো তিনি যেন এক সাধারণ স্নেহশীল বাঙালী গৃহস্থ।

গিরিজাবাবুর মেজো ছেলে তারাপ্রসাদবাবুকে দেখলাম আরও পরে। (তারাপ্রসাদের ডাক নাম বলাই)। সম্ভবত সেটা ১৯৩৮ সাল। তখন তাঁর সঙ্গে আমার প্রায়ই সকালবেলায় শেয়ালদা স্টেশনে দেখা হতো। আমরা ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতাম।

বলাইবাবু অর্থাৎ তারাপ্রসাদ তখন বেলঘরিয়ার ২ নম্বর মোহিনী মিলের নতুন মেশিন ফিট করছেন হাতে-কলমে। ম্যানেজিং এজেন্টের পুত্র হয়েও সে কাজে তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। তারও আগে তিনি নারায়ণগঞ্জে চিত্তরঞ্জন কটন মিলেও মেশিন ইরেকশন শিখে এসেছিলেন। তার মানে, সুবিধে পেলেই তিনি মেশিন চেনবার জন্যে নতুন মেশিন ইরেকশনে হাত পাকিয়ে আসতেন।

যন্ত্রের সঙ্গে তারাপ্রসাদের সেই যে মৈত্রী ঘটেছিল তা আজও বজায় আছে। স্নেহপ্রবণ মালিক যেমন পোষা জন্তুর কণ্ঠস্বরের ওঠাপড়ার তাৎপর্য মুহূর্তে বুঝে নেয়, তারাপ্রসাদ তেমনি তাঁর শ্রীঅন্নপূর্ণা মিলের তাঁতের ঠাস ঠাস মাকুর আওয়াজ এবং মিনিটে দশ বিশ হাজার বার ঘোরা টাকুর শন শন শব্দ শুনেই বলে দিতে পারেন কোথাও কিছু গোলমাল আছে কি না। অন্নপূর্ণার বেশির ভাগ মেশিনকে তিনি চিনতেন জাপানে তাদের জন্মকাল থেকে।

শ্রীঅন্নপূর্ণা গঠনের কথা ওঠবার কয়েক বছর আগে থেকেই গিরিজাবাবুর ছেলেরা ছোট ছোট দু তিনটে ব্যবসা ফেঁদেছিলেন। তাঁদের বউবাজারের বাড়ির একতলায় 'গিরিজা হোসিয়ারী' নাম দিয়ে ছোট একটা গেঞ্জির কল খুলেছিলেন আর ক্যানিং স্ট্রীটে খুলেছিলেন মিল স্টোর্সের কারবার। তা ছাড়া কটন মিল ও হাতে-চালানো তাঁতের জন্যে মাকু তৈরির একটি ছোট কারখানাও স্থাপনা করেছিলেন। এই ব্যবসার 'একজিকিউটিভ হেড' ছিলেন গিরিজাবাবুর সেজো ছেলে দুর্গাপ্রসাদ। তখন তাঁর বয়স ২০।২১ বছর। তাঁকে আবার এই ব্যবসাতেই সাহায্য করতেন তাঁর দুই ভাই উমাপ্রসাদ ও চণ্ডীপ্রসাদ।

ব্যবসাসূত্রে চক্রবর্তীদের সঙ্গে কলকাতায় পুরনো দুটো হোসিয়ারী মিলের (পাইওনীয়ার এবং খিদিরপুর-এর) মালিক শ্রীললিত মুখার্জি ও শ্রীশিবপদ মুখার্জি নামে দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। হোসিয়ারীর অধিকাংশ সুতোই আগে দক্ষিণ ভারত থেকে আসতো আর কিছু আসতো পশ্চিম ভারত থেকে। দাম ছিল খুব চড়া এবং ভালো সুতো দুষ্প্রাপ্য ছিল।

ললিতবাবুরা একদিন গিরিজাবাবুকে প্রস্তাব করলেন যে, তাঁকে পুরোভাগে রেখে একটা হোসিয়ারীর সুতো তৈরির মিল এখানে খোলা হোক। গিরিজাবাবুর তখন এমন একটা চোখের অসুখ হয়েছিল যে তিনি ভালো করে দেখতে পেতেন না আর বাড়ি থেকে বেরোতে পারতেন না।

মুখার্জিদের সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে দুর্গাপ্রসাদও উপস্থিত ছিলেন। সব শুনে তাঁর মনে হলো যে, বাজারে চক্রবর্তীদের, বিশেষ করে গিরিজাবাবুর যখন এতই ক্রেডিট, তখন তাঁরা তো অন্যের সহায়তা না নিয়ে নিজেরাই একটা সুতোকল গড়ে ফেলতে পারেন। সেই রাত্রেই তিনি বাবার কাছে প্রস্তাবটা পাড়লেন।

এর পরের ঘটনাপ্রবাহ খুব দ্রুত। ১৫ অগস্ট, ১৯৪৫-এ গিরিজাবাবু ও তাঁর পাঁচ ছেলে মিলে শ্রীঅন্নপূর্ণা কটন মিলস লিমিটেডের কম্পানি রেজিস্ট্রি করলেন। কিন্তু যেহেতু ললিত মুখার্জি ও শিবপদ মুখার্জি মশায়রা প্রস্তাবটির উত্থাপন করেছিলেন, সেইজন্যে তাঁদের দুজনকেও সঙ্গে রেখে অন্নপূর্ণার ম্যানেজিং এজেন্সী কম্পানির নাম রাখা হলো চক্রবর্তী-মুখার্জি প্রাইভেট লিমিটেড। শ্রীঅন্নপূর্ণার প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন গিরিজাবাবু। তাঁর মৃত্যুর পরে দেশবরেণ্য স্বর্গীয় নির্মলচন্দ্র চন্দ্র মশায়ও ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন।

শেয়ার বিক্রি শুরু হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই ১৬।১৭ লক্ষ টাকার বিক্রি হয়ে গেল। যুদ্ধের বাজারে নানা নিয়মকানুন হওয়াতে সেই সময়ে ইমপোর্টেড মেশিনারী লাগবে এমন কোন ফ্যাক্টরি বসাতে গেলে সরকারি লাইসেন্স লাগতো। টেক্সটাইল কমিশনারের বোম্বাই হেড অফিস থেকে মেশিনারী আমদানির কোটা বণ্টন করা হতো।

হঠাৎ দেখা গেল অবিভক্ত বাংলার সুরাবর্দী সরকার বাংলা দেশের কোটা থেকে শ্রীঅন্নপূর্ণাকে লাইসেন্স রেকমেন্ড করতে নারাজ। কুষ্ঠিয়া থেকে নির্বাচিত এম. এল. এ. সামসুদ্দীন সাহেব সুরাবর্দী গভর্নমেন্টে মন্ত্রী ছিলেন। চক্রবর্তীদের হয়ে তাঁর অনুরোধও সুরাবর্দী সাহেব ঠেললেন।

প্রমাদ গুনে গিরিজাবাবু শেয়ার বিক্রি বন্ধ করতে আদেশ দিলেন। মেশিনের অভাবে মিল যদি চালুই না করা যায় তবে আর শেয়ার বেচে কী হবে? বেচা শেয়ারের টাকাও তো ফেরত দিতে হবে!

সেই শেয়ার বিক্রি বন্ধ করাতে মধ্যবর্তী কালে যদিও অন্নপূর্ণার কর্তাদের খুব বিপদে পড়তে হয়েছিল, কিন্তু আখেরে যে তা কত ভালো ফল দিয়েছে সেটা বোঝা যায় প্রবন্ধের গোড়াতে ব্যালেন্স-শীটের হিসেবগুলির তাৎপর্য থেকে।

তখনকার সলিসিটর জেনারাল সম্প্রতি পরলোকগত স্যার ধীরেন মিত্রের সঙ্গে এঁদের প্রীতির সম্পর্ক ছিল। সলা-পরামর্শ করে স্যার ধীরেনের সাহায্যের জন্য দুর্গাপ্রসাদকে দিল্লীতে পাঠানো হলো। তদানীন্তন ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মেম্বার স্যার আকবর হায়দারীর সঙ্গে ধীরেন মিত্র মশায়ের খুব অন্তরঙ্গতা। সুরাবর্দীকে প্রভাবিত করার যোগ্য লোক একমাত্র স্যার আকবর হায়দারী।

ধুতি আর হাফ শার্ট পরা ২৫।২৬ বছরের ছেলে দুর্গাপ্রসাদ ১৯৪৫।৪৬ সালের ব্রিটিশ-শাসিত দিল্লীর সেক্রেটারিয়্যাটে দুরু দুরু বক্ষে ডাকসাইটে সিভিলিয়ান আকবর হায়দারী সাহেবের দপ্তরে ঢুকলেন স্যার ধীরেনের সঙ্গে।

ধীরেন মিত্র হায়দারীকে বললেন, "আকবর, দিস ইয়ংম্যান ইজ অ্যাজ মাচ এ ফ্রেন্ড টু মী অ্যাজ ইউ আর। দেখ, যদি একে সাহায্য করতে পারো।" হায়দারী দুর্গাপ্রসাদের ইতস্তত ভাব দেখে অভয় দিয়ে সোফাতে নিজের পাশে বসতে বললেন। দুর্গাপ্রসাদের বক্তব্য শুনে বললেন, "সুরাবর্দী দিল্লীতে আছে তা জেনেই নিশ্চয়ই তুমি এখানে এসেছো: সে একটু পরে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তুমি ওই পাশের ঘরে আমার সেক্রেটারির কাছে গিয়ে বসো। যথাসময়ে তোমাকে ডেকে পাঠাবো।"

ঘণ্টাখানেক পরে ডাক পড়লো। তখন হায়দারীর ঘরে সুরাবর্দীও উপস্থিত। ইতিমধ্যে স্যার আকবর সুরাবর্দীকে দিয়ে মেশিনের লাইসেন্স কবুল করিয়ে নিয়েছেন। দুর্গাপ্রসাদের কাছে শ্রীঅন্নপূর্ণার নাম শুনেই সুরাবর্দী চমকে উঠলেন; কিন্তু হায়, তখন আর তাঁর 'না' বলার উপায় নেই। লাইসেন্স মঞ্জুর হয়ে গেল।

তা তো হলো। ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি ছাড়িয়ে শ্যামনগরে রেললাইনের পূর্বদিকে জমিও কেনা হয়ে গেছে ১৩৬ বিঘা; কিন্তু বাড়ি তৈরী আর মেশিনের অর্ডার? যদিও ইঁট আর বালির ব্যাপারে চক্রবর্তীদের খুব সুবিধে হয়ে গিয়েছিল অদ্ভুতভাবে—যে জায়গায় সেই ১৩৬ বিঘা জমিটা কিনেছিলেন তার আদি নাম গড় শ্যামনগর। কোন্ এক রাজা বর্গীদের উৎপাতের ভয়ে সেখানে কবে যেন পরিখা খুঁড়ে মাটির ঢিবির দেওয়াল করে পুরোপুরি একটা দুর্গ তৈরি করেছিলেন। সেই ঢিবির মাটিতেই কারখানার সমস্ত ইঁট পোড়ানো হলো। আর এক খাশা ব্যাপার হলো বালি পাওয়া নিয়ে। ওই জমিরই এক প্রান্তে একটা মজা নদী ছিল; সেখানে পাওয়া গেল ভালো কোয়ালিটির বালি। (চক্রবর্তীদের কপাল দেখুন! তাঁরা একেবারে ডিম-ভরা কই, অথবা আরও একটু চড়িয়ে বললে, সবৎসা গাভী পেয়ে গেলেন)।

কিন্তু লোহা আর সিমেন্ট? তার অভাবে ফ্যাক্টরি তৈরি শেষ না হওয়ার দরুন জাপান থেকে মেসিন এলে পর বাক্সে প্যাক করা অবস্থায় কিছুদিন বাইরে ফেলে রাখতে হয়েছিল। যাই হোক, নিজেরা ইঁট তৈরি করে খরচ তো অনেক বাঁচলোই, উঁচুনীচু জমিটাও সমান হয়ে গেল।

মেশিনের ব্যাপারেও মহাসমস্যা। ইংল্যাণ্ডের মেশিন বিক্রেতারা বললো যে অর্ডার দেবার ৫ বছর পরে মেশিন ডেলিভারি হবে, আর বিলিতী স্পিণ্ডল আর তাঁতের দামও তখন খুব বেশি। তারাপ্রসাদ বাবুদের সামর্থ্য তো মোট ১৭ লক্ষ টাকার। হঠাৎ শেয়ার বিক্রি বন্ধ হয়ে যাবার পরেই লাগলো ১৯৪৬ অগস্টের 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' মার্কা দাঙ্গা। তারপরেই দেশ বিভাগ, বাজার একেবারে মাটি হয়ে গেল। শেয়ার আর বিক্রি হয় না।

এমন সময়ে ১৯৪৮-এ বিজিত জাপানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মার্কিন সেনাপতি ম্যাকার্থার জাপানীদের পুনর্বাসন ও বিধ্বস্ত জাপানী শিল্প-বাণিজ্যের পুনর্গঠন আরম্ভ করালেন। ভারতবর্ষ ১ লক্ষ জাপানী স্পিণ্ডলের 'কোটা' পেলো। জাপানী মেশিনের দাম বিলিতীর অর্ধেকের চাইতেও কম। তাই চক্রবর্তীরা তোড়জোড় করে জাপানী 'তোয়োদা' মেশিনের অর্ডার দিলেন।

ইতিমধ্যে গিরিজা চক্রবর্তী মশায়ের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হয়ে ১৯৪৭ সালের গোড়ায় ৭১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হলো। বাংলার শিল্প ও বাণিজ্য জগতের তো একটা ক্ষতি হলোই, পিতৃবিয়োগের জন্য গিরিজাবাবুর ছেলেদের শিল্প-প্রচেষ্টায় এক ভয়াবহ পরিস্থিতি দাঁড়ালো। তাঁরা যেন সব রকমে অনাথ হলেন।

চক্রবর্তী-ভ্রাতারা খুব সন্তর্পণে এগোতে লাগলেন। বড় ভাই দেবীপ্রসাদবাবু কুষ্ঠিয়ার ১নং মোহিনী মিলেই বেশী সময় কাটাতে বাধ্য হন। তারাপ্রসাদ জাপান গেলেন তোয়োদা কম্পানির কাছ থেকে মেশিন বুঝে নিতে। কাজেই কলকাতা অফিসের কাজের ভার পড়লো ছোট তিন ভাইয়ের ওপর। অফিস বলতে সুতোপটির ক্রস স্ট্রীটের মিল স্টোর্সের ছোট অফিস। আড়ম্বর, ঢাকঢোল নেই। চক্রবর্তীদের সাফল্যের মূলে হলো এই মিতব্যয়িতা। তাঁরা কখনো প্রয়োজনের বাইরে খরচ করেননি, করেনও না।

কিছু কিছু করে মেশিন এসে পুরো ডেলিভারি নেবার আগেই দেখা গেল ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স শেষ।

দুর্গাপ্রসাদকে আমি নিজে ১৯৪২।৪৩ সাল থেকে ভালো করে চিনি। তাঁর প্রিয়দর্শন চেহারা, চোখে হাসি আর মিষ্টভাষণের জন্যে তিনি বিশ্বপ্রিয় ছিলেন। ধনকুবের কুমার প্রমথ রায় বা কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় নরেন্দ্রচন্দ্র দত্তই হোন, সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত রবিশঙ্করই হোন, সমাজের নানা স্তরের ব্যক্তি তাঁকে একান্ত আপনার লোক মনে করে এসেছেন। এখনো বয়সে পঞ্চাশের বছর দুই নীচে, কিন্তু ইতিমধ্যেই দুর্গাপ্রসাদ বহু সরকারী ও জনহিতকর সংস্থার মাননীয় সভ্য। তিনি রিহ্যাবিলিটেশন ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের চেয়ারম্যান, স্টেট ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর, স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের সদস্য, চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সেক্রেটারি এবং কিছুদিন আগে ছিলেন কলকাতার শেরিফ।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং-এর চেয়ারম্যান নরেন দত্ত মশায় দুর্গাপ্রসাদকে ছেলের মতো ভালোবাসতেন। সপ্তাহে দু চারবার তাঁকে না দেখলে নরেনবাবু দুর্গাবাবুকে ডেকে পাঠাতেন।

দফায় দফায় মেশিন আসছে অথচ তা খালাস করবার টাকা নেই। পাগলের মতো ছোটাছুটি করে দুর্গাবাবুর আর নরেনবাবুর কাছে যাওয়াই হয়ে ওঠে না। ক'দিন দেখা না পেয়ে নরেনবাবু দুর্গাপ্রসাদকে বাড়ীতে ডেকে পাঠালেন। চিরসঙ্গী গড়গড়াটির নল ঠোঁটে গুঁজে নরেনবাবু বসেছিলেন। দুর্গাবাবুর চেহারা দেখে বললেন, "দেখা সাক্ষাৎ নাই, মুখ ব্যাজার, কী হইলো?" দুর্গাবাবু পরিস্থিতির বিবরণ দিয়ে বললেন, "আপনারা থাকতে আমাদের এমন বিপদে পড়তে হয়?" নরেনবাবু তাঁর পূর্ববঙ্গের ভাষায় বললেন, "আজই আমার অফিসে তোমার ভাইরা সকলে আইস। দেখা যাউক কি করা যায়।"

দিন দুয়েকের মধ্যে কোনো কিছু বন্ধক না রেখে দুর্গাবাবুরা পাঁচ ভাই কেবলমাত্র হ্যাণ্ডনোট সই করে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং থেকে ৫ লক্ষ টাকা ধার পেয়ে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন।

নরেনবাবুর কথা বলতে বলতে দুর্গাপ্রসাদের গলা আবেগে একটু কেঁপে গিয়েছিল।

কিছুদিন সহজভাবেই কাজ চললো। অনেক মেশিন জাহাজ ঘাটে আটকে ছিল। টাকা পেয়ে চক্রবর্তীরা সে সব ছাড়িয়ে আনলেন।

কিন্তু দেখতে দেখতে সেই ৫ লক্ষ টাকাও গেল ফুরিয়ে। আবার সেই অনটন। ১৯৪৮-এর শেষ ভাগ থেকে বাঙালী ব্যাঙ্কগুলির অবস্থাও কাহিল। দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেও চক্রবর্তীরা আর টাকার যোগাড় করতে পারছিলেন না।

এ যাত্রা নরেন দত্ত মশায়ের ছেলে বটকৃষ্ণ বা বটু দত্ত মশায় (অধুনা ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান), স্বর্গীয় নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, ব্যারিস্টার শ্রীস্নেহাংশু আচার্য, চক্রবর্তীদের নিকট কুটুম্ব স্বর্গীয় নিমাই মৈত্র, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় (এখন শ্রীঅন্নপূর্ণার চেয়ারম্যান) প্রমুখ কয়েকজন অকৃত্রিম বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে চক্রবর্তীরা ভাগ্যকুলের ধনকুবের কুমার প্রমথ রায়ের কাছে যাওয়া স্থির করলেন।

কুমার প্রমথনাথের বাড়ি যেতে দুর্গাপ্রসাদের সঙ্গী হলেন স্নেহাংশুবাবু ও নিমাইবাবু। বটু দত্ত মশায়ও নাকি পরে এঁদের হয়ে প্রমথবাবুকে অনুরোধ করতে গিয়েছিলেন।

দেবদ্বিজের পরম ভক্ত এবং সেকালের জাতিবর্ণ বিচারে নিম্নবর্ণের হিন্দু প্রমথনাথ সকাল বেলাতেই তিন বর্ণশ্রেষ্ঠকে নিজগৃহে পেয়ে কৃতার্থ বোধ করলেন। প্রস্তাব উত্থাপিত হলো— শ্রীঅন্নপূর্ণার যাবতীয় সম্পত্তি বন্ধক রেখে আরও ১০ লক্ষ টাকা চাই। প্রমথনাথ অদৃষ্টবাদী ছিলেন। মোটা একটি পঞ্জিকা সর্বদাই তাঁর কাছাকাছি থাকতো। বিশেষ করে কেউ টাকা ধার চাইলেই পঞ্জিকা খুলে অমৃতযোগ, মাহেন্দ্রক্ষণ, চন্দ্রাষ্টম সব কিছুর বিচার করে অ্যাপ্লিকেশন মঞ্জুর বা নাকচ করতেন। (শুনেছি যাকে ধার দেবার ইচ্ছে থাকতো না, তার বেলায় গুপ্তপ্রেসটি অল্প একটু খুলে অমৃতবল্লী কষায় আর বেদনানাশক মালিশের তৈলের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত এসেই অজুহাত দেখিয়ে মিষ্টি কথায় অপ্রীতিকর কাজটি সেরে ফেলতেন)।

প্রমথবাবু যখন শুনলেন যে, দেবী, তারা, দুর্গা, উমা ও চণ্ডীপ্রসাদ তাঁর খাতক হবেন, তখন যা করে বসলেন তাতে সকলে হতভম্ব। পঞ্জিকা বন্ধ করে রেখে ছেলের বয়সী দুর্গা-প্রসাদকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বসলেন। বললেন, "মায়ের নামে সকলের নাম, আপনাদের কি আমি ফেরাতে পারি?"

সংবিত ফিরে পেয়ে দুর্গাপ্রসাদ সসম্ভ্রমে দূরে সরে গেলেন। এই সেকেলে কুসীদজীবী ধনকুবেরের মানবতা ও সংবেদনশীলতার দিকটির বিবরণ দিয়ে চক্রবর্তীরা বললেন যে সেই সময়ে কুমার প্রমথ রায় মশায় টাকা ধার না দিলে শ্রীঅন্নপূর্ণা কতদূর এগোতে পারতো তা বলা যায় না।

তারাপ্রসাদবাবুদের প্ল্যান ছিল যে তাঁরা স্পিনিং সেকশনটিকে বড় করে কিছু সুতো নিজেদের তাঁতে কাপড় বোনবার জন্যে রেখে বাকীটা বাজারে বেচবেন হোসিয়ারীর সুতো হিসেবে। তাই যেখানে ২৭০০০ স্পিণ্ডল আনানো হয়েছিল সেখানে তাঁতের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল ৩০০ খানার। ওই ৩০০টির মধ্যে এখন ১০১টি জাপানী 'সাকামোটো' অটোম্যাটিক, এবং বাকীগুলি বিলিতী 'হেনরি লিভসে' তাঁত। এক এক তাঁতী একসঙ্গে ৩৩টা করে অটোম্যাটিক 'সাকামোটো' চালায়, মানে ১০১টি স্বয়ংক্রিয় তাঁতে মাত্র তিনজন তাঁতী কাজ করে। আর এক এক তাঁতী ৪টে করে 'লিভসে'-র সাধারণ তাঁত চালায়।

আমাদের সদ্য স্বাধীন ভারত সরকারের শিল্পমন্ত্রকের কাছ থেকে চক্রবর্তীরা কিন্তু

১৫০টি 'সাকামোটো' অটোম্যাটিক কেনবার অনুমতি চেয়েছিলেন। সরকার তা দিলেন না; বললেন—যদি বিড়লা ব্রাদার্সের সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া মেশিনারী কম্পানির ৪৮খানা সিমকো-অটোম্যাটিক চক্রবর্তীরা কেনেন তাহলে ১০১টা জাপানী তাঁত আমদানি করতে দেওয়া হবে। বাধ্য হয়ে তাঁরা সেইভাবে অর্ডার দিলেন। সেদিন আমি অন্নপূর্ণা মিলে গিয়ে দেখলাম পুরোদমে চালু 'সাকামোটো' অটোম্যাটিকের পাশে ৪৬টি সিমেকো চটের থলে মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। বলাইবাবু বললেন যে, তাঁতগুলি খুব মজবুত নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে বন্ধ হয়, মট মট করে পার্টস ভাঙে। সিমকোর কর্তাদের কাছে কিছু বলতে গেলে তাদের মুখে একই অভিযোগ, "আপলোগ মেশিন চালানা নাহি জানতা।"

সরকারি স্নেহপুষ্ট সিমকো বাছাদের তাই বলাইবাবু এতদিন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন। এখন ৪৮টার মধ্যে দুটো তাঁতের স্বয়ংক্রিয়তার 'ভ্যাসেক্টোমি' করে সাধারণ তাঁত হিসেবে চালাতে চেষ্টা করছেন। যদি সুবিধে না হয় তো আবার বন্ধ করে রাখবেন। এইভাবে অন্নপূর্ণার লাখ পাঁচেক টাকার মেশিনের উৎপাদনী শক্তি নষ্ট হচ্ছে। সারা ভারতে এইরকম কত মিলেই কত নষ্ট হচ্ছে, কে জানে! দেখুন দেখি, রাজনৈতিক হাওয়া পালে লাগিয়ে বাণিজ্যতরী ভাসাতে পারলে কেমন ওঁচা মালও বন্দরে গঞ্জে চালানো যায়! অবশ্য শুনেছি যে এখন জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে সিমকোর তাঁতের অনেক উন্নতি হয়েছে।

বাঙালী কটন মিলের উৎপাদন শক্তির অবক্ষয়ের চূড়ান্ত উদাহরণ পেলাম এখান ওখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। আমি যা হিসেব পেয়েছি তা থেকে দেখছি যে, কতকগুলি বাঙালী মিলের মালিকানা হাতবদল হয়ে অবাঙালীর কব্জায় চলে যাবার পর বাংলাদেশে এখন খাঁটি বাঙালী মিল আছে ১৩টি। এই তেরোটির মধ্যে ৬টি একেবারে বন্ধ হয়ে আছে, আর ৫টি কোনোরকমে চলছে।

কেবলমাত্র দুটি মিল নাকি ভালো চলছে। শ্রীঅন্নপূর্ণার কথা তো বলছিই, এবং আর একটি হলো কোলাঘাটের কাছে অনন্তপুর টেক্সটাইলস লিমিটেড। সেই মিলে ২২৪২৪টি স্পিণ্ডল আছে। তার মানে সম্পূর্ণভাবে স্পিনিং মিল। শ্রমিক কাজ করে ৭৫০ আন্দাজ। এই মিলের কর্ণধার হলেন দুই ভাই শ্রীমুরারিমোহন ও শ্রীকিশোরীমোহন মান্না।

বি, সি. নান অ্যাণ্ড ব্রাদার্সের বেঙ্গল ফাইন স্পিনিং অ্যাণ্ড উইভিং মিলস লিমিটেডের দুটি মিল আছে। তাঁদের কোন্নগরের মিলে ২৪৮০০ স্পিণ্ডল চালায় ১০৫০ জন শ্রমিক আর কল্যাণীর কাছে যে মিলটি আছে তাতে স্পিণ্ডল আছে ৫৩০০টা আর শ্রমিক ১৭০জন।

বাঙালীর প্রাচীনতম মিল বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের ৩৭০০০ স্পিণ্ডল ও ৯৩৫টি তাঁত আছে। কর্মিসংখ্যা প্রায় ২৫০০।

অচল মিলগুলি নিয়ে বাংলাদেশে কটন মিলের মোট সংখ্যা ৩৯। সেগুলির বিষয়ে সামান্য কিছু পরিসংখ্যান নীচে লিপিবদ্ধ করছি :—

কেবল স্পিনিং	কম্পোজিট	মোট স্পিণ্ডল	মোট তাঁত	গড়ে মাসিক সুতো উৎপাদন
২০টি	১৯টি	৮,৮৫,৫২৬	১০,১৭০	৩৭,৬৭,০০০ কিলো
				গড়ে মাসিক বস্ত্র উৎপাদন
				১,৭৩,০২,০০০ মিটার

(এ ছাড়াও বাংলাদেশে অসংখ্য পাওয়ার লুম ফ্যাক্টরি আছে। তাদের বস্ত্র উৎপাদনের সঠিক পরিসংখ্যান যোগাড় করা সম্ভব নয়)।

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কল্যাণী স্পিনিং মিলস লিমিটেডের নামও উল্লেখযোগ্য। এর সমস্ত শেয়ারই রাজ্য সরকারের হাতে। এই সংস্থার অধীনে দুটি মিল আছে—৫০০০০ স্পিণ্ডল বিশিষ্ট কল্যাণী উপনগরের ইউনিট এবং ২৫০০০ স্পিণ্ডল বিশিষ্ট গোমো-হাবড়ার অশোকনগর ইউনিট। দুটি মিলের মোট উৎপাদন আপাতত ১৬ লক্ষ কিলোগ্রাম আন্দাজ। নতুন মিল অশোকনগর ইউনিট পুরো চালু হলে আনুমানিক আরও ৮ লক্ষ কিলো সুতোর উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ভাগাভাগি করে দুই মিলে মোটা, মাঝারি ও মিহি সুতো তৈরি হয়। সেই সুতোর ক্রেতা হলো আমাদের ধনেখালি, ফরাসডাঙ্গা ও শান্তিপুরের তাঁতী, পাওয়ার লুম ফ্যাক্টরি এবং হোসিয়ারী মিল। দুই মিলের শ্রমিক সংখ্যা আন্দাজ ২০০০। ১৯৬২-৬৬ এই ৫ বছরে সংস্থার গ্রোস লাভ ২ কোটি এবং মোটা অবক্ষয় বাদ দিয়ে নীট লাভ প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা হয়েছে। আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানে লাভ, তা আবার এত ভালো লাভ, পরিচালনার কৃতিত্ব বলতে হবে। এর জন্যে আমরা কল্যাণী স্পিনিং এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীরামরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর অধীনস্থ কর্মিবৃন্দকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। পতিত জমিতে আবাদ করে সোনা ফলানোর এটা একটা উল্লেখ্য উদাহরণ নিশ্চয়ই।

যে-কটা বাঙালী মিল একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেগুলিতে তাঁত আছে ১৪২৮ এবং স্পিণ্ডল আছে ৯,১৫০৪৮। বন্ধ হওয়াতে যে শ্রমিকেরা বেকার হয়েছেন তাঁদের সংখ্যা ৬৫০০।

এইসব তথ্য উদ্ধারের পর কারণ অনুসন্ধানের জন্যে আমি 'বেঙ্গল মিলওনার্স' অ্যাসোসিয়েশনে'র সেক্রেটারি শ্রীসুবিনয় ভট্টাচার্যের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি যে যে বিশেষ কারণগুলির উল্লেখ করলেন তাও এখানে মোটামুটি সাজিয়ে দিচ্ছি :—

(১) আমরা তুলোর জন্যে পরনির্ভর—পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত থেকে তুলো আনতে আন্দাজ ১৮০ কিলোর এক একটা গাঁট বাবদ রেল-ভাড়া ৫০, টাকা করে বেশী লাগে। তাই বোম্বাই আহমেদাবাদের চাইতে আমাদের সুতোর পড়তা বেশী হয়।

(২) বাঙালী মিলগুলো সবেতেই কোরা ধুতি শাড়ি ও মার্কিন তৈরি হয়। তাতে লাভ যদি হয়ও তো তা খুবই সামান্য। প্রোসেসিং অর্থাৎ ডাইং, ব্লীচিং, মারসেরাইজিং ও স্যানফোরাইজিং করবার যন্ত্রপাতি না থাকলে মোটা লাভ করা অসম্ভব।

(৩) যন্ত্র আধুনিকীকরণে যে অর্থের প্রয়োজন, চোদ্দ আনা বাঙালী মিলের তা নেই।

(৪) যথেষ্ট কাঁচামাল, তুলো এবং মিলস্টোর্স সময় মতো এবং সস্তায় আমরা কিনে রাখতে পারি না, ওই অর্থাভাবের জন্যে।

(৫) বাঙালী মিল-শ্রমিকরা বুদ্ধিমান ও কর্মদক্ষ, কিন্তু ভ্রান্ত ট্রেড-ইউনিয়নিজমের জন্যে তাঁরা কাজের গতি শ্লথ করে ফেলেন।

অবশ্য এ ছাড়াও আরও কতকগুলি কারণ আছে যার জন্যে বস্ত্রশিল্পে বাঙালী আজ যায় যায়। কিন্তু তা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না। যেসব বাঙালী প্রতিষ্ঠানের

লক্ষ্মীলাভ হয়ে ওঠেনি তাদের অকৃতকার্যতার হেতু নিয়ে আমি পরিতপক্ষে মাথা ঘামাতে চাই না। আমি মৌমাছি হতে চাই—মাছি নয়।

অন্নপূর্ণার ম্যানেজার মনোরঞ্জন ঘোষাল মশাই পুরনো উইভিং মাস্টার। আহমেদাবাদে কাজ শিখে বহু বছর আগে ঢাকার কাছে চিত্তরঞ্জন কটন মিলে অনেক দিন ম্যানেজার ছিলেন। অন্নপূর্ণাতে আছেন ১৯৫০।৫১ সাল থেকে। এখন তাঁর বয়স ৬২ বছর।

মিল প্রাঙ্গণের চীনে ঝাউয়ের অ্যাভিনিউয়ের পাশে সুদৃশ্য দোতলা বাড়ির নীচের তলায় অফিস আর দোতলায় ইন্দ্রপুরীর তুল্য গেস্ট হাউস। অফিস ঘরে বসে তারাপ্রসাদবাবু, মনোরঞ্জনবাবু এবং স্পিনিং মাস্টার শ্রীকুমারেশ রায়ের সঙ্গে শ্রমিক সমস্যা নিয়ে কথা হচ্ছিল। মনোরঞ্জনবাবু বললেন যে, অন্নপূর্ণার ১৯০০ শ্রমিক নিয়ে তাঁরা তিন শিফটের অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার কাজ শান্তিতেই চালিয়ে যাচ্ছেন। কর্মীদের সঙ্গে পরিচালকদের সম্বন্ধ নাকি এই বাজারেও নেহাত মন্দ নয়।

স্পিনিং মাস্টার কুমারেশবাবু চিত্তরঞ্জনে তারাপ্রসাদের সঙ্গে এক ঘরে বাস করে কাজ শিখেছিলেন। মাঝে অন্য দু-একটা মিলে চাকরি করে তারাপ্রসাদের ডাকে শ্রীঅন্নপূর্ণায় এলেন জাপানী মেশিন আসবার সময় থেকে।

"বনজঙ্গলে ঘেরা গড় শ্যামনগরে বলাইদা আর আমি মেশিন ফিট করা শুরু করেছিলাম"—কুমারেশবাবু মিলের ভিতরটা দেখাতে দেখাতে আমাকে এই সব গল্প করছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই শুনলাম যে তারাপ্রসাদ এখন টেক্সটাইল এক্সপার্ট হিসাবে ভারতবিখ্যাত। অন্নপূর্ণা মোহিনীতে তো আছেনই, উপরন্তু মাদ্রাজের হেমলতা কটন মিল, গৌহাটির অ্যাসোসিয়েটেড ইণ্ডাস্ট্রিজের ডিরেক্টর এবং মধ্যপ্রদেশের নিমার কটন মিলের তিনি চেয়ারম্যান। ইতিমধ্যে তিনি দু দফা বেঙ্গল মিলওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিত্বও করেছেন।

শ্রীঅন্নপূর্ণার হোসিয়ারী সুতোর অবশ্য সারা ভারতে খুব আদর এবং কম্পানির বেশী লাভ সেই সুতো থেকেই, কিন্তু এঁদের কাপড়েরও খুব চাহিদা। এঁদের তৈরি 'মার্কিন' জাতীয় কোরা কাপড়ও বছরে ৫০।৬০ লক্ষ টাকার মতো বিদেশে রপ্তানি হয়।

মোট লাভের অঙ্ক দিয়ে তো আমি প্রবন্ধই শুরু করেছি।

চক্রবর্তীদের চার ভাইয়ের অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতাই হলো সমস্ত কিছুর মূলে। প্রোডাকশনে মনোরঞ্জনবাবু ও কুমারেশবাবুকে সহায়তা করেন তারাপ্রসাদ আর কেনাকাটা এবং অন্যান্য কাজে আছেন তাঁর অনুজবর্গ। তুলো ও মিল স্টোর্স কেনার ব্যাপারে ভার আছে ছোট দুই ভাই উমাপ্রসাদ ও চণ্ডীপ্রসাদের ওপর। ডিরেক্টর হওয়া সত্ত্বেও নিজেরাই বাজারে ঘুরে ঘুরে মাল কেনেন। সব সফল ব্যবসারই গোড়ার কথা হলো 'ওয়াইজ পারচেজ'।

একটা মর্মন্তুদ খবর পেলাম। এঁদের বড় ভাই দেবীপ্রসাদ ১নং মোহিনী মিলের দেখাশোনার জন্যে কুষ্ঠিয়াতেই অর্থাৎ পাকিস্তানে থাকতেন। ১৯৬৫ লড়াইয়ের সময় তাঁকে গৃহ-অন্তরীণ করা হয় এবং সেই অবস্থাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অন্তরীণ থাকা কালেই কুচিকিৎসা ও প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই বছর খানেক আগে তাঁর কুষ্ঠিয়াতেই মৃত্যু হয়। সইসাবুদ করা ছাড়া সক্রিয়ভাবে শ্রীঅন্নপূর্ণার কাজ কোনো দিন করেননি, কিন্তু জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের মতো বাকী

চার ভাইয়ের প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা ও স্নেহ পরোক্ষভাবে সকলকে অনুপ্রাণিত করে রেখেছিল।

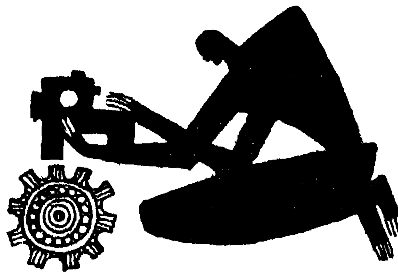
বাঙালীর অধিকাংশ কটন মিলের চরম দুর্দশার পাশে অন্নপূর্ণার পরম সমৃদ্ধির মূল কারণ হলো বস্ত্রশিল্পের অতি দ্রুত প্রগতির সঙ্গে তাল রেখে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। একটা অদ্ভুত দৃশ্য অন্নপূর্ণার স্পিনিং ডিপার্টমেন্টে দেখে এলাম। সুতো ওয়াইন্ডিং ফ্রেমের ওপরে একটি নাতিবৃহৎ চলমান যন্ত্র ফিট করা আছে। যন্ত্রটি (বার্বার কোলম্যান স্পুলার) সারাক্ষণ চালু ফ্রেমের ওপরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—লম্বা ফ্রেমের এ-পাশ থেকে ও-পাশ। নলির সুতো ছিঁড়ে গেলে জুড়ে দিচ্ছে অথবা অকেজো নলি বদলে নতুন নলি লাগিয়ে দিচ্ছে। কাছাকাছি লোকজন প্রায় নেই-ই। একে অটোম্যাটিক বললে ভুল হবে, এ হলো প্রায় অটোমেশন।

এণ্ড প্রডাক্ট-এর অর্থাৎ তৈরী মালের পড়তা কম হয়ে প্রতিষ্ঠানের লাভ হলে সে তো সম্প্রসারণ করে কর্মসংস্থান বাড়িয়েই চলবে। উন্নত দেশগুলিতে তাই হচ্ছে। তাতে তাদের জাতীয় সম্পদ সর্বতোভাবে বেড়েই চলছে।

প্রধানত আধুনিকীকরণে অবহেলাই হলো বাঙালীর অধিকাংশ মিলের শোচনীয় অবস্থার কারণ। ৬৫০০ কর্মী বেকার হলো; তার মানে প্রাক্-লুপ্ত পরিবারে গড়ে ৫ জন করে মোট ৩২৫০০টি মুখের অন্ন মারা গেল। তবুও আমরা সর্বাধুনিক প্রণালী অটোমেশনের মারণ-উচাটনের অভিচার করি কী করে?

রবীন্দ্রনাথের একটি সংক্ষিপ্ত উক্তিতেই বোধ হয় আমাদের অ্যাণ্টি-অটোমেশন তাত্ত্বিকদের উত্তর দেওয়া যায়: "যন্ত্রকে নিন্দা করে যদি নির্বাসনে পাঠাতে হয়, তাহলে যে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সেই নিন্দা রটাই তাকে সুদ্ধ বিসর্জন দিয়ে হাতে লেখার পুঁথির চলন করতে হবে।"

১৩ এপ্রিল, ১৯৬৮





বারো

ইংলিশ চ্যানেলে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মাঝখানে 'চ্যানেল আইল্যান্ডস' নামে চারটি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। দ্বীপের অধিবাসীরা ফরাসীভাষী হলেও ইংল্যান্ডের প্রজা। এই চারটির মধ্যে একটি দ্বীপের নাম গার্নজি এবং একটির নাম জার্সি। আমাদের কাছে এই দুই দ্বীপের বিশেষত্ব হল এই যে, খেলার সময়ে আমরা যে জার্সি পরি এবং যে গেঞ্জি প্রত্যহ পুরুষরা গায়ে দিই, সেই দুটি পরিধেয়র জন্ম হয়েছিল যথাক্রমে ১৮৩৬ এবং ১৮৫১ সালে, ওই দুই দ্বীপের বাসিন্দাদের রুচি অনুযায়ী। তারও প্রায় তিনশো বছর আগে নাকি এক রকমের জার্সি ছিল কিন্তু সে ইতিহাস একটু ধোঁয়াটে। উনবিংশ শতাব্দীতে দ্বীপবাসী মহিলারা এইসব জামা বোধ হয় হাতেই বুনতেন।

গত শতাব্দীর বিলেত-ফেরতরা সিংগলেট অর্থাৎ গেঞ্জি পরতেন; বিলেত থেকে আমদানি করে ধনীরাও কেউ কেউ গেঞ্জি পরতেন বলে শুনেছি। কিন্তু বাঙালী, তথা ভারতবাসী, পুরুষের অন্তর্বাস বলতে ছিল ফতুয়া। মধ্যবিত্ত ও গরীব লোকেরা যদিও অনেকেই ফতুয়া পরে বাইরেও বেরোতেন, ধনীরা বাড়ির বাইরে গেলে তার উপরে চড়াতেন চোগা-চাপকান জোব্বা অথবা পাঞ্জাবি, নয় তো কোট।

বাংলা দেশে গেঞ্জি তৈরির প্রচলন সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য আহরণ করা গেল তা-ই এবারে বলি। কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভূকৈলাসের রাজাদের এক দেওয়ান ছিলেন, নাম অন্নদা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৮৮৬।৮৭ সালে কলকাতার যাদুঘরের সামনে মহা সমারোহে এক শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল—ইণ্টারন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল একজিবিশন। অন্নদাবাবু সেই প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে মোজা গেঞ্জি তৈরির মেশিন দেখে এলেন এবং সঙ্গে আনলেন ব্রিটিশ মেশিন বিক্রেতা আই. এল. বেরিজ-এর দু' একটি ক্যাটালগ। সেই কাগজপত্র ভালো করে পড়ে দেখবার পর অন্নদাবাবু একটা গেঞ্জি ও মোজা তৈরির কল স্থাপনা করার সংকল্প করলেন।

বছর খানেকের মধ্যে বিলেত থেকে বেরিজ কম্পানির দুটি হস্তচালিত নিটিং মেশিন

গোপাল হোসিয়ারী
যাদবপুর কলোনী
কলিকাতা—৩২

১৩

আনিয়ে নিজের বাড়িতে ফিট করে মোজা গেঞ্জি তৈরি আরম্ভ করলেন। অন্নদাবাবু ও তাঁর গৃহিণী দুজনেই নাকি স্বহস্তে সেই মেশিন চালানো শিখেছিলেন।

১৮৯৩ সালে ওরিয়েণ্টাল হোসিয়ারী নাম দিয়ে অন্নদাবাবু একটি লিমিটেড কম্পানি করে ফ্যাক্টরির আয়তন অনেক বাড়ালেন। কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা কলকাতার সেদিনের সব ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্সের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ালেন। বিলিতী হোসিয়ারীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেশী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে, পরে নিজেদের দেশের তৈরি মাল বিক্রি ব্যাহত হবার ভয়ে তাঁরা ওরিয়েণ্টালের মাল বিক্রি করতে রাজী তো হলেনই না, উপরন্তু নানা বাধার সৃষ্টি করে ফ্যাক্টরিটিকে অচল করে দিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আবার ওরিয়েণ্টালকে পুনরুজ্জীবিত করা হলো, কিন্তু অন্নদাবাবু তখন পরলোকে। পুনরুজ্জীবনের ভার নিলেন তদানীন্তন বগুড়ার নবাব সাহেব এবং পাটনার দীপনারায়ণ সিংজী। সেকালের জমিদারের ব্যবসা, তাই বেশী দিন চললো না। ১৯০৮ সালে শ্রদ্ধেয় ভূপেন বসু সলিসিটর মশায় ওরিয়েণ্টালের মেশিনারী কিনে নিয়ে বেঙ্গল হোসিয়ারী নাম দিয়ে আবার সেগুলি চালালেন। এবারেও একই হাল; কিছুদিন চলে আবার বন্ধ হলো।

কিন্তু অনন্তযৌবনা নগরবধূর মতো ওরিয়েণ্টালের মেশিনারীর আদর আর কমে না। কিছুদিন বন্ধ থাকার পরে অন্নদাবাবুর সেই মেশিনারীই এবার গেল হাওড়ায়। আমাদের ছেলেবেলার 'পারজোয়ার' হোসিয়ারী ফ্যাক্টরি এখন হলো এর বল্লভ।

১৯০৮।০৯ সালে শিল্পে অনভিজ্ঞ কোনো কোনো বাঙালী ভদ্রলোক দুমদাম করে কতকগুলি নিটিং মেশিন আনালেন। কিন্তু দরকার মতো সুতো পাওয়া যাবে কিনা তার খোঁজ খবর আগে করে না নেবার জন্যে অধিকাংশ ফ্যাক্টরির মালিকরা সুতোর অভাবে বেশীদিন সেগুলি চালু রাখতে পারলেন না।

১৯১০ সাল আন্দাজ পাবনাতে 'শিল্প সঞ্জীবনী লিমিটেড' নামে একটি ফ্যাক্টরি স্থাপিত হলো আর ১৯১২।১৩ সালে গেঞ্জি মোজা তৈরি শুরু হলো ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে। এই দুই অঞ্চলের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছিল পাবনার কারখানাগুলি। কলকাতায় অবশ্য ততদিনে প্রায় ৩০টি ফ্যাক্টরি হয়ে গেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কিন্তু প্রায় সব গেঞ্জিকলই একে একে বন্ধ হয়ে গেল বিলিতী আর মার্কিন সুতোর আমদানির অভাবে।

লড়াই মিটে যাবার পর ১৯১৯ সাল থেকে সমস্ত ফ্যাক্টরিগুলিই আবার চালু হয়ে ১৯২১ সালে হোসিয়ারী-শিল্প সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করল। তার কারণ হল, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের পাট-চাষীর পৃষ্ঠপোষকতা। কাঁচা পাটের দাম মনকরা ৪ টাকা থেকে বাড়তে বাড়তে ৪০।৪২ টাকায় পৌঁছল। কৃষকদের ঘরে ঘরে সচ্ছলতা ও আনন্দের জোয়ার। চিরকাল যারা নগ্ন কলেবর ছিল, তেনা পরে আধপেটা খেয়ে মহাজন আর জমিদারের নৃশংস অত্যাচার সহ্য করত, ক্ষণস্থায়ী হলেও তাদের এবার একটু স্বস্তি, একটু আনন্দের দিন এল। পরনে উঠল পাবনা-নারায়ণগঞ্জের গেঞ্জি।

আমাদের পনেরো বছরের তিনটি পরিকল্পনা চাষীকে অবহেলা করে যদি শ্বেত-হস্তিযূথের বংশবৃদ্ধি না করত, তা হলে আজ শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি কোথায় পৌঁছতে পারত তা উপরের ওই উদাহরণ থেকে নিরেট গর্দভও বুঝতে পারবে। তাও তো সেই ইংরেজের শোষণ ও শাসনের আমলে দেশী শিল্পের জন্যে সংরক্ষণ বা প্রোটেকশনের কোনো সু-ব্যবস্থাই ছিল না; আর দেশে হোসিয়ারীর সুতোও তৈরী হত না।

যিনি আমাকে এই সমস্ত তথ্যের অনেকটাই যোগালেন সেই শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উল্লেখ আমি শ্রীঅন্নপূর্ণার কাহিনীতে করেছি। আটাত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ ললিতবাবু এখন বেঙ্গল হোসিয়ারী ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি খিদিরপুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরির মালিক এবং (সম্ভবত পাঞ্জাবের লুধিয়ানার সমসাময়িক হিসেবে) দেশে হোসিয়ারীশিল্পের অন্যতম পথপ্রদর্শক স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদের পুত্র। খিদিরপুর হোসিয়ারী পুরোনো প্রতিষ্ঠান। ১৯২০ সালে ললিতবাবু এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

খিদিরপুর হোসিয়ারী প্রতিষ্ঠার আগে ও পরে অসংখ্য ছোট-বড় হোসিয়ারী মিল বাঙালী ব্যবসায়ীরা স্থাপন করেছিলেন। প্রত্যেকটির জন্মবৃত্তান্ত ও আনুষঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করে তা আমার এই সীমায়িত প্রতিবেদনে পেশ করা যাবে না। দু'-চারজনের নাম সম্ভবত বাদও পড়ে যাবে। সেইজন্যে আমি সংশিলষ্ট শিল্পপতি এবং পাঠকের কাছে পূর্বাহ্নেই মাপ চেয়ে নিচ্ছি।

বাঙালীর হোসিয়ারী কারখানাগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান যেসব নামের তালিকা পেয়েছি, তা হল—স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র সোম প্রতিষ্ঠিত ঝামাপুকুর হোসিয়ারী, স্বর্গীয় হরিপদ নিয়োগীর কালীঘাট হোসিয়ারী, শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা গেঞ্জির কল শ্রী ডি. এন. বসুর হোসিয়ারী, শ্রীশৈলেন মুখোপাধ্যায়ের দেশবন্ধু হোসিয়ারী, শ্রীশিবপদ মুখোপাধ্যায়ের পাইওনীয়ার নিটিং, শ্রীসাধন চট্টোপাধ্যায়ের ক্যালকাটা টেক্সটাইলস, শ্রীশরৎ কুন্ডুর 'চেরী', শ্রীদুর্গাদাস পালের 'এম্‌প্রেস', শ্রীশান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান শ্রীপতি হোসিয়ারী প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রীসত্যেশ্বর সামন্তের অন্যতম প্রতিষ্ঠান সিদ্ধেশ্বরী হোসিয়ারী এবং শ্রীকেতকীরঞ্জন দন্ডের 'পি-থ্রি' মার্কা মোজা-গেঞ্জির প্রতিষ্ঠান মীরা নিটিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ প্রভৃতি। এগুলি ছাড়াও উল্লেখ্য হল, উৎপাদনের বৈচিত্র্যে বোধ হয় সর্বপ্রধান, ঘোষ-ভ্রাতৃবৃন্দের মালিকানায় যাদবপুরের গোপাল হোসিয়ারী।

আর একবার বলে নিই যে, বড় বড় এবং বর্তমানে চালু কারখানাগুলির নামই উপরে করলাম। ছোট প্রতিষ্ঠান অনেকেরই নাম করা গেল না নানাকারণে। এই অনুল্লেখ মার্জনীয়।

বেঙ্গল হোসিয়ারী ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাঙালী ও অবাঙালী সভ্যের সংখ্যা প্রায় ২৪০। তার মধ্যে ২০০টি কেবলমাত্র গেঞ্জির থান তৈরি করে বাজারে বেচেন, আর বাকী ৪০টি কম্পোজিট কারখানা নানারকমের তৈরী গেঞ্জি জার্সি শার্ট ড্রয়ার্স ইত্যাদি বিক্রি করেন।

সম্প্রতি আরও একটি সংঘ গঠিত হয়েছে। নাম পশ্চিমবঙ্গ হোসিয়ারী সংঘ। তার সভ্যবৃন্দ প্রধানত অবাঙালী এবং হোসিয়ারী ব্যবসায়ে লিপ্ত প্রতিষ্ঠান।

বি. এইচ. এম. এ-র জন্মকাহিনীটাও সংক্ষেপে বলি। এ-ও আমার শোনা বর্তমান সভাপতি শ্রদ্ধেয় ললিতবাবুর মুখে। ১৯২১-এর সমৃদ্ধির পরের বছরেই বাঙালী গেঞ্জি-মোজার কারখানাকে ভীষণ প্রতিযোগিতার সামনে পড়তে হল। কলকাতার পগেয়াপাট্টির ব্যাপারীরা এককাট্টা হয়ে জাপান থেকে সস্তা দরে গেঞ্জি-মোজার আমদানি শুরু করল। নন-কোঅপারেশনের যুগ, বিদেশী মাল চলবে না, তাই তাঁরা জাপানীদের বললেন মার্কা-টার্কা না দিয়ে মাল পাঠাতে। সেই হলদে রঙের বুকে টেপ ও বোতাম লাগানো মালে তাঁরা 'স্বদেশে প্রস্তুত' ছাপ দিয়ে বাজারে হুড়হুড় করে চালালেন। পাবনা, নারায়ণগঞ্জ আর কলকাতার তৈরী জিনিসের কাটতি ভয়ানকভাবে কমে গেল। তখন 'ট্রেড-মার্ক' (মারক্যানটাইল মার্কস অ্যাক্ট) আইন-কানুনেও এমন কতকগুলি ফাঁক ছিল যে, এই ভেজাল কারবার বন্ধ করাবার কোনো উপায় ছিল না। ১৯২২ সালে একটি 'ফিসক্যাল' (সংরক্ষণ সংক্রান্ত) কমিশনের বৈঠক হল, যার ফলে প্রধানত টাটা ইস্পাত কম্পানির ও সামগ্রিকভাবে বস্ত্রশিল্পের 'প্রোটেকশনে'র পথ সুগম হল।

ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজন উপলব্ধি করে বাংলার গেঞ্জিকল মালিকেরা ১৯২৩ সালে বেঙ্গল হোসিয়ারী ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন গঠন করলেন। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন কলকাতার ভূতপূর্ব মেয়র স্বর্গীয় ব্যারিস্টার নিশীথচন্দ্র সেন এবং সহসভাপতি ছিলেন শ্রীক্ষিতীশ নিয়োগী, যিনি পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছিলেন।

১৯২৬ সালে মিঃ ফ্র্যাঙ্ক নয়েস (যিনি পরে স্যার ফ্র্যাঙ্ক নয়েস হয়ে প্রাদেশিক গভর্নরের পদেও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন) সাহেবের নেতৃত্বে প্রথম টেক্সটাইল টারিফ বোর্ড বসল। বোর্ডের সিদ্ধান্ত হল যে, ছোট ছোট গেঞ্জিকলগুলিকে সংরক্ষণের জন্য কোনো আইন-কানুন পাস করতে গেলে রাঘব-বোয়াল কটন মিল-মালিকরাও সেই আইনের সুযোগে টাকার জোরে কটন মিলে হোসিয়ারী বিভাগ খুলে ছোট হোসিয়ারী কারখানাদের হটিয়ে দেবে। এই যুক্তি দেখিয়ে নয়েস সাহেব যেন হোসিয়ারী-শিল্পের ভালোর জন্যেই আর্জি নামঞ্জুর করলেন।

দ্বিতীয় টেক্সটাইল টারিফ বোর্ড বসল ১৯৩২ সালে। এবারে আমাদের ডঃ জন মাথাই (পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের অর্থমন্ত্রী) এই বোর্ডের সভাপতিত্ব করলেন। তাঁর বিচক্ষণতা ও সহৃদয়তার ফলে গেঞ্জিকলের পক্ষে সুবিচার হল। সরকার তাদের 'প্রোটেকশন'-এর জন্য বিদেশী হোসিয়ারী পণ্যের উপর আমদানি-কর ইত্যাদি অনেক বাড়িয়ে দিলেন।

এইভাবে ছোট-বড় ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাংলার হোসিয়ারী-শিল্প অনেক দূর সাঁতরে এসেছিল। এখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং দেশবাসীর পরিচ্ছদে ফিটফাট হবার দিকে নজর বাড়ার সঙ্গে গেঞ্জি-মোজার চাহিদা খুব বেড়ে গেছে। ললিতবাবু এবং গোপাল হোসিয়ারীর সুবোধবাবু বললেন যে, যেখানে অবিভক্ত বাংলায় মোট ৩ লক্ষ কিলোগ্রাম হোসিয়ারী দ্রব্য বিক্রি হত, সেখানে এখন কেবল কলকাতাতেই বিক্রি হচ্ছে ১০ লক্ষ কিলো। ভারতবর্ষের মোট উৎপাদন এখন আনুমানিক ৩০ লক্ষ কিলো আর পশ্চিম বাংলার উৎপাদন তার ⅓ অর্থাৎ ১০ লক্ষ কিলো। এই ১০ লক্ষ কিলোর মধ্যে ৭½ লক্ষ বিক্রি হয় রাজ্যের বাইরের চাহিদা মেটাবার জন্য।

কিছু দিন আগে পর্যন্ত ছবিটি বড় মনোরম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু গোপাল-এর সুবোধ

ঘোষ মশায় বললেন যে, এখন হুঁশিয়ার হবার সময় এসে গেছে। মাদ্রাজ রাজ্যে সুতাকলের ঘাঁটি কইম্বাটোরের কাছে তিরুপুর নামে এক শহর আছে। সেখানে খুব অল্প দিনের মধ্যে প্রায় ৪০০ হোসিয়ারী কারখানার উদ্ভব হয়েছে। তাদের মালও কলকাতার একই কোয়ালিটি মালের চাইতে ডজনে ৩।৪ টাকা করে কম। সাধারণ কোয়ালিটির অফসেট মুদ্রণে যেমন কলকাতার সংগে মাদ্রাজের শিবকাশি শহরের দারুণ প্রতিযোগিতার কথা আমি অন্য এক প্রবন্ধে বলেছি, হোসিয়ারীর ক্ষেত্রেও তেমনি তিরুপুর কম দামে সুতো ও শ্রম পেয়ে কলকাতাকে দাবিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে। সুবোধবাবু বললেন যে, এই প্রতিযোগিতাতে জিততে হলে বাংলার হোসিয়ারী কারখানাদের সরকারি সহায়তায় সস্তায় সুতো পেতে হবে। (তা হলে বেশ ভালই হবে, আমরা গরিবরা সস্তায় গোপাল-এর তুহিন গেঞ্জি পরতে পারব।)

সুবোধবাবু আরও কয়েকটা ইণ্টারেস্টিং খবর দিলেন। বেঙ্গল হোসিয়ারী ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্গত ২৪০টা কারখানার মধ্যে যে ২০০টি গেঞ্জির থান তৈরির কারখানা আছে (অবাঙালীপ্রধান সংঘটির শ'খানেক সভ্যের কথা বাদ দিলেও)। তাঁরা তাঁদের তৈরী কোরা গেঞ্জির থান বড়বাজারের ডীলারদের বেচেন। বড়বাজার সেই কোরা থান ব্লীচ করায় কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত প্রোসেসিং কারখানাগুলিতে। সব শেষে সেই ধোলাই করা থান যায় শোভাবাজারে। সেখানে আছে প্রায় ৬০০ সেলাইয়ের কারখানা, যাদের একমাত্র কাজ হল সেই থান থেকে গেঞ্জি তৈরি করা। পাইকারিভাবে (ফেব্রিকেটার্স ও জবার্সদের মাধ্যমে) এই প্রণালীতে যে গেঞ্জি তৈরী হয়, তার কোয়ালিটি ও মাপ যাই হোক না কেন, অ্যাসোসিয়েশনের বাকী ৪০টি 'কম্পোজিট ফ্যাক্টরি'র মাপসই ভাল গেঞ্জির চাইতে তা অনেকটা সস্তায় বিক্রি হয়।

মশায়, আমি নিজে বছর দশেক আগে পর্যন্ত দু'-চারবার বেশ ঠকেছি। বোকাসোকা লোক, শেয়ালদার ফুটপাথে চলতে চলতে দেখলাম ধবধবে সুদৃশ্য গেঞ্জি হকাররা বেশ সস্তায় বেচছে। স্বাস্থ্যটি তখন আমার মন্দ ছিল না। ভুঁড়ির মাপটা জানাব না, কিন্তু ছাতি ছিল প্রায় ৩৯ ইঞ্চি। দাঁওয়ে গেঞ্জি কিনে তো বাড়ি ফিরলাম। রাস্তায় ট্রাই করে নেওয়া সম্ভব হয়নি, তাই বাড়ি এসেই খালি গা হয়ে ব্র্যাণ্ড-নিউ গেঞ্জি পরতে গেলাম। বুকের মাঝামাঝি এসে গেল ঠেকে। টেনে-টুনে নীচে নামাতে গেলাম, তা ফররর্ করে এক কাঁধের সুতো খুলে এল। দিন তিন-চার কসরত করে পরবার চেষ্টা করে সেই সস্তার-কিস্তি গেঞ্জি বাতিল করে দিলাম। গোটা দুই গেঞ্জির সত্যিই আমার প্রয়োজন ছিল। এবারে গেলাম রিলায়েবল দোকানে। সাইজ সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল গেঞ্জির কলওয়ালাদের ওপর। তাই যেখানে ৩৮ হলেই চলত, সেখানে সেফ-সাইডে থাকবার জন্যে ৪০ ইঞ্চি কিনলাম। এবার বাড়ি এসে পরতে গিয়ে দেখি, আমি কেন, স্বয়ং কুন্তী-সম্রাজ্ঞী হামিদা বানুও তার মধ্যে তাঁর 'ইয়ে' সুদ্ধ ঊর্ধ্বাঙ্গটি সেঁধিয়ে দিতে পারেন।

ললিতবাবুর প্রদত্ত বি. এইচ. এম. এ-র ৩১ মার্চ ১৯৬৭-র সাধারণ সভায় সভাপতির ভাষণে লিপিবদ্ধ আরও কয়েকটি পুরোনো তথ্য গোপাল হোসিয়ারীর সুবোধবাবু আমাকে দেখালেন। যেমন, (১) গেঞ্জির চাহিদা এখন ভারতবর্ষের প্রতি পুরুষপিছু আধখানা করে।

সোজা বাংলায় বলি। ভারতের পুরুষ জনসংখ্যা যদি ২৪ কোটি হয় তো ১২ কোটি সুতীর হোসিয়ারী মাল বিক্রি হয়। (২) ১৯৫৭ সালের শেষে ভারতে ৩৫৬১টা হোসিয়ারী কারখানা ছিল এবং তাতে ২৬৩০০ শ্রমিক খাটত। (৩) সুতীর গেঞ্জি ইত্যাদির উৎপাদন ছিল প্রায় ১২ৄ কোটি কিলো। (৪) পশমের সোয়েটার ইত্যাদির উৎপাদন ছিল ২৭২ৄ লক্ষ কিলো। (৫) উৎপাদিত মালের মোট দাম ছিল ১৬২ৄ কোটি টাকা, এবং (৬) এই শিল্পে বিনিযুক্ত মূলধনের মোট অঙ্ক ছিল ৬২ৄ কোটি টাকা।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল উৎপাদন বাড়িয়ে নিম্নলিখিত অঙ্কে পৌঁছানো :—

(১) সুতীর হোসিয়ারী—২ কোটি ১০ লক্ষ কিলো, (২) পশমের হোসিয়ারী—২৫ লক্ষ কিলো, (৩) আর্ট সিল্কের—৩৫ লক্ষ কিলো এবং (৪) সিনথেটিক অর্থাৎ রেঅন বা নাইলন —২০ লক্ষ কিলো।

উল্লিখিত তথ্য বেজায় বাসী। এত পুরোনো একটি সংঘের পক্ষে উচিত ছিল তাজা খবর দেওয়া। আমি নিজেও অন্যত্র এর বাইরে কিছু খুঁজে পেলাম না।

ভারতের হোসিয়ারী কারখানার অব্যবহৃত শক্তি মোট উৎপাদন-শক্তির এক-চতুর্থাংশ। ভালো সুতোর ন্যায্য দামে দুষ্প্রাপ্যতাই নাকি এর অন্যতম প্রধান কারণ।

ললিতবাবু ভাষণে আরও বলেছেন যে, হোসিয়ারী কারখানারা যে-সমস্ত স্পিনিং মিলের কাছ থেকে সুতো কেনেন, সেই মিল সমতা রক্ষা বিষয়ে বোধ হয় অবহেলা করেন। তাতে গেঞ্জির কোয়ালিটিতেও তারতম্য ঘটে। তিনি বলছেন, সমাধানের পথ হল, সমবায় পদ্ধতিতে হোসিয়ারী কারখানার মালিকরা যদি নিজেদের জন্য একটা ১২৫০০ স্পিণ্ডলের স্পিনিং মিল বসাতে পারেন। কিন্তু গোপাল হোসিয়ারীর সুবোধবাবুর অভিমত হল যে, যদিও বা অতি কষ্টে মূলধনের জন্য ১।১২ৄ কোটি টাকার ব্যবস্থা হয়ও তবু তাতে কাজ হাসিল হবে না কারণ সুতো চাই নানারকমের—কটন, রেঅন, রবারের সুতো ইত্যাদি। ওই একটি ছোট কটন মিল কীই বা যোগাবে?

বাঙালীর গৌরবের বস্তু গোপাল হোসিয়ারীর কাহিনীটা এবারে 'নাছোড়বান্দা' সুবোধচন্দ্র ঘোষ মশায়কে নিয়েই আরম্ভ করা যাক।

১৯৩০ সালের এপ্রিলের গোড়ায় মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশের লবণ আইন ভঙ্গের জন্য যখন দণ্ডীর সমুদ্রকূলে যাত্রা করলেন, তখন তাঁর প্রধান বাঙালী শিষ্য শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত একদল বাঙালী যুবককে সত্যাগ্রহ করতে মেদিনীপুরের তমলুকের দিকে পাঠালেন। মামলা রুজু করার ঝামেলা এবং জেলে ঢুকিয়ে সরকারি খানা খাওয়াবার বাজে খরচ কমাবার জন্য অনেক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অধস্তন কর্মচারীদের আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, সত্যাগ্রহীদের ধরে ধরে পুলিসের লরিতে করে ১৫।২০ মাইল দূরে দুর্গম কোনো স্থানে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছ উত্তম-মধ্যমের পর ছেড়ে দিতে হবে। যাদবপুর ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এর ছাত্র সুবোধবাবু ছিলেন তমলুকের কাছে বাবুপুরের দলে—কলকাতা থেকে সতীশবাবুর পাঠানো সব তরুণ সত্যাগ্রহীর দল। বারবার গ্রেপ্তার হয়ে ওইভাবে ছাড়া পাবার পর তাঁরা পণ করলেন

যে, এমন কোনো উপায় অবলম্বন করবেন, যাতে পুলিস তাঁদের জেলে নিয়ে যেতে বাধ্য হবে। তাতে তাঁরা বেশ সাফল্য লাভ করলেন। সেই থেকে বাবুপুরের দলের নাম হয়ে গিয়েছিল 'নাছোড়বান্দার দল'।

জেল খেটে বেরোবার পর ১৯৩১ সালে সুবোধবাবু এঞ্জিনীয়ারিং পাস করলেন। কিন্তু ন্যাশন্যাল কাউন্সিলের পাস করা ছাত্রদের তখনকার চাকরির বাজারে ইজ্জত ছিল না। কাজেই চাকরি জুটল না। উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যাবার বাসনা ছিল, কিন্তু বাড়ির কর্তা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ মশায় তাতে বাধা দিলেন।

চারুবাবুর পিতৃদেব স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র ঘোষের আদি নিবাস ছিল খুলনাতে, কিন্তু পরে উত্তরবঙ্গের নীলফামারিতে গিয়ে মোক্তারি পেশা নিলেন এবং কালে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন। মোক্তারি ছাড়াও চারুবাবুর বাবা ব্যবসাতেও অল্পবিস্তর লিপ্ত ছিলেন।

গোপালবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র চারুবাবু নিজে করতেন ওকালতি। তাঁর পরেও এক ভাই ছিলেন। ১৯২৫ সালে তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। শোকের মধ্য দিয়ে চারুবাবুর মনে আর দুই ভাইয়ের প্রতি বাৎসল্য নিবিড় হয়ে উঠল। সুবোধবাবু ও তাঁর ছোট ভাই জ্যোতিষবাবু চারুবাবুর চেয়ে ১৫ বছরেরও বেশী ছোট। এক ভাই ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে, তাই সুবোধবাবুকে দূর দেশে পাঠাতে চারুবাবু রাজী হলেন না। ফলে, ১৯৩৬ পর্যন্ত পাঁচ বছর সুবোধবাবু বেকার হয়ে বসে রইলেন।

ছাত্রজীবনে সুবোধবাবু একটা কাজ করেছিলেন। হয়ত সেই কাজটিই পরে তাঁর ব্যবসা-জীবনের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। শ্রীহরিপদ সরকার নামে এক ভদ্রলোক নীলফামারিতে একটা কারখানা খোলবার জন্যে কয়েকটা হোসিয়ারী নিটিং মেশিন আনিয়েছিলেন এবং মেশিন বসানোর সময়ে হরিপদবাবু বেকার সুবোধবাবুর সাহায্য নিয়েছিলেন।

বেকারত্ব যখন কিছুতেই ঘোচে না, তখন দাদার অনুমতি নিয়ে ১৯৩৬ সালে সুবোধবাবু ঢাকুরিয়াতে একটা নিটিং ফ্যাক্টরি বসালেন। সম্বল দু'টি জাপানী নিটিং মেশিন। পরলোকগত পিতার নামে সুবোধবাবু ছোট প্রতিষ্ঠানটির নাম দিলেন 'গোপাল হোসিয়ারী'।

ছ' বছর ধরে গোপাল হোসিয়ারী ঢাকুরিয়াতেই রইল এবং ততদিন সুবোধবাবু একটি একটি করে মেশিন বাড়িয়ে মোট ১১টি মেশিন করে ফেললেন। ঢাকুরিয়ার সংকীর্ণ জায়গা থেকে কারখানা স্থানান্তরিত করবেন বলে তিন ভাই পরামর্শ করে যাদবপুরে কিছু জমিও কিনলেন।

ছোট ভাই জ্যোতিষবাবুর কথা বলা হয়নি, ইনিও রাজনীতি করে ১৯৩২ সালে কারবাস করে এসেছিলেন।

এমন সময়ে ১৯৪১ সালের শীতকালে কলকাতায় জাপানীদের কয়েকটা ছোট ছোট বোমা পড়ল। ছোট হলে কী হবে, তার দাপটে কলকাতা ফাঁক। রব উঠল : এল বলে—পালাও, পালাও।

কলকাতার শিশু, বনিতা ও বৃদ্ধ তখন যে যেদিকে পারেন ইভ্যাকুয়েট করে চলে গেছেন। শহরের গেরস্তপাড়ার কোনো বাড়িতে তখন কাচা শাড়ি-ব্লাউজ রোদে মেলা থাকলে আমরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতাম। অবাক লাগত বীরাঙ্গনাদের সাহসের কথা ভেবে, আর

দীর্ঘশ্বাস উঠত বিরহী যক্ষের মতো; কারণ, আমাদের মতো যারা গতর খাটিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত, তাদের প্রিয়ারা তখন পরদেশে।

সুবোধবাবুরা শুধু নিজেরাই গেলেন না; তাঁদের সেই ১১টি মেশিন সুদ্ধু নীলফামারিতে ইভ্যাকুয়েট করলেন।

৪২-এর আগস্টে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হতেই কিন্তু ঘোষ-ভ্রাতারা আবার ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে লড়াইয়ে নেমে পড়লেন। হোসিয়ারী অ্যাসোসিয়েশনের মারফত গেঞ্জিকলওয়ালারা পল্টনের জন্য মাল তৈরি করতেন, যার জন্য তাঁরা আবার সুবিধা দরে সরকারি সংস্থার মাধ্যমে সুতোর সাপ্লাই পেতেন।

গোপাল হোসিয়ারী ব্রিটিশের যুদ্ধের আর কোনোরকমে সামান্যতম সাহায্যও করবেন না পণ করে পল্টনকে মাল দেওয়া বন্ধ করলেন। আর সুবোধবাবু নামলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। গোপাল হোসিয়ারী শাস্তি পেল সরকারি সুতোর সাপ্লাই বন্ধ হয়ে এবং সুবোধবাবুর হল আড়াই বছরের জেল।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেই যুগে এমন একটি নজির কদাচিৎ খুঁজে পাওয়া যায়। সে সময়ে আমরা দেখেছি যে, এক ব্যবসায়ী পরিবারে এক ভাই জেলে গেছেন, কিন্তু অন্যরা মিলিটারি সাপ্লাই চালিয়ে যাচ্ছেন; আবার এও দেখেছি যে, বাংলাদেশের নিরামিষাশী অবাঙালী নেতা উচ্চৈঃস্বরে ব্রিটিশ-বিরোধিতা প্রচার করে নেপথ্যে পল্টনকে মাংস সাপ্লাইয়ের কন্ট্রাক্টও বজায় রেখেছেন।

প্রায় দু'বছর কারাবাসের পর সুবোধবাবু বাইরে এলেন। ১৯৪৭ সালে তিন ভাই যুক্তি করে নীলফামারির ইউনিটটা স্থানীয় লোককে বেচে দিলেন। সুবোধবাবু কলকাতায় এসে পূর্ব-পরিকল্পনামতে যাদবপুরে সেণ্ট্রাল রোডের কাছে নিজেদের জমিতে গোপাল হোসিয়ারীকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যবস্থা করলেন। নতুন করে মেশিন কিনে আবার কারখানা চালু হল।

তারপরে পঁচিশ বছর কেটে গিয়েছে। গোপাল হোসিয়ারী এখন আর কারখানা নেই, সুন্দর একটি কারুশালায় পরিণত হয়েছে। সেখানে এখন ৪৪টি বিলিতী, মার্কিন ও জাপানী নিটিং মেশিন সপ্তাহে ৬ দিন ২৪ ঘণ্টা করে চলে। উপরন্তু, গোপালের প্রিপারেটারি মেশিন এবং আধুনিকতম ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্যুয়িং মেশিনের সংখ্যাও অনেক। মন্দার আক্রমণে যখন সকলেই মৃত বা মৃতপ্রায়, তখনও নাকি গোপালের কাজ পুরোদমেই চালু ছিল।

পুরোপুরি সুতীব গেঞ্জি বাদেও গোপাল হোসিয়ারীতে রেঅন ও রবারের সুতো দিয়ে এবং উল দিয়েও নানারকম অন্তর্বাস ও বহির্বাস তৈরী হয়। রবারের সুতো বস্তুটা আমার কাছে অভিনব লাগল। জাঙিয়ার ইলাস্টিক প্রভৃতির জন্য এর প্রয়োজন। শুঁয়োতোলা সোয়েটার, কার্ডিগান বোনবারও একটি জার্মান রাশিং ও ন্যাপিং মেশিন দেখলাম। গ্রীষ্মাগমে সেটিকে খুলে পরিষ্কার করা হচ্ছে বলে তার কাজ দেখতে পেলাম না। নাইলনের সুন্দর সুন্দর মোজাও গোপাল হোসিয়ারীতে বানানো হয়। সুতীর তো হয়ই।

সেলাই ও ধোলাই বিভাগ চলে যথাক্রমে এক ও দুই শিফট। বাচ্চা ও মেয়েদের জন্যে

হোসিয়ারী সান-স্যুট, ব্লাউজ প্রভৃতি ছাপাবার জন্যে গোপালের একটা স্ক্রীন প্রোসেস (সিল্কস্ক্রীন) প্রিন্টিং বিভাগ আছে। সেইসব চিত্তাকর্ষক মুদ্রণের নমুনা বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় চলা উচিত বলে মনে হলো, কিন্তু সুবোধবাবু বললেন যে, বিদেশী জিনিসের সঙ্গে দামে হেরে যেতে হয়, তাই রপ্তানি লাভের ব্যবসা নয়।

এদেশে গোপালের মালের এই অবিরত চাহিদার মূলে আছে ঘোষ মশায়দের, বিশেষ করে সুবোধবাবুর, আধুনিকতা। প্রত্যেকটি মেশিনকে তাঁরা অতি যত্ন রাখেন আর মডেল পুরনো হয়ে গেলেই সর্বাধুনিক মেশিন আনিয়ে পুরাতনকে বিদায় দেন।

সেদিন কাগজে শিল্পসংক্রান্ত বিশেষ একটি খবর পড়লাম—এবং এক নতুন সুর শুনলাম। ভারতীয় বণিক ও শিল্প সমিতির (এফ. আই. সি. সি. আই) বার্ষিক অধিবেশনে বোম্বাইয়ের প্রতিনিধি শ্রীদেবীপ্রসাদ কেজরিওয়াল বলেছেন যে, বস্ত্রশিল্পের বর্তমান দুরবস্থার জন্য সরকারের চেয়ে শিল্পপতিরা নিজেরাই বেশী দোষী। গত ২০ বছরের বেশী সময় সুতীবস্ত্রের ক্ষেত্রে বিক্রেতার বাজার (সেলার্স মার্কেট) গিয়েছে। শিল্পপতিরা সে সময়ে প্রচুর মুনাফা লুটেছেন, কিন্তু সে টাকা শিল্পের আধুনিকীকরণের জন্য বিনিয়োগ করেননি। ফলে যন্ত্রপাতি সব সেকেলে হয়ে গিয়েছে। এখন অসুবিধায় পড়েই শিল্পপতিরা পরের ওপর দোষ চাপাচ্ছেন। (আনন্দবাজার, ১-৯-৬৮)

প্রায় ১৫।১৬টা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিক্রমা করে এবং বিশেষ করে সম্প্রতি বস্ত্রশিল্পে বাঙালীর চরম দুরবস্থা দেখে এখন আমার মনেও এ ধারণা দিন দিন শিকড় গাড়ছে যে অধিকাংশ বাঙালী শিল্পপতিই কেবল নিজের কোলে ঝোল টেনে কথা বলেন। নিজেদের অবিমৃষ্যকারিতার কথা তাঁরা স্বীকার করতে চান না। মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন যে, মতিভ্রষ্ট মানুষ নাকি এইভাবেই 'র‍্যাশান্যালাইজ' করে নিজের পাগলামি বা অপরাধের স্খালন করবার চেষ্টা করে।

না হলে একই অঞ্চলে একই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে কাজ করে শ্রীদুর্গাপূর্ণা কটন মিল ও গোপাল হোসিয়ারী কী উপায়ে সফলতা পায় আর অন্য অনেকে পায় না, আর তা না পেয়ে কেবল সরকার ও শ্রমিক আন্দোলনকে দায়ী করে প্রতিষ্ঠানের নিমজ্জনের জন্য?

গোপালের চারুবাবু সুবোধবাবুরা শুধু যান্ত্রিক আধুনিকীকরণেই সন্তুষ্ট থাকেননি, তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ পরিচালকদের প্রস্তুতিও সেইভাবে করাচ্ছেন। এঁদের এক ছেলে বিশ্বনাথ ঘোষ ইংল্যান্ডের হোসিয়ারী শিল্পের কেন্দ্র লিস্টার-এর কলেজ অব এঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে নিটিং টেকনোলজি পাস করে এসেছেন; দেবব্রত গ্লাসগো থেকে 'বিজনেস ম্যানেজমেন্ট' পাস করে ফিরেছেন; সুপ্রিয় লণ্ডনের মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার; সুব্রত মিশিগানের (আমেরিকা) এম. এস.। আরও ছোট গৌতম ও স্বপন গোপালের কাজে শিক্ষানবিসি করছেন।

এই ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ নরেন্দ্রপুরে একটা মেশিন শপ স্থাপনা করে নানা মেশিন তৈরিও আরম্ভ করেছেন।

দফা বদলের ঘণ্টা বাজলো। আমাকে জ্যোতিষবাবুর হেফাজতে রেখে সুবোধবাবু কী

১৪

একটা কাজে নীচে গেলেন। আমিও উঠছিলাম। নীচে নেমে দেখি, ধুতি আর গেঞ্জি পরেই সুবোধবাবু লিটিং ডিপার্টমেন্টের দেয়ালে হাতুড়ি পিটিয়ে একটা ক্ল্যাম্প ফিট করছেন।

'নাছোড়বান্দা' সুবোধ ঘোষ হাতুড়ি হাতেই আমাকে বিদায় নমস্কার জানালেন।

২০ এপ্রিল, ১৯৬৮





তেরো

সামান্য কয়েকটা প্রবন্ধ লিখে আমি ইতিমধ্যেই কারও কারও বিরাগভাজন হয়েছি বলে শুনেছি। আমি নাকি পুঁজিপতিদের বন্দনা গানের চারণ। বলছেন- দেশ পত্রিকার কোনো কোনো পাঠক, যাঁরা একান্তই বাঙালী।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীবটকৃষ্ণ দত্ত মশায়কে প্রসঙ্গক্রমে কথাটা আমি বলেছিলাম। তার উত্তরে তিনি বললেন যে, বাঙালী রাজনৈতিক নেতারা নিশ্চয়ই চান না যে আমাদের এই বাংলা দেশটা মরুভূমি হয়ে যাক। গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশের মঙ্গল ঘটানোর ব্রত যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা কখনোই চাইবেন না যে, বিপ্লব বা বিবর্তন এমন এক রূপ নিক যাতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যায়! তাঁরা নিশ্চয়ই এমন একটি দেশ, এমন একটি জাতির নেতৃত্ব করতে চান যে দেশ, যে জাতি সমৃদ্ধ। মরুভূমিতে রাজত্ব করতে কে চাইবেন? সুতরাং নিছক ধনতন্ত্রের বিরোধিতা করবার জন্যেই যদি তাঁরা সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠানকেও আঘাত করেন তবে তাঁরা কি যাকে বলে 'গুড ম্যানেজমেন্ট', তা কোনো প্রতিষ্ঠানে কখনো চালু করতে পারবেন? আর তা যদি না পারেন তাহলে আখেরে বাঙালীর শিল্প ও বাণিজ্যের কী অবস্থা হবে, আর দেশটার কী অবস্থা হবে?

আশা করি শ্রী বি কে দত্ত মশায়ের এই যুক্তি আমার সমালোচকের মনে কিঞ্চিৎ ভাবনার খোরাক জোটাবে।

অসৎ অথবা সেকেলে নির্বোধ পরিচালনাকে উৎখাত করে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠু পরিচালনায় সমর্থ ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার যে কোনো সংস্থার শ্রমিক ও কর্মীর আছে, আজকের জনমত ও সরকারি আইন এ বিষয়ে তাঁদের সাহায্যই করবে। কিন্তু গুড ম্যানেজমেন্টের কদর তাঁদের দিতেই হবে। না হলে বাঙালীর মুক্তি নেই। রাজনীতি করে দিন চলবে না, না খেয়ে আর আধপেটা খেয়ে কিছুদিন রাজনীতি করা চলে, চিরদিন নয়।

আমি যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠানের গুণকীর্তন করে চলেছি, অনুকরণীয় উদাহরণ লোকের সামনে তুলে ধরবার ক্ষীণ চেষ্টা করছি আমার অতি সামান্য বুদ্ধি

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
৪, নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সরণি
কলিকাতা—১

ও শক্তি দিয়ে, তার অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঙালীর মনে সেই বোধ জাগ্রত করা। আমি বলতে চাই যে, সকল শিল্প পরিচালকরা যেমন ক'রে গড়েছেন তেমনি কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও গভীর মমত্ববোধ দিয়ে প্রতিষ্ঠান আপনি-আমিও গ'ড়ে তুলি কিংবা গঠনে সহায়তা করি; তারপরে যথাসময়ে সেই সুঠাম বস্তুটি গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র বা যে কোনো তন্ত্রের হাতে তুলে দিই।

কিন্তু গ'ড়ে তোলার সেই ক্ষমতাটি ভাই আমার নেই। আশা করি আমার সমালোচকবৃন্দের তা আছে।

অতি কষ্টে লেখাপড়া করে কুমিল্লার নরেন দত্ত মশায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আইন পরীক্ষা পাস করে কলকাতা থেকে কুমিল্লায় এসে আদালতে চার-পাঁচ বছরের মধ্যে বেশ পসার জমিয়ে ফেলেছিলেন। কে এক বন্ধুর সঙ্গে নরেনবাবু একদিন সত্যনিষ্ঠা বিষয়ে সদালাপ করছিলেন। বন্ধু বললেন যে, ওকালতি পেশা তো মিথ্যার বেসাতি। কথাটার সত্যতা উপলব্ধি করে নরেনবাবুর মনের অবস্থা এমন হলো যে, পারলে সেই মুহূর্তেই তিনি ওকালতি ছেড়ে দেন; কিন্তু দায় ছিল পরিবার প্রতিপালনের। তাই সেইদিন থেকেই পথের সন্ধানে রইলেন।

পথ খুঁজে পেতে বেশী দেরী হলো না। ১৯১৪ সালে নরেনবাবু কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা করলেন। মূলধন (পেড-আপ ক্যাপিটাল) হলো ৪০০০ টাকার আর আমানত (ডিপজিট) পেলেন ২৫০০ টাকার। তার মধ্যে ১৫০০ টাকার শেয়ার তাঁর নিজের। ব্রত নিলেন যে, নিজেকে বঞ্চিত করে হলেও ব্যাঙ্ক পরিচালনার খরচ নিম্নতম অঙ্কে রেখে সুষ্ঠু পরিচালনার উচ্চমান তিনি বজায় রাখবেন। তা যে তিনি করেছিলেন সে কথা নতুন করে আমার আর বলবার দরকার নেই। মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯৬২ সালে ৮৪ বছর বয়সে তিনি পরলোক-গমন করেছেন। তাঁর কর্মসুন্দর জীবন-কাহিনী নানা লেখা, নানা বক্তৃতার মাধ্যমে সকলের মনে তাজা আছে। আজ আমি বলবো তাঁর যোগ্য পুত্র ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান শ্রীবটকৃষ্ণ দত্তের কথা। বটুবাবু তাঁর পিতারই ছায়া, উপরন্তু পিতার আদর্শকে বাস্তবে আরও বড় করে রূপ দিয়ে তিনি তাকে মহীয়ান করে তুলেছেন। তাই এই কাহিনীও নরেনবাবুর জীবন-চরিতের একটি অংশ হয়ে দাঁড়াবে।

১৯৩০-৩১ সালে কুমিল্লা শহর আর ত্রিপুরা জেলায় মহা ডামাডোল। একদিকে গান্ধী-বাদীরা লবণ আইন ভঙ্গ আর আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, আর অন্যদিকে সন্ত্রাস-বাদীরা বোমা বন্দুক নিয়ে শ্বেতাঙ্গ ও রাজকর্মচারী নিধনের জেহাদ ঘোষণা করেছেন।

চোদ্দ পনেরো বছর বয়সের ছোট ছোট দুটি স্কুলে পড়া মেয়ে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টীভেন্স সাহেবকে গুলি করে মেরে ফেললো। আর কে যেন সেই ঘটনাকে গানে বাঁধলো :

তবর বেটী শান্তি ঘোষ দেবেন ঘোষের মাইয়া,
সুনীতি চৌধুরী নাম কবিল বিধলবার মারিয়া রে—
মন আমার পাক পানি চিনিয়া নাও বাইও॥

(মেয়ে দুটি যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিতা হয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে মিসেস শান্তি ঘোষ কংগ্রেস এম এল এ হয়েছিলেন এবং ডাঃ মিসেস সুনীতি ঘোষ এখন চন্দননগরে ডাক্তারী করছেন)।

এই উত্তেজনার কেন্দ্র কুমিল্লা শহরে দুই কর্মযোগী কিন্তু তাঁদের দেশসেবা অন্যভাবে করে চলেছিলেন। দুজনেরই গড়ে তোলার কাজ- একজন গড়ছিলেন তার ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান আর তার কর্মীদের; আর একজন গড়ছিলেন মানুষ। নরেনবাবু আর মহেশ ভট্টাচার্য মশায় আবার প্রতিবেশী ছিলেন; একেবারে পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন। স্বর্গীয় মহেশ ভট্টাচার্য ছিলেন প্রসিদ্ধ ওষুধের প্রতিষ্ঠান এম ভট্টাচার্য কম্পানির স্বত্বাধিকারী; কিন্তু লক্ষপতি মহেশবাবু নিজেকে তাঁর প্রতিষ্ঠানের লাভের টাকার মালিক মনে করতেন না। তিনি যেন ছিলেন জনসাধারণের সেবা-ভান্ডারের অছি। তাঁর উপার্জিত লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষুদ্র অংশ পরিবারের জন্যে রেখে বাকী সমস্তই জনসেবায় বিলিয়ে দিতেন। কুমিল্লা ও ত্রিপুরা জেলার কত স্কুল, পাঠশালা, হাসপাতাল আর দাতব্য চিকিৎসালয় যে সেই টাকায় চলতো তার হিসেব নেই। বিদ্যাশিক্ষার জন্যে তিনি এত দান করেছিলেন অথচ বাল্যকালে তাঁর নিজের কোনো নিয়মিত বিদ্যাভ্যাসের সুযোগ হয়নি।

মহেশবাবু আদর্শ গান্ধীবাদী ছিলেন, অথচ মুক্তিসংগ্রামের সব যোদ্ধাদের প্রতিই তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তাই পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসবাদীরাও যে তাঁর সহায়তাপুষ্ট ছিলেন না, এ কথা বলা চলে না। আর পুলিসের লাঠি যখন কুমিল্লার মানুষকে দলে দলে জখম করতে লাগলো, নরেনবাবু তখন ডিপজিটারদের অনুমতি নিয়ে একমাসের জন্যে ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ রেখে ব্যাঙ্কের অফিস বাড়িটাকে হাসপাতালে পরিণত করালেন।

বাবার তেজস্বী ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রভাবের সঙ্গে মহেশ ভট্টাচার্য মশায়ের নিষ্কলুষ উদারতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বটকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে কোনো দলে যোগ না দিয়েও তিনি সব দলেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন; পরোক্ষ-ভাবে সকলেই তাঁর সাহায্যও নিতো।

কে যেন কুমিল্লা শহরের জন্য একটি যথার্থ বিশেষণ যুগিয়েছিলেন -এ টাউন অফ ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ট্যাঙ্কস। একদিকে বাঙালীর বড় বড় নামকরা ব্যাঙ্ক আর অন্যদিকে বিশাল বিশাল দীঘি আর সায়রে ভরা এই শহর পূর্ব বাংলার এক সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। প্রধান প্রধান ব্যাঙ্ক ছিল কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং, স্বর্গীয় ইন্দুভূষণ দত্ত মশায়ের প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাংক এবং ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় বিধানসভার প্রাক্তন সহ-সভাপতি স্বর্গীয় অখিলচন্দ্র দত্ত মশায়ের অধুনালুপ্ত পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক।

কুমিল্লা শুধু ব্যাঙ্কিং আর স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্রই ছিল না; সাংস্কৃতিক তীর্থক্ষেত্র হিসেবে পূর্ব বাংলায় এ শহরের স্থানমাহাত্ম্যও ছিল। পরম শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব, সুরসাগর স্বর্গীয় হিমাংশু দত্ত, শ্রীজ্ঞান দত্ত, কবি স্বর্গীয় অজয় ভট্টাচার্য আর তাঁর অনুজ শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য—সকলেরই নিবাস ছিল কুমিল্লা শহর এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চল। এ'রা ছাড়াও কুমিল্লা শহর আরও দুজন বিখ্যাত ব্যক্তির ডেরা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ত্রিপুরার রাজকুমার

গায়কশ্রেষ্ঠ শ্রীশচীন দেব বর্মন এবং কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল তো শেষ পর্যন্ত তাঁর বন্ধু বীরেন্দ্রনাথ সেন মশায়ের নিকট-আত্মীয়া প্রমীলা দেবীকে বিবাহ করে কুমিল্লার জামাই-ই হয়ে গেলেন।

বটুবাবুর সাধ ছিল কবিতা লিখবেন, সেতার বাজাবেন আর এঞ্জিনীয়ার হবেন। মহেশ-বাবুর প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বর পাঠশালায় ম্যাট্রিক এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে আই এস-সি পাস করে এঞ্জিনীয়ারিং-এ ভর্তি হবার জন্যে বটুবাবু কলকাতায় এলেন। কিন্তু কলকাতায় পেঁছিতে না পেঁছিতেই কুমিল্লা থেকে বাবার এক টেলিগ্রাম এলো -এঞ্জিনীয়ারিং না পড়ে কমার্স ক্লাসে ভর্তি হবার আদেশ। এঞ্জিনীয়ার হবার সংকল্পের মূলেই ঘা পড়লো। পুরুষের ভাগ্য এইভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়। এঞ্জিনীয়ার হলে বটুবাবু আজ হয়তো কোনো বাঁধ বাঁধা কিংবা কোনো প্রকল্পের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, ব্যাঙ্কিং করতেন না।

কলকাতা থেকে কমার্স গ্র্যাজুয়েট হয়ে বটকৃষ্ণ কুমিল্লায় ফিরলেন। বাবার নির্দেশে কুমিল্লা ব্যাংকিং করপোরেশনে শিক্ষানবিসি শুরু করলেন।

পিতার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রভাব তো সর্বক্ষণই আছে, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্বকে একেবারে খর্ব করে পিতার স্নেহচ্ছায়ায় পুষ্ট হওয়ায় বটুবাবুর মন সায় দিচ্ছিল না। বাবাকে বললেন যে তাঁর আশীর্বাদ নিয়েই নিজের পায়ে দাড়াবার পথ তিনি করে নেবেন, যাকে বলে 'স্টার্টিং ফ্রম স্ক্র্যাচ'।

বটু দত্ত কিন্তু কুলধর্ম ত্যাগ করলেন না। ব্যাঙ্কিং-এই নামলেন, কিন্তু স্বাধীনভাবে। মাসিক ৪।৫ টাকা ভাড়ায় মহেশ ভট্টাচার্য মশায়ের একটা খালি গ্যারাজ ভাড়া করলেন। নবগঠিত ব্যাঙ্কের নাম দিলেন 'দি নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক'।

বটুবাবুর নিজস্ব একটি সাইকেল ছিল; একটা টাইপরাইটার কিনলেন হায়ার-পারচেজে; আর করালেন কিছু খাতাপত্র আর ব্যাঙ্কের নাম ছাপানো চিঠির কাগজ, চেকবই ইত্যাদি। দুজন পার্টটাইম কর্মচারী নিয়োগ করলেন- অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও ক্যাশিয়ার। তারপরে বটকৃষ্ণ কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ৩০,০০০ টাকা পেড আপ ক্যাপিটাল নিয়ে কম্পানির কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু বটুবাবু আমাকে বললেন--কম্পানির আসল মূলধন ছিল ম্যানেজিং ডিরেক্টর বটকৃষ্ণের পিতৃপরিচয়।

শহরের বড় ব্যাংকাররা তাদের স্নেহের পাত্র ২১ বছর বয়সের ছেলে বটুর দুঃসাহসিকতায় বোধ হয় অবাক হলেন আর কৌতুকও বোধ করলেন। ভাবলেন, কিছুদিন পরেই নেশা কাটবে; তখন নরেনবাবুকে ছেলের ভুলের মাশুল গুনে দিয়ে ছেলেকে আবার ঘরে ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু ধাতু যে একই, ছেলে যে বাপেরই ব্যাটা সেটা বুঝলেন অল্প কয়েকদিনের মধ্যে।

শাস্ত্রীয় ব্যাঙ্কিং-এর বাধাধরা নিয়ম ভেঙে বটুবাবু মৌলিক উপায়ে কাজ আরম্ভ করলেন। সম্পূর্ণ মৌলিকই বা বলি কী করে; তাতেও ছিল নরেনবাবুর পরামর্শ ও উৎসাহ। প্রয়োজন হলেই কানুন-ভাঙ্গা ব্যাঙ্কিং করে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিংকে নরেনবাবু বড় করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলতে হবে যে, অন্যদিকে অনিয়ম যাই করে থাকুন না কেন, ব্যয় সংকোচ এবং 'লিকুইডিটি' বজায় রাখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন নির্দয়।

মহেশবাবুর গ্যারাজে নিউ স্ট্যান্ডার্ডের হেড অফিস খুলতো সকাল ৮টায়। সেখানে ১০টা পর্যন্ত চলতো চেয়ার টেবিল আর কাউন্টারে বসে শাস্ত্রসংগত ব্যাঙ্কিং। ১০টা বাজতে না-বাজতেই হেড অফিস বন্ধ। ইতিমধ্যে আরও দুটি সাইকেল ব্যাংকের মালিকানায় এসেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও তাঁর কর্মীযুগল কোনোরকমে স্নান খাওয়া সেরে এসে বেলা ঠিক এগারোটায় নিউ স্ট্যান্ডার্ডের হেড অফিস থেকে একটা মিছিল বের করতেন। তিনটে সাইকেলের শোভাযাত্রা। প্রথমটি বটুবাবুর সাইকেল, দ্বিতীয়টি ক্যারিয়ারে লেজার চেকবই বাঁধা অ্যাকাউন্ট্যান্টের সাইকেল, আর সবার পিছনে ক্যাশ ও ক্যাশবুকের ঝোলাটি স্টিয়ারিং-এ ঝুলিয়ে ক্যাশিয়ার। মোবাইল ব্যাঙ্ক বাণিজ্যে বেরিয়ে পড়তো।

(এইখানে ক্যাশিয়ার ভদ্রলোকের ছোট একটু পরিচয় দিই। এঁর নাম শ্রীসুখময় দাশগুপ্ত। ইনি এখন কলকাতার বিখ্যাত ডেয়ারী-ফার্ম 'কেভেন্টার কম্পানি' এবং প্রাচীন মেশিন ধোলাইয়ের লণ্ড্রি 'লাইভওয়ায়ার ক্লীনার্স'-এর অন্যতম অংশীদার। এই পুরনো ইংরেজ প্রতিষ্ঠান দুটি এখন সম্পূর্ণভাবে বাঙালীর)।

কুমিল্লা সদর আদালত; বেলা ১১টার আগেই লোকে লোকারণ্য। নিউ স্ট্যান্ডার্ডের সাইকেল মিছিল ঠিক সময়ে সেখানে পৌঁছে যেত। বার-লাইব্রেরির বারান্দার এক পাশে উকীলের মুহুরি আর স্ট্যাম্পভেন্ডারদের পাশে একটু জায়গা করে বসে যেত নিউ স্ট্যান্ডার্ডের সারাদিনের দ্বিতীয় অধিবেশন। ব্যাঙ্কের 'ক্লায়েন্টেল' ছিল মামলায় বাদী প্রতিবাদীর দল, যারা অধিকাংশই ছিল আশপাশের চাষা, জোতদার, বড় জোর তালুকদার। আর সামান্য কিছু ছিলেন উকীল মোক্তার ও স্থানীয় দোকানদার। তাঁদের সুবিধে—ব্যাঙ্কে যেতে হয় না, ব্যাঙ্কই তাঁদের কাছে আসে। আর ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কে?—না "আমাগো নরেন দত্তেরই পোলা (ছেলে)।"

'ব্যাঙ্ক অব আমেরিকা' তো এখন পৃথিবীর বৃহত্তম ব্যাঙ্ক। আপনাদের জ্ঞাতার্থে বৃহত্তমের আমানত আর লগ্নীর সামান্য দু-একটা হিসেব দিই। ১৯৬৭ সালের গোড়ায় তার ডিপজিটের (আমানতের) অঙ্ক ছিল ১৬৮২ কোটি ডলার আর বাজারে অ্যাডভান্স (লগ্নী) দেওয়া ছিল ১০৯২ কোটি ডলার। ৭½ গুণ করে নিলেই টাকার অঙ্কে সংখ্যাগুলি কী দাঁড়ায় তা বুঝবেন, কারণ এখন ১ ডলারের বিনিময় মূল্য সোজা পথে ৭·৫০ টাকা (চোরা পথে আরও বেশী)। ১৯৬৬-তে ব্যাঙ্ক অব আমেরিকার লাভ হয়েছিল ১১ কোটি ডলার, মানে ৮০ কোটি টাকারও বেশী।

প্রতিষ্ঠাতা এ. পি. জিয়ানিনি সাহেব যৌবনে ইটালি থেকে আমেরিকার পশ্চিম কূলে স্যান ফ্র্যান্সিস্কোতে পদার্পণ করে ছোট একটা বন্ধকী কারবারের দোকান (প'ন শপ) খুলেছিলেন। ১৯০৪ সালে, তাঁর ৩৪ বছর বয়সে, লাখ তিনেক ডলার, মানে সে সময়ের লাখ ন'য়েক টাকা নিয়ে ব্যাঙ্ক অব আমেরিকা গঠন করেন। জিয়ানিনিও মাত্র দু'তিনজন কর্মী নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলেন আর দরকার হলে তিনিও শাস্ত্রীয় ব্যাঙ্কিংকে শিকেয় তুলে রাখতেন। তাছাড়া ব্যাঙ্ক অব আমেরিকারও আদি যুগের প্রধান মক্কেল (ক্লায়েন্ট বা কাস্টমার) ছিল যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলের ছোট ছোট খামারের মালিক, ক্ষুদ্রশিল্পের অতিক্ষুদ্র শিল্পপতি আর গরীব দোকানদার। সেদিনের প্রকাণ্ড সব মার্কিন ব্যাঙ্কাররা এই ছোটদের দিকে প্রায় ফিরেই তাকাতেন না। জিয়ানিনি

এই উপেক্ষিতদের দুঃখ দুর্দশা বুঝতেন আর জানতেন যে, কৃষকেরাই হলো জাতির মেরুদণ্ড। তাই তাদের চরম দুর্দিনে যখন কোনো ব্যাঙ্ক, কোনো মহাজন সাহায্য করতে এগিয়ে আসতো না, তখনই জিয়ানিনি তাঁর ছোট ব্যাঙ্কের সামান্য শক্তি নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াতেন। কাজেই বিপদ আপদ কাটিয়ে খামারের মালিকরা যখন আবার সুদিনের মুখ দেখলো তখন তারা প্রতিদানে জিয়ানিনিকে দিল তাদের সমৃদ্ধির ফল—প্রথমে লক্ষ লক্ষ, পরে কোটি কোটি ডলারের আমানত। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাঙ্ক অব আমেরিকা পৃথিবীর বৃহত্তম ব্যাঙ্কের পদমর্যাদা পেল। ১৯৬৬-র শেষে তার আমানত দাঁড়ালো ১২৩০০ কোটি টাকায় আর লগ্নী হলো ৮২০০ কোটি টাকার। ভারতবর্ষের মতো দু চারটে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ভার নেবার ক্ষমতা ব্যাঙ্ক অব আমেরিকা রাখে।

কিন্তু কার সঙ্গে কার তুলনা করছি? কোথায় গরুড়, জটায়ু, স্বর্ণঈগল আর কোথায় আমাদের ছোট পাখি চন্দনা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক আর তার ১৩০ কোটি টাকার ডিপজিট! আমাদের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক 'স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া'ই সাতষট্টির শেষে ডিপজিট দাঁড়িয়েছে মাত্র ৯৫৯ কোটি টাকার।

অবশ্য ইটালিয়ান বংশোদ্ভব জিয়ানিনির মজ্জাতে ছিল ব্যাঙ্কিং আর কর্মক্ষেত্র ছিল আমেরিকার মতো দেশ। ('ব্যাঙ্ক' শব্দটির উৎপত্তিই হলো ইটালিয়ান শব্দ 'বাংকা' থেকে। মধ্যযুগে ইটালির লম্বার্ড অঞ্চলের স্বর্ণকার ও শ্রেষ্ঠীরা ব্যাঙ্কিং প্রথার প্রচলন করে সারা বিশ্বে তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন)।

অনেক অনেক কম ডিগ্রিতে ফল পেয়ে থাকলেও নরেনবাবু ও তাঁর ছেলে বটুবাবুকে মনোবৃত্তির সমতার দিক দিয়ে জিয়ানিনির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই বটুবাবুই তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ মৌলিকতা ও অধ্যবসায় দিয়ে কোনো উন্নত দেশে কাজ করলে কি করতে পারতেন তা বলা যায় না।

ব্যাঙ্কিং ব্যবসাতে বাঙালীর ঐতিহ্য বলতে তেমন কিছুই ছিল না। নবাবী আমলে বাংলা দেশের সরকারি ব্যাঙ্কারের কাজ করতেন রাজপুতানা থেকে আগত জগৎ শেঠরা। 'জগৎ শেঠ' কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম ছিল না। মাণিকচাঁদ শেঠ দিল্লীর মুঘল বাদশা ফাররুকশিয়ারের মহাজনি করে বাদশাহী খেতাব পেয়েছিলেন 'জগৎ শেঠ'। তাঁর ভাইপো ফতেচাঁদ 'জগৎ শেঠ' ১৭১৩ সালে মুরশিদ কুলি খাঁর মহাজনি করতে বাংলা দেশে এলেন। তাঁর উত্তরপুরুষরা নবাবী আমলের পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির ব্যাঙ্কার হিসেবেও কাজ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই 'জগৎ শেঠ' নামে খ্যাত ছিলেন। এ অঞ্চলে দীর্ঘকাল বসবাসের পর তাঁদের দু'-এক পরিবার বংশধর এখন আধা বাঙালী হয়ে গেছেন—পুরো নয়।

১৮২৯ সালে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্‌যোগে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কথা তুলে অনেকে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন যে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে বাঙালীর ঐতিহ্য আছে। কিন্তু যে ব্যাঙ্ক মাত্র আঠারো বছর চলার পরে ১৮৪৭ সালে অবলুপ্ত হয়েছিল তার উদাহরণ দিয়ে এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে তাঁর কৈশোরে সেই ব্যাঙ্কে শিক্ষানবিস ছিলেন সেসব কথা বলে বাঙালীর মান যে বাড়ে তা নয়। ইতিহাসটা মোটেই গৌরবজনক নয়।

ভারতবর্ষে পাশ্চাত্ত্য মতে ব্যাঙ্কিং শুরু হয় ১৮০৯ সালে 'ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের' স্থাপনার সময় থেকে। তারপরে 'ব্যাঙ্ক অব বম্বে' প্রতিষ্ঠিত হলো ১৮৪০-এ আর 'ব্যাঙ্ক অব ম্যাড্রাস' ১৮৪৩-এ। (আশি বছর পরে ১৯২১ সালে এই সরকারি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক তিনটি একীভূত হয়ে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কে পরিণত হয়। ১৯৫৫ সালে জাতীয়করণ হয়ে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক আবার হয়ে গেল 'স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া'। সারা ভারতে এখন তার শাখা আছে প্রায় ১০০০)।

১৮৬৩ সালে 'ক্যালকাটা ব্যাঙ্কিং করপোরেশন' নামে কলকাতায় একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই ব্যাঙ্কের সাতজন ডিরেক্টরের মধ্যে চারজন ছিলেন ভারতীয়; তার মধ্যে আবার তিনজনই ছিলেন বাঙালী--দুর্গাচরণ লাহা, হীরালাল শীল ও পতিতপাবন সেন—জাতিতে সকলেই বোধ হয় সুবর্ণবণিক। কিন্তু ১৮৬৪ সালের ২রা মার্চ সেই ব্যাঙ্কের নাম হয়ে গেল 'ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া' (অধুনা ন্যাশান্যাল অ্যান্ড গ্রিন্ডলেজ) আর হেড অফিস চলে গেল লন্ডনে। যেটুকু বাঙালিত্ব ছিল তাও গেল। তারপরে অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানে বাঙালী যে 'বেঙ্গল ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক' করেছিল তারও পরিণতির স্মৃতি সুখকর নয়; যদিও ভেঙে পড়বার আগে সেই ব্যাঙ্ক বহু বাঙালী প্রতিষ্ঠানকে খাড়া করে দিয়ে গিয়েছিল।

আমাদের ছেলেবেলায় শহর, মহকুমা ও জেলায় জেলায় যেসব 'লোন অফিস' ছিল তারাও একে একে নিবে গেল। কিন্তু বাঙালীর একখাতের লোকসান তারা অন্য খাতে পুষিয়ে দিয়ে গেল; কারণ সেইসমস্ত লোন অফিসের লগ্নীর টাকায় বাঙালীরই ছোট বড় অনেক শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছিল।

বটুবাবু আর তাঁর সহকর্মীদের কুমিল্লা টাউনের আদালতের ভিড়ে নিউ স্ট্যান্ডার্ডের দ্বিতীয় অধিবেশনে ফেলে রেখে আপনাদের নিয়ে অ্যামেরিকা-ট্যামেরিকা ঘুরিয়ে আনলাম।

বেলা ৩টেয় আদালতের পোদ্দারি সেরে মোবাইল ব্যাঙ্কের মিছিল আবার হেড অফিসে ফিরতো। সেখানে দিবসের তৃতীয় অধিবেশনের কাজ চলতো সন্ধ্যে পর্যন্ত। এমনি করে কঠোর পরিশ্রমের ফলে নিউ স্ট্যান্ডার্ডের আমানত এসে দাঁড়ালো প্রায় ৭০,০০০ টাকায়।

একটা খবর দেওয়া হয়নি। বটুবাবুর বড় ক্লায়েন্টেল ছিল স্থানীয় মুসলমান পরিবারের মহিলাদের মধ্যে। একান্তভাবে কুমিল্লার ছেলে বলে এইসব ছোট বড় মুসলমান পরিবারের অন্দরমহলে বটুবাবু কারও ছিলেন ভাই, কারও ভাইপো বা ভাশুরপো, আবার কারও দেবরের মতো। তিনি তাঁদের ঘরে ঘরে গিয়ে চাচী, ফুফু, ভাবী আর বুবুদের কাছ থেকে টাকা জমা নিতেন আর চেক ভাঙিয়ে দিতেন। এ হলো সে যুগের পূর্ববঙ্গের হিন্দু মুসলমানের প্রীতির সম্পর্ক; শুনেছি এখনো নাকি পাকিস্তানী বাঙালী মুসলমানরা তাঁদের সংখ্যালঘু বাঙালী হিন্দু প্রতিবেশীকে ব্যক্তিগতভাবে মোটামুটি সেই চোখেই দেখেন; কিন্তু যখনই তাঁদের ইসলামী রাষ্ট্রের স্বার্থে কোনো আঘাতের সম্ভাবনা আছে বলে তাঁরা কল্পনা করেন তখনই সেই নেক-নজর পালটে যায় বলেই মনে হয়।

বটুবাবুর ব্যাঙ্কের প্রথম ব্রাঞ্চ খোলা হলো কুমিল্লা কোর্টের সাড়ে তিন টাকা ভাড়ার এক পানের দোকানে। শহরময় ঢিটিক্কার পড়ে গেল আর ব্যাঙ্কের ডিরেক্টাররা লজ্জায় হলেন অধোবদন।

সামাল দিলেন কোর্টের চীফ জজ সাহেব। নরেনবাবুর ছেলের খাতিরে সরকারি আইন বাঁচিয়ে আদালত-প্রাঙ্গণেই পাকা ভিত লোহার ফ্রেম আর টিনের চালের একটা ঘর তুলতে দিয়ে বটুবাবুর মান রাখলেন।

একই সময়ে বটু দত্ত মহেশবাবুর গ্যারাজ থেকে ব্যাঙ্কের হেড অফিস বাবার বৈঠকখানাতে উঠিয়ে নিয়ে এলেন।

তেইশ বছরের সপ্রতিভ ছেলে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে দেখে নরেনবাবু তাঁকে সংসারধর্মে প্রবেশ করানো উচিত মনে করে সেই অল্প বয়সেই বিয়ে দিলেন। সেটা তেত্রিশ সালের কথা। কিন্তু শানাইয়ের সুরের রেশ কাটতে না-কাটতেই বটুবাবু আবার ফুলটাইম অফিসের কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। তাঁর কাজের সেই হাই প্রেসার উত্তরোত্তর বেড়ে ইস্পাতের কারখানার অনির্বাণ ব্লাস্ট-ফারনেসের মতো হয়ে দাঁড়ালো; ক্লান্তি নেই, নেই ছুটিছাটা, কেবল প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তোলার নেশাতে দিনরাত মশগুল হয়ে রইলেন বটকৃষ্ণ দত্ত।

আজকের ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান শ্রী বি কে দত্ত নিজের জীবনের কাহিনী বলতে বলতে এইখানে এসে একটু থামলেন। বললেন: "জানেন মশায়, ছেলেমেয়ে আমার হয়েছিল অনেক আগেই, কিন্তু ১৯৪৬ পর্যন্ত ঘুমন্ত ছাড়া তাদের আমি খুব কমই দেখেছি। আর তারা আমাকে প্রায় দেখতেই পেত না। ছেচল্লিশ সালের পরে যখন আমার একটু দম ফেলবার সময় হলো তখন একদিন সকালে আমার এক মেয়ে আমাকে দেখে হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে বললো, এতদিনে সে তার বাবাকে দেখে ফেলেছে।" আবার একটু থেমে বললেন যে, তাঁর জীবনের সার্থকতার প্রধান সহায়ক হলেন তাঁর স্ত্রী উমা দেবী। কৈশোর থেকে আজ পর্যন্ত নেপথ্যে থেকে স্বামীকে শক্তি যুগিয়ে গেছেন। নিজের জন্যে কখনো কিছু দাবি করে স্বামীকে বিব্রত করেননি। যা পেয়েছেন তাতেই তিনি খুশী।

এমন করে বলার একটা বড় মানে আছে। দাম্পত্য চাওয়া পাওয়ার বোঝা অনেক প্রতিভার উন্মেষ হতে দেয়নি, এ আমি জীবনে বহু দেখেছি।

সেদিনের যুবক বটু দত্ত তো এই হাড়ভাঙা খাটুনি না-ও খাটতে পারতেন। যশস্বী আইন-জীবী নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত তো তাঁর ভালো প্র্যাকটিস ছেড়ে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশন গড়ে তোলবার ব্রত না নিলে পারতেন। স্বর্গীয় ইন্দুভূষণ দত্ত তাঁর জমিদারি ছেড়ে 'কুমিল্লা ইউনিয়নে'র প্রাণ-প্রতিষ্ঠা না করলেও পারতেন আর তাঁর ভাই ডঃ শান্তিভূষণ দত্ত ব্যারিস্টারির পসার নিয়েই সসম্মানের সুখে থাকতে পারতেন। স্বর্গীয় জ্যোতিষচন্দ্র দাশ 'বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক' নিয়ে মাথার ঘাম পায়ে না ফেলে তাঁর অডিট ফার্মের ভালো ব্যবসা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন; আর উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহনের বংশতিলক স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় হুগলি ব্যাঙ্ক তৈরি না করে জমিদারি আর রাজনীতি নিয়েই সমাজের উচ্চ শিখরে বিরাজ করে যেতে পারতেন।

কীসের জন্যে এঁরা স্বস্তি ও শান্তি বিসর্জন দিয়ে পরের ধনে পোদ্দারির মতো গভীর দায়িত্বপূর্ণ কাজ হাতে নিতে গেলেন?

ধনবিজ্ঞানী বলেছেন যে, মূলধন হলো অতীত শ্রমের ফসল, যা দিয়ে বর্তমান শ্রমকে পুষ্ট করা হয়। ব্যাঙ্কারের কর্তব্য হলো সেই অতীত শ্রমের উদ্বৃত্ত ফসলকে গোলাঘরে পচতে আর

ইঁদুর-আরশোলার ভক্ষ্য হতে না দিয়ে তার পুষ্টি থেকে নতুন প্রাণের সঞ্চার করা আর অর্ধাহারে ক্ষীণ পুরাতনকে পুনরুজ্জীবিত করা; বন্ধ জলাকে স্রোতস্বিনীতে পরিণত করা। নিজে মূলধনের স্রষ্টা না হয়েও মূলধন যে মহাজনের কাছে মজুত আছে তা নিয়ে এসে উদ্যোগী খাতকের হাতে তুলে দেওয়া। সেই খাতকের মাধ্যমে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে মূলধন প্রয়োগ করাই হলো ব্যাঙ্কারের মূল কর্তব্য।

বাংলা দেশে কি ব্যাঙ্ক ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। ভালো ভালো বিদেশী ব্যাঙ্ক, ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক, অবাঙালী ব্যাঙ্ক ছিল। কিন্তু উদ্যোগী বাঙালীকে সাহায্য করতে তারা বেশি দূর এগিয়ে আসতো না।

নরেনবাবু ইন্দুবাবুরা অনেক বেশি আরামের কাজ ছেড়ে প্রকাণ্ড ঝুঁকি নিয়ে বন্ধুহীন বাঙালীর সহায়তায় এগিয়ে এলেন। লক্ষ লক্ষ বেকার বাঙালীর কর্মসংস্থানের পথ করে দিয়ে তাঁরা আজ আমাদের বরেণ্য। কলকাতার ময়দানে বাঙালী ব্যাঙ্কিং-এর এইসব দিক্‌পালদের মূর্তি স্থাপনা করে তাঁদের জন্ম ও মৃত্যু দিনকে জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করা উচিত। তাঁদের তৈরী ব্যাঙ্কগুলি মিলিত হয়ে আজ যে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের মতো বিরাট একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, না হোক সেটা ব্যাঙ্ক অব আমেরিকার মতো সাতমহলা প্রাসাদ, গরিব বাঙালীর এই দোতলা পাকা ইমারতই গর্বের বস্তু। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এঁরা অসংখ্য বাঙালীর কর্ম ও অন্নের সংস্থান করে গেছেন। ব্যক্তির নয়—এ হলো সমষ্টির লক্ষ্মীলাভ।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের জন্ম হয়েছিল ১৯১৪ সালে, সে কথা আগেই বলেছি। তারপরে ১৯১৮ সালে বেঙ্গল সেন্ট্রাল ও ১৯২২-এ কুমিল্লা ইউনিয়ন স্থাপিত হলো। সব শেষে ১৯৩২-এ হুগলি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্কের কার্যকরী মূলধন কিছুটা বাড়তেই বটুবাবু ছোট চাষীর কাছে লগ্নী করার সঙ্গে বড় চা-করদেরও তালিকাভুক্ত করার কথা ভাবলেন। চা-শিল্পে নিউ স্ট্যান্ডার্ডের প্রথম অ্যাডভান্স হলো মাত্র ১০,০০০ টাকা। নিলেন সিলেটের টী-প্ল্যান্টার মৌলবী আবদুর রশিদ তাঁর ছোট্ট 'দিলখুশা' চা-বাগানের জন্য।

১৯২৯।৩০ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দায় ভারতবর্ষের চা-করদের মহাসংকটের যুগ এলো। চায়ের ব্যাপারে ইংরেজ প্ল্যান্টারদের স্বার্থ খুব বেশি জড়িত ছিল বলে চা-বাগিচার আয়তন সংকোচন প্রভৃতির আইন-কানুনের প্রবর্তন হলো। শিল্পটি এতে বাঁচলো বটে, কিন্তু বাঙালী চা-করদের বিপদ কাটলো না। ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর পিছনে বিলিতী ব্যাঙ্ক ও বিনিয়োগ সংস্থারা প্রচুর অর্থবল নিয়ে হাজির থাকতেন, কিন্তু দেশীয় চা-করদের কেউ ছিল না।

সেই সময়ে কুমিল্লার ব্যাঙ্কাররা বলিষ্ঠ মনোবৃত্তি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। ব্যাঙ্কিং করপোরেশন ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে দেশীয় চা-করদের লক্ষ লক্ষ টাকা যোগালেন। সামর্থ্য অনুযায়ী নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্কও ছোট করে সেই কাজ আরম্ভ করলেন। উত্তরকালে নিউ স্ট্যান্ডার্ডের অ্যাডভান্স এই খাতে লক্ষ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছিল।

যদিও নিউ স্ট্যান্ডার্ডকে সকলেই প্রসিদ্ধ নরেন দত্ত মশায়ের ছেলের গড়া ব্যাঙ্ক বলে জানতেন

এবং ধনী দরিদ্র সকলেই সেই কথা ভেবে এই ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, কিন্তু বটুবাবু তাঁর কার্যসূচীতে একটি নীতি দৃঢ়ভাবে মেনে চলতেন। কুমিল্লা শহরের বাইরে যে সমস্ত ছোট শহরে ব্যাঙ্কিং করপোরেশন বা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের শাখা অফিস ছিল সেই সব স্থান পরিহার করে চলতেন। এমন কি ১৯৪০-এর আগে কলকাতাতেও কোনো ব্রাঞ্চ খোলেননি।

কুমিল্লার বাইরে নিউ স্ট্যান্ডার্ডের প্রথম শাখা অফিস হলো শিলচর শহরে। এই সময়ে শ্রীহিমাংশু দাস ও শ্রীধীরেন ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন উদ্যোগী যুবক বটকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন। নিউ স্ট্যান্ডার্ডের সকল কর্মীরই ব্যাঙ্কের জন্যে গভীর একটা মমত্ববোধ ছিল। তার বিশেষ পরিচয় তাঁরা দিয়েছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। জাপানী আক্রমণের ভয়ে আসামের লোক যখন ব্যাঙ্কের টাকা ও অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে সীমান্ত অঞ্চল ছেড়ে পালাচ্ছে, নিউ স্ট্যান্ডার্ডের কর্তব্যপরায়ণ কর্মীরা তখন সকলেই স্থির হয়ে নিজের নিজের কাজে মোতায়েন ছিলেন। এ সৌভাগ্য অন্য অনেক ব্যাঙ্কারেরই হয়নি। দৃষ্টান্ত আছে যে, বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে তখন একাধিক ব্যাঙ্কের কর্মচারী ব্যাঙ্কের তহবিলের টাকা ফেলে পালিয়ে এসেছিলেন কিংবা লুট হয়ে গিয়েছে বলে কোনো কোনো ব্যাঙ্কের সমূহ ক্ষতি করে দিয়েছিলেন।

আর এক বিষয়ে সমপর্যায়ের ব্যাঙ্কদের চাইতে নিউ স্ট্যান্ডার্ডের নীতি ভালো ছিল। তা হলো 'লিকুইডিটি' অর্থাৎ আমানতের অনুপাতে যথেষ্ট নগদ টাকার সংস্থান বজায় রাখার নীতি। এ নীতিও বটুবাবু তাঁর বাবার কাছ থেকে আগাগোড়া শিখে এসে নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করতেন।

ডিপজিটারের কাছে ব্যাঙ্কের দেনার একটা বড় অংশ নগদ কিংবা নগদের মতো করে রাখা ব্যাঙ্ক-মাত্রেরই অবশ্যকর্তব্য, কারণ ব্যাঙ্কের ওপর মানুষের আস্থা জিনিসটা বেজায় ঠুনকো। কী কারণে যে সেই আস্থা হঠাৎ টলে যায় তা দেবাঃ ন জানন্তি। সেইজন্যেই আধুনিক ব্যাঙ্কিং ডিপজিটারের জমার টাকাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। মেয়াদী আমানত অথবা 'টাইম লায়াবিলিটি' এবং ডিপজিটার চাওয়া মাত্রই ক্যাশ থেকে বের করে দিতে হবে এমন টাকা মানে 'ডিমান্ড লায়াবিলিটি'। এই 'ডিমান্ড লায়াবিলিটি'-র জন্যে ব্যাঙ্ক সর্বদাই নগদ টাকা ছাড়াও এমন কয়েকটা খাতে টাকা লাগিয়ে রাখে যা মুহূর্তে নগদে পরিণত করা যায়। আর লগ্নী করে লাভ করার পথ রাখে 'টাইম লায়াবিলিটি' ইত্যাদি দীর্ঘমেয়াদী দেনার টাকা খাটিয়ে।

এমনিতে সাধারণ ডিপজিটারের অহেতুক বা সহেতুক ভয় বা 'প্যানিক' থেকে ব্যাঙ্কের ওপর 'রান' হবার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে প্রচুর আছে। বছর কুড়ি আগে বাঙালী ব্যাঙ্কের এমনি এক দুর্দিন এসেছিল।

কতকগুলি ক্ষীণবল ব্যাঙ্ক বলতে গেলে হার্ট ফেল করে মরলো। পরিচালকের অন্যায়ের জন্যে কয়েকটা গেল। তখন ব্যাঙ্কের বাঙালী মহাজনরা আত্মবিস্মৃত হয়ে পাগলের মতো ছুটলো, কে আগে বাঙালী ব্যাঙ্ক থেকে নিজের পুঁজিটি উদ্ধার করতে পারে, তার জন্যে। ফলে কয়েকটা শক্তিশালী ব্যাঙ্কও শহীদ হলো। বটুবাবু 'নাথ ব্যাঙ্ক'-এর উদাহরণ দিলেন। বন্ধ হবার আগে ও পরে 'নাথ ব্যাঙ্ক' নাকি তার ডিপজিটের বারো তেরো আনা পরিশোধ করেছিল। এবারেও সেই একই কথা—এই সব প্রতিষ্ঠানের মৃত্যুর আগে তাদের দাক্ষিণ্য বহু শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থাকে পুষ্ট করে গিয়েছিল। উত্তরকালে সেই সংস্থাগুলি সমৃদ্ধ হয়ে বহু লোকের অন্নসংস্থান করেছিল।

বাঙালী ব্যাঙ্কিং-এর এই পর্ব ১৯২৯-৩০ সালের যুক্তরাষ্ট্রের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তখন আমেরিকার প্রায় ৭০০০ ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদেরই লগ্নী দিয়ে গড়া শিল্প ও বাণিজ্য বেঁচে বর্তে থেকে কালক্রমে দেশের বিরাট সমৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

ব্যাঙ্কের ওপর আর একরকমের চোটও মাঝে মাঝে আসে। কোনো শক্তিশালী বা ধনী লোক রেগে গিয়েও ব্যাঙ্ককে কাবু করে ফেলবার যোগাড় করে। অধুনা বৃহত্তম ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা স্যার সোরাবজী পোচকানওয়ালাকে একটানা বেশ কয়েক বছর এইভাবে একটি লোকের উপদ্রব সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁর নাম শ্যামদাসানি। তিনি আগে স্যার সোরাবজীর একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। কি কারণে যেন সোরাবজী তাঁকে বরখাস্ত করেন। শ্যামদাসানি ক্ষেপে গিয়ে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। তারপরে ভারতবর্ষের শহরে শহরে ঘুরে পোচকানওয়ালার নামে অপপ্রচার করে নিয়মিত কিছুদিন পরে পরে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ওপর 'রান' করালেন। সোরাবজীর আবার কয়েকটি ধনকুবের বন্ধুও ছিলেন। তাঁদের সোরাবজীর ওপর আস্থা তো ছিলই উপরন্তু তাঁরা দূরদর্শী ছিলেন। দেশীয় ব্যাঙ্কের উন্নতির জন্যেই তাঁরা বার কয়েক মোটা মোটা টাকা ডিপজিট দিয়ে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ককে বাঁচিয়েছিলেন।

শুধু সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের মতো বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কেন, বিলেতের সরকারি ব্যাঙ্ক, মানে 'ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডে'র ওপরেও একবার এইরকম এক হামলা হয়েছিল বহুকাল আগে।

জার্মান য়িহুদী ধনকুবের রথসচাইল্ড পরিবার অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপের রাজা-বাদশাদের জগৎ শেঠ, মানে মহাজন ছিলেন। অর্বুদ-পতি এই পরিবারের এক একজন এক এক রাজ্যে বাস করে মহাজনী করতেন। ইংল্যান্ডে যে ব্যারন রথসচাইল্ড ছিলেন তিনি অথবা তাঁর বাবা (কাহিনীটা আমার অনেক আগে পড়া, তাই ঠিক নামটি মনে নেই) একবার কী একটা কাজে তাঁর এক কর্মচারীকে 'ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডে' পাঠিয়েছিলেন। ব্যাঙ্কের লোকেরা কুক্ষণে সেই ভদ্রলোকের সংগে খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছিলেন। খবর পেয়ে রথসচাইল্ড সাহেব রেগে আগুন। ইংল্যান্ডে তখন স্বর্ণমানের (গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের) যুগ। আর ব্যাঙ্কের কারেন্সি নোট হলো সরকারের কাটা দর্শনী হুণ্ডি বা তমসুক বা হ্যান্ডনোট, যা বলেন।

আমাদের ৫।১০।১০০ টাকার নোটগুলির লেখা যদি ভালো করে পড়ে দেখেন তো দেখবেন তাতে সরকারের বকলম রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর বাহাদুর সই করে ছাপার হরফে মুচলেকা দিয়েছেন, "I promise to pay the bearer on demand the sum of rupees...at any office of issue." মানে সরকার ওইসব হ্যান্ডনোট কেটে আমাদের কাছ থেকে টাকা ধার করেছেন, আর আমরা গিয়ে সেই হ্যান্ডনোট দাখিল করে টাকা চাইলেই সরকার সোনার টুকরো বা চাঁদির টুকরো আমাদের দিতে বাধ্য; না পারলে ফেল। আমাদের আস্থা বা বিশ্বাস ভাঙিয়ে সরকার রাজ্যপরিচালনা করছেন, ধার ক'রে। (সেই সরকারের আবার কত আব্দার দেখুন! আমাদের খাতক হয়েও আমাদের ওপর কী হম্বিতম্বি। ট্যাক্স দাও, ডিউটি দাও, হেন কর, তেন কর, কত কী! নয় কি? আবার সোনাচাঁদির তো আমাদের ছড়াছড়ি—নোট ভাঙিয়ে তা চাইলেই যেন পাচ্ছি কত)।

ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডে ওই ঘটনার পরদিন রথসচাইল্ড সাহেব স্বয়ং একগাদা বাক্স পেঁটরা

ব্যাগ আর বেশ কয়েকটি লোক নিয়ে ব্যাঙ্কের থ্রেডনীডল স্ট্রীটের অফিসে চড়াও হলেন। খোদ রথসচাইল্ড ব্যাঙ্কে এসেছেন শুনে ব্যাঙ্কের গভর্নর সাহেব ছুটে এসে তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ রথসচাইল্ড কোনো কথা না বলে কয়েকটা ব্যাগ থেকে তাড়াতাড়া নোট বের করে বললেন সেই নোট ভাঙিয়ে সোনা চাই। ব্যাঙ্কের অন্য সব কাজ ফেলে কর্মচারীদের মধ্যে রথসচাইল্ডকে সোনা সাপ্লাইয়ের ধুম লেগে গেল। ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড ফেল হয় হয়, তখন গভর্নর সহ ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের কর্মচারীরা সাহেবের কাছে কৃতকর্মের জন্যে ক্ষমা চেয়ে সে যাত্রা রক্ষা পেলেন।

এখন কিন্তু আমাদের দেশে শেডিউল্ড ব্যাঙ্কের ওপর 'রান' হবার কোনো কথাই ওঠে না; ঘটনাচক্রে যদিই বা কখনো তা হয় তো কুফল কিছুই হবে না। একে তো রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কড়া হুঁশিয়ারী সব ব্যাঙ্কের ওপর সর্বক্ষণ লেগেই আছে, উপরন্তু এখন ব্যাঙ্কের কাছে জনসাধারণের ডিপজিট আংশিকভাবে ইনসিওর করা থাকে। তা সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যাঙ্কের ওপর ডিপজিটারের অতিরিক্ত চাপ কখনো আসে তো সেই ব্যাঙ্ককে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার মাধ্যমে অন্য ব্যাঙ্কের সঙ্গে রাতারাতি 'অ্যামালগ্যামেশন' করিয়ে পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার বিকল্প ব্যবস্থাও হয়েছে।

ডিপজিট ইনসিওরেন্সের এই চমৎকার ব্যবস্থাটি আবার এদেশে প্রবর্তিত হয়েছে মুখ্যত আমাদের বি কে দত্ত মশায়ের জন্যেই। বিদেশ থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করে বটুবাবু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে ১৯৪৮ সালে বাংলা দেশের ব্যাঙ্কিং-এ ঘোর সঙ্কটের সময়ে কথাটি পেড়েছিলেন।

তার পরে বছর চারেক প্রস্তাবটি ধামাচাপা পড়েছিল। ১৯৫২ সালে যে 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কমিটি অন ফাইন্যান্স ফর প্রাইভেট সেক্টর' নিযুক্ত হলো তাতে এই প্রসঙ্গটিকে নতুন করে গুরুত্ব দিলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তখনকার গভর্নর স্যার রামা রাও। মনে হয় নেপথ্য থেকে তদানীন্তন অর্থ-উপমন্ত্রী শ্রীঅরুণ গুহও এ বিষয়ে চাপ দিয়েছিলেন। শ্রী এ ডি শ্রফ এই কমিটির সভাপতি হলেন। শ্রীশ্রফ আবার কমিটি থেকে বি কে দত্ত মশায়কে বেছে নিয়ে 'ব্যাঙ্ক ডিপজিট ইনসিওর‍্যান্স' সাব-কমিটির একক নেতৃত্বের ভার দিলেন। বেশি বয়সের ধুরন্ধর ব্যক্তিরা থাকতে ৪২ বছর বয়সের বটুবাবুকে এই দায়িত্ব দিয়ে শ্রী এ ডি শ্রফ যে সম্মান দেখিয়েছিলেন, বটুবাবু তা আজও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন। শ্রীদত্ত বলেন যে, এই ইনসিওর‍্যান্স বিষয়ে সেই একই সময়ে পৃথকভাবে শ্রীরণেন্দ্রমোহন মিত্র নামে আর এক বাঙালী ব্যাঙ্কারও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে কথাটা পেড়েছিলেন এবং কাগজে লেখালিখিও করেছিলেন। শ্রীমিত্রের গড়া 'ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়ন' এখন 'ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক' নামে বাঙালীর দ্বিতীয় ব্যাঙ্কটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর রণেনবাবু এখন ব্যাঙ্কিং ছেড়ে 'ভারত ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ' ও 'জি-ই-সি' এই দুটি সংস্থার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন।

বটুবাবুর চেষ্টাতেই ভারতীয় ব্যাঙ্কিং-এ এক নতুন অধ্যায় রচিত হলো। এ শুধু তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, বাঙালীর গৌরবের বিষয়।

ব্যাঙ্কিং জগতে বাঙালীর গৌরব বৃদ্ধিতে আরও যাঁদের উল্লেখ্য অবদান আছে তাঁরা হলেন

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং বর্তমান ডেপুটি গভর্নর শ্রীঅর্ধেন্দু বক্সী মশায়।

অমানুষিক পরিশ্রমে মাঝে মাঝে যখন শরীর মন অবসন্ন হয়ে পড়তো বটকৃষ্ণ তখন বইয়ের আড়ালে আশ্রয় নিতেন। এই পাঠের প্রেরণা যুগিয়েছিলেন তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু যশস্বী কবি ও সাহিত্যিক শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য। অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রতাত্ত্বিক বহু বই পড়ে বটুবাবু নিজের অসমাপ্ত বিদ্যার কিছুটা পুরিয়ে নিলেন। সেই বিদ্যা ও বটুবাবুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কিছুটা প্রতিফলন আমরা দেখতে পেয়েছি তাঁর প্রদত্ত নানা বক্তৃতা ও প্রবন্ধে। ১৯৬০ সালে তিনি 'অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার স্মৃতি বক্তৃতাবলীর' উদ্বোধনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Monetary Discipline and Indian Banking' বিষয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এই প্রসঙ্গে তা উল্লেখযোগ্য।

কেবল পদাধিকারের জন্যই নয়, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও বহুমুখী প্রতিভার জন্যেও শ্রীবটকৃষ্ণ দত্ত সরকারী আধা-সরকারী ও বে-সরকারী বিভিন্ন সংস্থার মাননীয় সভ্য ও সভাপতি। কয়েকটি সংস্থার নাম করি—ন্যাশানাল ক্রেডিট কাউন্সিল (সভ্য), ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া (ডিরেক্টর), ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স করপোরেশন (ডিরেক্টর), এগ্রিকাল-চার্যাল রিফাইন্যান্স করপোরেশন (ডিরেক্টর), পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড অব ইণ্ডাস্ট্রিজ (চেয়ারম্যান), ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন (কমিটি মেম্বার), বোর্ড অব গভর্নরস—ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাণ্ড বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট (সভ্য), ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কার্স (সভ্য), এফ আই সি সি আই (সভ্য) এবং কলকাতা পোর্ট কমিশনের কমিশনার। তিনি এখন বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারেরও প্রেসিডেণ্ট। এইসব সংস্থা ছাড়াও আর যে সমস্ত পদে ছিলেন বা আছেন তার দীর্ঘ তালিকা এখানে লিপিবদ্ধ করবার স্থানের অকুলান আছে।

যুদ্ধের তীব্রতা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিউ স্ট্যাণ্ডার্ডের কাজ বড়ো বড়ো ধাপে বেড়ে যেতে লাগলো। কিন্তু ততদিনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতকগুলি ছোট ব্যাঙ্কের কার্যকলাপে ত্রুটি দেখে তার পরিচালনার ওপর সতর্ক দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করেছে। ১৯৩৪ সালে আইন প্রণীত হয়ে ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেই আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ ছিল; এখনকার মতো কড়া শাসনের পথ খোলা ছিল না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তদানীন্তন গভর্নর স্যার চিন্তামন দেশমুখ সব ক্ষুদ্রাকার ব্যাঙ্ককেই অনুরোধ করছিলেন যে, হয় তাঁরা কয়েকটিতে মিলে একটা বড় প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলুন, নয়তো ছোটরা বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে 'অ্যামাল গ্যামেশন' করুন। না হলে, এমন দিন আসছে যখন ছোটদের আর কাজ করবার ক্ষমতা থাকবে না। তা হবে জাতির পরম অকল্যাণের বিষয়।

স্যার চিন্তামনের উপদেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বটুবাবু বাবার সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারপর ১৯৪৬-এর মে মাসে বৃহত্তর কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের সঙ্গে ছোট নিউ স্ট্যাণ্ডার্ডের অ্যামালগ্যামেশন ঘটলো। তখন নিউ স্ট্যাণ্ডার্ডের শাখা ছিল ১৪টি, ডিপজিট ৩ কোটি

টাকা আর মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। এই অ্যামালগ্যামেশনের ফলে শ্রী বি কে দত্ত হলেন কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং-এর ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

এর পরের ঘটনাবলী যেন কয়নার ভূমিকম্পের মত ভীষণ। বাঙালীর দুঃসহ ক্ষতির মূল ছেচল্লিশের কলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গা এবং সাতচল্লিশের বঙ্গব্যবচ্ছেদ বাঙালী ব্যাঙ্কিং-এর ওপর কুঠারাঘাত করলো। ফলে মাঝারি ও ছোট বাঙালী ব্যাঙ্ক তাসের ঘরের মত ধসে পড়লো। ক্ষুদ্রতম, ক্ষুদ্রতর থেকে সাধারণের অনাস্থা বৃহতের দিকে এগোতে ১৯৫০-এর মে মাসে বড় নাথ ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করলো।

বাঙালী ব্যাঙ্কগুলিকে একীভূত করার সলাপরামর্শ ১৯৪৮-এ সংকট শুরু হবার সময় থেকেই চলছিল, কিন্তু নানা কারণে তা এতদিন হয়ে ওঠেনি। নাথ ব্যাঙ্কের পতন হঠাৎ যেন সকলকে আবার সজাগ করে তুললো। এক সপ্তাহের মধ্যেই বোম্বাই থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর মেখরি সাহেব ছুটে এলেন। চারজন বড় বাঙালীকে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে ডেকে পাঠালেন। সেই মিটিং-এ স্বর্গীয় ধীরেন মুখার্জি, ডঃ শান্তিভূষণ দত্ত, শ্রীবটকৃষ্ণ দত্ত এবং বেঙ্গল সেন্ট্রালের তরফে শ্রী এ কে রায় উপস্থিত ছিলেন। বটুবাবু তখন সবে কঠিন অসুখে ভুগে উঠেছেন, তাই তাঁকে ইনভ্যালিড চেয়ারে করে সেই মিটিং-এ যেতে হয়েছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে ছিলেন শ্রীমেখরি, কলকাতা অফিসের ম্যানেজার শ্রীভার্গব বোধহয় ছিলেন, আর ছিলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেডিউলড ব্যাঙ্ক বিভাগের কর্তা শ্রী কে সি মিত্র।

এই গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছিল স্মৃতিমন্থন করে আঠারো বছর পরে সেদিন ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান কিছু কিছু আমাকে বললেন। কতকগুলি নাটকীয় সংলাপ এখনও তাঁর পরিষ্কার মনে আছে। নীচে তা লিপিবদ্ধ করছি।

শ্রীমেখরি।—বন্ধুগণ, এই সমূহ বিপদ থেকে বাংলা দেশের বাকী ব্যাঙ্কগুলির রক্ষা পাবার কি কোনো উপায় নেই?

শ্রী বি কে দত্ত।—(কেউ ঠিক করে কোনো উত্তর দিতে পারছেন না দেখে একটা কাগজে তাড়াতাড়ি একটি বিবৃতি লিখে, প'ড়ে শোনালেন) আমি সানন্দে ঘোষণা করছি যে, কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং, কুমিল্লা ইউনিয়ন, বেঙ্গল সেন্ট্রাল ও হুগলি ব্যাঙ্ক একীভূত হবার সিদ্ধান্ত করেছেন।"—(মেখরি সাহেবের জবানিতে এইটি তৈরী হলো)।

শ্রীমেখরি। (অন্য তিনজনের মৌনতা লক্ষ্য করে বটকৃষ্ণকে) বাট, হোয়াট অ্যাবাউট ইওর ফ্রেন্ডস?

তখনও সকলে নীরব। মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ভেবে শ্রী কে সি মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে বি কে দত্ত মশায় তখুনি এই দারুণ খবরটা প্রচারের জন্যে পি টি আই অফিসের দিকে পা বাড়ালেন। ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়েছেন এমন সময়ে ধীরেন মুখার্জি মশায় এক প্রশ্ন করে বসলেন।

শ্রীমুখার্জি।—কিন্তু এই অ্যামালগ্যামেশন কী বেসিসে (ভিত্তিতে) হবে?

(এই জাতীয় একীকরণে সাধারণত একীভূত প্রতিষ্ঠানগুলির দেনাপাওনার হিসেব করে

পরস্পরের শেয়ার ও সম্পত্তির মূল্য ধার্য ও বণ্টন হয়। কম বেশি উদ্বৃত্ত বা ঘাটতির ভিত্তিতে একজনের সম্পত্তির দাম অন্যের চাইতে বেশি বা কম হয়)।

শ্রীদত্ত।—(এক মুহূর্ত মৌন থেকে) অ্যামালগ্যামেশনের 'বেসিস' হবে 'অ্যাট পার'। (অর্থাৎ হিসেবে যাই বেরোক না কেন, সবাই সমান পাবে)।

পি টি আই-এর ম্যানেজার শ্রীনৃপেন ঘোষ সেই রাত্রেই রেডিও-তে এবং পরদিন সব কাগজের মারফত এই সুসংবাদটি প্রচার করে দিলেন।

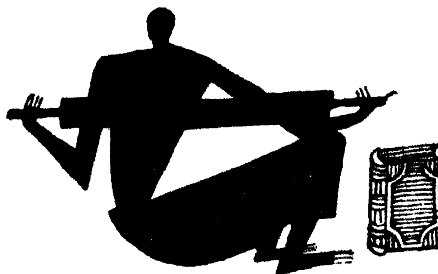
আধঘণ্টার মধ্যে বাঙালীর এত গুরুতর একটি সমস্যার সমাধানের কথা আগে কখনো শুনিনি। সেদিন যদি বিখ্যাত ব্যাঙ্কারদের মধ্যে একজনও বয়ঃকনিষ্ঠ বটুবাবুর ক্ষিপ্র সমাধানে বেঁকে বসতেন তাহলে আজ বাংলাদেশে বাঙালীর কোনো ব্যাঙ্কেরই অস্তিত্ব থাকতো কিনা সন্দেহ। তাঁদের বিচারবুদ্ধির জন্যে তাঁরা বাঙালী জাতির ধন্যবাদার্হ। সেই সিদ্ধান্তের ফলে বাঙালীর শিল্প ও বাণিজ্যে আজ অগুনতি বাঙালীর কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং আমরা বাঙালীরা বিপথে না গেলে আরও হবে।

জন্মের সময়ে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের সর্বসাকুল্যে ডিপজিট ছিল ২৭ কোটি টাকা, আজ সেখানে ১৩০ কোটি টাকা · লগ্নী যেখানে ছিল ১২/১৩ কোটি, আজ সেখানে ৮৮ কোটি টাকা : পেড-আপ ক্যাপিট্যাল অবশ্য সামান্যই বেড়েছে, এখন তা হলো ২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা, আর রিজার্ভ এসে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকাতে।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াকে বাদ দিলে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং-এ ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের স্থান এখন ষষ্ঠ। বাঙালীর এই অর্বাচীন ব্যাঙ্ক অল্পকাল আগে আসনের পারম্পর্যে প্রাচীন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ককেও পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে।

আর মোবাইল ব্যাঙ্কের সাইকেল মিছিলের নবীন পাইলট প্রৌঢ়ত্বের সীমা পার হবার আগেই বাঙালীর একান্ত নিজস্ব ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের হাল নিপুণ হাতে ধরে রয়েছেন।

২৭ এপ্রিল, ১৯৬৮





চৌদ্দ

রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পের যজ্ঞনাথ নিরুদ্দেশ বংশধরের জন্যে ঘড়া ঘড়া টাকা আর মোহর মাটির নীচের ঘরে জমা করে অজানতে নিজের নাতি গোকুলকেই পাথর চাপা দিয়ে যখ বানিয়ে ফেললেন। তারপর যক্ষের আসল পরিচয় পেয়ে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে পাগল হয়ে গেলেন।

সে যুগে ব্যাঙ্ক থাকলে কিন্তু গোকুলকে অমন বীভৎসভাবে মরতে হতো না। ওয়ারিশের অনুপস্থিতিতে সেই হাজার হাজার টাকা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অথবা ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল ব্যাঙ্কে 'ফিক্সড ডিপজিট' করে অ্যাটর্নিকে দিয়ে উইল করিয়ে রাখলে যজ্ঞনাথের সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো। টাকাটা সুদে বাড়তো, শিল্প ও বাণিজ্যে খেটে দেশের উন্নতিও করতে পারতো, আর ভবিষ্যতে গোকুল কিংবা তার বাবা বৃন্দাবন অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরে এসে 'সাকসেশন সার্টিফিকেট' দেখিয়ে টাকাটার মালিকানা দাবী করতো।

গত প্রবন্ধে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক আর তার চেয়ারম্যান বটকৃষ্ণ দত্ত মশায়ের কথা সবিস্তার বলেছি। ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল ব্যাঙ্ক নামে বাঙালীর যে আর একটিমাত্র ব্যাঙ্ক আছে তার কথা বলা হয়নি।

পূর্ব বাংলার ভাগ্যকুলের ধনকুবের রায়বংশের স্বর্গত যদুনাথ রায় মশায়ের চেষ্টায় ১৯৪০ সালে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর আত্মীয় স্বর্গত প্রিয়নাথ রায় ও কুমার রমেন্দ্রনাথ রায় কলকাতার প্রসিদ্ধ লাহা পরিবারের ডঃ সত্যচরণ লাহা এবং ইনসিওরেন্স জগতে বিখ্যাত স্বর্গত অবিনাশচন্দ্র সেন মশায়কে নিয়ে যদুনাথবাবু ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়্যালের প্রথম ডিরেক্টর বোর্ড গঠন করেন।

১৯৪৭ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের কাজ বেশ ভালোই চলেছিল, কিন্তু পার্টিশানের পরে বিপদ হলো ব্যাঙ্কের কয়েকটি সমৃদ্ধ পাকিস্তানী শাখা নিয়ে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি শাখার

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৭, ওয়েলেসলি প্লেস
কলিকাতা-১

ব্যবসাতে ধীরে ধীরে ভাটা পড়ে গেল। তবুও সেই সব বাধা বিপর্যস্তর মধ্য দিয়েও ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ব্যাঙ্কের কাজ ঢিমেতালে চলল।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হবার পরে অন্য ছোট ছোট বাঙালী ব্যাঙ্কের ওপরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশেষ দৃষ্টি রেখেছিল। ছোট ছোট ব্যাঙ্ককে একত্রিত করে শক্ত সবল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে নীতি অবলম্বন করেছিল তার বিবরণ আমি পূর্ববর্তী প্রবন্ধে দিয়েছি। তদনুসারে ১৯৬৩ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্দেশ দিল যে, 'প্রবর্তক ব্যাঙ্ক' ও 'ব্যাঙ্ক অব বাঁকুড়া' নামে অপেক্ষাকৃত ছোট দুটি বাঙালী ব্যাঙ্ক যেন বৃহত্তর ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়্যালের সঙ্গে মিলিত হয়। তা-ই হলো এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল ব্যাঙ্ক ছোট ব্যাঙ্ক দুটির সম্পূর্ণ দেনা ও পাওনার দায়িত্ব নিল।

বাঙালীর আরও দুটি ব্যাঙ্ক 'মেট্রোপলিটান' ও 'সাদার্ন' তখনো একক ব্যবসা চালাচ্ছিল। (পূর্ববর্তী প্রবন্ধে উল্লেখিত 'ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়ন' নামে ব্যাঙ্কটি ইতিপূর্বেই মেট্রোপলিটানের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।) ১৯৬৪ সালে ডিপজিটাররা হঠাৎ তাদের ওপর আস্থা হারালো। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষিপ্র হস্তক্ষেপে সেই দুই ব্যাঙ্ক কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে প্রথমে পাওনাদারদের যথাক্রমে বারো আনা ও দশ আনা পেমেন্ট করে দিল; তারপরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্যে ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়্যালের সঙ্গে যুক্ত হলো। ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল ব্যাঙ্ক এখন একদিকে ওই দুটি ব্যাঙ্কের পাওনার টাকা আদায় করছে ও অন্যদিকে বাকী দেনা শোধ করছে কিস্তিবন্দী করে। আগের প্রবন্ধে আপনাদের বলেছি যে, আজকের দিনে ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে লোকের টাকা আর মারা যায় না। এই উদাহরণ থেকে তারই সমর্থন পাওয়া যায়। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে, এই দুই দফা 'অ্যামালগ্যামেশন' সত্ত্বেও পাঁচটি ব্যাঙ্কের একজন কর্মীরও চাকরি যায়নি।

এই সব ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে ওঠবার পর ১৯৬৫ সালের গোড়া থেকে ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল ব্যাঙ্কের কার্যক্রমে একটা উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটলো। পরিচালনা সংস্কারের জন্যে তৎকালীন চেয়ারম্যান স্যার ধীরেন মিত্র মহাশয় বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁর চেষ্টাতে এক অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার পদে যোগ দিলেন। এঁর নাম শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়। ইনি প্রথম যৌবনে কিছুদিন বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেছিলেন। তারপরে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং এ বহু বছর যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে কমার্শিয়্যাল ব্যাঙ্কিং-এ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। উপরন্তু, ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়্যালে যোগ দেবার আগে তিনি প্রায় ১৬ বছর সরকারী 'রিহ্যাবিলিটেশন ফিনান্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' ও 'রিহ্যাবিলিটেশন ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল করপোরেশন'-এ যথাক্রমে ডেপুটি চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার এবং সেক্রেটারির পদাভিষিক্ত ছিলেন।

বর্তমান চেয়ারম্যান ভাগ্যকুল পরিবারের শ্রীকৃষ্ণদাস রায়ের নেতৃত্বে নন্দলালবাবু এখন ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়্যালকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে নিয়ে চলেছেন। নীচের অঙ্কগুলি থেকে এই ব্যাঙ্কের অগ্রগতির মাত্রা বোঝা যায় :—

	১৯৬৩	১৯৬৫	১৯৬৭
আমানত	১,৭৮,৫২০০০	৪,৬১,৭৮০০০	৫,৪৬,১৮০০০ টাকা
লগ্নী	৮৯,৬৭০০০	২,৬১,০৯০০০	৩,৬৫,৯৬০০০ টাকা
ব্রাঞ্চের সংখ্যা	কলকাতায়-১৬,	মফস্বল বাংলায়-৪,	পাটনায়-১=২১

নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় মশায়ের সফল পরিচালনায় বাঙালীর এই ব্যাঙ্কটিও খুব শীঘ্র আরও অনেক বড়ো হবে বলে আমরা আশা রাখি।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সুযোগ্য 'ইকনমিস্ট' শ্রী টি আর সাহ এবং তাঁর সহকর্মী শ্রীদ্বিজেন ভট্টাচার্যের কাছ থেকে যে সব তথ্য পেলাম তা থেকে বাংলা দেশে ব্যাঙ্কিং-এর দ্রুত প্রসারের মাত্রাটাও বোঝা যায়।

সাল	ব্যাঙ্কের অফিসের সংখ্যা	যত শহরে এই অফিস অবস্থিত	গড়ে শাখা প্রতি জনসংখ্যা	ডিপজিট (আমানত)	অ্যাডভান্স (লগ্নী)
১৯৫১	১৭৭	৪৭	১,৪০,০৩৮	১৭৫½ কোটি	১৬১ কোটি
১৯৬০	...	...	...	২৮৬ কোটি	২১৬ কোটি
১৯৬৬	৩৮২	৮৯	১,০৬,০০০	৫১৭ কোটি	*৫৭৫ কোটি

(* অন্য অঞ্চল থেকেও টাকা এনে বাংলায় লগ্নী করা হয়েছে)।

বিশেষ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার এবং আংশিকভাবে অন্যান্য ব্যাঙ্কের সম্প্রসারণ নীতির কল্যাণে ১৫ বছরে ব্যাঙ্কের শাখা এতটা বেড়েছে।

কিন্তু প্রত্যহ ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের অফিসের কাউন্টারে ক্যাশ টাকায় বিল দেওয়ার প্রচণ্ড ভীড় দেখে মনে হয় যেন আমরা এখনো যজ্ঞনাথের যুগেই বাস করছি। ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের বিল চেকে পেমেণ্ট করাও যায়; বড় বড় অফিসগুলিতে ডাকবাক্সের মত বিলসহ চেক ফেলে দেবার জন্যে বাক্স রাখা আছে। ইলেকট্রিক সাপ্লাই সেই চেকের রসিদ পরে ডাকে পাঠিয়ে দেন; তার জন্যে আলাদা কিছু চার্জ দিতে হয় না। যাঁরা পারেন তাঁরা ব্যাঙ্কে সেভিংস অ্যাকাউণ্ট খুলে চেক কেটে দিলেই পারেন; আজকাল তো কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ব্যাঙ্কের অফিস আছে।

১৯৬৭-তে আর একটি হিসেব করা হয়েছিল। সেটা হলো বিভিন্ন খাতে সমস্ত ব্যাঙ্কের লগ্নীর পরিসংখ্যানে সারা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের স্থানের নির্ণয়।

সিকিওরিটি (বন্ধকী পণ্য)	সারা ভারত	পশ্চিমবঙ্গ
খাদ্যদ্রব্য	৬·২%	৩·৪%
শিল্পের কাঁচামাল	৮%	৫·৯%
কৃষিজাত পণ্য	৩·২%	৭·৯%
শিল্পজাত ও খনিজ পণ্য	৪০·৬%	৪৪·৮%
বিবিধ	৪২%	৩৮%
	১০০	১০০

কিন্তু একথা আমাদের জানা দরকার যে বাঙালীর পরিচালিত শিল্প ও বাণিজ্যে এর কতটা নিয়োজিত হচ্ছে আর সর্বক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মীর মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা কত।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্কলিত আরও কয়েকটা তুলনামূলক পরিসংখ্যান নীচে লিপিবদ্ধ করছি। প্রথমে দেখাচ্ছি ভারতবর্ষে মোট শেডিউলড ব্যাঙ্কের সংখ্যা, তাদের আমানত ও লগ্নীর অঙ্ক ইত্যাদি :—

তারিখ	ব্যাঙ্কের সংখ্যা	ডিমান্ড লায়াবিলিটি	টাইম (মেয়াদী) লায়াবিলিটি	মোট	আডভান্স	নগদ ও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স
ডিসেম্বর, ১৯৪৯	৯৫	৬৬৬ কোটি	২৯৭ কোটি	৯৬৩	৪৪২	৬৭ কোটি
২৯-৩-৬৮	*৭৬	২০৩৪ কোটি	২০৪৭ কোটি	৪০৮১	৩০৩৫	২২০ কোটি

* এই ৭৬টি ব্যাঙ্কের মধ্যে ১৫টি বিদেশী ব্যাঙ্ক আছে।

এইবারে আপনাদের জ্ঞাতার্থে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আরও একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান লিপিবদ্ধ করছি (১৯৪৯-এর অঙ্কগুলিতে সামান্য ভুল থাকতে পারে) :—

তারিখ	কারেন্সি নোটের ইস্যু	তার পিছনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুত সোনার দাম	রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বত্বে বিদেশীয় গভর্নমেণ্ট পেপার	মোট ফরেন ব্যালেন্স	রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বত্বে ভারতীয় গভর্নমেণ্ট পেপার
১৯৪৯ (জুন)	১১৮৬ কোটি	*৪০ কোটি	৬৮৬ কোটি	৭৮০ কোটি	৪১৩ কোটি টাকা
৫-৪-৬৮	৩৩১৮	**১১৬	১৬৬½	২০৪	২৯৬১ কোটি টাকা

(*১৯৪৯-এ সোনার বাটের দাম প্রতি তোলা ২২½ টাকা করে ধরা হয়েছিল)।

(** ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে সোনার মূল্যায়ন বদল করে তোলা প্রতি ৬২½ টাকা অর্থাৎ প্রতি ১০ গ্রামের দাম ৫৩·৫৮ টাকা হিসেবে ধরা হয়েছিল। মনে হয় যে, ওপরের ১১৬ কোটি টাকার সোনার দাম সেই ভিত্তিতেই ধরা আছে, যদিও ১৯৬৬-তে টাকার মূল্য হ্রাসের পর থেকে সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ৮৪·৩৯ টাকা ধার্য হয়েছে। ১ তোলা=১১·৬৬ গ্রাম। ২·৪৩ তোলা=১ আউন্স। আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম এখন আউন্স প্রতি ৩৫ ডলার অথবা ২৬২½ টাকা)।

অর্থনীতির ছাত্র বাদে এই প্রবন্ধের অন্যান্য পাঠকরা ওপরের পরিসংখ্যানের সূক্ষ্ম-বিচার নিয়ে শিরঃপীড়ায় না ভুগে আমার নিম্নলিখিত বক্তব্যটা অনুধাবন করুন। এটা আমার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত একটি কচকচি বলেও ধরে নিতে পারেন।

আগের প্রবন্ধে আমি কারেন্সি নোটের সংজ্ঞা দিয়েছিলাম সরকারী হ্যাণ্ডনোট। ওপরের সংখ্যাগুলি থেকে আমরা দেখছি যে কারেন্সি নোট খাতেই আপনার আমার কাছে সরকারের

দেনা কত বেড়েছে—১১৮৬ থেকে ৩৩১৮ কোটি টাকা। এর ওপর আবার আছে কিঞ্চিদূর্ধ্ব ৯০০০ কোটি টাকার গভর্নমেন্ট পেপারের (চলতি কথায়, কম্পানির কাগজের) বাবদ মেয়াদী দেনা; উপরন্তু ৩১-৩-৬৭ তারিখের হিসাব অনুযায়ী বৈদেশিক ঋণ ছিল ৪৬২৩½ কোটি টাকার, যার মধ্যে ডলারেই ঋণ ছিল ৩১৭৫ কোটি টাকার। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত দেনা আর দেনা। কিন্তু এইটুকুতেই শেষ করে দিলে বোধহয় ভুল হবে।

গোটা ভারতবর্ষকে যদি একটা যৌথ বিনিয়োগ সংস্থা অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্ট কম্পানি লিমিটেড বলে ধরে নেওয়া যায় তো কী দাঁড়ায়?

১৯৪৯ সালে এই কম্পানির বিভিন্ন কারবারের আয়তন ছোট ছিল। সম্পত্তি যেমন কম ছিল শেয়ারও তেমনি কম বেচা ছিল। ১৯৬৮ সালে আরও ঢের বেশি শেয়ার বিক্রি হয়েছে, আর ব্যাঙ্কে ও বাজারে দেনাও বেড়েছে অনেক। কিন্তু কম্পানির বিষয় সম্পত্তির দামও অনুপাতে অনেক বেশি হয়ে গেছে। রেলওয়ে সম্প্রসারণ খাতেই তো প্রকাণ্ড বৃদ্ধি ঘটেছে। তারপরে আছে বিরাট বিরাট ইস্পাতের কারখানা, বড় বড় বিদ্যুতের কারখানা, হেভী এঞ্জিনীয়ারিং, খনিজ ও বনজ সম্পদ, তৈল শোধনাগার, শিপিং করপোরেশন, স্টীমার সার্ভিস, পরিবহণ সংস্থা, জীবনবীমার ব্যবসা, ওষুধ তৈরি, এমন কি পুস্তক প্রকাশনাও। রাস্তাঘাট আর নদীনালার সংস্কার হয়ে কম্পানির ভূসম্পত্তিরও দাম বেড়েছে; আর সবার উপরে আছে এই ভারতবর্ষ-কম্পানির জমিদারীর খাজনা আর প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করা নানারকমের জিজিয়া কর। এইবারে যদি ঘরে বাইরে বিরাট দেনার বিপরীতে এই বিশাল সম্পত্তির হিসেব ধরা যায় তবে এই কম্পানির অবস্থা খুব খারাপ কী?

তবে হ্যাঁ, বলতে পারেন যে, ভারতবর্ষ-কম্পানির ডিরেক্টরবর্গ সম্পত্তি বাড়াতে গিয়ে নগদের দিকটা ভেবে দেখেননি। 'লিকুইডিটি' মানে নগদ টাকার সংস্থান না থাকাতে এখন বাজার দেনা বাড়িয়ে কাজ চালাচ্ছেন। মহাজন হলাম আমি, আপনি, হ্যারল্ড উইলসন, লিণ্ডন জনসন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

যদি চালু কারবার বা জমিদারী হিসেবে বিশ্বের বাজারে এই ভারতবর্ষ-কম্পানিকে বিক্রি করা যায় তো এটা ভাল দামেই বিকি হবে। এঁরা যদি ভারতীয় রেলকে বেচে দেন তাহলেই ২।৩ হাজার কোটি টাকা পেয়ে যেতে পারেন তো! অথবা, শ' দেড়েক বছর আগে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা যেমন করে ফ্রান্সের কাছ থেকে লুইসিআনা অঞ্চলের জমিদারীটা কিনেছিলেন তেমনি একটা বেচাকেনার কথা যদি ভাবা যায়, মানে, আমাদের ইন্দিরা কাশ্মীর, বাংলা, আসাম আর কচ্ছের কিছু কিছু অংশ খয়রাত করে না দিয়ে যদি নীলামে চড়ান!

ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামো সম্বন্ধে আমার এই জ্ঞানগর্ভ অ্যানালিসিস মোরারজী ভাইয়ের কানে কেউ তুলে দিলে নেক্সট ফিফটিন্থ্ অগস্টে তিনি আমাকে পদ্মভূষণ-টূষণ কিছু একটা করে দিতে পারেন বোধ হয়! অবশ্য আপনারা রেকমেণ্ড করে দিলেই সেটা সম্ভব হয়।

ব্যাঙ্কিং-এর বিষয়ে আপাতত আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই। এত সব বললাম এইজন্যে যে, পৃথিবীতে ব্যক্তি বা সমষ্টির লক্ষ্মীলাভের উপায় হলো প্রথমত ও প্রধানত ব্যাঙ্কের

সহায়তা পাওয়া। যে দেশের ব্যাঙ্কিং যতটা উন্নত সে দেশের সমৃদ্ধিও ততটা। আপাতত আমাদের কর্তব্য হলো বাঙালীর বেসরকারি ও সমবায় ব্যাঙ্ককে আরও বড় করে তোলা, আর এই ব্যাঙ্কদের দায়িত্ব হলো আগু বাড়িয়ে বাঙালী কৃষক আর বাঙালী শিল্পবাণিজ্যকে পুষ্ট করা। তাহলেই সম্মিলিত চেষ্টায় (তথাকথিত) লক্ষ্মীছাড়া বাঙালীর দুঃখদুর্দশা ঘুচতে পারে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রভিনশিয়াল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক

বেসরকারি ইউনাইটেড ব্যাংক ও ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের সঙ্গে সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য হলো সরকারি সমবায় মন্ত্রকের অধীনস্থ ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রভিনশিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। অন্যপক্ষে এটি আবার একটি শেডিউলড ব্যাংক অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত; এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সমবায় ব্যাঙ্কগুলির শিরোমণি অর্থাৎ অ্যাপেক্স ব্যাঙ্ক। অতএব একে পশ্চিমবাংলার যাবতীয় সমবায় উদ্যোগের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড বলা চলে। ডিস্ট্রিক্ট কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং ডিস্ট্রিক্ট কোঅপারেটিভ সোসাইটির নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দও এই ব্যাঙ্কের বোর্ড অব ডিরেক্টরস অলংকৃত করে থাকেন।

এখানে অ্যাকাউন্ট খোলার বিষয়ে জনসাধারণের কোনো নিষেধ নেই। যে কেউ এখানে টাকা জমা রেখে চেক কাটতে পারেন, ফিক্সড ডিপজিটও করতে পারেন। তবে, এই সংস্থার টাকার লগ্নী প্রধানত হয়ে থাকে সারা বাংলার সমবায় প্রতিষ্ঠানদের মধ্যে—তা সে কৃষি সমবায়ই হোক, কিংবা শিল্প, বাণিজ্য বা ক্রেতা সমবায়ই হোক।

বর্তমানে এই ব্যাঙ্কের মূলধন, আমানত এবং লগ্নীর পরিমাণ এখানে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে :—

*পেড-আপ ক্যাপিট্যাল	..	১·১৫ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে
রিজার্ভ ফান্ড ইত্যাদি	...	৩·১০ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে
ডিপজিট (আমানত)	..	৬·৪৭ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে
কার্যকরী মূলধন বা ওয়ার্কিং ফান্ডস্	...	১৬·৮৮ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে
লগ্নী	...	১০·৫৫ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে
গভর্নমেন্ট সিকিওরিটি ইত্যাদি	..	২·৩৩ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে

* পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই শেয়ার ক্যাপিট্যালের মধ্যে ২১ লক্ষ টাকার অংশীদার।

বর্তমানে ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রভিনশিয়াল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হলেন শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার, সেক্রেটারি শ্রীনির্মলেন্দু সেনগুপ্ত এবং ম্যানেজার শ্রীঅশোকচন্দ্র চৌধুরী।

বিনিয়োগ সংস্থা

শিল্পোৎসাহী বঙ্গবাসী যাতে শিল্পপ্রচেষ্টায় ব্যাঙ্কের সাহায্য ছাড়াও আর্থিক ও বাণিজ্যিক সহায়তা পেতে পারেন সেই জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েকটি সংস্থা গঠন করেছেন; তাঁরা কেউ সরকারী কেউ-বা আধা-সরকারী। তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'কটেজ অ্যান্ড স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ' বিভাগের জয়েণ্ট ডিরেক্টর (প্ল্যানিং) শ্রীসুনীলকুমার সেনগুপ্ত এবং এঁদের তরুণ সেক্রেটারি শ্রীনলিনী চক্রবর্তীর সঙ্গে এই অধিকার-এর কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা হলো।

সুনীলবাবুর কথার মধ্য থেকে কাজ করবার, দেশের শিল্প ও সম্পদ বাড়িয়ে তোলবার, একটা প্রবল আগ্রহ ফুটে উঠছিল। জানি না, সরকারী অফিসে বসে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের বিভিন্ন পরিকল্পনাকে বাস্তবে ঠিক কতটা রূপ দিতে পেরেছেন বা পারবেন। সাধারণত এই সব সরকারী পরিকল্পনা পর্বতের মূষিক প্রসবের মতো ফল দিয়ে থাকে বলেই এ কথা বললাম।

সুনীলবাবু বললেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্প ও বাণিজ্য খাতে রাজ্য সরকার ৫ কোটি টাকা খরচ মঞ্জুর করেছিলেন। তৃতীয় প্ল্যানে বরাদ্দ হয়েছিল প্রায় ১০ কোটি। কিন্তু এখন তৃতীয় ও চতুর্থের মাঝে এই ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় বরাদ্দের অঙ্ক বছরে ১ কোটির ওপরেও নয়

এই বরাদ্দের টাকা যেভাবে নিয়োজিত হয়ে এসেছে তার বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। সরকারী বিবৃতি এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে এ বিষয়ে বহুবিধ প্রচার হয়ে চলেছে।

এ যাবৎ যতটা কাজ হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'State Aid to Industries' খাতে ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ধার দেবার রীতি। এর সাহায্যে অনেক বাঙালী ক্ষুদ্র শিল্প প্রচেষ্টায় উপকৃত হয়ে এসেছেন। সুনীলবাবুরা উৎসাহীদের সকলকেই এই সুবিধা দেবার জন্যে উদ্গ্রীব। এই ঋণের জন্যে সুদের হারও খুব কম—বার্ষিক ৩% থেকে ৫% মাত্র।

কিন্তু ছোট ছোট শিল্পের মালিকদের, বিশেষ করে মেশিন-শপ ও ফাউণ্ড্রীওয়ালাদের বিশেষ একটি দোষের কথা সুনীলবাবু বললেন। তা হলো যন্ত্র নবীকরণ ও উৎপাদন প্রণালী আধুনিকীকরণে তাঁদের অবহেলা। কাঁচামালের অনটন সত্ত্বেও ১৯৬৫ পর্যন্ত তাঁদের যে সুদিন ছিল সেই সময়ের মধ্যে তা করে নেবার সুযোগ-সুবিধা তাঁদের ছিল। এখন যে তাঁরা

অন্ধকার দেখছেন—রেলওয়ে অর্ডারের অভাব ছাড়াও তার আর একটা বিশেষ কারণ এই অতীত অবহেলা।

অথচ, সুনীলবাবু খুব জোর দিয়ে বললেন যে, আমাদের হাওড়ার কামারশালার শ্রমিকদের কারিগরি দক্ষতা অপূর্ব। তাঁরা আলোবাতাসহীন কারখানায় পুরনো মেশিনে কাজের নানা অসুবিধা সত্ত্বেও যেভাবে খুব সূক্ষ্ম কাজও করে থাকেন তা দেখে বিদেশী পন্ডিতরাও অবাক হয়ে যান। তাঁরা বলেন যে, এই দক্ষতা অতুলনীয়। সুনীলবাবুর মতে এই কারিগরি নিপুণতার সঙ্গে যান্ত্রিক ও উৎপাদনশৈলীর আধুনিকীকরণের সমন্বয় ঘটলে বাংলাদেশ কী-ই না করতে পারতো!

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীশীতল বসু কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিং থেকে এই নবজাত সরকারী সংস্থায় এসেছেন।

১৯৬৭ সালের গোড়ায় রেজিস্ট্রি হয়ে মাত্র গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই সংস্থা কাজ আরম্ভ করেছে। ব্যাঙ্কিং-এ দীর্ঘ ২৫ বছরের অভিজ্ঞতার ফলে শীতলবাবু ইতিমধ্যেই অনেকটা এগিয়ে গেছেন; যথেষ্ট কার্যকরী মূলধন হাতে না পেয়েও সামান্য যা পুঁজি পেয়েছেন তাই নিয়ে দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব করতে পেরেছেন। এই সংস্থার চেয়ারম্যান হলেন প্রাক্তন আই সি এস, স্বনামধন্য শ্রী ডি এল মজুমদার এবং ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীশরদিন্দু দত্ত মজুমদার আই এ-এস (স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান)।

এই মাস আটেকের মধ্যেই সংস্থাটি প্রায় ২২ লক্ষ টাকার দীর্ঘমেয়াদী লগ্নী মঞ্জুর করেছেন এবং বিভিন্ন কম্পানির শেয়ার কেনাও মঞ্জুর করেছেন ১১ লক্ষ টাকার। এঁরা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনস্থ ন'ন বলে কতকগুলি বিষয়ে গতানুগতিকতা অতিক্রম করতে পেরেছেন। এমন অনেক শিল্পোৎসাহী টেকনিশিয়ান আছেন যাঁদের বিদ্যা আছে যথেষ্ট কিন্তু শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মত সঙ্গতি নেই। শিল্পোদ্যোগে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে এই সংস্থা সহজ শর্তে আর্থিক সহায়তা করছেন।

সংস্থার অন্যান্য কয়েকটি উদ্দেশ্যের মধ্যে যেটি আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো তা হচ্ছে ক্ষুদ্রশিল্পের মাল বিক্রির পরে বিলের টাকার ব্যাপারে সাহায্য করা। এই ছোট ছোট শিল্পপতিদের অর্থবল খুব ক্ষীণ; তাই মাল সাপ্লাই-এর সঙ্গে সঙ্গেই বিলের একটা মোটা অংশ তাঁদের হাতে না এলে কাজ বন্ধ হবার উপক্রম হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কানুন অনুসারে বিল জিনিসটিকে বন্ধকী দলিল বলে গণ্য করা হয় না; কাজেই ব্যাঙ্করা এই কারবারীদের বিলের ওপর টাকা ধার দিতে পারেন না। শীতলবাবু তাই এখন সেই কার্যকরী মূলধনের ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। আগেই বলেছি যে, তাঁর সংস্থা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আওতায় পড়ে না। তিনি সফল হলে হীনবল ক্ষুদ্র বাঙালী শিল্পের পরম উপকার হবে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনানশিয়্যাল করপোরেশন

এই সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীমানস রায়ের প্রকাশিত সুমুদ্রিত একটি পুস্তিকা দেখেই পুরনো এক প্রতিষ্ঠানের পরলোকগত কর্মকর্তার কথা আমার মনে পড়লো। স্বর্গীয় ধীরেন মুখার্জি মশায় হুগলি ব্যাঙ্কের প্রগতি লিপিবদ্ধ করে এইরকম সুসজ্জিত তথ্যবহুল বই বছরে বছরে বের করতেন, প্রচারের জন্য। (যে-চারটি বাঙালী ব্যাঙ্ক যুক্ত হয়ে ১৯৫০ সালে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া গঠিত হয়েছিল হুগলি ব্যাঙ্ক তার অন্যতম)। ধীরেন্দ্রনারায়ণের উপযুক্ত শিষ্য মানসবাবু গুরুর এই শিক্ষাটি চমৎকার কাজে লাগিয়েছেন।

১৯৫৪ সালে এই সংস্থাটি গঠিত হয়। প্রসিদ্ধ বাঙালী প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল রাবার ম্যানুফ্যাকচারার্স কম্পানির চেয়ারম্যান এবং বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীকেদার-নাথ মুখোপাধ্যায় এখন এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। বিশিষ্ট বাঙালী শিল্পপতি ও রাজ-কর্মচারী অলংকৃত ডিরেক্টর বোর্ডে কয়েকজন নামকরা অবাঙালীও আছেন।

নীচে আমি মানসবাবুর সঙ্কলিত এই বইটির বিশেষ কয়েকটা পরিসংখ্যান পেশ করছি :—

(১) সংস্থার কাছে ঋণপ্রাপ্ত মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা—১৭৯।

(২) আরম্ভে তাঁদের যে টাকা ধার দেওয়া হয়েছিল তার অঙ্ক—৯ কোটি ১৩ লক্ষ।

(৩) এখন ১৬৩টি শিল্পের কাছে বাকী পাওনা—৬ কোটি ৩৫ লক্ষ।

(৪) এই সংস্থা বিভিন্ন যৌথ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনেছেন—৬৮ লক্ষ টাকার।

(৫) যোগ্য শিল্পপতি এই সংস্থার কাছে ঋণের দরখাস্ত করলে তা মঞ্জুর হতে লাগে—মাত্র * ৩ মাস।

(*সরকারী ঋণ পেতে আবেদনকারীর ২৩ মাসেও তা হয় না)।

(৬) এই সংস্থার কর্তৃপক্ষ খাতকের যোগ্যতা বিচার বিষয়ে এত বিচক্ষণ যে, সময়মতো পার্টির কাছ থেকে পাওনা আদায় হতে থাকে—৯১%।

(৭) আগেও মন্দ ছিল না, কিন্তু মানসবাবু ভার নেবার পরে সংস্থার বার্ষিক নীট লাভ দাঁড়িয়েছে—১৫½%।

কিন্তু এই গ্রন্থটি থেকে যে দুটি বৈশিষ্ট্য আমার দৃষ্টি বিশেষ করে আকর্ষণ করলো তা হচ্ছে, (ক) ৯ কোটি টাকা লগ্নী করে এই সংস্থা বাংলা দেশে প্রায় ৪৯ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করেছেন, আর তার চাইতেও বড় কথা হলো, (খ) সংস্থার সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্পে ৩০৬৭২ জনের কর্ম সংস্থান হয়েছে, যার মানে হলো যে প্রায় ১½ লক্ষ মানুষের মুখের ভাত জুটছে।

কতকগুলি কথার মারপ্যাঁচে ডিরেক্টর বোর্ড ও মানসবাবুর যোগ্যতা এবং সংস্থার দেশ সেবার প্রশংসা না করে আমার এই বিশ্লেষণ সম্ভবত আপনাদের মনঃপূত হবে।

উপসংহারে দুটো প্রশ্ন করছি। পশ্চিমবঙ্গ ফিনানশিয়্যাল করপোরেশনের কাছ থেকে বাঙালী শিল্পোৎসাহীরা আরও বেশি সহায়তা কেন পাচ্ছেন না? শুনলাম বাংলা দেশের এই

সংস্থা থেকে অনুপাতে শতকরা ৫০টি বাঙালী প্রতিষ্ঠান এর সহায়তা পাচ্ছে। যদি যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠিতে সেই অনুপাতের সৃষ্টি হয়ে থাকে তো বিশেষ কিছু বলার থাকে না। কিন্তু শিল্পপতি যে অঞ্চলেরই হোন না কেন, ৩০৬৭২ জন শ্রমিক ও কর্মীর মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা শতকরা ৯৫ হওয়া উচিত। তাই আছে কী?

আর একটি কথা—১১-৪-৬৮ তারিখের স্টেটসম্যান পত্রিকা লোকসভায় আলোচিত 'জাতীয় কয়লা (খনি) উন্নয়ন সংস্থা'র (এন. সি. ডি. সি.) পরিচালকবৃন্দের চূড়ান্ত অকর্মণ্যতা ও বেহায়াপনার দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে কোটি কোটি টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়ে এসেছে। এমন উদাহরণ বহু সংস্থাতেই দেখা যায়। টাকার যথেচ্ছ অপচয় করতে দেবার কথা আমি নিশ্চয়ই বলবো না, কিন্তু সরকার যখন এইসব অনাচারের মাশুল গুন দিতে পারছেন, তখন বাঙালীর সৎপ্রচেষ্টাতে কঠিন শর্তে মুক্ত আরও সহায়তা দিন না! শতকরা ২৫ জন যদি সেই সহায়তা পেয়েও অকৃতকার্য হন তো বাকী ৭৫ জনের সফলতায় সেই ক্ষতিপূরণের পরেও সমবেতভাবে বাঙালীর যে লাভই হবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

৪ মে, ১৯৬৮





পনেরো

বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামের সেন বংশের পরিচয়টি প্রথমেই লিপিবদ্ধ করছি।

'ঝানসির রানী', 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ', 'মহারাজা নন্দকুমার', 'টমকাকার কুটির' প্রভৃতি উনিশ শতকের বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস ও অনুবাদ-গ্রন্থের রচয়িতা চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫—১৯০৬) পেশায় ছিলেন সবজজ, ধর্মে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত।

তাঁর ন'টি সন্তানসন্ততির মধ্যে জ্যেষ্ঠা ছিলেন 'আলো ও ছায়া', 'দীপ ও ধূপ' প্রভৃতি সেকালে সমাদৃত কাব্যগ্রন্থের রচয়িত্রী কবি কামিনী রায় (১৮৬৪—১৯৩৩)। ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদকে ভূষিতা হয়েছিলেন। দ্বিতীয়া ডাঃ মিস যামিনী সেন, আই এম এস (১৮৭১—১৯৩২), বিলেতের 'সোসাইটি অব সারজানস অ্যাণ্ড ফিজিসিয়ানস্'-এর 'ফেলো' ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্রমোহন (১৮৭৩—১৯০৬) প্রথমে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্রের পিতা স্বর্গত প্রবোধচন্দ্র মহলানবিশের সঙ্গে খেলার সরঞ্জাম ও গ্রামোফোনের কারবার 'সেন অ্যাণ্ড মহলানবিশ'-এ অংশীদার ছিলেন এবং পরে 'সেন অ্যাণ্ড সেন' নামে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র নিশীথচন্দ্র (১৮৭৯—১৯৫১) কলকাতা হাইকোর্টের যশস্বী ব্যারিস্টার ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেশবন্ধুর অধীনে তাঁর অবদান ভোলবার নয়। ১৯৩১ সালে তিনি কলকাতার মেয়র নির্বাচিত হন। চণ্ডীচরণের তৃতীয় পুত্র প্রভাতচন্দ্রও বিখ্যাত ব্যারিস্টার ছিলেন। তিনি পূর্ণিয়া শহরে প্র্যাকটিস করতেন। এ'রা ক'জন ছাড়াও চণ্ডীচরণের আরও দুই কন্যা প্রেমকুসুম সেন ও চিন্ময়ী দত্ত শিক্ষা ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং চতুর্থ পুত্র ললিতমোহন ছিলেন বিলেতফেরতা কৃতী এঞ্জিনীয়ার।

এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র সুধীরকুমার (১৮৮৮—১৯৫৯) চণ্ডীচরণের কনিষ্ঠ সন্তান। তিনি ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের কন্যা মীরা দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁর দুই পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে সেন-র‍্যালের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর অভিজিৎ জ্যেষ্ঠ। ছোট ছেলে সঞ্জয় সেন-র‍্যালের অন্যতম ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ন্যাশান্যাল ট্যানারির চেয়ারম্যান।

সেন-র‍্যালে লিমিটেড
মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস, লাল বাজার
কলিকাতা—১

কন্যা শ্রীমতী সুমিত্রা সেন কনিষ্ঠা। ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টীল কম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী শ্রীরঞ্জন সেনের সঙ্গে বিবাহের আগে পর্যন্ত সুমিত্রাও পিতৃদেবের অফিস সংক্রান্ত কাজে সহায়তা করতেন। অভিজিৎ সেনের পত্নী অমিয়া দেবী অগ্নিযুগের বীণা (দাশ) ভৌমিকের ভগ্নিকন্যা (অর্থাৎ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের গুরু স্বনামধন্য শিক্ষাব্রতী স্বর্গীয় বেণীমাধব দাশ মহাশয়ের দৌহিত্রী) এবং সঞ্জয় সেনের স্ত্রী রত্না দেবী হলেন বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ কম্পানির প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত সুরেন্দ্রমোহন বসুর কন্যা।

যে বিশিষ্ট পরিবারটির ঐতিহ্য ছিল সরস্বতীর সাধনা, সেই বংশে জন্মগ্রহণ করে সুধীরকুমারের মতো এক পুরুষেই চাঁদ সদাগর হওয়ার দৃষ্টান্তে বিস্মিত হয়েছিলাম বলেই বংশপরিচয় দিয়ে প্রবন্ধ শুরু করলাম। কী করে এমনটি হল তার উত্তর খুঁজছিলাম। মনে হচ্ছে তা পেয়েছি।

বাঙালী তার বুদ্ধি দিয়ে পারে না এমন কোনো কাজ নেই। অতীতে বাঙালীর শিল্প ও বাণিজ্যবিমুখতার কারণ বোধ হয় এই ছিল যে, বাঙালী সরস্বতীর আরাধনাতেই বেশি তৃপ্তি পেতো। সেই সাধনার ফলে যদি ভগিনী লক্ষ্মীর কৃপাও কিঞ্চিৎ জুটে গেল তো ভালো, নইলে বাঙালী পরোয়া করতো না। কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্মীর ভজনা করলে ভারতের অন্য অঞ্চলের বাসিন্দার চাইতে কম সময়েই বুদ্ধিমান বাঙালী দেবীর কৃপালাভ করতে পারতো, এই আমার বিশ্বাস। অবশ্য সেই নিষ্ঠার মধ্যে ডিসিপ্লিন গুণটিও যে থাকা দরকার, এ কথা বলা বাহুল্য।

সুধীরকুমারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যতীন্দ্রমোহন সামান্যভাবে ব্যবসাতে নেমেছিলেন বটে, কিন্তু অকালমৃত্যু তাঁর ক্ষেত্রে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিল। পুরো ইতিহাসটি বলতে গেলে প্রবন্ধ বেশি বড় হয়ে যাবে বলে কয়েকটি ধাপ বাদ দিয়েই আমি সুধীরকুমার ও 'সেন অ্যান্ড পন্ডিতের' কাহিনী আরম্ভ করবো। আশা করি এই সংক্ষেপ তাঁর জীবনীকে ক্ষুণ্ণ করবে না।

স্বর্গীয় সুধীরকুমার সেনের জীবনীকার বলেছেন, "সুধীরকুমারের জীবনেতিহাস প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে সাইকেল ব্যবসায় ও সাইকেল শিল্পের উন্নতি, বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস।" 'পরিণতি' শব্দটিতে আমার আপত্তি আছে, কারণ সুধীর সেন মশায়ের দুই পুত্র শ্রীঅভিজিৎ ও শ্রীসঞ্জয় সেনের উদ্যম সেন-র‍্যালে ও সেন অ্যান্ড পন্ডিতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ভবিষ্যতে উৎকর্ষের কোন্ পর্যায়ে নিয়ে যাবে তার নির্ণয় আপনি আমি করে উঠতে পারবো না। এই প্রসঙ্গে পূর্বাহ্ণেই একটা কথা বলবো। এই বিরাট রথের রশি টানার কাজে সেন পরিবারের সঙ্গে যাঁরা নিজেদের সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য ও মমত্ববোধ ঢেলে দিয়েছেন, সেই কর্মী-গোষ্ঠীর সহযোগিতা না পেলে কোনো কিছুই সম্ভব হতো না।

সেন অ্যান্ড পন্ডিতের আদিকান্ডে যেমন স্বর্গত কিরণ চট্টোপাধ্যায় ও রাজেন দাশগুপ্ত মহাশয়দের মতো বিশ্বাসী ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং জেনারেল ম্যানেজার না পেলে সুধীরকুমারের পক্ষে প্রতিষ্ঠান চালানো অসম্ভব হতো, বর্তমান পরিচালক ও কর্মীদের বিষয়েও একই মন্তব্য করা চলে। সুদক্ষ প্রবীণ কর্মচারীরা পরিচালনার রাশ ধরে

রয়েছেন। তাঁদের অধস্তন নবীন অফিসার ও কর্মীরা যেন সব হীরের টুকরো ছেলে। জনে জনে সকলের কথা বলার সুযোগ হবে না, কিন্তু প্রবন্ধের মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে কয়েকজনের কথা না বললে এই সুপরিচালিত সংস্থাগুলির পরিচিতি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এটা যে 'করপোরেট ইকনমি'র যুগ, 'ফিউড্যালিজম' যে আজ অচল—সেন প্রতিষ্ঠান-গুলির পরিচালনার কাঠামো সেই নীতিটাই ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। দক্ষতার পরিচয় দিতে পারলে সময়ে সবাই পরিচালনার বিশিষ্ট আসনে বসতে পারবে তারই ইঙ্গিত সেন সংস্থার সর্বত্র বিরাজ করছে। মেশিন ও পণ্য উৎপাদনের আগে সেই লক্ষণগুলির দিকেই আমার নজর বেশি করে পড়লো।

পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে হলে ইংরেজী অনার্স নিয়ে বি এ পাসের পর ব্যারিস্টার বা জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে সুধীর সেন মশায়কে কর্মজীবন যাপন করতে হতো। সে সম্ভাবনাও বেশি করেই হয়েছিল। কিন্তু তাতে ব্যাঘাত ঘটিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বড়দাদা যতীন্দ্রমোহন। তাঁর গড়া ছোট্ট দোকানটি তাঁর অকালমৃত্যুর পর চালাতে গিয়েই ছোট ভাই সুধীরকুমার বাণিজ্যের আস্বাদ পেলেন। তা-ও তাঁকে রাজকর্ম কিংবা আইনজীবিত্ব থেকে রক্ষা করতে পারতো না, যদি না তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলি' কাগজে 'বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার' শীর্ষক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিখ্যাত প্রবন্ধটি পড়ে পথনির্দেশ পেতেন।

কিন্তু ক্ষুদ্র 'সেন অ্যান্ড সেন'-এর ব্যবসা বাড়াতে গেলে আরও মূলধনের দরকার; অথচ সুধীর সেনের তখন সম্বল স্বোপার্জিত চার শ' টাকা। বাড়ির কারও কাছ থেকে তিনি ঋণ বা দান নেবার কথা বাদই দিয়েছিলেন, কারণ উপার্জনক্ষম দাদা দিদি কত কষ্টে টাকা রোজগার করেন তা তিনি বুঝতেন। সেই উপার্জনের সামান্য অংশও ব্যবসাতে লাগিয়ে ঝুঁকি নেওয়াকে সুধীর সেন উচিত মনে করেননি।

একটি আকস্মিক ঘটনা—হঠাৎ-দেখা এক ভদ্রলোকের সহায়তা থেকে তাঁর মূলধনের অভাব মোচন হল।

কলকাতা হাই কোর্টের প্রথম ভারতীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের রামচন্দ্র নামে এক পৌত্র অমৃতসরের ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স অ্যান্ড ব্যাঙ্কিং কম্পানির কলকাতা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার ছিলেন। সুধীরকুমারের সঙ্গে তাঁর একদিন পরিচয় হয়ে গেল ডালহাউসি পাড়ায়। বল্লভদাস নামে ধর্মতলার এক বিশিষ্ট গুজরাটী ব্যবসায়ী ভদ্রলোক সুধীরবাবুকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর কাছ থেকে একটি সুপারিশ যোগাড় করে সুধীরবাবু সদ্যপরিচিত রামচন্দ্র পণ্ডিতের কাছে গেলেন 'সেন অ্যান্ড সেনের' জন্য কিছু ঋণের আশায়। সেই থেকে দুজনের মধ্যে এমন একটা বন্ধুতা হলো যে, রামচন্দ্র নিজের কাছ থেকেই সুধীর সেনকে কিছু মূলধন দিলেন।

সেন অ্যান্ড পণ্ডিতের জন্ম হলো। তা সত্ত্বেও সেন অ্যান্ড সেনের পৃথক অস্তিত্ব বহুকাল ধরে বজায় ছিল।

রামচন্দ্রের কিন্তু এই বাণিজ্যে স্পৃহা ছিল না; তাঁর উৎসাহ ছিল ব্যাঙ্কিং-এ। তাই

১৯১০ সালে সেন অ্যান্ড পণ্ডিতের স্থাপনার বছরখানেক পরেই এই কারবারের মালিকানার অংশ সুধীরবাবুকে বেচে দিয়ে রামচন্দ্র পণ্ডিত পাটনায় গিয়ে ব্যাঙ্ক অব বিহার প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু তাঁর অনুমতি নিয়ে সুধীরকুমার ফার্মের নামটি সেন অ্যান্ড পণ্ডিত-ই রেখে দিলেন, কারণ অল্প দিনেই বাজারে তার বেশ একটি 'গুডউইল' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুধীর সেনের বন্ধু বল্লভদাসের ১৭০নং ধর্মতলা স্ট্রীটের অফিসের ছোট্ট একটি ঘরেই সেন অ্যান্ড পণ্ডিতের প্রথম অফিস খোলা হয়েছিল।

সেন অ্যান্ড পণ্ডিতের ক্রমবিকাশের সঙ্গে ভারতীয় সাইকেল ব্যবসা ও সাইকেল শিল্পের ইতিহাস জড়িত; আর সেই ইতিহাসের কেন্দ্রস্থলে আছেন সুধীরকুমার সেন। তার বিশদ বিবরণের আগে বাইসিক্‌ল নামক দ্বিচক্রযানটির ইতিহাস আমাদের একটু জানা দরকার।

সতেরো আঠারো শতকে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে 'হবি হর্স' নামে এক রকমের দুই চাকা ও স্যাডেলবিশিষ্ট পেডাল-হীন কাঠের সাইকেল ছিল। পা দিয়ে মাটিতে ধাক্কা মেরে মেরে সেটা চালাতে হতো। ১৮৩৯ সালে ইংল্যাণ্ডের ডামফ্রিজশায়ারে কার্কপ্যাট্রিক ম্যাকমিলান নামে এক কর্মকার এক হবি হর্সে দুটি পেডাল লাগিয়ে বাইসিক্‌লের আদি রূপ দিলেন।

এ ছাড়াও আদি সাইকেলের ইতিহাসের একটি ফরাসী সংস্করণ আছে। ১৭৭৯ সালে রাজা ষোড়শ লুই ও তাঁর রানী মারি অ্যান্টয়নেটের দরবারে ভেলোসিপিড নামে একটি দু' চাকার যন্ত্র মহা সমারোহে চালিয়ে দেখানো হয়েছিল। এই ফরাসী যন্ত্রটি নাকি পরে ব্যারন ফন ড্রাইজ নামে এক অভিজাত ভদ্রলোক 'ড্রাইজিয়েন' নাম দিয়ে ইংল্যাণ্ডে চালু করে দিয়েছিলেন। এটার চাকা দুটো ছিল লোহার; তাই এতে চড়ে খানিকটা দৌড়লে চালকের দেহের হাড়গোড় আলগা হয়ে যাবার উপক্রম হতো। নামকরণে ওস্তাদ ইংরেজ এর নাম রাখলো বোন-শেকার। উপরন্তু, সে যুগের ভয়ানক দামী সাইকেল কেনবার সামর্থ্য সাধারণ লোকের ছিল না বলে এর আর এক নাম রাখা হলো ড্যাণ্ডি হর্স, মানে বাবুলোকদের ঘোড়া।

হাওয়া ছাড়া সলিড-রবার টায়ারের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলের রূপও খানিকটা বদলালো। বোন-শেকারের চাকা দুটি ছিল সমান বেড়ের; এখন হলো সামনের চাকাটা মস্ত বড় আর পেছনেরটা অনেক ছোট। সেইরকম সাইকেলের খেলা সার্কাসে এখনো দেখানো হয়। চেহারা দেখে ইংরেজরা এরও এক মজার নাম দিল—পেনি-ফার্দিং—ইংল্যাণ্ডের মুদ্রা পেনি ও ফার্দিং-এর ছোটবড় আকারের মতো। কিন্তু এই পেনি-ফার্দিং-এর স্যাডল এত উঁচুতে থাকতো যে, পড়ে গেলে চালক বেশ চোট পেতো। তাই ১৮৮৫ সালে চেহারার পরিবর্তন হয়ে নীচু সেফটি সাইকেল তৈরী হলো।

১৮৮৭ সালে খেলার ছলে হঠাৎ এক দারুণ আবিষ্কার হয়ে সাইকেলে যুগান্তর এনে দিল। জন বয়েড ডানলপ ছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের এক পশু চিকিৎসক। তাঁর ছোট একটি ছেলে এক ট্রাই-সাইকেল রেসে নাম দিয়েছিল। ডানলপের হঠাৎ কি খেয়াল হলো ছেলের সাইকেলে রবারের পাইপ লাগিয়ে হাওয়া দিয়ে ফুলিয়ে দিলেন। ছেলে সেই প্রতিযোগিতায় প্রথম হলো। এই আকস্মিক আবিষ্কারের স্বত্ব 'পেটেণ্ট' করিয়ে নিয়ে তিনি আরও কয়েকজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১৮৮৮ সালে ডানলপ রাবার কম্পানি প্রতিষ্ঠিত করলেন। আজকের

ডানলপ কম্পানিকে দেখে তার উৎপত্তির কথা ভাবলে কী অদ্ভুতই না লাগে! তখন মোটরকারের সবে জন্ম হয়েছে; এই নিউম্যাটিক টায়ার ও টিউব কেবল সাইকেলেই ব্যবহৃত হতো।

ডানলপের আবিষ্কারের পর থেকে সাইকেলের জনপ্রিয়তা খুব বেড়ে গেল। সাইকেল শিল্পের বিরাট বিস্তার হলো। সাধারণ ব্যবহার ছাড়াও নানা দেশে নানা শহরে সাইকেল ক্লাব গঠিত হলো।

১৮৮৯ সালে কলকাতাতে প্রথম সাইকেলের আমদানি হয়। তার কিছু পরে বিদেশের মতো কলকাতাতেও কয়েকটা ক্লাব গঠিত হলো আর বিদেশের মতো এখানেও কমপাল্লা ও দূরপাল্লার সাইকেল রেসের প্রবর্তন হলো। সেইসব ক্লাবের মধ্যে ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব এখনও বিরাজমান, যদিও এখনকার সভ্যরা আর সাইক্লিং না করে ফুটবল, হকি খেলা নিয়েই ব্যস্ত; আর বছরে একবার দু'বার লটারি করে আপনাদের কারও কারও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে লাখ টাকা ঢেলে দিতে উদ্গ্রীব।

আমাদের বিখ্যাত ফিল্ম ডিরেক্টর শ্রীনীতীন বসু ও ক্রিকেটার শ্রীকার্তিক বসুর বাবা একদা-প্রসিদ্ধ 'কুন্তলীন' কেশতৈল ও 'দেলখোস' সেন্টের স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় এইচ (হেমেন্দ্রমোহন) বোস নিজেই শুধু সাইকেল চড়তে ভালোবাসতেন না, অন্যকেও উৎসাহিত করে শেখাতেন। তাঁর তিনজন প্রধান শিষ্যের নাম আমরা সকলেই জানি—স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও স্যার নীলরতন সরকার।

দৃশ্যটা কল্পনা করে দেখুন! মালকোঁচা এঁটে দাড়িওয়ালা আচার্য রায় সাইকেলে চড়ে টলমল করছেন আর এইচ বোস স্যাডেলের নীচের রড একবার ধরে আর একবার ছেড়ে দিয়ে বরেণ্য ব্যক্তিটিকে "প্যাডেল করুন, এবারে ডাইনে ঘোরান, আরে আরে আরে, শিগগীর ব্রেক কষুন, ব্রেক কষুন!" এইসব বলে জোর গলায় নির্দেশ দিচ্ছেন। (আহা! সত্যজিৎ রায় যদি তখন মুভি ক্যামেরা নিয়ে পাশে খাড়া থাকতেন তো ফিল্মটা জাতীয় সংগ্রহশালায় রাখবার মতো ছবি হতে পারতো। হেমেন্দ্রমোহনের স্ত্রী আবার সত্যজিৎ রায়ের পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর আপন বোন ছিলেন কিনা, তাই আইডিয়াটা হঠাৎ আমার মাথায় খেলে গেল)।

ইতিহাস ঘেঁটে দেখছি যে, সে যুগের মনীষীরা সকলেই সাইকেল চড়তে খুব ভালোবাসতেন। বার্নার্ড শ' তাঁর প্রেয়সী শার্লট পেইন টাউনসেন্ডকে নিয়ে সাইকেলে করে ইংল্যান্ডের পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে চলে যেতেন। ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও বিবাহবন্ধন বিষয়ে শার্লটের মনের গতি বোধ হয় বিলম্বিত লয়ে চলছিল; সাইকেলই ঘটনাটাকে দ্রুত করে দিল। একবার সাইকেল ভ্রমণের সময়ে পড়ে গিয়ে কড়া রকমের জখম হলেন বার্নার্ড শ'। উদ্বিগ্ন শার্লট তাঁর সেবার ভার নিয়ে শ'-এর এত কাছে এসে গেলেন যে, আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গেই শ'-এর বাসনা পূর্ণ হলো। তাঁদের পরিণয় মঙ্গলোৎসব ঘটে গেল। অথচ অকৃতজ্ঞ বার্নার্ড শ' মানুষের সাইকেল চড়া নিয়ে উত্তরকালের রচনায় জোর হাসিমস্করা করেছিলেন।

শ'-এর ক্ষতবিক্ষত সাইক্লিং-জীবনই বোধ হয় এইসব ব্যঙ্গকৌতুকের জন্য দায়ী। একবার শ' আর তাঁর দুই বন্ধু—বিখ্যাত ফেবিয়ান এবং লন্ডন স্কুল অব ইকনামিক্সের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সিডনী ওয়েব ও মনীষী বারট্রান্ড রাসেল—সাইকেলে করে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। রাসেল ছিলেন আগে, বার্নাড শ' মাঝে আর সিডনী ওয়েব সবার পরে। উঁচুনীচু রাস্তার এক উঁচু জায়গায় এসে শ' মনের আনন্দে শোঁ শোঁ করে নীচের দিকে সাইকেল ছোটালেন। শ'-এর নিজের উক্তিতে আছে : "ঠিক সেই মুহূর্তে গণিতশাস্ত্রী রাসেল নির্ভুল গণনা করে তাঁর সাইকেলের ব্রেক কষে আমার ছুটন্ত সাইকেলের সামনে এমন কায়দায় দাঁড়ালেন যে, আমার তারস্বরে চেঁচামেচি ডাইনে বাঁয়ে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে বাঁচবার চেষ্টা ব্যর্থ করে সেদিন আর একটু হলেই গণিতশাস্ত্র এবং নাট্যসাহিত্যের সব আশা ভরসা নির্মূল হয়ে যেতো। নেহাত কপালজোরেই রাসেল আর আমি সেদিন বেঁচে গেলাম।"

এইচ বোস মশায় হ্যারিসন রোডে একটা সাইকেলের দোকানও খুলেছিলেন। সুধীরকুমার ছাত্রাবস্থায় তাঁর প্রথম 'রোভার' সাইকেলটি সেখান থেকেই কিনেছিলেন। সাইকেলের ইংরেজ ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দোকানদারদের কেন্দ্র ছিল ধর্মতলা। বাঙালীর মধ্যে সেখানে প্রথম দোকান খুললেন স্বর্গত হরিদাস নন্দী। ১৯১০-এ ধর্মতলায় সেন অ্যান্ড পন্ডিতের যে অফিস খোলা হয়েছিল, বছর দুই তিন পরে সাইকেলের নতুন (এবং বর্তমান) কেন্দ্র বেন্টিংক স্ট্রীটে সেই দোকান স্থানান্তরিত হলো। এইটাই সুধীরকুমারের প্রথম নিজস্ব অফিস।

সে যুগে সাইকেল কেনবার সামর্থ্য বেশি লোকের ছিল না। তা ছাড়া তখন সাইকেল ততোটা জনপ্রিয় হয়েও ওঠেনি। তাই সাইকেলের দোকানদাররা অন্যান্য জিনিসের কারবারও করতেন। সুধীর সেনের কর্মসূচীও তাই ছিল; কিন্তু সাইকেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে তিনি সেদিকেই বেশি ঝুঁকলেন।

যে রথটি আগে শ্বেতাঙ্গ আর এ-দেশীয় ধনীদের শখের জিনিস ছিল, দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিয়ে সুধীরকুমার শুধু নিজের এবং বাঙালী ও ভারতীয় সাইকেল ব্যবসায়ীদের উন্নতির পথই করলেন না, জনসাধারণেরও এতে পরম উপকার হলো। বি এস এ, র‍্যালে প্রভৃতি দামী সাইকেল থেকে শুরু করে 'ফিলিপস' ও 'প্রিমিয়ার'-এর মতো মাঝারি দামের এবং ৩০/৩৫ টাকা দামের 'হারকিউলিস' ও 'ওয়ারিঅর' সাইকেলের আমদানি করে তিনি বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরের মানুষকে সাইকেল ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করলেন। যেন একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটালেন।

নেহরু একবার বলেছিলেন যে, সাইকেল থেকে অটোমোবাইলের যুগে উত্তীর্ণ হওয়ার চাইতে গরুর গাড়ির আমল থেকে সাইকেল-যুগে পেঁছিনো ব্যাপারটা সমাজের পক্ষে ঢের বড় বিবর্তন। আর আমাদের রসিকশিরোমণি চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী বলেন যে, বাইসাইকেল হচ্ছে মানুষের প্রিয়তম সখা ও সাথী। কুঁদুলে বউয়ের মতো সে খুনসুটি করে না, বেশি খাটালে গাঁইগুঁই করে না; চুপচাপ নিজের কাজটি সারে। ঘোড়ার মতো সাইকেলকে খোরাক যোগাতে হয় না—একেবারে যাকে বলে বামুনের গরু।

সাইকেলের প্রচারের জন্যে সুধীর সেন মশায় ১৯১৭ সালে 'ইন্ডিয়ান সাইকেল অ্যান্ড

মোটর জারন্যাল' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন; আজও সেটা চলছে।

উপরন্তু, পুরো সাইকেল ছাড়া সাইকেল পার্টস আমদানিতেও সেন অ্যান্ড পন্ডিতের ধাপে ধাপে উন্নতি হলো। ভারতের শহরে শহরে ছাড়াও ইংল্যান্ড-জার্মেনিতেও সেন অ্যান্ড পন্ডিতের অফিস খোলা হলো।

মার্কেটিং ও সেলসম্যানশিপের রাজা সুধীরকুমারের প্রকৃত ব্যবসায়ী-জীবনের সূচনা হয়েছিল ১৯১২ সালে প্রথম ইংল্যান্ড সফরের সঙ্গে সঙ্গে। উপলক্ষটি ছিল ভারতে সাইকেল শিল্পপতিদের আয়োজিত এক বাণিজ্যিক সম্মিলন। লন্ডনে এই আসন্ন সম্মিলনে যোগ দেওয়ার জন্য কলকাতার দেশীয় সাইকেল ব্যবসায়ী মহল সুধীরকুমারকে অনুরোধ করলেন এবং তাঁদের মধ্যে একজন, শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় সুধীরবাবুর বিলেত যাবার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। ফলে সুধীরকুমার বিলেতের শিল্পপতিদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলেন। ইংরেজরাও সাইকেল ব্যবসাতে সুধীর সেনের অভিজ্ঞতা বুঝতে পেরে অতঃপর ভারতে তাঁদের ব্যবসার প্রসারের বিষয়ে সেন অ্যান্ড পন্ডিতের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেন। তাই স্বাধীনতার পরে যখন 'কোল্যাবোরেশনের' যুগ এলো তখন র‍্যালে-র মত বিরাট ইংরেজ প্রতিষ্ঠান ভারতের অন্যতম বৃহৎ বণিক গোষ্ঠীর হাজার অনুরোধ উপরোধ ঠেলে হাত মেলালো অর্থবলে অনেক ছোট সুধীর সেনের সঙ্গে। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কাছে টাকার জোর ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি হেরে গেল।

সেই ১৯১২ সালে সুধীরকুমার সেনের যে বাণিজ্যযাত্রার শুরু হয়েছিল উত্তরকালে তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাৎসরিক অভিযান। প্রতি বৎসর এপ্রিল-মে মাসে তিনি সওদা করতে বেরোতেন, আর ইংল্যান্ড, জার্মেনি, আমেরিকার মত সব দেশ পরিক্রমা করে স্বদেশে ফিরতেন সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ। এমনি করে বিংশ শতাব্দীর এই চন্দ্রধর সওদাগর প্রায় অর্ধ শতক ধরে চৌদ্দ ডিঙা ছাড়াই দেশে দেশে বাণিজ্য করে শেষ পর্যন্ত সেই বিদেশ জার্মেনিতেই ইহলোক ত্যাগ করলেন। তারিখটা ছিল ১৯৫৯ সালের অগাস্ট মাসের আটাশে।

এতক্ষণ বণিক সুধীরকুমারের কথা বলেছি; এবারে শিল্পপতি এস কে সেনের কাহিনী আরম্ভ করি।

সেন-র‍্যালে কম্পানির প্রচার সচিব শ্রীসুধীন দাশগুপ্ত এবং সহ-সচিব শ্রীঅমূল্য দাশশর্মা তাঁদের সুবিন্যস্ত প্রচার বিভাগের আলমারী ও দেরাজ থেকে নানান তথ্য আমাকে যোগালেন। আর খানিকটা দিলেন সর্বাধ্যক্ষ শ্রীঅভিজিৎ সেন এবং সেক্রেটারি শ্রীকালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়।

১৯২০ সালেও একবার সুধীর সেন মশায় 'সাইকেল প্রোডাকশন্স লিমিটেড' নাম দিয়ে এ দেশে সাইকেল তৈরীর এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু সে সময়ে মন্দা এসে পড়াতে কাজ বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। তখন লড়াইয়ের জন্য ও ঠিক তার পরে আমদানি খুব কমে যাওয়াতে দেশের নানা শহরে ছোট ছোট সাইকেলের কারখানা বসেছিল; মন্দার জন্য তারাও বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারেনি।

১৯৩৮-এ ইন্ডিয়া সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং কম্পানি লিমিটেড নামে বাঙালীর একটি প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেছিল; কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুন তাঁদের আর পুরো সাইকেল

তৈরী সম্ভব হয়ে উঠলো না; তাঁরা কেবল সাইকেলের সরঞ্জাম তৈরীতেই সীমাবদ্ধ রইলেন। ১৯৩৯-এ বোম্বাইয়ে হিন্দ সাইকেলস লিমিটেড হলো। পাটনায় হিন্দুস্থান বাইসাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল করপোরেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনার অল্প দিনের মধ্যেই কাজ গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হলো। তবুও এই দুটি কম্পানি যুদ্ধের সময়ে ৫৫০০০ সাইকেল বানিয়ে মিলিটারি সাপ্লাই করেছিল। যন্ত্রশিল্পে নিপুণ পাঞ্জাবীরাও তখন পাঞ্জাবের আনাচে-কানাচে সাইকেল ও তার সরঞ্জাম তৈরির ছোট ছোট অনেক কারখানা গড়ে তুলেছিলেন।

১৯৪৩-এ সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন নামক সঙ্ঘটি স্থাপিত হয়ে ১৯৪৫-এ টারিফ বোর্ডের কাছে সংরক্ষণ দাবি করলো। তদন্ত হয়ে ১৯৪৭ সালে সাইকেল শিল্প সংরক্ষিত-শিল্প পর্যায়ে গণ্য হলো। কিন্তু সর্বনাশা দেশবিভাগ এসে সংরক্ষণের মাধ্যমে যা ভালো ফল পাওয়া যেত তা দিল নষ্ট করে। এইসব কারণে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সাইকেল বিদেশ থেকেই মোটা আমদানি হয়ে চললো। ১৯৫১-তে দেশে ৪০০টি ইম্পোর্টার ফার্ম ছিল আর প্রায় ৩ লক্ষ সাইকেল আমদানি হয়েছিল।

১৯৪৮-এ জাতীয় সরকার সাইকেল শিল্পকে বে-সরকারী শিল্পের তালিকাভুক্ত করলেন। পরের বছর দ্বিতীয় টারিফ বোর্ড আমদানি-করা সাইকেলের ওপর চড়া ডিউটি বসিয়ে দেশীয় শিল্পকে প্রকৃত সংরক্ষণ দিলেন। তার পরেই আরম্ভ হলো কোল্যাবোরেশন আর তারই ফলে জন্মালো মাদ্রাজের টি আই সাইকেলস অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড (হারকিউলিস ও ফিলিপসের নির্মাতা) এবং বাংলার সেন-র‍্যালে ইণ্ডাস্ট্রিজ অব ইণ্ডিয়ার মত ভারতের বৃহত্তম দুটি প্রতিষ্ঠান।

অনেকক্ষণ গল্প বলেছি। এবারে খানিকটা পরিসংখ্যান দিয়ে আমাদের দেশের বাইসিকল সভ্যতার প্রগতিটা বোঝাবার চেষ্টা করি।

(ক) ভারতে সাইকেল উৎপাদন :	১৯৬০	প্রায় ১৩ লক্ষ
	১৯৬৬	প্রায় ১৭ লক্ষ
	১৯৬৭	প্রায় ১৮ লক্ষ

(গড়ে ১৫০ টাকা করে প্রতি সাইকেলের দাম ধরলে ১৯৬৭-র উৎপাদনের দাম দাঁড়ায় ২৭ কোটি টাকা।)

(খ) সরঞ্জামের উৎপাদন :—	১৯৫৬	প্রায় ৩½ কোটি টাকা দামের।
	১৯৬১	প্রায় ৬ কোটি টাকা দামের।
	১৯৬৬	প্রায় ১০ কোটি টাকা দামের।
(গ) *সাইকেল ও সরঞ্জাম রপ্তানি :—	১৯৬৪/৬৫	প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা দামের।
	১৯৬৫/৬৬	প্রায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা দামের।
	**১৯৬৬/৬৭	প্রায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা দামের।

(*প্রধান ক্রেতা ছিল মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ।)

(** ১৯৬৬ সালে ডিভ্যালুয়েশনের আগের দাম ধরলে এর দাম হতো ৯০ লক্ষ টাকা।)

ভারতের পথেঘাটে এখন ১২ কোটি সাইকেল, সাইকেল রিক্সা এবং সাইকেল ডেলিভারী-ভ্যান চালু রয়েছে। আমরা এখন গর্ব করে বলতে পারি যে, এই সাইকেলগুলির পার্টসের ৯৯ পারসেন্ট এবং শ্রমের পুরোটাই স্বদেশী। সাইকেলের টায়ার-টিউবও সংখ্যায় বছরে প্রায় দু' কোটি করে ভারতেই তৈরী হয়। কাঁচামালের আমদানি এখনো যা করতে হয় তা হলো নিকেল ধাতুটি এবং ইলেক্‌ট্রো-প্লেটিং করার মালমসলা। স্পেশাল স্টীলের অভাব প্রায় মিটে এসেছে।

সাইকেলের ব্যবহার সবচাইতে বেশি রাজধানী দিল্লীতে—প্রায় ৪ লক্ষ। তার পরেই জোড়া শহর হায়দ্রাবাদ-সেকেন্দ্রাবাদে—প্রায় ২ লক্ষ; সেখানে আবার ১৭০০০ সাইকেল রিক্সাও চলে। আর পাটনায় চলে প্রায় ৭৫০০ সাইকেল রিক্সা যা চালিয়ে সেখানে ২০০০০ লোকের রুজি জোটে।

বিলেতের প্রসিদ্ধ র‍্যালে কম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রথমত ১ কোটি টাকা মূলধন নিয়ে (এখন এর বর্ধিত পেড-আপ ক্যাপিট্যাল ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা) ১৯৪৯ সালের জুন মাসে 'সেন র‍্যালে ইন্ডাস্ট্রিজ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড' (অধুনা সেন র‍্যালে লিঃ) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রস্তুতি-পর্বে ইংল্যান্ডে সুধীরকুমারের সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন তাঁর বড় ছেলে অভিজিৎ এবং ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরী। মাঝে বছরখানেক বাদ দিয়ে চৌধুরী মশায় প্রথম থেকে বরাবরই সেন র‍্যালের ডিরেক্টর বোর্ডে আছেন। আর ছিলেন বাঙালীর আর এক নাম-করা প্রতিষ্ঠান ভারত ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীশচীন্দ্র-প্রসাদ সাহা। তিনিও সেন র‍্যালের ডিরেক্টর আছেন বরাবরই।

তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তা ও উৎসাহেই এই কোল্যাবোরেশন সম্ভব হয়েছিল। শিল্পে বাঙালী পিছিয়ে আছে, স্বাধীন ভারতবর্ষে বাংলা দেশে বাঙালীর হাতে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠুক, এই ছিল তেজস্বী শ্যামাপ্রসাদের সংকল্প। সুধীর সেনকে তিনি বলেছিলেন, "দেরি করবেন না, তাড়াতাড়ি দরখাস্ত দিন। আমি যথাসাধ্য করবো।"

ইস্পাত ও কয়লা উৎপাদনের কেন্দ্র আসানসোলের সংলগ্ন কন্যাপুরে বিরাট এক খণ্ড জমি কিনে ১৯৫১ সালের গোড়ায় ভিত্তিস্থাপনের পর পনেরো মাস ধরে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে সুধীরকুমার ১৯৫২ সালের জুন মাসে তাঁর কীর্তিসৌধ সেন-র‍্যালে ফ্যাক্টরীর প্রতিষ্ঠা করলেন। যা ছিল বিস্তীর্ণ উঁচু নীচু, সাপ আর জোঁকে ভরা এক নির্জন প্রান্তর তা আজ পরিণত হয়েছে এক উপনগরে। সেখানে আজ সৃষ্টি হয়েছে স্কুল পাঠশালা হাসপাতালে অলঙ্কৃত কর্মরত মানুষের এক বসতি।

নিজের ছেলেরা ছাড়া সেই সময়ে যাঁরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরই মত শত কষ্ট স্বীকার করে এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখ্য হলো সেন-র‍্যালের বর্তমান সেক্রেটারি শ্রীকালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম। ইনি হলেন সেনদের সেই গোত্রের বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান কর্মচারী যাঁর মধ্যে অতীতে রাজেনবাবু কিরণবাবুরা ছিলেন; আর আছেন সেন অ্যান্ড পণ্ডিতের বর্তমান জেনারেল সেলস ম্যানেজার শ্রী টি এইচ বি অ্যাডভানি, যিনি আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বলতম ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে এঁদেরই দেখে।

সকলের আড়ালে আর একজন আছেন, শ্রীমতী মীরা সেন। সুখে দুঃখে স্বামীর মনে শক্তি যোগানোর মূলে ছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়—দার্শনিক এমারসন একদা বলেছিলেন Men are what their mothers make them । সেই উক্তি যদি যথার্থ হয় তবে আজ যে আমরা বাঙালীরা অভিজিৎ ও সঞ্জয়ের কৃতিত্বে গর্বিত, তা-ও তো ঘটেছে তাঁদের মা মীরা দেবীর জন্য। এমন কি, পুত্রবধূদের বাণিজ্যকর্মেও আছে তাঁরই উৎসাহ।

১৯৫২ সালের শেষভাগে উৎপাদন আরম্ভ হয়ে ১৯৫৩ সালে কন্যাপুরে ৩৭৮০৭টি সাইকেল তৈরী হলো। হাতে তখন আরও এক লক্ষ সাইকেলের অর্ডার।

কন্যাপুরের সেই সুকন্যা সেন-র‍্যালে আজ সেখানে তৈরি করছে বছরে প্রায় ৮ কোটি টাকা দামের সাইকেল ও তার সাজ-সরঞ্জাম। শুনলেও অবাক লাগে যে, ১৪০০টিরও বেশি সংখ্যক পার্টসের সমন্বয়ে একটি সাইকেল তৈরী হয়।

১৯৬৭ সালে এই প্রতিষ্ঠান ২০ লক্ষ টাকার সাইকেল পার্টস রপ্তানি করেছিল। গত বছরে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা মূলধনের এই কম্পানির লাভ হয়েছিল প্রায় ৪১½ লক্ষ টাকা।

সেন র‍্যালেতে সাইকেলের উৎপাদন তো বছরে বছরে বেড়েই চলেছে, অধিকন্তু শীঘ্রই 'মোপেড' নামে মোটরচালিত একরকম সাইকেল তৈরী আরম্ভ হচ্ছে।

চেয়ারম্যানের ভাষণে ১৯৬৭ সালে শ্রীঅভিজিৎ সেন উল্লেখযোগ্য যে কথাটি বলেছেন তা হলো এই প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩৩০০ কর্মীর (যার শতকরা ৯৮জনই বাঙালী এবং ১৯৬৬ সালে সহযোগী র‍্যালে কম্পানির ইংরেজ উপদেষ্টারা চলে যাবার পর যে প্রতিষ্ঠান এখন সম্পূর্ণভাবে বাঙালীর পরিচালনায় আছে) কর্মতৎপরতা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি মমত্ববোধের প্রশংসা। ক্রমবর্ধমান এই শ্রমিক গোষ্ঠী আজ পনেরো বছর ধরে সুস্থ ও একাগ্র চিত্তে কাজ করে চলেছেন। কন্যাপুরে কোনো দিন না হয়েছে স্ট্রাইক, না লক-আউট।

আমার একটি বাঁধা বুলি আছে—গুড ম্যানেজমেণ্ট। অভিজিৎ সেন আর তাঁর সহযোগীরা আমাদের সামনে সেই উদাহরণ তুলে ধরেছেন।

কন্যাপুরের সেন র‍্যালের তৈরী র‍্যালে, রবিন হুড, রাজ্ ও হাম্বার সাইকেল কন্যাকুমারিকা থেকে কাশ্মীর ও কাথিয়াওয়াড় থেকে কামরূপ পর্যন্ত ছেয়ে যাক, আর তারা গরিব চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর প্রধান বাহন হয়ে উঠুক, এই কামনা করি।

সুধীর সেন বলেছিলেন, "বাঙালী বড় অল্পেতে ছেড়ে দেয়, টিকে থাকে না। যদি টিকে থাকতে পারে তা হলে বাঙালীর প্রতিভা ও পরিশ্রম অসাধ্য সাধন করতে পারে। অন্তত, আমি তাই পেরেছিলাম। ....নেমেছিলাম তো মাত্র চার শ' টাকা সম্বল করে; কিন্তু অন্তর থেকে একটা প্রেরণা বোধ করতাম যে, সেন অ্যান্ড পণ্ডিত দাঁড়াবেই।" তা সেন অ্যান্ড পণ্ডিত ৫৮ বছর ধরে দাঁড়িয়েই আছে, সেন-র‍্যালে বিশালকায় হয়ে উঠছে, আর ন্যাশান্যাল ট্যানারিও সগৌরবে এগিয়ে চলেছে।

১৮ মে, ১৯৬৮



ষোল

আমরা বাঙালীরা ইয়োরোপের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে বহুকাল ধরে ইয়োরোপীয় ধাঁচে অসংখ্য জীবনচরিত প্রণয়ন করে এসেছি। কিন্তু ইয়োরোপীয় জীবনীকারের ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং স্বচ্ছ দৃষ্টি আমাদের মধ্যে না থাকাতে কোনো কোনো ক্ষমতাশালী আদর্শবাদীর জীবন-চরিতেও আমাদের জীবনীকার অনেক ক্ষেত্রে মস্ত ফাঁক রেখে গেছেন। সমাজের ও জাতির চোখের সামনে তুলে ধরবার মতো অনেক জীবনচরিত আবার অলিখিতও থেকে গেছে। এমন উদাহরণও আছে যে, মহৎ ব্যক্তিবিশেষের আত্মপ্রচারে অনীহার জন্যেও জীবনীকার বিপদে পড়েছেন। বড়লোকটি কোন মতেই নিজেকে জাহির করতে চাননি বলে স্বজনবন্ধুকেও নিজের কাজকর্ম সম্বন্ধে কিছু জানতে না দেবারই চেষ্টা করেছেন। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পরে গুছিয়ে কেউ সবটা বলতে পারেন নি। আর আমাদের জীবনচরিত-প্রণেতারও অবকাশ থাকেনি যে, চিঠিপত্র গল্পগুজবের আবর্জনা ঘেঁটে চরিত্রটিকে যথাযথ রূপদান করবেন। এই কাজটি ইয়োরোপীয় জীবনীকার কিন্তু বহু ক্লেশে সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করে থাকেন।

তাই বোধ হয় সমারোহ করে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হওয়া সত্ত্বেও নীরব কর্মী ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের প্রকৃত জীবনালেখ্যটি লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

চব্বিশ পরগণার ন্যাতড়া গ্রামের ক্ষুদ্র ভূস্বামী নন্দলাল সরকারের দ্বিতীয় পুত্র নীলরতন (১৮৬১-১৯৪৩) কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়ে মানুষ হয়েছিলেন। ক্যামবেল মেডিক্যাল স্কুলে এল-এম-এফ পাস করে নীলরতনের মেডিক্যাল কলেজে ঢোকা এবং সেখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম-বি ও এম-ডি পাস করার পর্ব আমাদের জানা আছে। উত্তরকালে লর্ড কারমাইকেলের পৃষ্ঠপোষকতায় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর এবং ডাক্তার সুরেশ সর্বাধিকারীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কারমাইকেল মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতালের (অধুনা আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ) স্থাপনা করা কিংবা ন্যাশানাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের (অধুনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) স্থাপনা ও অর্থসহায়তা করা- স্যার নীলরতনের এই সব জনকল্যাণমূলক কীর্তির বিবরণ আমরা অনেকেই জানি।

কিন্তু বাংলা দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের স্থাপনা ও উন্নয়নের জন্যে নীলরতন নীরবে কত কাজ করে গেছেন তার খবর আমরা ক'জন রাখি? নীলরতনের অন্তরঙ্গ সুহৃদ আচার্য রায়ও তাঁর আত্মচরিতে (১৯৩২-এ প্রকাশিত) বন্ধুর জীবনের এই দিকটার কোন খবর যোগান নি। কেন, তা জানি না।

স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র এবং নীলরতনের জামাতা শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেদিন আলোচনার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না যে, এই শতকের একেবারে গোড়ায় স্যার নীলরতন সরকার জলপাইগুড়ি অঞ্চলের কলাবাড়ি, সারদা, চাঁদমণি, কমলা প্রভৃতি নাম-করা কয়েকটি চা-বাগিচার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মানে, বলতে গেলে বাঙালী চা-করদের তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। জানতাম না যে, শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অণ্ডালের উখড়া অঞ্চলের কয়েকটি কয়লার খনির খননকার্য থেকে শুরু করে সেই খনির কয়লা রীতিমতো বাজারে চালু করিয়েছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ শিশুসাহিত্যিক ভ্রাতা যোগীন্দ্রনাথ এবং বন্ধু শশীভূষণ বসু ও সত্যানন্দ বসুর সহযোগিতায় 'ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' করে গিরিডির বাবগন্ডা অঞ্চলটিকে নীলরতনই যে স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবে গ'ড়ে তুলেছিলেন তা আমাদের অনেকের অজানা। আর আমি এও জানতাম না যে, তাঁর ৬১নং হ্যারিসন রোডের বসতবাড়িতে ওয়ার্কশপ খুলে তিনি মেশিন তৈরীর কাজেও লিপ্ত ছিলেন। ধন্বন্তরী নীলরতন যে এইভাবে তাঁর স্বোপার্জিত লক্ষ লক্ষ টাকা ঢেলেছিলেন তা, খালি আমার কেন, খুব কম লোকেরই জানা ছিল।

আমি শুধু জানতাম যে, নীলরতন বেঙ্গল কেমিক্যালের ভ্রূণ অবস্থা থেকে বরাবর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন; আর জানতাম যে, তিনি ন্যাশান্যাল ট্যানারির স্বত্বাধিকারী এবং অধুনালুপ্ত ন্যাশানাল সোপ ফ্যাক্টরির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এটাও জানতাম যে, ভগিনীপতি স্বর্গত প্রবোধচন্দ্র মহলানবিশের (অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্রের পিতা) সঙ্গে অংশীদার হয়ে স্যার নীলরতন 'কার অ্যান্ড মহলানবিশ' নামে চৌরঙ্গীতে খেলার সরঞ্জাম ও গ্রামোফোনের বিরাট একটা দোকান করেছিলেন।

এসবের বাইরে আরও একটা দিক আমরা জানতাম। নীলরতন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থটি নীলরতনকে উৎসর্গ করেছিলেন।

এই প্রবন্ধে স্যার নীলরতন সম্বন্ধে এর বেশী আর কতটুকু লিখতে পারবো? কতটা শক্তি থাকলে একজন লোক এই বিশাল দেশের চিকিৎসক-শিরোমণিত্বের তুমুল ব্যস্ততা সত্ত্বেও সমান করে দেশের হিতের জন্যে বহুমুখী শিল্পোদ্যোগে এমনভাবে প্রবৃত্ত হতে পারেন তার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত কোনো বলিষ্ঠ লেখনী লিপিবদ্ধ করুক, এইটাই আমরা চাইবো; ইতিহাসও তাই দাবী করে।

সারা ভারতের অভিজাত মহলে চিকিৎসাবৃত্তি করে স্যার নীলরতনের উপার্জনের কোনো ঠিকঠিকানা ছিল না। সেই উপার্জনের অধিকাংশ তিনি শিল্প ও বাণিজ্যে নিয়োগ করতেন। ট্যাক্সের গুরুভারমুক্ত যুগে তিনি ডাক্তারিতে যা উপার্জন করতেন তা দিয়ে তিনি তালুকমুলুক কিনে ফেলতে পারতেন।

এক কথা বারবার বলার মানে হলো যে, নীলরতনের এই শিল্পোদ্যোগ ছিল বাঙালীকে জাগিয়ে তোলার, উদ্বুদ্ধ করার সাধনা—মুনাফা-লোলুপতা নয়।

এই শতকের আরম্ভে নীলরতন কী যেন একটা কাজে একবার মাদ্রাজের দিকে গিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন যে, সেখানকার চর্মশিল্পের কেন্দ্র থেকে বছরে ১৪।১৫ কোটি টাকার কাঁচা চামড়া বিলেতে রপ্তানি হয়; আর দেশের মুচীরা ভালো চামড়া পায় না। দেখে-শুনে তিনি কলকাতায় একটা ট্যানারি গড়ে তোলবার সংকল্প করে ফেললেন।

কলকাতার পূর্ব উপকণ্ঠের তিলজলা, গোবরা, ট্যাংরা প্রভৃতি অঞ্চল আজকের মত সেকালেও ছোট বড় চামড়া ট্যানিং কারখানার কেন্দ্র ছিল। তিলজলার ন্যাশান্যাল ট্যানারি প্রতিষ্ঠানটির মালিক ছিলেন হরেকিষণ নামে এক পাঞ্জাবী। ব্যক্তিগত কারণে হরেকিষণজী সেই ট্যানারিটি বিক্রি করে দেশে ফেরবার উপক্রম করছিলেন। ডাক্তার সরকার খবর পেয়ে সেটি কিনে নিলেন। প্রথম থেকেই অনেক টাকা তিনি এতে ঢাললেন। ন্যাশান্যাল সোপ ফ্যাক্টরিও (পরবর্তী কালের ন্যাসকো-র সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ ছিল না) সমসাময়িক।

বছর তিনেক পরে ডাক্তার সরকার তিলজলার কিছু দূরে পাগলাডাঙ্গায় বিঘা পঁচিশেক জমি কিনে ট্যানারিটা উঠিয়ে নিয়ে গেলেন।

ট্যানিং-এর সংজ্ঞা হলো চামড়াকে কাঁচা পচনশীল অবস্থা থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পাকাই করা। সোজা কথায়, ট্যানারি হলো মুচীর কারবার। তায় আবার ছাগল ভেড়া ছাড়াও গরুমহিষের চামড়া নিয়ে ব্যাপার। ভদ্র বাঙালী সে কাজে নামার কথা সেকালে ভাবতেই পারতো না। কিন্তু কয়েক বছর পরে ডাক্তার সরকারের সঙ্গে আরও দুজন বাঙালী সক্রিয়ভাবে এতে যোগ দিলেন। তাঁদের নাম সুরেন্দ্রনাথ রায় ও রায়বাহাদুর বিরাজমোহন দাস। নীলরতনের মূলধন, সুরেন রায়ের পরিশ্রম এবং বিরাজমোহনের ট্যানিং-এর জ্ঞান, এই তিনে মিলে ন্যাশান্যাল-কে উন্নতির পথে নিয়ে চললো। বিরাজমোহন ছিলেন ভারতের প্রথম বিদেশী ডিগ্রীধারী লেদার টেকনোলজিস্ট। তিনি ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত ন্যাশান্যাল ট্যানারিতে ছিলেন। তারপরে যখন স্যার নীলরতনের উদ্যোগেই কলকাতায় সরকারী 'বেঙ্গল ট্যানিং ইন্সটিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হলো তখন নীলরতনই চেষ্টা করে বিরাজমোহনকে সেই শিক্ষায়তনটিকে দাঁড় করাবার জন্যে নিযুক্ত করালেন। ১৯৫৩ সালে বিরাজমোহন মাদ্রাজে অবস্থিত 'সেন্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইন্সটিটিউটের' প্রথম ডিরেক্টর হয়েছিলেন। বর্তমানে ভারতের যে সব বিখ্যাত ট্যানিং-বিশারদ আছেন তাঁরা অধিকাংশই বাঙালী এবং অনেকেই বিরাজমোহনের শিষ্য। আর পরবর্তী কালে নীলরতনের জামাতা সুধীরকুমার সেন যখন ন্যাশান্যাল ট্যানারির ভার নিলেন, তখন বিরাজমোহনের পরামর্শেই সুধীর সেন মশায়ের ছোট ছেলে সঞ্জয় সেন (কম্পানির বর্তমান চেয়ারম্যান) আমেরিকায় গিয়ে চর্মশিল্পে বিশেষজ্ঞ হয়ে এসেছিলেন।

কিছুকাল পরে কিন্তু ন্যাশান্যালের ব্যবসাতে ভাটা পড়তে শুরু করলো। চামড়ার বাজারে মন্দা এলো। তাই ১৯১৯ সালে নীলরতন আর একজন বিখ্যাত বাঙালী, মার্টিন কম্পানির স্যার রাজেন মুখার্জিকে ট্যানারিটির ভার নিতে অনুরোধ করলেন। মার্টিন কম্পানি পরিচালনার ভার

নিতে রাজী হলো। নিজের কয়েক লক্ষ টাকা এতে আটকে থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাবার জন্যে ডাঃ সরকার এই ব্যবস্থা করেছিলেন। নীলরতনের কন্যা শ্রীমতী মীরা সেন আমাকে বললেন যে, এই সব বিরাট লোকসানেও নীলরতন কখনো বিচলিত হননি। 'টাকাটা দেশের সেবায় গেল', এই-ই তিনি ধরে নিতেন।

উনিশ বছর চালাবার পর ১৯৩৮-৩৯ সালে মার্টিন কম্পানিও এই প্রতিষ্ঠানের ভার আর বইতে চাইলেন না। তাঁরা তখন ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়মুক্ত হয়ে ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল প্রভৃতি বিরাট প্রকল্পের সুপরিচালনার জন্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। ফলে, বছর দুই তিনের জন্যে ন্যাশন্যাল ট্যানারির কাজ বন্ধ রইলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জমে ওঠার পর রোগশয্যায় শায়িত স্যার নীলরতন তাঁর জামাতা বিখ্যাত সাইকেল ব্যবসায়ী সুধীর সেন মশায়কে ডেকে ন্যাশন্যাল ট্যানারির ভার নিতে অনুরোধ করলেন। এত পুরনো এবং স্যার নীলরতনের এত সাধের প্রতিষ্ঠানটির পুনরুজ্জীবনের ভার সুধীর সেন নেওয়া স্থির করলেন। ঐতিহ্যময় বাঙালী সংস্থাটি বাঁচলো। সেটা ১৯৪১ সাল।

টাকার দরকার—তা যোগালেন কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিখ্যাত ব্যাংকার ডঃ শান্তিভূষণ দত্ত, ব্যারিস্টার অ্যাট-ল। বাঙালীকে শিল্প ও বাণিজ্যে সহায়তা করা ছিল শান্তি-ভূষণের ব্রত।

প্রথমেই মিলিটারি কনট্র্যাক্ট নিয়ে ন্যাশন্যাল ট্যানারি আবার সচল হলো। বাধ্য হয়েই সুধীর সেন তা নিলেন। কারণ, ব্রিটিশ সরকার লড়াইয়ের সরঞ্জামের জন্যে ভারতবর্ষের সমস্ত ট্যানারির উৎপাদন দাবি করেছিলেন। সেই অর্ডারের মাল সরবরাহের ব্যবস্থার জন্যে সুধীর সেন কোমর বেঁধে লাগলেন। সঙ্গে নিলেন অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সে সদ্য এম এস-সি পাস বড় ছেলে অভিজিৎকে। যুদ্ধের জন্য সাইকেল আমদানির ব্যবসায় তখন প্রায় অচল অবস্থা; তাই সুধীর সেন তাঁর সমস্ত শক্তি ট্যানারির কাজে নিয়োগ করতে পারলেন।

পেট্রল রেশনিং-এর যুগ। বাপব্যাটা রোজ সকালে খালের ধার দিয়ে চার মাইল সাইক্লিং করে ন্যাশন্যালের পাগলাডাঙ্গার কারখানায় যেতেন--দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। ট্যানারির কাজের তদারক করে যেতেন লালবাজারের অফিসে; আবার দিনের শেষে পার্ক সারকাসের বাড়িতে ফিরতেন--সবই সারতেন সাইকেলে।

ন্যাশন্যাল ট্যানারির বর্তমান ডিরেক্টর শ্রীমতী মীরা সেন বললেন যে, তাঁর স্বামীর দূর-দৃষ্টি ও সৌভাগ্য ছিল অতুলনীয়। তাই সুধীর সেন কম্পানির ভার নেবার পর দ্বিতীয় বছর থেকেই ন্যাশন্যাল ট্যানারি শেয়ারহোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড দিতে আরম্ভ করেছিল।

আর একটা কথা মীরা দেবী বললেন--১৯১৯ সালে বিবাহের পর থেকে ১৯৫৯-এ সুধীরকুমারের পরলোকগমন পর্যন্ত সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরে তিনি তাঁর স্বামীকে কখনো ভীত বা বিচলিত হতে দেখেন নি। সব ব্যবসাদারই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে অর্থসংকট বা অনুরূপ কোনো বিপদে পড়েন বলে শোনা যায়। সুধীর সেন কখনো তেমন বিপদের সম্মুখীন হননি। মীরা দেবীর মতে, সুধীরকুমারের দূরদৃষ্টির জন্যেই সেটা সম্ভব হয়েছিল। দুই ছেলে অভিজিৎ ও সঞ্জয়ও পিতার সেই গুণের অধিকারী।

সেদিন ন্যাশান্যাল ট্যানারির পাগলাডাঙগার বিশাল কারখানাটিতে ঢুকে প্রথমেই যে দুটি গুণ আমাকে মুগ্ধ করলো তা হলো যন্ত্রের আধুনিকতা ও যন্ত্রীর তারুণ্য ও সপ্রতিভতা। অবশ্য সদাব্যস্ত চেয়ারম্যান সঞ্জয় সেনের সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপে আমি বঞ্চিত। কিন্তু সৌম্যদর্শন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অনুপম সেন-এর মিষ্ট ব্যবহার এবং অভিনিবেশ অনুকরণীয়।

'ফিনিশড্ লেদার অ্যান্ড লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল'-এর চেয়ারম্যান সঞ্জয় সেন পরের দিনই যাচ্ছেন ইংল্যান্ডের 'লেস্টার' মেলায় যোগ দিতে। উদ্দেশ্য, ভারতের বর্তমান ৭০।৭৫ কোটি টাকার চামড়া ও জুতো রপ্তানি বাড়িয়ে কী করে ১০০ কোটির সীমা পার করানো যায়, বিদেশী খরিদ্দারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তারই ব্যবস্থা করা। ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যে পাট, চা ও কাপড়ের পরেই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চতুর্থ স্থান হলো কাঁচা ও ট্যানড্ চামড়া এবং পাদুকাশিল্পের। (এদেশে গরু, ঘোড়া ও মহিষের সংখ্যা আনুমানিক ২০ কোটি, ছাগলের সংখ্যা ৭ই কোটি আর ভেড়া আছে ৪ কোটি আন্দাজ। ১৯৬৬ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে সেই বছরে আমাদের উৎপাদিত গরু ও মোষের চামড়া তৈরী হয়েছিল ২ কোটি, ছাগলের চামড়া ৩ই কোটি আর ভেড়ার চামড়া হয়েছিল ১ কোটি ৭০ লক্ষ আন্দাজ)। আমি যেদিন ন্যাশান্যাল ট্যানারি দেখতে গেলাম সেদিন সঞ্জয় সেনের আসন্ন যাত্রা নিয়ে অনুপম সেনও খুব ব্যস্ত ছিলেন।

কিন্তু তার জন্যে আমার পরিক্রমায় কোনো অসুবিধে হলো না। কম সময়ে অল্প কথায় এমন একটি বৃহৎ শিল্পের মোদ্দা কথাগুলি আমার মতো এক নিপট আনাড়িকে বুঝিয়ে দেওয়া সহজ কাজ নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু ন্যাশান্যালের অভিজ্ঞ ওয়ার্কস ম্যানেজার জ্যোতির্ময় সিংহরায় ঠিক সেই কাজটিই করলেন।

'অভিজ্ঞ' শব্দটা শুনলেই কেমন যেন পাকা দাড়ি পাকা চুল বা টাক আর ভুঁড়ি সংবলিত রাশভারী পুরুষসিংহ অথবা বিরসবদন ডিস্পেপটিকের ছবি এতকাল আমার মনে জেগে উঠতো। সেন মহাশয়দের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সুপুরুষ কর্মীদের দেখে আমার সেই কনসেপশনটা এবার যেন বদলাতে শুরু করেছে। জ্যোতির্ময়বাবু তো ছেলেমানুষ; বয়স মাত্র ৩৪ বছর। ডেপুটি ওয়ার্কস ম্যানেজার আশিস চক্রবর্তী, 'অ্যাপ্লিকেশন ইঞ্জিনীয়ার' অশোক রায়, 'এক্সপোর্ট ফোরম্যান' অমিতাভ ভট্টাচার্য এবং আরও ১২।১৩ জন লেদার টেকনোলজিস্ট—সকলেই তরুণ, ত্রিশের এদিক আর ওদিক। আর অনেকেই বেঙ্গল ট্যানিং ইন্সটিটিউটে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করে ইংল্যান্ড জার্মেনি থেকে 'পাকাই' হয়ে এসেছেন। ৫০০ শ্রমিক ও কর্মী-বিশিষ্ট এই বৃহৎ কারখানার এঁরাই হলেন পরিচালক।

কত পরিভাষা-ই না শিখছি! 'পাকাই' মানে চামড়া ট্যানিং। জুতোর সোলের পরিভাষাটি বোধ হয় এখনো তৈরি হয়নি। সোল বানাবার চামড়া পাকাই করতে হয় ছাল-পাকাই (ভেজিটেবল ট্যানিং) প্রণালীতে। তাতে লাগে বাবলা, হরতুকি আর বিদেশী ওয়াটল-এর ছাল কিংবা ছালের নির্যাস। এই ছাল-পাকাই পদ্ধতিতে ভারতের কয়েকটি অন্ত্যজ জাতি আবহমান কাল ধরে চামড়া ট্যান করে এসেছে। এই চামড়া সাধারণত গরু ও মহিষের চামড়া; তা-ও আবার বিদেশের মতো স্লটার-হাউসে জবাই করা জন্তুর চামড়া নয়—ভাগাড় থেকে কুড়নো

মরা জানোয়ারের চামড়া, যাকে চর্মশিল্প বিশারদরা বলেন ফলেন হাইডস। এই ফলেন হাইডের মান যে স্ট্যাণ্ডার্ড হাইডের চাইতে নিকৃষ্ট হয়ে থাকে, তা বলাই বাহুল্য। তাই পাকাইয়ের পরেও তার মান বিদেশী ছাল-পাকাই চামড়ার মতো হয় না। ছাল-পাকাইয়ে মাদ্রাজ ও কানপুর কলকাতার অগ্রগণ্য। খবরের কাগজে যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কিপস-এর কথা প্রায়ই চোখে পড়ে তা হচ্ছে সেই বয়সের গরুমোষের ছালপাকাই চামড়া যে-পশুগুলি বাছুরের চাইতে বড় অথচ সম্পূর্ণ পরিণত নয়।

ক্রোম পাকাইয়ে কিন্তু কলকাতার নাম বেশী। আর কলকাতার চীনেদের ছোট ছোট ট্যানারি হিসেবে ধরলে ক্রোম-পাকাইয়ে কলকাতার উৎপাদন মাদ্রাজ কানপুরের চাইতে বেশী।

আর এক রকমের ট্যানিং আছে, সেটা হয় তেলের মাধ্যমে। আপনার মোটরগাড়ির ক্লীনারকে যে শ্যাময় লেদার ব্যবহার করতে দেন তার পাকাই হয় এই প্রণালীতে।

মাদ্রাজ ও কলকাতার চাইতে 'সোল' তৈরীর ব্যাপারে কানপুরের লোক বেশী দক্ষ; আর কুটিরশিল্প পর্যায়ে আগ্রার পাদুকাশিল্প হচ্ছে অগ্রণী। সঞ্জয় সেন তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছেন যে, ভারতের জুতো তৈরীর কারখানাগুলির শতকরা ৯০টিই কুটিরশিল্পের পর্যায়ে পড়ে। তার জন্যে আমাদের প্রধান অসুবিধে দাঁড়িয়েছে যে, সমতা ও সামঞ্জস্যের অভাবে রপ্তানির মালের মান বজায় রাখা যায় না। সেই কারণ দেখিয়ে শ্রীসঞ্জয় সেনের নেতৃত্বে চর্ম উন্নয়ন এবং চর্ম রপ্তানি উন্নয়ন সংস্থা দুটি চর্ম ও পাদুকা শিল্পের কারখানাগুলির উৎপাদনের মানোন্নয়নের এবং আরও বড় বড় কারখানা স্থাপনের সুপারিশ করেছেন।

সরকারের হয়েছে 'শ্যাম রাখি, না কুল রাখি' অবস্থা। বৃহৎ শিল্পোদ্যোগে উৎসাহ দিয়ে কুটিরশিল্পের ক্ষতি করতে দিতে চান না, আবার আধুনিক পদ্ধতিতে চামড়া পাকাই এবং জুতো তৈরী না হলে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনও ব্যাহত হয়। তবুও, উৎপাদনের ৫০ পারসেণ্ট রপ্তানি করতে হবে এই কড়ারে কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাশান্যাল ট্যানারিকে ও মাদ্রাজের একটি প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রতি জুতো তৈরীর অনুমতি দিয়েছেন। তাঁরা শীঘ্রই উৎপাদন শুরু করবেন।

ভারতে এখন মাত্র গুটি চারেক বৃহৎ ট্যানারি আছে কলকাতার ন্যাশান্যাল ও বাটা শু কোং, মাদ্রাজের গর্ডন উড্রোফ কোং ও ক্রোম লেদার কোং, এবং কানপুরের কুপার অ্যালেন ('ফ্লেক্স' জুতোর কারখানা)।

কলকাতার বাটা কম্পানি বেশী রপ্তানি করেন তৈরী জুতো, চামড়া পাঠান কম। ন্যাশান্যাল পাকাই চামড়ার রপ্তানিতে বাটার চাইতে বড়। টমাস বাটার মাতৃভূমি চেকোস্লভাকিয়া ভারত থেকে অনেক চামড়া কেনেন। সেই চামড়ার অনেকখানি আবার ন্যাশান্যালের কাছ থেকে কেনেন।

ন্যাশান্যাল ট্যানারির ক্রমবর্ধমান রপ্তানির বৃত্তান্তটি জানবার মতো। ১৯৬২—৯৭ হাজার টাকার; ১৯৬৪—৪৫ লক্ষ টাকার; ১৯৬৬—১ কোটি ২৯ লক্ষ এবং ১৯৬৭-তে ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকার পাকাই চামড়া ন্যাশান্যাল রপ্তানি করেছে। এঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৭২ সালে রপ্তানি হবে ৬ কোটি টাকার পাকাই চামড়া ও জুতো।

একটি বিশেষ ধরনের বেল্টিংও ন্যাশান্যালে তৈরী হচ্ছে। দু দিকে চামড়া ও মাঝখানে

সূক্ষ্ম নাইলনের পাত দিয়ে তৈরী এই বেল্টিং-এর টেনসাইল স্ট্রেংথ বা প্রসার্যশক্তি নাকি দুর্দান্ত।

উঃ—কী গন্ধ! এই ছাল-পাকাই বিভাগের পাশে যদি ফুটন্ত ফুলে ভরা এক হাজারটা বসরা গোলাপের গাছও থাকতো তবুও আপনার আমার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসতো। এইসব ছেলেরা বোধ হয় নিজেদের নাসারন্ধ্রও পাকাই করে নিয়েছেন, না হলে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কেমন করে এখানে কাটান! জ্যোতির্ময়বাবুর সঙ্গে কারখানার ভেতরে ঘুরতে ঘুরতে সেই কথাটাই ভাবছিলাম। কিন্তু যখন বার্নিশ করা তৈরী চামড়ার বিভাগে এলাম তখনকার গন্ধটা ছেলেবেলার জন্মদিন আর পুজোপার্বণের কথা মনে পড়িয়ে দিল। বাবা দাদার হাত ধরে যখন কলেজ স্ট্রীটের দোকান থেকে নতুন জুতোর বাক্সটি সগর্বে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরতাম—আঃ—কোথায় গেল আমার নতুন জুতোর (আর নতুন বইয়েরও) গন্ধে ভরা অনাবিল আনন্দের সেই সব দিন!

অনেক ঝড়ঝাপটা সয়ে ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের সাধের ন্যাশানাল ট্যানারি আজ বাঙালীর শিল্পোদ্যোগের এক আলোকস্তম্ভে পরিণত হয়েছে। এখন আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি যে, তাঁর দৌহিত্রদের দক্ষ পরিচালনায় এ প্রতিষ্ঠান এগিয়েই যাবে।

সেন অ্যাণ্ড পণ্ডিত ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

মাঝে মাঝে নিজের চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। সরকার—তা কেন্দ্রেরই হোক বা রাজ্যের হোক, তার খুঁত দেখতে পেলে আমি মাছির মতন ভনভন করে উঠি কেন? আমি তো মৌমাছি হতে চাই, মাছি নয়! তবু এ ছিদ্রান্বেষণ কেন? বোধ হয় প্রতিদিনের বড় বড় সরকারী বুলির ফাঁপা আওয়াজে বিশ্রী রিয়্যাকশন হয় বলেই মনটা আমার এমন হয়েছে।

যেমন ধরুন উপনগর কল্যাণীর কথা—ডাক্তার বিধান রায়ের মানসকন্যা এই আজব নগরীটিতে তাঁর মৃত্যুর পরে ছ'সাত বছরে উন্নতিটা কী হয়েছে? একটা নবগঠিত পৌরশাসন অধিকারের কাছ থেকে ন্যূনতম যেটুকু প্রাপ্য তাও কল্যাণীর বাসিন্দারা পান না। বর্ষা নামলে শহরের স্থানে স্থানে ড্রেন পায়খানার নোংরা জল ওপরে উঠে এসে মানুষের হাঁটু অবধি ডুবিয়ে দেয়; শহরের ময়লা ঠিক মতো পরিষ্কার হয় না; আগুন লেগে গেলে, এই আধুনিক-কালেও কল্যাণীর ফায়ার-ব্রিগেডের ক্ষমতা নেই, সাজসরঞ্জাম নেই যে, তা নেবাতে পারে, আর কেউ যদি সন্ধ্যের অন্ধকারে পকেটে কিছু নিয়ে বেরোন তো ছেনতাই অবধারিত।

৬৩০ জন কর্মীর জীবিকার যোগান দেয় যে সেন অ্যাণ্ড পণ্ডিত ইণ্ডাস্ট্রিজ তার কারখানা দেখতে গিয়ে পরিচালক কানাই দে ও তাঁর সহকারী প্রভঞ্জন সেনের কাছ থেকে এই সব কথা শুনে এলাম।

ডাক্তার বিধান রায়ের অনুরোধ এড়াতে না পেরে কল্যাণী ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল এস্টেটের এক শেড ভাড়া নিয়ে সুধীর সেন মহাশয় সাইকেলের সরঞ্জাম তৈরীর এই বড় কারখানাটা বসাতে রাজী হয়েছিলেন। ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ১৯৫৮ সালে সেন অ্যাণ্ড পণ্ডিত ইণ্ডাস্ট্রিজ স্থাপিত হয়েছিল। তৈরী কারখানা বাড়ির দখল নিতে গিয়ে দেখা গেল সরকারী স্থপতির

কেরামতি আছে। যেখানে শেড-এর উচ্চতা করা উচিত ছিল ১৭।১৮ ফুট সেখানে তা করা হয়েছে বারো না তেরো ফুট। ফলে টিনের চালের এই নীচু নীচু ঘরগুলিতে চৈত্র বৈশাখের প্রখর তাপে শ্রমিকরা ভাজা ভাজা হয়ে যায়। পরে অবশ্য সম্প্রসারণের সময়ে সেন পণ্ডিত তাঁদের নিজেদের তৈরী শেডগুলিতে এই গলদ শুধরে নিয়েছেন, কিন্তু পুরনো সরকারী কীর্তিসৌধ তো খাড়াই রইলো। কম্পানি এখন জমিসুদ্ধ কারখানা বাড়িটা সরকারের কাছ থেকে কিনে নিচ্ছেন। সরকারী ইমারতের সংস্কার করার খরচ তাদের ঘাড়েই পড়ছে। এই কাণ্ডকারখানা দেখার পরে কি আমরা সরকারকে অভিনন্দন জানাবো?

এই প্রতিষ্ঠানেও কুশলী নবীন সব এঞ্জিনীয়াররা আছেন আর তাঁদের উপরে আছেন যুগ্ম ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীকালিদাস গঙ্গোপাধ্যায় এবং সেন গোষ্ঠীর আর একজন অতি পুরাতন কর্মী শ্রী টি এইচ বি অ্যাডভানি। ফ্যাক্টরি-অফিসে আছেন চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট নিখিল মজুমদার। নিখিলবাবুর যোগ্যতার বিষয়ে কালিদাসবাবু খুব প্রশংসা করলেন।

প্রধানত টিউব ভালভ্, বটম্ ব্র্যাকেট, বেয়্যারিং-এর জন্য ইস্পাতের খুদে খুদে বল এবং রিম প্রভৃতি কতকগুলি সাইকেল পার্টস এই কারখানায় তৈরী হয়। এ তো সামান্য কয়েকটা। এক-একটি সাইকেলে নাকি ১৪০০টিরও বেশী সাজসরঞ্জাম থাকে। বিস্ময়কর ব্যাপার।

সেন অ্যান্ড পণ্ডিত ইন্ডাস্ট্রিজের তৈরী পার্টসের প্রায় সমস্তটাই সেন-র‍্যালে কিনে নেয়। কেবল টিউব ভালভ্ জিনিসটির সামান্য রপ্তানিও হয়। ১৯৬৬-তে মাত্র ২২,০০০ টাকার রপ্তানি হয়েছিল, আর ১৯৬৭-তে হয়েছে ৬৪,০০০ টাকার। বিশেষ কিছুই নয়, তবু সংখ্যাটা ঊর্ধ্বগামী। এই প্রতিষ্ঠানের সুবিধে এই যে, এঁদের উৎপন্ন ৮০।৮৫ লক্ষ টাকা দামের মাল সেন-র‍্যালের কাছে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যায়। কাজেই পড়তাটা নীচের দিকে রাখতে পারলে লাভ হতে বাধ্য।

পশ্চিম জার্মানিতে শিক্ষিত প্রোডাকশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট বিমল ব্যানার্জি আমাকে ফ্যাক্টরি দেখাচ্ছিলেন। এখানে প্রায় সব কাজেই শব্দ আছে প্রচুর, কিন্তু তাতে একটা লয়ও আছে। বড় বড় ইমপোর্টেড মেশিনগুলির কাজ দেখতে ভাল লাগে। এই ছন্দোবদ্ধ হট্টগোলের মধ্যে প্রকাণ্ড একটি মেশিন প্রায় নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে সেটা হলো ইলেকট্রোপ্লেটিং মেশিন।

ঝকঝকে তারুণ্যে ভরা কর্মীদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি মমত্ববোধটা বিমলবাবুর কয়েকটি কথার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠলো। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, পশ্চিম জার্মেনির ব্যয়সাপেক্ষ শিক্ষালাভের মূল্য তিনি এখানে পাচ্ছেন কি না। উত্তরে বিমলবাবু বললেন যে, শ্রমমূল্য আরও বেশি হওয়া উচিত বটে, কিন্তু কম্পানির বর্তমান অবস্থায় তিনি তা কী করে দাবি করবেন -- সে হবে নিজের কাছ থেকেই দাবি করা। কম্পানির সামর্থ্য বাড়লে চেয়ারম্যান সঞ্জয় সেন বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর কালিদাসবাবুকে বলতে হবে না; তাঁরা আপনা থেকেই সকলের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দেবেন। সেন প্রতিষ্ঠানের নিয়মই তাই।

এই সুর আজকাল বেশি শোনা যায় না। এ সেন তিমিরবরণের সেই লুপ্ত রাগিণী উদ্ধারের মতো।

সেন অ্যান্ড পণ্ডিত ইন্ডাস্ট্রিজের ৬৩০ জন কর্মীর প্রায় শতকরা ৯৯ জনই বাঙালী; ৪০০ জন আবার উদ্বাস্তু বাঙালী। আর তাঁরা সবাই তরুণ, সবাই তাজা।

অ্যানাসিলারি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

ডিরেক্টর শ্রীশমীন বসু ও সেক্রেটারি শ্রীসোমেন গুপ্ত পরিচালিত এই কারখানার সমষ্টি কল্যাণীতে সেন-পন্ডিতের কারখানার সংলগ্ন ইন্ডাস্ট্রিয়্যাল এস্টেটেই অবস্থিত। তরুণ ওয়ার্কস সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রী এস মুখার্জির নেতৃত্বে এই কারখানা তিনটিতেও প্রায় ৩০০ বাঙালীর কর্মসংস্থান হয়েছে।

এ'দের প্রধান কাজ হলো সাইকেলের লাগস্ ও ব্র্যাংকস্ তৈরি করা। খরিদ্দারও প্রধানত সেন-র‍্যালে।

এস কে সেন অ্যান্ড সন প্রাইভেট লিমিটে

শ্রীঅভিজিৎ সেনের পত্নী অমিয়া দেবী এবং শ্রীসঞ্জয় সেনের পত্নী রত্না দেবী এই প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এ'দের ব্যবসা হলো প্রধানত ভারতীয় কারুশিল্প রপ্তানি করা। এই উপলক্ষে পরলোকগত শ্বশুর মহাশয়ের মতো রত্না দেবীও নিয়মিত ইয়োরোপ-আমেরিকাতে বাণিজ্যযাত্রা করেন। এ'দের পণ্য বিদেশের বাজারে সমাদৃত হয়েছে; বাণিজ্যপদ্ধতিও প্রশংসা পেয়েছে। সম্ভ্রান্ত কুলবধূরা দাসদাসী-পরিবৃতা হয়ে আরামে ঘরকন্না করতে পারতেন; তা না করে স্বামীদের মতো কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, সে কথা ভাবলেও কত ভালো লাগে! বিশেষ করে তাঁরা বাঙালী ঘরের মেয়ে বলে।

সেদিন এক অশীতিপর বয়স্ক পাঠকের কাছ থেকে সুন্দর একটি চিঠি পেলাম। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটি কর্মজীবনে সাংবাদিক ছিলেন। নানা সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; এমন কি, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজী দৈনিক 'বেঙ্গলি'-তেও লিখতেন বলে জানিয়েছেন। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "বাঙ্গালীর দুর্নাম অপগত হইয়াছে এবং বাঙ্গালী এখন ব্যবসা জগতে প্রধান স্থানের অধিকারী হইতেছে জানিয়া বিশেষ গর্ব ও আনন্দলাভ করিতেছি" ইত্যাদি।

কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও স্যার নীলরতনের আদর্শবাদ কি আমরা সত্যিই গ্রহণ করতে পেরেছি? বোধ হয় এখনো নয়, 'দিল্লী এখনো অনেক দূরে।' তবে, বাঙালীর এই সব প্রতিষ্ঠান দেখলে মন আশায় ভরপুর হয়ে ওঠে। ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকলে আমরা আরও দ্রুতবেগে এগিয়ে যেতে পারি। লক্ষ্মীলাভ করতে হলে দুটো গুণ থাকা বাঙালীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন—শৃঙ্খলা ও মমত্ববোধ।

২৫ মে, ১৯৬৮



সতেরো

আমার খুব চেনা একজনের চরিত্র-চিত্র আমার দুর্বল ভাষায় রূপায়িত করতে সক্ষম নই। তাই আমি আশ্রয় নিচ্ছি ইংরেজ কবি কিপলিং-এর 'ইফ' কবিতাটির কয়েকটি ছত্রের :

"If you can talk with crowds and keep your virtue
Or walk with kings—nor lose the common touch,
Yours is the Earth and everything that's in it
And which is more—you'll be a Man, my son!"

কয়েক বছর আগেও পূর্বাঞ্চলের ব্যাঙ্কিং মহলে যাঁর বিশেষণ ছিল 'দি গ্র্যান্ড মোগল অব ক্লাইভ স্ট্রীট' (অবশ্য এটা তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ একটা খেতাব), ভারতের বৃহত্তম যৌথ ব্যাঙ্ক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার পূর্বাঞ্চলের প্রাক্তন প্রধান সেই আহমেদ হোসেন সাহেবের চরিত্রটিকেই কবি যেন তাঁর এই চারটি লাইনে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই আহমেদ হোসেন সাহেব না থাকলে আজ যাঁরা শিল্প ও বাণিজ্য জগতে মহারথী তেমন বহু বাঙালীরই লক্ষ্মীলাভ হবার সম্ভাবনা থাকতো না বলেই তাঁর পূর্ব জীবনের কথা সামান্য একটু উচ্ছ্বাস মাখিয়ে বলছি। তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কালের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা আছে বলে তাঁর কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী আমার জানা আছে।

তাঁকে আমি দেখেছি দেশের বিশালতম যৌথ ব্যাঙ্কের কলকাতা ও পূর্বাঞ্চলের চীফ এজেণ্টরূপে যখন তিনি রাজা মন্ত্রী নগরপাল শ্রেষ্ঠীদের আমন্ত্রণে প্রাসাদে, হোটেলে, ক্লাবে লাঞ্চ ডিনার খেয়ে শক্তিমান বিত্তবানদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সংসর্গ করেছেন সেই সময়ে; সেখানে তাঁর সম্মান দেখে মনে হয়েছে তিনিই যেন সেই নিমন্ত্রণ সভার মধ্যমণি। আবার তার পরের দিনই দেখেছি তিনি ছেঁড়া মাদুর পেতে দীনহীন মানুষের পাশাপাশি বসে ডালভাত খাচ্ছেন আর খোশগল্প করছেন; সেখানেও তাঁর সহজ ব্যবহারে সঙ্গীসাথীরা ভাববার কোনো অবকাশ পায়নি যে তিনি তাদেরই একজন নন। আমি এও জানি যে, তিনি তাঁর সেই দুস্থ বন্ধুদের

প্রয়োজন বুঝতে পেরে অযাচিতভাবে সকলের অলক্ষ্যে পকেটে একশো টাকার নোটও গুঁজে দিয়ে বলেছেন : "এটা রাখো, কিন্তু কাউকে বলো না যেন!" মানুষের জীবনের তীব্রতম বেদনা উপযুক্ত পুত্রবিয়োগের শোকেও তাঁকে অবিচলিত দেখেছি; মহাসংকটে পড়েও তিনি হাসিমুখেই দুঃখকে বরণ করে নিয়েছেন, তাও আমি নিজে দেখেছি।

সেইজন্যেই পরের ভাষায় আমি বলতে চেয়েছি যে বিকশিত মনুষ্যত্বের তিনি এক প্রতীক। অবাঙালী ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক কর্তা হয়েও হোসেন সাহেব অবহেলায় ভেঙে পড়ো-পড়ো সব ছোট ছোট বাঙালী প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করেছেন তাঁর বোম্বাই হেড অফিসের ভর্ৎসনা সহ্য করেও। সেই প্রতিষ্ঠানসমূহের অনেকে যে আজ প্রকাণ্ড হয়েছে তা আগেই বলেছি। আবার কেউ কেউ যখন ব্যাঙ্কের ঋণ শুধতে না পেরে দেউলিয়া হয়ে গেছে তখনো তাঁকে আমি বলতে শুনেছি, "আহা, বেচারীরা, এত চেষ্টা করেও কারবারটা চালাতে পারল না!" ব্যাঙ্কের সেই সব লোকসান তিনি উশুল করে দিয়েছেন তাঁর অধীনস্থ শাখাগুলিতে বছরে কোটি টাকার লাভ দেখিয়ে।

প্রায় বার্ধক্যে উপনীত হয়ে কয়েক বছর আগে হোসেন সাহেব ব্যাঙ্কের কাজ থেকে অবসর নিয়ে এখন তাঁর ছোট ছেলের প্রতিষ্ঠানে চেয়ারম্যান হয়েছেন। এখন সেই প্রতিষ্ঠান রসট্রন অ্যান্ড কম্পানির আর তার নবীন ম্যানেজিং ডিরেক্টর আনোয়ার (মণ্টু) হোসেনের গল্প আপনাদের বলবো। মণ্টু তার প্রখর মেধা এবং নিরহংকার অথচ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব পেয়েছে তার বাবার কাছ থেকে। এঁদের আগে দেশ ছিল উত্তরবঙ্গের রংপুরে (অধুনা পূর্ব পাকিস্তান), কিন্তু বাপব্যাটা দুজনেরই মিষ্ট ভাষণ যেন শান্তিপুরের লোকের মতো মধুর। ব্যবসাতে সাফল্যের অর্ধেকটাই তো আসে ওই মিষ্টভাষণ ও নম্র ব্যবহার থেকে!

শিল্পোদ্যোগের টেকনিক্যাল দিকে মণ্টুর ব্যুৎপত্তি কিন্তু একান্ত নিজস্ব। তাতে উত্তরাধিকারের কথা ওঠে না, কারণ ব্যাঙ্কার হিসেবে হোসেন সাহেবকে যদিও সব শিল্পোদ্যোগেরই অ-আ-ক-খ জানতে হয়েছে, কিন্তু সেটা হয়েছে বাণিজ্যিক পরিপ্রেক্ষিতে; শিল্পের প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না।

রসট্রন অ্যান্ড কম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড অথবা 'রসকো' পুরনো প্রতিষ্ঠান। ১৯২৬ সালে মিঃ রস্ট্রন নামে এক ইংরেজ বণিক এই ব্যবসাটি এজেন্সী হিসেবে গড়েছিলেন। তিনি বিলিতি বেল্টিং এবং রবারের জিনিসে লাগে এমন সব ইমপোর্টেড কেমিক্যালের এজেন্সী করতেন। এখন থেকে বছর আট নয় আগে হোসেনরা 'রসকো' কিনে নিলেন। মণ্টু তখন সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে সকালে বি-কম ক্লাশ করে দিনের বেলা অফিস করতো, সেই এজেন্সীর কাজই করতো। হোসেন সাহেব তখনো সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক থেকে অবসর গ্রহণ করেননি। যাঁর কাছ থেকে হোসেনরা শেয়ার কিনে নিলেন তিনি তখনো বিলেত চলে যাননি। তিনি এবং রসট্রন কম্পানির কয়েকজন পুরনো কর্মচারী মণ্টুকে কাজে সাহায্য করতো, শিখিয়েও দিতেন। তখন তার বয়স ১৮।১৯। কিন্তু আমার নিজের চোখে দেখা—

ওইটুকু ছেলের কী মেধা আর কী অধ্যবসায়! বছর খানেকের মধ্যেই সে বহু বছরের অভিজ্ঞ লোকের চেয়েও ব্যবসাতে বেশি রপ্ত হয়ে উঠলো।

সরকারী নীতি অনুসারে বিদেশ থেকে অনেক মালের ইমপোর্ট বন্ধ হয়ে আসছিল দেখে রস্টন কম্পানি দেশী হেয়ার বেল্টিং-এর এজেন্সী নিয়েছিল।

ভাষায় একটু অলঙ্কার মিশিয়ে বেল্টিং শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে মেশিনের কোমরবন্ধ। এইটি প'রে গতিবেগ স্রষ্টা এঞ্জিন বা মোটরের সঙ্গে বন্ধপরিকর না হলে শিল্প সম্পর্কিত কোনো মেশিনই চলতে পারে না, উৎপাদন করতে পারে না—তা সে অতি ক্ষুদ্র ভি-বেল্টই হোক আর দীর্ঘতম চামড়া বা নাইলনের হেভি ডিউটি কোনো বেল্টিং কিংবা ইস্পাতের চেন-ড্রাইভই হোক। আপনার মোটরকারে লাগে ফ্যান বেল্ট আর আমার সাইকেলে লাগে চেন। সব বিষয়ে ওই একই কথা।

ভারত বেল্টিং কম্পানি নামে ছোট একটি ছয় তাঁতের কারখানা ১৯৬০ সালে স্থাপিত হয়েছিল। তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীরামপুর বেল্টিং কম্পানির কর্তা, ভূতপূর্ব এম পি জিতেন লাহিড়ী মশায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীশংকর লাহিড়ী। 'রসকো' সেই ভারত বেল্টিং-এর এজেন্সী নিলো। মণ্টুর মনে তখন অন্য চিন্তা—নিজেরা একটা বেল্টিং কারখানা বসালে কেমন হয়! নানা কারণে শংকরবাবুরও ইচ্ছে ছিল ফ্যাক্টরিটা বিক্রি করে দেবার। সলাপরামর্শ করে হোসেনরা ১৯৬৩-তে সেটা কিনে নিলেন। কিন্তু শংকরবাবুকে তাঁরা ছাড়লেন না; উপদেষ্টা হিসেবে এখনো তিনি মণ্টুর সঙ্গে আছে। বুদ্ধি পরামর্শ দিতে সর্বদাই শংকরবাবু উপস্থিত।

আগেই বলেছি যে, ব্যাঙ্ক থেকে অবসর নেবার পরে আহমেদ হোসেন সাহেব রস্টন অ্যান্ড কম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান হয়েছেন। এই ক'বছরে ভারত বেল্টিং-এর আয়তন তো অনেক বৃদ্ধি পেয়েইছে, উপরন্তু এঁরা আরও তিনটি কারখানা বসাচ্ছেন। কলকাতার ক্যানাল ইস্ট রোডে ভারতের ফ্যাক্টরিতে বেজায় স্থানাভাব। তাই বজবজ রোডে বড় জমি নিয়ে অন্য তিনটি কারখানা স্থাপনার কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

রসকো এই চার কারখানায় বহুবিধ বেল্টিং, হোজপাইপ ইত্যাদি বেশি করে করবার পরিকল্পনা করেছে। এখনই নাইলন, রবার, হেয়ার (পাকানো সুতোর সঙ্গে পশম মিশ্রিত) বেল্টিং প্রভৃতি পাওয়ার-ট্র্যান্সমিশন (বৈদ্যুতিক ও অয়েল এঞ্জিন চালিত শক্তি যন্ত্রে প্রয়োগ) সংক্রান্ত অনেক জিনিস তৈরী হচ্ছে। তাছাড়া আছে পি ভি সি (পলিভেনিল ক্লোরাইড) অর্থাৎ প্লাস্টিকের প্রলেপ দেওয়া কনহেবেয়ার বেল্টিং। কয়লার ও অন্যান্য ধাতুর খনিতে, বড় বড় কারখানায়, চা-বাগিচাতে এবং চকোলেট বিস্কিট প্রভৃতি খাবার জিনিস তৈরীর ফ্যাক্টরিতে এই সলিড উয়োহেবন কনহেবয়ার বেল্টিং আধুনিক দ্রুতগতি উৎপাদনে অত্যাবশ্যক। এর পরেও আছে কয়লার খনিতে অত্যন্ত জরুরী একটি জিনিস যা মণ্টু প্রায় বানাতে শুরু করেছেই বলা চলে।

আমরা বছরে দু বছরে একবার করে কাগজে পড়ি, কোন্ এক কয়লার খনিতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়ে একশো দুশো খাদের শ্রমিক পুড়ে মরলো, লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হলো

ইত্যাদি। এই প্রাণহানি বন্ধ করবার জন্যে সরকার এখন আইন করেছেন যে, 'মাইন ফায়ারপ্রুফ ভেন্টিলেশন ডাক্টিং' নামে একরকমের মোটা ব্যাসের বায়ু চলাচলের পাইপ প্রত্যেক খনিতে বিশেষ করে যেসব খনিতে গ্যাস জমবার লক্ষণ বেশি আছে তাতে ব্যবহার করতেই হবে। মাটির ওপর থেকে খাদের শেষ পর্যন্ত এই নল চালিয়ে দিয়ে যান্ত্রিক উপায়ে খনির দূষিত বাতাসের বদলে শুদ্ধ বাতাস ভরে দেবার আপাতত এটাই একমাত্র পন্থা।

সরকারের এই নির্দেশ খুবই প্রশংসনীয়। এটি পালন করলে কত নিরীহ শ্রমিকের অমূল্য জীবন অকালে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের একটি কীর্তির কথাও, মাপ করবেন, না বলে পারছি না।

এই 'ডাক্টিং' বা নল এ যাবৎ দেশে তৈরি হয়নি। এখন যেটুকু হচ্ছে তা অতি সামান্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ফায়ারপ্রুফ অর্থাৎ অগ্নিরোধক নয়। আমাদের খনি-মন্ত্রক পূর্বোক্ত আইন পাশ করিয়েছেন অথচ আমাদের অর্থমন্ত্রক দেশে দুর্লভ এই অত্যাবশ্যক জিনিসটির ইমপোর্ট বন্ধ করে দিয়েছেন। যাক গিয়ে সে কথা, আমার আবার ইতিমধ্যেই বদনাম হয়ে গিয়েছে যে আমি নাকি কথায় কথায় সরকারের নিন্দে করি। আমি কিন্তু ভাই, নিজে তা করতে চাই না; আমাদের গোল্ড-কন্ট্রোলার মোরারজী ভাইয়ের শুভানুধ্যায়ীরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমাকে দিয়ে করান।

আমাদের মন্টু হোসেন এখন তাঁর কারখানাতে এই 'মাইন ভেন্টিলেশন ডাক্টিং' তৈরি আরম্ভ করেছেন বলে শুনলাম। আরও কোনো প্রতিষ্ঠান করছে কিনা ঠিক জানা গেল না।

হোসেনদের কারখানায় কিছু কিছু নাইলনের বেল্টিং তৈরি হয়। এই 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল' নাইলনের আমদানী নীতিও কড়া; তা সত্ত্বেও উদ্যোগ ভবনে ধর্না দিয়ে মন্টু খানিকটা লাইসেন্স যোগাড় করে।

রবারের বেল্টিং-ও এঁরা করেন। করেন না কেবল চামড়ার অর্থাৎ লেদার বেল্টিং। শেষোক্ত জিনিসটি ভালোভাবে করার প্রধান অন্তরায় হলো দেশে ভালো লেদার ট্যানিং-এর অভাব। ছোট ছোট কতকগুলো ভারতীয় প্রতিষ্ঠান নাকি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই জিনিস তৈরি করে, কিন্তু খুব ভালো কোয়ালিটির (বিলিতির সমতুল্য) লেদার বেল্টিং অধিকাংশ কারখানাই করতে পারে না বলে শুনলাম—উপযুক্ত চামড়ার অভাবে। বাংলা দেশে ভালো ট্যানিং বলতে উল্লেখযোগ্য সেন-র‍্যালে কম্পানির সেন মশায়দের পৃথক প্রতিষ্ঠান ন্যাশন্যাল ট্যানারি।

বাংলাদেশে, তথা ভারতে, প্রথম হেয়ার বেল্টিং-এর ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয় ১৮৯০-৯১ সালে। কলকাতার কাছে শিল্পাঞ্চল রিষড়াতে হেস্টিংস জুট মিল নামে একটা পাটকল আছে। অতীতে এর মালিক ছিলেন বার্কমায়ার ব্রাদার্স নামে এক স্কচ ফার্ম। স্কটল্যান্ডের অধিবাসীদের খ্যাতি আপনারা জানেন, আঙুলের ফাঁক দিয়ে পাই পয়সাটিও গলে না। একবার নাকি এডিনবরা শহরে বাস ভাড়া কমে যাওয়াতে সেখানকার সাধারণ লোকের মাথায় বজ্রপাত হয়েছিল। স্থানীয় ইংরেজরা স্কচদের আত্মীয় বিয়োগের মতো মুখের ভাব দেখে কারণ জিজ্ঞেস করাতে জানতে পারলো যে স্কচদের সঞ্চয় কমে গেল বাস ভাড়া কমে যাওয়াতে। আগে কর্মস্থলে হেঁটে

যেতে যতটা বাস ভাড়া বাঁচানো যেতো এখন সেই পদব্রজেই গেলে সেভিংসটা তার চাইতে কমে গেল।

পাটকলে হেয়ার বেল্টিং-এর দরকার হয়। তাই স্কচম্যান স্যার আর্চি বার্কমায়ার ৪০টা বেল্টিং বোনবার তাঁত ও অন্যান্য সরঞ্জাম বিলেত থেকে আনিয়ে 'বার্কমায়ার' বেল্টিং কারখানা বসালেন। নিজের জুট মিলে তা ব্যবহার করে প্রচণ্ড লাভের অঙ্কটা তো আরও বাড়ালেনই, উপরন্তু বাজারেও বেচতে লাগলেন। সেই প্রতিষ্ঠান এখনো আছে, কিন্তু এখন তার মালিক নেপালের এক রাণা পরিবার।

এর অনেক বছর পরে ১৯২৬ সালে তিনজন শিক্ষিত বাঙালী একত্র হয়ে রিষড়ার পাশে শ্রীরামপুরে এক হেয়ার বেল্টিং-এর ছোট কারখানা খুললেন। এঁদের মধ্যে ভূতপূর্ব লোকসভা-সদস্য শ্রীজিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ও সতীশচন্দ্র দে মশায় শ্রীরামপুরেরই বাসিন্দা ছিলেন। তাছাড়া শ্রীরামপুরে মিল বসাবার বিশেষ সুবিধা হলো বেল্টিং-এর তাঁত চালাবার সুদক্ষ তাঁতী ও অন্যান্য কারিগর, পাশে রিষড়ার বার্কমায়ার কম্পানির কল্যাণে সহজে পাওয়া যেতো বলে। তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন যাদবপুর ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের প্রফেসর স্বর্গীয় সুরেন রায়। তাঁরা তিনজনে শুধু এই প্রথম বাঙালী হেয়ার বেল্টিং কারখানাই খুললেন না, অধুনা প্রসিদ্ধ বেঙ্গল ল্যাম্পের ফ্যাক্টরি অর্থাৎ বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস নামে প্রথম বাঙালী বাল্ব কারখানাও একই জমির ওপর পাশাপাশি বসালেন।

বছর কয়েক এক সঙ্গে চালাবার পরে জিতেনবাবু বেঙ্গল বেল্টিং ছেড়ে দিয়ে হিন্দুস্থান বেল্টিং নামে আর একটি ফ্যাক্টরি তৈরি করলেন। ১৯৪৪ সালে সেটিকেও বেচে দিলেন এক অবাঙালীর কাছে এবং শেষ পর্যন্ত গঠন করলেন তাঁর বর্তমান বৃহৎ প্রতিষ্ঠান শ্রীরামপুর বেল্টিং কম্পানি। এখন ৮৩ বছর বয়সেও তিনি পুরোদমে সেই মিল চালাচ্ছেন। ওদিকে প্রফেসর রায়ও কিছুদিন পরে বেঙ্গল বেল্টিং ছেড়ে দিয়ে বেঙ্গল ল্যাম্পেই তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। রইলেন কেবল সতীশবাবু। ১৯৫১ সালে শ্রীসতীপ্রসন্ন ভৌমিক নামে এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রফেসর রায়ের অংশটা কিনে নিয়ে বেঙ্গল বেল্টিং-এ ঢুকলেন। আবুকরিমের চটি জুতোর মতো খোল নলচে সব বদলে সতীপ্রসন্নবাবুর সর্বময় কর্তৃত্বে বেঙ্গল বেল্টিং এখনো বিরাজমান।

একথা জেনে আপনারা সম্ভবত অবাক হবেন যে ভারতবর্ষের মোট ৯টা উল্লেখযোগ্য (বড়) হেয়ার বেল্টিং কারখানার ৮টাই বাংলাদেশে (যার অধিকাংশই শ্রীরামপুর-রিষড়া অঞ্চলে) এবং আটটার মধ্যে পাঁচটায় বাঙালীর মালিকানা।

মন্টু হোসেনের সঙ্গে আলোচনার সময়ে তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু অলোক (বিলি) বসুও উপস্থিত ছিলেন। এঁদের দুজনের আবার ব্যবসা সম্পর্কও আছে। বিলির প্রতিষ্ঠান প্রখ্যাত কিলবার্ন কম্পানি মন্টুর কাছ থেকে অনেক বেল্টিং কেনে। কিলবার্নের সেলস অফিসার হিসেবে বিলি বসু এইসব কম্পানির বেল্টিং-এর বার্ষিক বিক্রি বিষয়ে যেসব তথ্য আমাকে দিলেন সেগুলিকে আনুমানিক পরিসংখ্যান হিসেবে ধরে নীচে লিপিবদ্ধ করছি :—

ক ॥ বাংলাদেশে বাঙালী বেল্টিং কারখানা :

নাম	কর্তা		বার্ষিক বিক্রি ও উৎপাদিত জিনিস
(১) শ্রীরামপুর (লাহিড়ী)		—	৪০।৫০ লক্ষ টাকার হেয়ার কটন রাবার হোজ-পাইপ ইঃ
(২) ভারত (অর্থাৎ রসম্ভিন)		--	৩৬ লক্ষ হেয়ার কটন রাবার নাইলন হোজ-পাইপ ইঃ
(৩) বেঙ্গল (ভৌমিক)		—	৩৫ লক্ষ হেয়ার কটন রাবার ও হোজ
(৪) ইস্টার্ন (শ্রীসুরেন ঘোষ)		—	২৩ লক্ষ ঐ ঐ
(৫) এশিয়া (শ্রীকানাই চৌধুরী)		—	১২ লক্ষ ঐ ঐ
(৬) ন্যাশান্যাল রাবার (বাকুলিয়ার মুখোপাধ্যায় বংশ)		—	৩½ কোটি টাকার রাবার বেল্টিং ॥

খ ॥ বাংলাদেশে অবাঙালীর মালিকানায় :

(১) হিন্দুস্থান	—	২২ লক্ষ টাকার হেয়ার কটন রাবার ইঃ
(২) ইন্ডিয়া	--	১৮ লক্ষ ঐ ঐ

গ ॥ অভারতীয়দের পরিচালিত কারখানা :

(১) জে এইচ ফেনারের এই দিকের বিক্রি		৯০ লক্ষ টাকার (মাদুরায় কারখানা)
(২) বার্কমায়ার ব্রাদার্স	—	১৮ লক্ষ টাকার বিক্রি (বাংলাদেশে কারখানা)

(৩) এরা বাদেও ডানলপ টায়ার কম্পানি রাবার ও কনহেবয়ার বেল্টিং তৈরি করেন।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বারের তত্ত্বাবধানে বেল্টিং শিল্পের একটি সমিতি আছে--ইন্ডিজীনাস (দেশীয়) বেল্টিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন।

এই জাতীয় বেল্টিং ফ্যাক্টরি বাংলাদেশে স্থাপিত হবার কারণ, প্রধানত পাটকল ও চা-বাগিচার প্রয়োজন মেটাবার জন্যে এবং বার্কমায়ার ও বেঙ্গলের কল্যাণে এই অঞ্চলে বংশ পরম্পরায় বেল্টিং বোনবার নিপুণ তাঁতীদের বসতি আছে বলে। তা ছাড়াও অতীতে এবং বর্তমানেও বিহার ও উত্তরপ্রদেশের চিনির কলগুলির চাহিদা মিটতো তাদের কলকাতায় অবস্থিত 'পারচেজ' অফিসগুলির মাধ্যমে। কটন মিল গুলি বিশেষ একরকমের হেয়ার বেল্টিং ব্যবহার করে থাকে, যার নাম 'লুম' হেয়ার বেল্টিং এবং রোলিং মিলেও এইসব বেল্টিং-এর ব্যবহার হয়।

বেল্টিং বিষয়ে মণ্টুর মন্ত্রগুরু শঙ্কর লাহিড়ী মশায় তাঁর পিতৃব্য জিতেনবাবুর প্রথম যুগের তৈরী বেঙ্গল বেল্টিং-এর হোজপাইপ সম্বন্ধে একটা মজার গল্প বললেন। বেঙ্গলের শৈশবে কলকাতা করপোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার ছিলেন যুবক সুভাষচন্দ্র বসু, অর্থাৎ আমাদের নেতাজী। তখন নেতাজীর বয়স ২৯।৩০। তাঁর জাতীয়তাবাদের আদর্শ

অনুসারে তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় স্বদেশী জিনিস করপোরেশনে চালাতে বেঙ্গল বেল্টিং-এর কর্তাদের অসুবিধে হলো না। শঙ্করবাবু বললেন যে সেই বেঙ্গলের হোজ পাইপ দিয়ে করপোরেশনের রাস্তায় জল দিতে গিয়ে শ্রমিকরা পড়তো মহা ফ্যাসাদে। পাইপের দুই মুখ দিয়েই কেবল জল ঢুকতো বেরোতো না, সর্বাঙ্গ দিয়ে ফোয়ারার মতো বারিবর্ষণ হতো। জল-মিস্তিরিরা নাজেহাল হয়ে বোধ হয় রেগেমেগে সেই ফোয়ারা পাইপ ছিঁড়েফুঁড়ে ফেলতো, যদি এর ক্ষণস্থায়িত্ব দেখে কর্তারা আবার সেই মজবুত বিলিতি মাল দেন, সেই আশায়। বাঙালীর তৈরি জিনিস ছাড়া অন্য কিছু পারতপক্ষে ব্যবহার করবেন না বলে সুভাষ বোস জিতেনবাবুদের খুব বকাবকি করে আবার বেঙ্গলকেই অর্ডার দিতেন।

বিবরণটি শুনে আমারও একটা মজার বিদেশী গল্প মনে পড়ে গেল। লন্ডন না নিউ-ইয়র্কের এক বড় রাস্তার ওপর কলকাতার ফারপো ফেরাজিনির মতো একটা কেক পাঁউরুটির মস্ত সাজানো দোকান ছিল। তার শো-উইনডোতে দামী দামী কাঁচ ফিট করা থাকতো। রাস্তার একটা দুষ্টু ছেলে নিছক দুষ্টুমির বশেই একদিন ভারী এক টুকরো পাথর ছুঁড়ে সেই দামী কাঁচের একটা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে দৌড়ে পালালো। ছেলেটি তো পালালো, রাস্তায় জমে গেল ভিড়, আর পথিকরা কেউ কেউ দোকানদারটির লোকসানের জন্যে সহানুভূতি জানাতে লাগলো। বেচারী দোকানদারের বেশ কয়েকশো টাকা লোকসান হয়ে গেছে। কিন্তু অর্থনীতিতে পণ্ডিত কোনো কোনো পথিক আবার অন্য কথা বললেন। বললেন যে, এই ভাঙা কাঁচ বদলাবার জন্যে যে নতুন কাঁচ লাগবে তাতে কাঁচের কারখানার তো কিছু লাভ হবে! সেই কাঁচওয়ালা তার বিক্রির টাকা দিয়ে তো অন্য কোনো জিনিস কিনবে! তৃতীয় ব্যক্তি সেই টাকা পেয়ে আবার কিছু কিনবে এবং এইভাবে টাকাটা হাতে হাতে ঘুরবে ফিরবে তো! পাঁউরুটিওয়ালার লোকসান হলো বটে, তবে ওই দুষ্টু ছেলেটা দেশের অর্থনীতির চাকাটাও ছোট্ট করে ঘুরিয়ে দিয়ে গেল। সব কিছুরই ভালোমন্দ দুটো দিক আছে--এই হলো রাজপথের ইকনমিস্টের সুচিন্তিত অভিমত। আশা করি কোনো দুষ্টু ছেলে আমার এই গল্প পড়ে সেইভাবে ভারতীয় অর্থনীতিরও মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করবে না। নতুন করে আবার তো ইলেকশন আসছে। দোহাই আপনাদের, কেউ যেন আবার বিধ্বংসী আন্দোলনে যোগ দিয়ে চৌরঙ্গীর নয়ন ভুলানো বিপণিগুলোর কাঁচ লোষ্ট্রাঘাতে ভেঙে দেবেন না কিংবা ভালো ভালো দোতলা লেল্যান্ড বাসগুলো পুড়িয়ে ছাই করে দেবেন না। আমাদের প্রোডাকশন কম আর মানি মার্কেট টাইট, সে কথা প্লীজ মনে রাখবেন।

গত বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বাঙলী বেল্টিং কম্পানিরা মস্ত অর্ডার পেয়েছিলেন পল্টনের জন্য খাকি বেল্ট তৈরি করবার। এতে তাঁদের উন্নতির পথ আরও প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল। ব্রহ্মদেশেও এঁদের মালের একটা খুব ভালো বাজার ছিল, কিন্তু ব্রহ্ম সরকারের বর্তমান আমদানী নীতির পরিপ্রেক্ষিতে এখন এখান থেকে মাল রপ্তানী বন্ধ হয়ে গেছে। আশা করি সম্প্রতি ব্রহ্মরাষ্ট্রপ্রধানের ভারত দর্শনের ফলে দুই দেশের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

রসকো-র প্রধান গ্রাহক হলো ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ। রেলওয়ের হেয়ার-নাইলন জাতীয় বেল্টিং-এর অধিকাংশই মণ্টু যোগায়। তা ছাড়া আছে জুট ও কটন মিল এবং চা-বাগানের চাহিদা।

মাত্র চার পাঁচ বছরের মধ্যে ছোট একটা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলে উপরন্তু নতুন আরো তিনটে সৃষ্টি করার মূলে আছে মণ্টুর অদম্য উৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা। আমার সঙ্গে সায় দিয়ে অলোক বসুও বললেন যে মণ্টু যেমন হাইপ্রেসারে কাজ করতে পারে এমন খুব কমই দেখা যায় তরুণ শিল্পপতিদের মধ্যে। উদ্ভাবনী শক্তিও তার অপরিমেয়। ওই ছোট্ট ভারত বেল্টিং-এর ফ্যাক্টরি শেডে নানা কায়দায় সে অনেকগুলি তাঁত ও আনুষঙ্গিক মেশিনারী বসিয়েছে। এটা তার এঞ্জিনীয়ারিং বুদ্ধির পরিচায়ক। কম খরচে বেশি উৎপাদনের দৃষ্টান্ত কেউ দেখতে চাইলে ছোট ফ্যাক্টরির মধ্যে ভারত বেল্টিং-ই উল্লেখ্য।

এই উৎপাদনও আবার হচ্ছে মণ্টু ও শঙ্করবাবুর নিজেদের ডিজাইনের মেশিনে। হেভি-ডিউটি একটি তাঁত বিদেশ থেকে আমদানী করলে খরচ হতো প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। এখানকার বিভিন্ন এঞ্জিনীয়ারিং কারখানা থেকে মণ্টু নিজস্ব ডিজাইন অনুগ সেই তাঁতের পার্টস করিয়ে নিচ্ছে। তাতে একটি তাঁতের দাম পড়ছে লাখ টাকার নীচে। এইভাবে মেশিন তৈরী থেকে মাল বিক্রি পর্যন্ত বেল্টিং শিল্পের সম্পূর্ণ 'ইকনমিক্স'-টিকে চলতি ভাষায় বলতে গেলে, যেন গুলে খেয়ে পরিপাক করে ফেলেছে, মাত্র ২৬ বছর বয়সের এই আনোয়ার হোসেন। এখনই সে মানকসংস্থার বেল্টিং শিল্পের উপদেষ্টা; দেখতে পাচ্ছি, ভবিষ্যতে সে হয়ে দাঁড়াবে শিল্প-জগতের দেশগৌরব।

রসকো-র শ্রমিক সংখ্যা এখন ২৫০। শুনলাম এখানে শ্রমিক সমস্যা আছে ঘোরতর। বিশেষ করে বাঙালী শ্রমিকরা—কি হিন্দু, কি মুসলমান—সকলেই নাকি আন্দোলন প্রিয়। মণ্টু কিন্তু আজকের দুনিয়ার নিরাশায় ভরপুর 'রাগী ছোকরার দলের' (অ্যাংগ্রি ইয়ংমেন) সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সে আশাবাদী। সে ভরসা রাখে যে রাজনীতির ক্রীড়নক আজকের শ্রমিকরা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করবে যে শৃঙ্খলাবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়নের সংযত ও সহিষ্ণু নীতিতে বিশ্বাসী নিঃস্বার্থ শ্রমিকনেতার নেতৃত্ব ছাড়া দেশের শিল্পোন্নয়নের উপায় নেই। মালিক শ্রমিক কেউই অসহিষ্ণু হলে তা হবে প্রগতির পরিপন্থী।

রাতারাতি গণতান্ত্রিক রামরাজ্য প্রবর্তনে উৎসাহী শ্রমিক নেতাদের মদন বাউলের ভাষায় আমিও বলতে চাই—

নিঠুর গরজী!
তুই কি মানুষ মুকুল ভাজবি আগুনে?
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি, সবুর বিহুনে?

৬ এপ্রিল, ১৯৬৮



আঠারো

"What Bengal thinks today India will think tomorrow"— মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলের এই প্রসিদ্ধ উক্তিটি বাঙালী রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বস্তাপচা হয়ে গেছে। এখন পরের অনুকরণ করাটাই যেন অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে; মৌলিক আর কিছুই নেই। দুর্নীতির নকলটাই যেন আবার মাত্রায় বেশী। শ্রমিকশোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করবার অছিলায় নির্বিচারে প্রযুক্ত 'ঘেরাও' নামক মালিক-পরিচালক পীড়নের কৌশলটিও বাঙালী পলিটিশিয়ানকে শেষে কিনা মহারাষ্ট্র থেকেই আমদানি করতে হলো! 'ঘেরা ডালো' মন্ত্রটি বছর তিনেক আগে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল বোম্বাইয়েই। আমাদের নকলনবিস মহারথীরা তো মহারাষ্ট্রের ভালো কিছুর অনুকরণ করতে পারেন না—তাঁরা ওই 'ঘেরা ডালো'-কেই বেছে নিলেন মালিক নির্যাতনের মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে। স্বীকার করতে হয় যে, প্রয়োগের বেলায় বাঙালী শ্রমিক নেতারা গোখলে-কথিত মৌলিকতা বেশ কিছুটা দেখিয়ে দিলেন। যত দূর মনে পড়ে, মহারাষ্ট্রের শ্রমিককুল ফ্যাক্টরি ও অফিসেই তাঁদের 'ঘেরা ডালো' সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন; বাঙালীরা মালিক ও পরিচালকের বাড়িতে সদলে চড়াও হয়ে ঘেরাও চালালেন। তাঁদের নেতারা নির্দেশ দিলেন, "আমৃত্যু ঘেরাও চালাও।" অবশ্য, কার মৃত্যু, মালিকের না শ্রমিকের, না উভয়ের সেটা বোধ হয় তাঁরা উহ্য রেখেছিলেন।

১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি বাঙালীর, তথা ভারতের, স্টোরেজ ব্যাটারি নির্মাতাদের অন্যতম পথিকৃৎ শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ সাহা সপরিবার "ঘেরাও"-এর বলি হতে চলেছিলেন। কারখানাতে ঘেরাওয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বোমা ও পটকাবর্ষণ তো হয়েইছিল, অধিকন্তু তাঁর বসতবাড়ি পর্যন্ত ৯ দিন 'আমৃত্যু' ঘেরাও থেকেছিল। ভাগ্যক্রমে প্রথম দিন ভোরবেলায় বাড়ি ঘেরাও শুরু হবার অল্পক্ষণ আগে প্রতিবেশীর সংকেতে শচীনবাবু তুরক-পরিবেষ্টিত রাজা লক্ষ্মণ সেনের মতো সপারিষদ গৃহত্যাগ করে কয়েক মাইল দূরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে সাময়িকভাবে আত্মগোপন করতে পেরেছিলেন।

ব্যাপারটা ঘটেছিল কলকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলের রাজপথের ওপর—বেলঘরিয়ার ইনু মিলের এলাকায় নয়।

ভারত ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং প্রাঃ লিমিটেড
২৩৮-এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা-২০

বলা বাহুল্য, যে বাংলা দেশে তখন গণভোটে নির্বাচিত এক সরকার হইহই করে রাজত্ব করছিলেন এবং তাঁদের বাণী ছিল, "আইনের পথে রাজ্যশাসন করবো ; দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করবো।" তাঁদের 'করেঙ্গে ইয়া মারেঙ্গে' ব্রত আধাআধি উদ্‌যাপিত হলো বহু কারখানা ও অফিস বন্ধ হয়ে—বাংলা দেশের শিল্প ও বাণিজ্যকে বানচাল করে। (ঈশ্বর করুন, বাকিটা যেন আর আমাদের দেখতে না হয়!) মালিক-পরিচালকরা মার খেয়ে খেয়ে ঢিট হয়ে গেল। আর শ্রমিক? শ্রমিকের ওপর মারের চোট হলো আরও নিদারুণ। অনাহার আর অর্ধাহারের জ্বালায় তাঁরা হলেন মৃতপ্রায়।

দিন কয়েক আগে চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের ডিরেক্টর মেজর জেনারেল অনিলকুমার গুপ্ত মহাশয়ের কাছে মর্মান্তিক একটি খবর পেলাম। সেবাসদন হলো মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মহিলাদের প্রসূতি ভবন এবং চিকিৎসা ও আরোগ্য কেন্দ্র। জেনারেল গুপ্ত বললেন যে, রোগিণী-দের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা অপুষ্ট ও অর্ধপুষ্ট। এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে একবাক্যে প্রায় সব মহিলাই নাকি বলেন যে, স্বামী বা ছেলে কিংবা ভাই অমুক কারখানা আর তমুক অফিসে কাজ করতেন, তা ধর্মঘট বা লক-আউট হবার পর থেকে কাচ ছেলেমেয়ে সুদ্ধ পরিবারের সবাই প্রায় খেতেই পান না—পুষ্টি হবে কোথা থেকে?

এমনিতেই আমাদের গরিব দেশের বিপুল জনসংখ্যা অভাব অনটনে পুষ্টিকর খাদ্য কমই পায়। তবু সংখ্যালঘু কারখানার শ্রমিক আর অফিস-কর্মীদের যা একটু সুযোগ সুবিধে ছিল তা-ও যদি এমনি করে রাজনীতির বলি হয়ে দাঁড়ায় তো বৃথাই আমার এই বাঙালীর লক্ষ্মীলাভের লম্বা-চওড়া গল্প বলা।

প্রবন্ধটা বোধ হয় একটু জ্বালাময়ী হয়ে উঠছে। কিন্তু কি করি! বণ্ডেল রোডে ভারত ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রাইভেট লিমিটেডের কারখানা পরিক্রমা করবার পর এই মন্তব্য না করে উপায় নেই। দেশের আদি প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করবার এমন স্থূল চেষ্টা আর পরিচালকদের এমন লাঞ্ছনা! কেন, দেশে কি ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আইন ছিল না? শচীনবাবুর পরিচালনায় যদি গলদ ছিল তো নিরসনের জন্যে আইনকানুনের আশ্রয় নিলে আট ন' মাস ধরে কারখানা বন্ধ থাকতো না। প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার পণ্য উৎপাদন মাঠে মারা যেত না।

আমি যাঁদের কথা লিখতে বেশী ভালোবাসি, অর্থাৎ যাঁরা খুব সামান্য অবস্থা থেকে উদয়াস্ত খেটে স্বয়ংসিদ্ধ হয়েছেন, শচীনবাবু সেই বর্ণের লোক। এঁরা পায়ের ওপর পা তুলে প্রজা শাসন করেন না ; নিজেরা খেটে দশজনের কর্মসংস্থান করেন। অন্তত এঁদের ক্ষেত্রে আমাদের খড়্গপাণি শ্রমিক নেতারা যেন সুবিচার করবার পরে আঘাত হানেন।

শচীন্দ্রপ্রসাদ সাহা মশায়ের দেশ ছিল বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের যশোর জেলার শোলকুপা গ্রামে। শচীনবাবুর বাবা ছিলেন রেল-কর্মচারী এবং জ্যাঠামশায়ের ব্যবসা ছিল পাট ও ভূষিমালের।

১৯২৭ সালে বনগাঁ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও ১৯২৯-এ আই এস-সি পাসের পর শচীন্দ্রপ্রসাদ যাদবপুরের ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনে কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে ভর্তি হন।

বাণিজ্যিক ঐতিহ্যে বাংলা দেশের বৈশ্য সাহাদের কৌলীন্যের কথা সবিস্তরে বলা

নিষ্প্রয়োজন। শচীনবাবু সেই ছাত্রাবস্থা থেকেই চাকরির কথা না ভেবে ব্যবসার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। মধুসূদন মজুমদার নামে যাদবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের এক প্রাক্তন ছাত্র কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এ বিদেশী ডিগ্রী নিয়ে এসে অধুনালুপ্ত 'মিনার' টর্চ লাইট ও টর্চ ব্যাটারির নির্মাতা হাসান মনজুর কম্পানিতে চাকরিতে ঢুকেছিলেন। মধুবাবুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে শচীনবাবু জানলেন যে, মোটরকার, লরি বা বাসে ব্যবহৃত 'সেকেন্ডারি' অর্থাৎ 'স্টোরেজ' ব্যাটারি এ দেশে তৈরী হয় না।

'ব্যাটারি' শব্দের আভিধানিক অর্থ আমাদের কাছে শব্দটির চেয়ে বেশী কঠিন—'বিদ্যুৎ উৎপাদনার্থ ধারক-কোষ ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি দিয়া নির্মিত যন্ত্রবিশেষ'। ওটি অভিধানেই থাক : আমরা ধারক-কোষকে সেল বলবো আর ব্যাটারিকে বলবো ব্যাটারি-ই।

আমরা যখন টর্চের একটি সেল হাতে নিয়েও বলি টর্চের ব্যাটারি, শাস্ত্রমতে সেই উক্তিতে ভুল থেকে যায়। যতক্ষণ না একাধিক সেল টর্চ-লাইট, রেডিও বা ট্রানজিস্টারের খোলের মধ্যে পুরে যুক্ত করে দেওয়া যায়, ততক্ষণ 'ব্যাটারি'-তে পরিণত হয় না।

ব্যাটারিরও প্রকারভেদ আছে। টর্চের সেলগুলি হলো প্রাইমারি সেল এবং তার সমষ্টি হলো 'প্রাইমারি ব্যাটারি'। আমাদের কাছে প্রাইমারি ব্যাটারির সহজ সংজ্ঞা হচ্ছে, যে ব্যাটারির শক্তি একবার শেষ হওয়া মানে নিঃশেষ হয়ে অকেজো হয়ে যাওয়া; যার আর পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। আর 'সেকেন্ডারি' বা 'স্টোরেজ' ব্যাটারি হচ্ছে সেই ব্যাটারি যার শক্তি ক্ষয় হয়ে গেলে বারবার 'চার্জ' করে বছর দেড়-বছর চালানো যায়। উদাহরণ : মোটরগাড়ির, ট্রেনের কামরার বাতির, ডুবো-জাহাজের, ট্যাঙ্ক কামান প্রভৃতি রণক্ষেত্রের বিবিধ যন্ত্রের, আর আজকের মহাকাশযানের জন্য নানারকমের ব্যাটারি। মোট কথা, স্টোরেজ ব্যাটারি সেইসব ক্ষেত্রেই অপরিহার্য যেখানে তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারের উপায় নেই।

ব্যাটারির আবিষ্কর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি নাম হলো গ্যাসটন প্লান্ট ও ফোঅর এবং তাঁদের অনেক পরে, আবিষ্কারকদেব মহামহোপাধ্যায় টমাস আলভা এডিসন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্লান্টই স্টোরেজ ব্যাটারি বস্তুটির উদ্ভাবন করেন; ১৮৮০ নাগাদ ফোঅর তার কিছুটা উন্নতিসাধন করেন; আর এই শতকের প্রথম দশকে এডিসনের হাতে ব্যাটারির প্রগতি দ্রুততর হয়।

মোটরগাড়িতে স্টোরেজ ব্যাটারি জুড়ে সেলফ-স্টার্টারের আবিষ্কার হলো ১৯১১ সালে। স্টোরেজ ব্যাটারি ও মোটরগাড়ি—যন্ত্র দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই এখানে মোটরগাড়ির ইতিহাস ও সামান্য কিছু পরিসংখ্যান পরিবেশন করলে বোধ হয় মন্দ হয় না।

১৮৮৬ সনে জার্মান বৈজ্ঞানিক ও এঞ্জিনীয়ার গোটলিব ডেমলার মোটরকার ও মোটর সাইকেলের আবিষ্কার করে মানবসভ্যতার অন্যতম যুগপ্রবর্তক হলেন। তখন যদিও সেলফ-স্টার্টারের বালাই ছিল না; 'পরশুরাম'-এর ভাষায়, হ্যান্ডিল মারলেই গাড়ি চলতো ভটর ভটর ভোঁ (চিকিৎসা-সংকটে নিধিকেষ্টর ডায়লগ দ্রষ্টব্য)। প্রায় ২৫ বছর ধরে হ্যান্ডল স্টার্টের পর ১৯১১-তে স্টোরেজ ব্যাটারির সাহায্যে সেলফ-স্টার্টার হলো।

পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের মোটর-যানবাহনের একটি বাসী পরিসংখ্যান (তাজা খবর সংগ্রহ করতে পারলাম না) নিম্নে লিখিত হলো—

১৯৬৪ সালে চালু গাড়ির মোটামুটি সংখ্যা

মহাদেশ	মোটর কার	লরি	বাস	মোট
উত্তর এবং মধ্য আমেরিকা	৭৮৪ লক্ষ	১৫৭½ লক্ষ	৩¾ লক্ষ	৯৪৫¼ লক্ষ
দক্ষিণ আমেরিকা	২৬ লক্ষ	১৭¾ লক্ষ	১½ লক্ষ	৪৫¼ লক্ষ
ইয়োরোপ	৪০০ লক্ষ	৯২½ লক্ষ	২০ লক্ষ	৫১২½ লক্ষ
এশিয়া	৩৫½ লক্ষ	৪৪¾ লক্ষ	২¾ লক্ষ	৮৩ লক্ষ
ওশেনিয়া	৩৩ লক্ষ	১০¼ লক্ষ	৪ হাজার	৪৩¼ লক্ষ
পৃথিবীতে মোট	১২৭৮½ লক্ষ	৩২২¾ লক্ষ	২৮ লক্ষ	১৬২৯¼ লক্ষ

তথ্য পরিবেশক আমাকে সঠিকভাবে বলতে পারলেন না যে, রাশিয়া, লাল চীন প্রভৃতি দেশের পরিসংখ্যান এর অন্তর্গত কিনা। অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকলে লরি ও বাসের সংখ্যা নিশ্চয়ই অনেক বাড়বে। মোটরকারের সংখ্যা বোধ হয় বেশী বাড়বে না। ওসব দেশের নেতারা ছাড়া জনসাধারণ কি মোটরকারে চড়বার বেশী সুযোগ পান? কী জানি!

আর একটি পরিসংখ্যান: ৩১ মার্চ ১৯৬৫-তে ভারতবর্ষে চালু মোটর-যানবাহনের সংখ্যা ছিল ৭,৭০,৪৪৪টি।

ভারতবর্ষে প্রথম মোটর কার ইমপোর্টেড হয়েছিল ১৮৯৮ সালে।

আমাদের সরকারি হিসেবমতো ১৯৬৫ সালে অটোমোবাইলের উৎপাদন হয়েছিল সংখ্যায় ৭২,৫৮৫, মোটর সাইকেল ২১,৩৬৪ এবং স্কুটার ও মোপেড ২৬,০৬৪।

পরিসংখ্যান বিচার করে দেখলে মনে হয় মোটরকার, লরি ও বাসের জন্যেই এখন আমাদের দেশে বছরে লাখ আষ্টেক স্টোরেজ ব্যাটারি লাগে। এর বাইরে আছে দেশরক্ষা বাহিনীর প্রয়োজনীয় ব্যাটারি · রেলওয়ের, ডাক ও তার বিভাগের, জাহাজ ও স্টীমারের এবং এইরকম নানা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় স্টোরেজ ব্যাটারি।

ভারতবর্ষে ১৯৬৫ সালে উৎপাদিত স্টোরেজ ব্যাটারির সরকারি মতে মোট সংখ্যা ছিল ৭,৪৫,০০০টি। বাজার চালু নাম-করা ব্যাটারি ছাড়া শহরে শহরে যেসব ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানে শুল্ক এড়িয়ে ব্যাটারি তৈরি ও বিক্রি হয় তার হিসেব নিশ্চয়ই এই পরিসংখ্যানের অন্তর্ভুক্ত নয়। যে প্রতিষ্ঠানের কর্মিসংখ্যা ৫ জনের বেশী নয় তাঁদের স্টোরেজ ব্যাটারি উৎপাদনের ওপর শুল্ক দিতে হয় না। তার বেশী হলে শুল্ক লাগে পুরো ব্যাটারির ওপর দামের শতকরা ১৬ টাকা এবং কেবলমাত্র ব্যাটারির সাজ-সরঞ্জামের ওপর শতকরা ১৯½ টাকা। সেইজন্যে দেশে এখন বহু ক্ষুদ্র

ব্যাটারি-মেকারের উদ্ভব হয়েছে। শুল্কের প্রবর্তন হয়েছিল ১৯৫৫ সালে অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখের সময়ে।

যা বলছিলাম—শ্রীমধুসূদন মজুমদার শচীন সাহা মশায়কে বললেন যে, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্টোরেজ ব্যাটারি তৈরি করা খুব শক্ত; কেউ করেও না। (সেই বিশ বা ত্রিশ দশকে এয়ার-কণ্ডিশনিং-এর চলও হয়নি)। তবুও চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

বাবার কাছ থেকে হাজার চারেক টাকা নিয়ে ১৯৩১ সালে শচীন সাহা ব্যাটারি তৈরির শিল্পোদ্যোগে নেমে পড়লেন কলেজের থার্ড ইয়ারে উঠেই। এই ব্যবসার আরও দুই শরিক হলেন। শ্রীঅজিত রায়চৌধুরী নামে শচীনবাবুর এক তরুণ আত্মীয় আরও হাজার চার পাঁচ টাকা মূলধন যোগালেন আর মধু মজুমদার হলেন শূন্য বখরাদার ও টেকনিক্যাল এক্সপার্ট। প্রতিষ্ঠানের নাম হলো শক্তি ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারিং কম্পানি; ঠিকানা, কালীঘাট।

শচীনবাবু অবশ্য কলেজ ছাড়লেন না। ১৯৩২-এ ফাইন্যাল ইয়ারে উঠলেন। এই ইয়ারের ছাত্রদের ওপর নির্দেশ ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শিল্প সংক্রান্ত সমস্যার ওপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ (থীসিস) রচনা করা। কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রফেসর স্বর্গত হীরালাল রায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে শচীন সাহা 'স্টোরেজ ব্যাটারি' বিষয়টি বেছে নিলেন। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল কাজ করবার জন্যে যে জায়গাটুকুর দরকার সেকালের ক্ষুদ্র যাদবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে তারও অকুলান ছিল। মুরগি রাখার ঘরের মতো ছোট্ট একটা স্থান খুঁজে নিয়ে শচীনবাবু সেখানেই তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন। আর যাতায়াত শুরু করলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। সেখানে ডক্টর জ্যোতিপ্রকাশ সরকার নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো। জ্যোতি-প্রকাশের কর্মজীবনটি ছিল অদ্ভুত। ইনি ছিলেন ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের আপন ভাইপো। ডাক্তারি পাস করেছিলেন, কিন্তু করতেন বৈজ্ঞানিক আর এঞ্জিনীয়ারের কাজ। জ্যোতিপ্রকাশ সরকার মশায় শচীনবাবুকে জানালেন যে, আচার্য জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক প্লাণ্টের অনুসরণ করে দুটি সীসের পাত দিয়ে স্টোরেজ বা সেকেণ্ডারি ব্যাটারি তৈরি করেছেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের কাজে পার্থক্য ছিল। জগদীশচন্দ্রের পদ্ধতিটি ছিল উন্নততর।

বসু বিজ্ঞান মন্দির ছাড়াও হাওড়ার ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কারখানায় ব্যাটারি প্লেট তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিলেত থেকে ব্যাটারি প্লেট আমদানি ব্যাহত হওয়াতে রেলওয়ে কম্পানিরা ট্রেন লাইটিং-এর ব্যাপারে খুব অসুবিধায় পড়েছিল। সেই অসুবিধা দূর করবার জন্যেই ই. আই. রেলওয়ে এই প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হয়েছিল; কিন্তু লড়াই মিটে যাবার পরে রেল কর্তৃপক্ষ তা নিয়ে আর মাথা ঘামালেন না।

ওদিকে শক্তি ব্যাটারি কম্পানির কাজ নমো নমো করে চলছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সে সময়ে হার্ড রবারের ব্যাটারির বাক্স তৈরি করতো 'সেন রাবার মিলস' নামে টালিগঞ্জের এক অধুনালুপ্ত বাঙালী প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু ১৯৩৩ সালে শক্তি ব্যাটারি কম্পানি হাতছাড়া হয়ে গেল। দুই সক্রিয় অংশীদার অজিত রায়চৌধুরী ও মধুসূদন মজুমদারের মধ্যে মতের অমিল হয়েই ঘটনাটি ঘটলো। শচীন-বাবুর বাবার কষ্টার্জিত চার হাজার টাকা জলে গেল। তাতেও কিন্তু শচীন সাহা দমলেন না। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যাটারি তৈরি করে যে প্রচুর লাভ করা যায় সে বিষয়ে শচীনবাবু তখন

নিঃসন্দেহ হয়েছেন। ইতিমধ্যে কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এর ডিপ্লোমাও পেয়ে গেছেন।

এবারে তিনি তাঁর মায়ের শরণ নিলেন এবং পরিবারের সামান্য পুঁজি থেকে আবার কিছু টাকা পেলেন।

শক্তি ব্যাটারি তৈরী হতো ইমপোর্টেড প্লেট থেকে; শচীনবাবু এখন থেকে মোল্ড (ছাঁচ) তৈরি করিয়ে তা থেকে ব্যাটারি সেল-এর প্লেট তৈরির ব্যবস্থা করলেন।

ভারত ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারার্স কম্পানির জন্ম হলো। শচীন সাহা-র ভারত ব্যাটারি নিজস্ব প্লেট থেকে তৈরী ব্যাটারির নির্মাতা হিসেবে ভারতবর্ষে প্রথম বলেই শুনলাম।

এ দেশে তখন একটিমাত্র বিদেশী প্রতিষ্ঠান সেকেণ্ডারি ব্যাটারি তৈরি করতো—'ক্লোরাইড-এক্সাইড' (বর্তমান 'এক্সাইড') কম্পানি। কিন্তু তারাও ইম্পোর্টেড প্লেট ব্যবহার করতো।

১৯৩৩-৩৪ সালে বালিগঞ্জের ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনসের এক পাশে শচীনবাবুর ক্ষুদ্র কারখানায় দিনে মাত্র ২০০।২৫০ প্লেট তৈরি হতো। বাক্স সুদ্ধ পুরো ব্যাটারি তৈরি তখনো তাঁর কাছে সুদূরপরাহত ব্যাপার। শচীনবাবু নিজেই দিনের উৎপাদন সেই সামান্য ক'টি প্লেট সাইকেলের ক্যারিয়ারে বেঁধে কালীঘাটে বাস আর ট্যাক্সির ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে আসতেন। ইমপোর্টেড ব্যাটারির বিক্রেতা অস্লার প্রভৃতি কলকাতার বড় বড় কম্পানি তাদের ব্যাটারি প্লেট বেচতো শতকরা ৪৮ টাকা দামে; সেই জায়গায় শচীনবাবু বিক্রি করতেন শতকরা ২৫ টাকায়। তফাত ছিল এই যে, ভারত ব্যাটারির বিক্রি ছিল নগদ আর বিলিতী কম্পানিরা বেচতো ধারে।

মন্থর পদবিক্ষেপে উন্নতি হয়ে ১৯৩৩ সালে বার্ষিক ১২,০০০ টাকার জায়গায় ১৯৩৮-এ ভারত ব্যাটারির বিক্রি এসে দাঁড়ালো ৪২,০০০ টাকায়। বছরে ১৩।১৪,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হচ্ছে। ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনসে স্থানেরও অকুলান হচ্ছে দেখে ভারত ব্যাটারির কারখানাকে স্থানান্তরিত করা হলো। বাঙালীর আদি ইলেকট্রিক বালব্ নির্মাতা 'বেঙ্গল ল্যাম্প ওয়ার্কস'-এর কারখানা যাদবপুরে উঠে যাওয়াতে তাঁদের পরিত্যক্ত বালিগঞ্জের ডিহি শ্রীরামপুর লেনের কারখানা-বাড়িটি ভাড়া নিয়ে শচীনবাবু ব্যাটারির কারখানা তুলে নিয়ে গেলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় মেশিনারির অভাবে তখনো ভারত ব্যাটারির বহু সাজ-সরঞ্জাম নিজ ফ্যাক্টরিতে তৈরী হতে পারতো না।

ইতিমধ্যে ১৯৩৭ সাল নাগাদ শক্তি ব্যাটারির অন্যতম উদ্বোদ্ধা মধুসূদন মজুমদার মশায় চাকরি নিয়েছেন জামসেদপুরের শিখ শিল্পপতি সর্দার বাহাদুর ইন্দ্র সিং-এর সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'ট্রপিক্যাল অ্যাকিউমিউলেটার্স লিমিটেড'-এ। ১৯৪০ সালে ইন্দ্র সিংজী ঠিক করলেন যে, 'ট্রপিক্যাল' আর চালাবেন না। খবর পেয়ে শচীনবাবু দরাদরি করে 'ট্রপিক্যাল'-এর মেশিনারি কিনে নিয়ে কলকাতায় ভারত ব্যাটারির কারখানায় তুলে আনলেন। 'ভারত' এখন এক স্বয়ম্ভর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো। কিন্তু এই অতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগের জন্যে মূলধনের টানাটানি শুরু হলো। তাই ১৯৪০ সালে শচীন্দ্রপ্রসাদ নেপালের এক রানা পরিবারকে ৭০,০০০ টাকা মূলধন লাগাতে রাজী করলেন। কম্পানিকে প্রাইভেট লিমিটেড করা হলো; রানাদের সত্তর হাজার আর শচীনবাবুর ৫০,০০০ টাকা নিয়ে নতুন কম্পানির পেড-আপ ক্যাপিট্যাল হলো ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার।

১৯৪১-এর শেষ ও ৪২-এর গোড়ায় কলকাতায় জাপানী বোমা পড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাংলা দেশের দুয়ারে পৌঁছতেই রানা সূর্য শামসের এখানকার বিষয়-সম্পত্তি গুটিয়ে নেপালে

ফিরে যাওয়া ঠিক করলেন। তাঁর টাকা ফিরিয়ে দিতে শচীনবাবুর বেশ অসুবিধায় পড়তে হলো ঠিকই, কিন্তু আর এক দিক দিয়ে তা হলো শাপে বর; প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরির বাঙালীর হয়ে গেল। সব শেয়ারই শচীন্দ্রপ্রসাদের পারিবারিক সম্পত্তি হলো।

১৯৪৮ সালে ভারত ব্যাটারির কারখানাতে আবার স্থানের সঙ্কীর্ণতা দেখা দিল। ইতি-মধ্যে শচীনবাবু একটি মৌলিক কাজ করলেন। এযাবৎ স্টোরেজ ব্যাটারির প্লেটগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখার জন্যে বিদেশে ও দেশে পাতলা কাঠের সেপারেটার ব্যবহার হতো। শচীনবাবুই প্রথম কাঠের বদলে রবারের সেপারেটারের প্রবর্তন করলেন। উত্তরকালে আরও এক ধাপ এগিয়ে তিনি নিজের পরিকল্পিত মেশিনে প্লাস্টিকের সেপারেটার তৈরি করলেন; এখনো তাই তৈরি ও ব্যবহার হচ্ছে। আগেই বলেছি, হার্ড রবারের ব্যাটারির বাক্স নির্মাণের প্রবর্তন করেন টালিগঞ্জের বাঙালী প্রতিষ্ঠান অধুনালুপ্ত 'সেন রাবার মিলস'; এঁরা ছাড়াও জামসেদপুরের বিরাট ইংরেজ প্রতিষ্ঠান 'ইন্ডিয়ান কেবল্ কম্পানি'-ও উন্নত ধরনের শক্ত রবারের বাক্স তৈরি করলো। শচীনবাবু ভারত ব্যাটারিতেও ভালো রবারের বাক্স করা শুরু করলেন; এবং প্লাস্টিক সেপারেটার প্রভৃতি তাঁর প্রবর্তিত সব কিছুরই 'পেটেন্ট' নিলেন। শুধু তাই নয়, শচীন্দ্রপ্রসাদ ব্যাটারির নানা সাজ-সরঞ্জাম তৈরির মেশিন নির্মাণেরও উদ্‌যোগ করলেন।

ডিহি-শ্রীরামপুর লেনের ভাড়াটে কারখানা-বাড়িতে এত সব করার জায়গা ছিল না বলে বালিগঞ্জ প্লেসের কাছে বন্ডেল গেটের গায়ে দুই বিঘা জমি কিনে ভারত ব্যাটারির কারখানা বসানো হলো।

ভারত ব্যাটারির গোড়ার কথা প্রায় সবই বলা হয়েছে; ক্রমোন্নতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আর দিতে চাই না। নিম্নলিখিত ক্রমবর্ধমান বিক্রয়ের হিসেবটিই ছবিটাকে পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলবে :—

১৯৩৩—১২,০৮৬ টাকা; ১৯৩৮—৪২,২২৮ টাকা; ১৯৪৬—১,৪৪,৩৮৫ টাকা; ১৯৫১—৯,০২,৭২৯ টাকা; ১৯৫৬—১৩,৬১,৩৩৭ টাকা; ১৯৬১—১৯,৩২,৮১৭ টাকা; ১৯৬৬—৩৬,৮৭,৮২৪ টাকা।

বর্তমানে ভারত ব্যাটারির সম্প্রসারণের (শচীন্দ্রপ্রসাদ কথিত) বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলি। বন্ডেল রোডে ২নং কারখানার সংলগ্ন দুই বিঘার আরও এক খণ্ড জমি নেওয়া হচ্ছে আর হাওড়া বর্ধমান মেইন লাইনে বঁইচি স্টেশনে ১২ বিঘা জমির ওপরে ভারত ব্যাটারির ৩নং ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয়েছে। শচীনবাবু দিল্লিতেও এক কারখানা বসিয়েছেন ভিন্ন নামে এবং মীরাটের কোনো এক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান 'ভারত ব্যাটারি'র সঙ্গে বন্দোবস্ত করে সেখানেও এই মার্কার ব্যাটারি তৈরির আয়োজন করছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে, শচীনবাবুর কর্মক্ষেত্র এখন সাগরপারেও প্রসারিত হচ্ছে; শীঘ্রই আফ্রিকার টাঙ্গানিয়াতে ভারত ব্যাটারির একটি কারখানা স্থাপিত হবে।

ভারত ব্যাটারি ছাড়া অন্যান্য বিখ্যাত ব্যাটারি নির্মাতাদের মধ্যে যাঁরা প্রাচীন অর্থাৎ যেসব প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল সেই ত্রিশ দশকেই, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটা নাম :—

(১) বিচারপতি ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র মশায়ের ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং প্রাঃ লিঃ ('মিটার' ব্যাটারি)—বর্তমান কর্তা শ্রীসুনীল মিত্র;

(২) ইলেকট্রিক স্টোরেজ ব্যাটারি প্রাঃ লিঃ ('সেনকো')—বর্তমান কর্তা শ্রীকিরণ সেন;
(৩) ইস্টার্ন অ্যাকিউমিউলেটর কম্পানি ('ভিক্টর')—বর্তমান কর্তা শ্রী ডি কুমার।

পরবর্তী কালে শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'জেনারেল লেড ব্যাটারিজ প্রাঃ লিমিটেড'-এর নামও উল্লেখযোগ্য। এ'রা হলেন 'গোল্ড ব্যাটারি'র নির্মাতা।

ব্যাটারির নির্মাতাদের সঙ্ঘের নাম 'অল ইণ্ডিয়া ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন।'

ভারতবর্ষের আর একটি বিখ্যাত স্টোরেজ ব্যাটারির কারখানা হলো 'মহীশূরের 'অ্যামকো' ব্যাটারি তৈরির প্রতিষ্ঠান 'অ্যাকিউমিউলেটর ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ'। এরও উৎপত্তি বাঙালীর চেষ্টায়। অরবিন্দ বসু নামে এক বাঙালী ভদ্রলোক বহু কাল আগে বোম্বাই অঞ্চলে 'হিন্দুস্থান অ্যাকিউমিউলেটর ম্যানুফ্যাকচারিং কম্পানি' নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করেছিলেন। পরে মহীশূরের প্রগতিপন্থী মহারাজা বাহাদুরের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় সেই সংস্থার মেশিনারি ইত্যাদি মহীশূরে উঠিয়ে আনা হয় এবং কম্পানির নামেরও পরিবর্তন হয়।

এ দেশে এখন প্রাইমারি অর্থাৎ টর্চ ব্যাটারির উৎপাদনও বিরাট। বৃহত্তম সংস্থা (মূলত আমেরিকান) 'ইউনিয়ন কারবাইড কম্পানি'র ১৯৬৭ সালে টর্চ-সেল বিক্রি হয়েছে প্রায় ১৭ কোটি টাকার। এ ছাড়া 'এস্ট্রেলা', 'টিউডর', 'জীপ' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানেরও প্রচুর বিক্রি আছে।

শচীন্দ্রপ্রসাদের বড় দুই ছেলে সমরেন্দ্রপ্রসাদ ও সৌরেন্দ্রপ্রসাদ স্কুল-জীবনে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন। পরে সমরেন্দ্র পশ্চিম জার্মানী, হল্যাণ্ড ও ইটালীতে কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে এখন ভারত ব্যাটারির ফ্যাক্টরী পরিচালনায় বাবাকে সাহায্য করেন। সৌরেন্দ্রও প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক দিকটায় বাবার সহকারী। তিনি এখন 'বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট'-এ বিশেষ বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে ইয়োরোপে আছেন। কনিষ্ঠ সঞ্জীবপ্রসাদ ভারত ব্যাটারির হেড অফিসে শিক্ষানবিসি করছেন।

শচীনবাবু 'অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অর্গানাইজেশনে'র পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি এবং 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার'-এর কার্যকরী সমিতির সভ্য।

শ্রমিক-আন্দোলনে সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত সাহা মশায় আমাকে দুঃখ করে বলছিলেন যে, বাংলা দেশের রাজনীতির শোধন না হলে এ অঞ্চলে শিল্প ও বাণিজ্যের সমৃদ্ধি কী করে হবে? দেশের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত কত দিন চলবে?

আমরা জানি যে, এই প্রশ্নটির উত্তর কেবল শচীন্দ্রপ্রসাদ সাহা-ই নয়, আমরা শতকরা ৯৫ জন বাঙালীই খুঁজে বেড়াচ্ছি; কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, হবে না, সামান্য কয়েকজন ক্ষমতালোলুপ রাজনৈতিক ও শ্রমিক-নেতার বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। আর কত দিন আমরা এই পরিস্থিতি বরদাস্ত করে চলব?

১ জুন, ১৯৬৮



ঊনিশ

ননীগোপালবাবু বললেন, "হিটলার আর ইংরেজে লড়াই না বাধলে এদেশে শিশিবোতল ছাড়া কাচের আর কোনো বস্তু কোনোদিনও তৈরী হ'তে পারতো কিনা সন্দেহ এবং রণ রায় না থাকলে 'সিগকল'-এর জন্মই হতো না।"

রণ রায় মানে, ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃত-বিজ্ঞানে ট্রাইপোজ (অনার্স-স্নাতক) এবং কলকাতার প্রসিদ্ধ অডিটার ফার্ম 'রায় অ্যান্ড রায়' কম্পানির অন্যতম অংশীদার স্বর্গীয় রণজিৎ রায়।

রণজিৎ রায় এবং তাঁর পরলোকগত ছোট ভাই অমিয়নাথ জন্মেছিলেন বড় ঘরে রুপোর চামচ মুখে করে। তাঁদের বাবা ছিলেন সেকালের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাঃ ডি. এন. রায়, জ্যাঠামশায় এবং অন্য সম্পর্কে মেসোমশায় ছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় অভিনন্দিত ভারতের প্রথম সারির র‍্যাংলার (ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত পরীক্ষায় উচ্চতম অনার্স প্রাপ্ত) ডঃ প্রসন্নকুমার রায় আর ছোট মেসোমশায় ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। মা ছিলেন বাংলা দেশে নারী জাগরণ ও প্রগতির অন্যতম হোতা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতৃব্য দুর্গামোহন দাসের কনিষ্ঠা কন্যা শৈলবালা এবং তাঁর দিদি, প্রসন্নকুমারের স্ত্রী সরলা ছিলেন কলকাতার গোখেল মেমোরিয়্যাল স্কুলের অন্যতমা প্রতিষ্ঠাত্রী এবং ধাত্রীস্বরূপা।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুণ্যতম পরিবেশে মানুষ রণ রায় তাঁর হিসাব-পরীক্ষকের পেশা ও পসারকে গৌণ রেখে শিল্পোদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং অকালে প্রাণ দিয়েছিলেন সেইজন্যই।

'সিগকল' অর্থাৎ সায়ান্টিফিক ইন্ডিয়ান গ্লাস কম্পানি লিমিটেড ছিল তাঁর একাধিক শিল্পপ্রচেষ্টার অন্যতম। স্যার নীলরতনের কথায় আগে একবার বলেছি যে দেশের শিল্পোন্নতিই ছিল তাঁর কাম্য—নিজের লাভ হোক বা না-হোক। রণ রায়ের কর্মক্ষেত্র ততোটা বিস্তীর্ণ না হলেও উদ্যম ও মননশীলতায় তিনি স্যার নীলরতনের জাতের মানুষ ছিলেন। আর দু'জনেই ছিলেন ব্রাহ্ম।

অ্যাডলফ হিটলার-এর প্রাদুর্ভাব না ঘটলে ভারতবর্ষে ল্যাবোরেটরির কাচের ফ্লাস্ক, টেস্ট-টিউব, হাইড্রোমিটার, ফানেল বা ব্লাড ব্যাঙ্কের রক্ত রাখার বোতল, কিছুই বোধহয় ভারতে কোনোদিন তৈরী হতে পারতো না। আজ আমরা যে স্বদেশী ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্কে গরম ঠাণ্ডা জল, চা, দুধ, কফি রাখি তাও আসতো ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মেনী অথবা এদিকে জাপান থেকে। তাই কুখ্যাত হিটলার এক্ষেত্রে বাঙালীর, তথা ভারতের, ধন্যবাদের পাত্র। গোড়াতেই কথাটা বলেছিলেন সিগকল-এর সর্বাধ্যক্ষ ডিরেক্টর শ্রীননীগোপাল সরকার।

নিজেকে পার্শ্বচরিত্রে রেখে ননীবাবু তিন ঘণ্টা গল্প-আলোচনার মধ্যে ঘণ্টা দেড়েক বললেন রণ রায়ের মহত্ত্বের কথা, ঘণ্টাখানেক বললেন কাচশিল্পে বাঙালীর অন্যতম পথপ্রদর্শক স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ সেন এবং তাঁর পুত্র শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ ব্যক্তিদের কথা, এবং রুড়কি এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী, আর আমার নির্বন্ধাতিশয্যে বাকী আধ ঘণ্টা বললেন নিজের কথা।

বোম্বাইয়ের ইব্রাহিম পীরমহম্মদ ফার্মটি ছিল প্রাচীন বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড-এর মালিক। কলকাতার দমদম ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত তাঁদের প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ভার তাঁরা দিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের অনুচর ও কংগ্রেস নেতা বৈকুণ্ঠনাথ সেনের ছোট ভাই প্রসিদ্ধ উকীল হেমেন্দ্রনাথ সেন-কে। পরে এই কম্পানিটির পুনর্বিন্যাস হয়ে সেন পরিবারের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'নিউ ইন্ডিয়ান গ্লাস ওয়ার্কস প্রাঃ লিমিটেড'-এ পরিণত হলো। হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এখন এই প্রাচীনতম বাঙালী প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার।

ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম বিষয়ে এদেশে প্রথম গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন রুড়কি এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের উপাধ্যক্ষ জার্মেনীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বর্গীয় বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়। শুনলাম তিনিই প্রথম কাচ তৈরীর জন্য আবশ্যিক কয়লা ও পেট্রলজাত গ্যাস ভারতবর্ষে তৈরীর বিষয়ে নানা চিন্তা ও কাজ করেছিলেন। 'ইন্ডেন' চুল্লির জন্যে আজকাল আমরা যে গ্যাস ব্যবহার করি কাচশিল্পে ব্যবহৃত পেট্রল গ্যাস তৈরীর প্রণালীও কিছুটা সেইরকম। বেণীমাধবের প্রেরণায় এলাহাবাদের বিখ্যাত মুদ্রক ইন্ডিয়ান প্রেস-এর বাঙালী স্বত্বাধিকারী ঘোষ মহাশয়রা ১৯১১ সালে 'সায়ান্টিফিক ইনস্ট্রুমেণ্ট কম্পানি লিঃ' (সংক্ষেপে 'সিকো') স্থাপিত করেন। সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেণীমাধব নিজের হাতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজ শিখিয়েছিলেন।

ননীগোপাল এই বেণীমাধব মুখার্জি মশায়ের প্রশিষ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি নামে এলাহাবাদের আরেক ব্যক্তি জার্মেনী গিয়ে সেই ইন্ডাস্ট্রিয়্যাল গ্যাস তৈরি শিখে এসে বিদ্যা ঝালিয়ে নেওয়ার পর নিজের চেষ্টায় বোম্বাই স্যান্টাক্রুজে একটি বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তার নাম 'গ্যানসন অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড'।

ইন্ডাস্ট্রিয়্যাল গ্যাস ছাড়াও গ্যানসন-এর উৎপাদনসূচী বহুমুখী বলে খবর পেলাম। তার কিছু কিছু এখানে বিক্রি করেন গ্যানসন-এর পূর্বাঞ্চলের এজেন্ট কলকাতার ইংরেজ প্রতিষ্ঠান কিলবার্ন কম্পানি।

কিন্তু আমি ভাবছিলাম যে, কলকাতায় কি আমাদের আর বোম্বাই-গ্যাস আমদানি করার দরকার হবে? রাজনৈতিক গ্যাস-এর সঙ্গে কিছুটা 'দুর্গাপুর' ব্লেন্ড করে নিলেই তো আমাদের সব কারখানা অষ্টপ্রহর চালু থাকতে পারবে!

অসুস্থতাবশত ননীগোপালবাবু একটু থেমে থেমে কথা বলছিলেন। রণ রায় থেকে জ্ঞান ব্যানার্জির কাহিনীর বিবরণের মধ্যে মধ্যে নিজের কথা যা যা বললেন তাতে ভদ্রলোককে পার্শ্বচরিত্র করে রাখা সম্ভব নয়। তাঁর কথা কীভাবে বললে কম করে বলা যায় সেটা ভেবে নিতে নিতে একবার সায়ান্টিফিক (বৈজ্ঞানিক) কাচের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসটা ঘেঁটে নেওয়া যাক। উচিত ছিল দেশী ও বিদেশী কিংবদন্তীসম্মত সাধারণ 'কাচমণি'-র জন্মবৃত্তান্ত দিয়ে শুরু করা; কিন্তু সায়ান্টিফিক কাচের বেলায় ইতিহাসের কথাটাই প্রবল, তাই কিংবদন্তী এবারে মুলতবী থাক।

সায়ান্টিফিক কাচ নানারকমের; তার মধ্যে প্রধান হলো অপ্থ্যালমিক্ বা চশমার কাচ এবং অপ্টিক্যাল বা বীক্ষণ কাচ। দ্বিতীয় সারিতে আছে নিউট্র্যাল অর্থাৎ অম্ল ও ক্ষারের প্রভাবমুক্ত কাচ এবং হীট্ রেজিসট্যান্ট বা উচ্চতাপ-সহনশীল কাচ। রাসায়নিক পরীক্ষার কাজে শেষোক্ত দু'-রকমের কাচ একান্ত প্রয়োজনীয়।

এইগুলি ছাড়াও অসাধারণ আরও দু'-এক রকমের আধুনিক কাচের কথা এখানে বলা যেতে পারে। ফোম গ্লাস, ফাইবার গ্লাস এবং গ্লাস উল। এগুলি ঠিক সায়ান্টিফিক কাচের পর্যায়ে পড়ে না। শোলা বা কর্কের বদলে ব্যবহারযোগ্য ফোম-কাচ এখন আমাদের দেশেও তৈরী হচ্ছে। কেন্দ্রীয় কাচ ও সেরামিক গবেষণা সংস্থার (সি. জি. সি. আর. আই) বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন মুখার্জি, প্রচার বিভাগের সহসচিব শ্রীরণজিৎ রায় এবং উপগ্রন্থাগারিক শ্রীঅজয় রায় আমাকে এইসব তথ্য যোগালেন। ফাইবার কাচ অর্থাৎ কাচের সুতো দিয়ে আজকাল সিনেমার পর্দা তৈরী হয় আর সেই পর্দার ওপরে ফেলা ছবি হয় সাধারণ কাপড়ের পর্দায় ফেলা ছবির চাইতে ঢের বেশী উজ্জ্বল। কাচের সুতোও এখন আমাদের দেশে তৈরী হয় আর গ্লাস উলও হয়। বিদেশে এখন বাক্সের মধ্যে পণ্য ভরে তার পাশে কাঠের গুঁড়োর বদলে এই গ্লাস-উল ব্যবহার করা হয় অনেক সময়ে।

কথিত আছে যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইটালির ফ্লোরেন্স শহরের এক ধর্মযাজক চশমা আবিষ্কার করেন। ছাপাখানার আগে, মানে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত চশমার ব্যবহার প্রায় ছিলই না। মুদ্রণযন্ত্রের উদ্ভবের সঙ্গে মানুষের পাঠে আসক্তি জন্মালো; তাই চশমার ব্যবহার অনেক বেড়ে গিয়ে সারা ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়লো।

দূরবীন বা টেলিস্কোপ যন্ত্রটি নাকি ১৬০৮ সাল নাগাদ হানস্ লিপারশাই নামে হল্যান্ডের এক চশমা ব্যবসায়ী হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও (১৫৬৪—১৬৪২) দূরবীনের অনেক উন্নতি করেন এবং তাঁর দূরবীন দিয়ে বৃহস্পতির উপগ্রহগুলির সন্ধান পান। তাঁর পূর্বসূরী পোল্যান্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপারনিকাসের (১৪৭৩—১৫৪৩) মতাবলম্বন করে গ্যালিলিও প্রচার করলেন যে, পৃথিবী

ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই মতবাদের জন্যে সেকালের শক্তিধর গোঁড়া ধর্মযাজকরা তাঁকে জ্যান্ত পুড়তে ফেলবার যোগাড় করছিলেন। তাঁদের শাস্ত্র বলতো যে, সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। গ্যালিলিও প্রাণের ভয়ে মত বদলে ফেলেছিলেন। 'ঘুরুক ব্যাটা সূর্য পৃথিবীর চারদিকে আমি বেঘোরে মরতে যাই কেন?'—ভাবটা বোধ হয় এই ছিল গ্যালিলিওর।

প্রায় দেড় শ' বছর পরে এলেন উইলিয়াম হার্শেল (১৭৩৮—১৮২২)। তিনি আসলে ছিলেন জার্মান। ইংল্যান্ডে গিয়ে সংগীত চর্চা আর শিক্ষাদান করতেন; সঙ্গে সঙ্গে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনুশীলন করতেন। রাজা তৃতীয় জর্জ তাঁকে রাজসভার জ্যোতির্বিদের পদে অভিষিক্ত করে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করলেন। স্যার উইলিয়াম ও তাঁর ছেলে স্যার জন হার্শেল (১৭৯২—১৮৭১) দূরবীন ছাড়াও কাচ ও ধাতুর তৈরী নানারকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কারক। 'ইউরেনাস' বা আমাদের আধুনিক পাঁজিকা মতে 'ইন্দ্র' গ্রহটিকে স্যার উইলিয়ামই দূরবীন দিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন বলে তার আর এক নাম 'হার্শেল'।

এরপর থেকেই বীক্ষণ ও চশমার কাচের বিবর্তন ও বিকাশের কাজটি জার্মান বৈজ্ঞানিকরা হাতে নিলেন। সে কথায় পরে আসছি।

ননীগোপাল সরকারের পারিবারিক ইতিহাস এবং তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কৃচ্ছ্রসাধনার কাহিনী উহ্য রেখে একেবারে ১৯২৭ সালে চলে আসি। ইতিমধ্যে পিতার কর্মস্থল এলাহাবাদে থাকতে থাকতে তিনি বেণীমাধবের শিষ্য রাধারমণ দাসের কাছে পেট্রল থেকে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস' তৈরীর প্রণালীটি শিখে নিয়েছেন। আধুনিক যন্ত্রশালায় এই গ্যাসের ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য।

শ্রীধীরেন সেন প্রমুখ স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথের ছেলেদের পরিচালিত বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কস-এর কথা আগেই বলেছি। ননীগোপাল সেখানে একটি চাকরি পেলেন। এইখানেই গ্যাস তৈরীর মাধ্যমে তিনি কাচ-শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

উচ্চাভিলাষী ননীগোপাল কিন্তু দেশে যেটুকু কাজ শিখেছিলেন তাতে মোটেই খুশি ছিলেন না; বিদেশে যাবার পথ খুঁজছিলেন, কিন্তু পাথেয়র কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। কিছুদিন কাজ করার পর সেন মশায়দের কাছ থেকে আংশিক অর্থ সাহায্য পেয়ে বাকীটা নিজে যোগাড় করে ১৯২৭ সালে ননীবাবু সাগরপাড়ি দিলেন। পেঁছলেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস ও সায়ান্টিফিক কাচ-শিল্পের তীর্থ জার্মেনীতে। কিছুকাল মেলেনবাখ-এ গ্যাস ও বার্নার বিষয়ে শিক্ষালাভ করে তিনি ল্যাবরেটরির কাচের সরঞ্জাম প্রস্তুত-কেন্দ্র ইলমেনাও শহরে গেলেন। বলতে গেলে, সায়ান্টিফিক কাচ তৈরীতে তাঁর হাতে খড়ি এই ইলমেনাও শহরেই। সেখানেও কিছুদিন কাজ শেখবার পর ননীবাবু বীক্ষণ ও চশমার কাচ তৈরীর বিশ্ববিখ্যাত কেন্দ্র থুরিংগিয়া অঞ্চলের ইয়েনা শহরে উপস্থিত হলেন।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ একটি নাম--কার্ল ৎসাইস—১৮১৬/৮৮। আপনাদের মধ্যে যাঁরা বিশ ত্রিশ বছর আগে ক্যামেরা, বাইনোকুলার বা দূরবীন ব্যবহার করতেন তাঁদের কাছে এ এক আদরের নাম ছিল নিশ্চয়ই।

আমার এক বাল্যবন্ধুর জীবনে কার্ল জাইস মস্ত বড় অংশ নিয়েছিলেন। বন্ধুবর তাঁর বাড়ির ছাদ থেকে জাইসের লেন্সওয়ালা বাইনোকুলার দিয়ে দূরে এক উঁচু পাঁচিল ঘেরা বাড়ির প্রাঙ্গণে এক সুন্দরী তরুণীকে দেখে মুগ্ধ হন। অনেক কষ্টে আলাপ করে সুযোগ বুঝে জাইসের 'টেসার' লেন্সের দামী ক্যামেরা দিয়ে সুন্দরীর কয়েকটা ছবি তুলে ফেলেন। সেই ছবির পায়ে দিনের পর দিন ফুলের অর্ঘ উৎসর্গ করে একদিন তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হলো; মানসীকে ঘরনী করে নিয়ে এলেন। পরে তিনি জাইসের লেন্সের দূরবীন দিয়ে প্রেয়সীকে চাঁদের কলঙ্ক দেখাতেন কিনা তা আমার জানা নেই। কারণ, স্ত্রৈণ বন্ধু বিয়ের পর থেকে আমার কাছে দুর্লভ হয়ে উঠেছিলেন।

১৮৪৮ সালে ইয়েনা শহরে কার্ল জাইস তাঁর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির কারখানা স্থাপিত করেন; কিন্তু তখন কাচ বা লেন্সযুক্ত সরঞ্জাম বিশেষ করে তৈরী হতো না। ১৮৭৫ সালে প্রফেসর আর্নস্ট আব্ (১৮৪০—১৯০৫) নামে এক প্রতিভাধর তরুণ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপনা ছেড়ে জাইসের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অংশীদার হয়ে যোগ দিলেন। স্থানীয় শট্ অ্যান্ড জেন গ্লাস ওয়ার্কসের মালিক অটো শটকেও আব্ নিজেদের মধ্যে টেনে আনেন। তারপরে যান্ত্রিক জাইস এবং কাচ-শিল্পী শট্-কে নিজের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও বৈজ্ঞানিক প্রেরণা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে প্রফেসর আব্ অতুলনীয় এক সমন্বয়ের সৃষ্টি করেন। প্রতিষ্ঠান যখন বিশালাকার ধারণ করলো তখন কিন্তু এই নিঃস্বার্থ বৈজ্ঞানিক নিজে কর্মকর্তা হয়েও মহত্ত্ব দেখালেন প্রতিষ্ঠানের নাম 'কার্ল ৎসাইস্ ফাউন্ডেশন' রেখে।

এই শতকের দ্বিতীয় দশকে ইয়েনা শহরে এক পরমাশ্চর্য আবিষ্কার হয়। জাইস কম্পানির উদ্যোগে পৃথিবীর সর্বপ্রথম প্ল্যানেটেরিয়াম প্রতিষ্ঠিত হলো। আমাদের কলকাতার বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের সমস্ত যন্ত্রপাতিও জাইসের ইয়েনা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আনানো হয়েছিল। জার্মেনী বিভাগের পর জাইস প্রতিষ্ঠানও খণ্ডিত হয়েছে। এক ভাগ, 'ইয়েনা' রয়ে গেছে পূর্ব জার্মেনীতে, আর এক ভাগ চলে এসেছে পশ্চিম জার্মেনীতে অবস্থিত দুটি কারখানাতে।

আমাদের যাদবপুরের কেন্দ্রীয় গ্লাস ও সেরামিক ইনস্টিটিউট এখন বছরে প্রায় ৯ টন করে বীক্ষণ কাচ ইত্যাদি তৈরি করছেন। তাছাড়া আমাদের দুর্গাপুর প্রকল্প-ও বীক্ষণ এবং চশমার কাচ তৈরী শুরু করছে। সাধু প্রচেষ্টা—কিন্তু ভয়ের কথা যে, এটাও একটা সরকারি উদ্যোগ।

বীক্ষণ ও চশমার কাচ শিল্পে জাইসের পরেই নাম করতে হয় প্যারিসের 'পারামাতোয়া' প্রতিষ্ঠানের। এও এক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সংস্থা। ইংল্যান্ডে এই শ্রেণীর কাচ প্রস্তুতকারকদের মধ্যে পিলকিংটন, বৃটিশ হীট রেজিস্ট্যান্ট গ্লাস কম্পানি ও ফিনিক্স ওয়ার্কসের নাম করলেন ননীগোপাল সরকার।

ননীগোপালের জার্মেনি পরিক্রমা পর্ব এক কৃচ্ছ্রসাধনার কাহিনী। দারুণ অর্থকষ্টে তিনি

মাসের পর মাস একবেলা খেয়ে কাটাতেন। যথেষ্ট গরম কাপড়-জামার অভাবে প্রচণ্ড শীতের কামড়ের (ফ্রস্ট-বাইট) ভয় থাকা সত্ত্বেও ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে সূর্যোদয়ের অনেক আগে কাজে বেরোতে হতো। সামান্য উপার্জন থেকে সঞ্চিত টাকা দিয়ে একটা ওভারকোট কিনেছিলেন, তাও চুরি গেল।

সঙ্গীসাথিদের অবস্থা যদিও প্রায় একই ছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর স্ত্রী, আমাদের ভূতপূর্ব রাজপাল পদ্মজা নাইডুর দুই মামা বীরেন ও হরীন চট্টোপাধ্যায় এবং মাসি সুশীলা নাম্বিয়ার, আর মীরাট ষড়যন্ত্রে দণ্ডিত ইংরেজ কমিউনিস্ট হাচিনসন। এই দলে আরও একজন অসমসাহসী ব্যক্তি ছিলেন; তাঁর নাম চন্দ্রশেখর পিল্লাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 'এমডেন' নামে যে জার্মান রণতরীটি মাদ্রাজে এসে গোলাবর্ষণ করেছিল, চন্দ্রশেখর পিল্লাই সেই জাহাজে ছিলেন বলে শোনা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নাৎসিরা চন্দ্রশেখরকে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করেছিল।

এইসব কট্টর মার্কসবাদী ও বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেও উত্তরজীবনে ননীগোপাল কী করে শিল্পপতি হয়ে গেলেন, সে প্রশ্ন করাতে তিনি মৃদু হাসলেন। বললেন, "না, দু'-একবার টেররিস্টদের জন্যে হাত-বোমার 'ফিউজ' তৈরি করে দেওয়া ছাড়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দেওয়া আমার হয়ে ওঠেনি। একবার কেবল কয়েক দিনের জন্যে স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিসের হেফাজতে থাকতে হয়েছিল, এই যা।"

উনত্রিশ সালে শিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরে ননীগোপাল আবার বেঙ্গল গ্লাস কম্পানিতে কাজ নিলেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে ঢাকা জেলার এক কাচ-শিল্পপতির আহ্বানে বেঙ্গল গ্লাস ছেড়ে ননীবাবু নারায়ণগঞ্জে চলে গেলেন। সেখানে ওই শিশি বোতল গেলাস তৈরীর মাঝে মাঝে মনমরা ননীগোপাল ঘুরে আসতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্সের প্রফেসার (অধুনা জাতীয় অধ্যাপক) সত্যেন বসু ও কেমিস্ট্রির প্রফেসর জ্ঞান ঘোষ (উত্তরকালে স্যার জ্ঞান ঘোষ) মহাশয়দের কাছ থেকে। উদ্দেশ্য, যদি কোনোরকমে শিশিবোতল উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে সায়ান্টিফিক কাচ-ও তৈরি করতে পারেন। ননীগোপাল অবশ্য নারায়ণগঞ্জে বসেই বাঙালীর প্রথম ইলেকট্রিক বাল্‌বের কারখানা 'বেঙ্গল ল্যাম্প'-এর জন্য কিছু কিছু কাচের খোল তৈরি করে দিতেন।

নারায়ণগঞ্জের সেই কারখানাটি হঠাৎ একদিন রহস্যজনকভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ননীবাবু বেকার হলেন।

সত্যেন বসু ও জ্ঞান ঘোষ মহাশয়রা তরুণ ননীগোপালকে স্নেহ করতেন এবং কাচ শিল্পে এঁর অভিজ্ঞতার বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট আস্থা ছিল। তাঁদের দুজনের আশীর্বাদ ও শংসাপত্র নিয়ে ননীগোপাল ১৯৩৫ সালে কলকাতায় ফিরে এলেন। সম্বল ওই পণ্ডিত যুগলের দেওয়া মহামূল্য সার্টিফিকেট দুখানা।

কলকাতায় এসে তারাপদ চ্যাটার্জি নামে এক পূর্ব পরিচিত ভদ্রলোকের সহায়তায় স্বর্গীয় প্যারীমোহন মুখার্জির সঙ্গে ননীবাবুর আলাপ হলো। প্যারীবাবু ছিলেন বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের ছাতকে অবস্থিত আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট কম্পানির অন্যতম কর্তাব্যক্তি।

প্যারীমোহনের সঙ্গে 'রায় অ্যান্ড রায়' ফার্মের রণজিৎ রায় মশায়ের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। প্যারীবাবু এও জানতেন যে ভবিষ্যত উজ্জ্বল, এমন সব শিল্পোদ্যোগে রণ রায়ের দারুণ উৎসাহ।

রায় ভ্রাতাদের নিজেদের অর্থবল তো ছিলই, অধিকন্তু প্রয়োজন মত অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতাও ছিল যথেষ্ট। প্যারীমোহনের সুপারিশে ননীগোপাল রণ রায়ের কাছে গেলেন। দরিদ্র বেকার ননীগোপাল সরকার এত দিনে এক নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছিলেন। শুধু নিরাপদ নয়, রণ রায়ের সান্নিধ্য ছিল সাধুসঙ্গের মতো।

সত্যেন বসু ও জ্ঞান ঘোষের শংসাপত্র পড়ে কালবিলম্ব না করে ১৯৩৭-এর ১৫ ডিসেম্বর 'সায়ান্টিফিক ইন্ডিয়ান গ্লাস কম্পানি লিমিটেড'-এর রেজিস্ট্রি করানো হলো। মূলধন হলো কিঞ্চিদূর্ধ্ব ৬০,০০০ টাকা। ডিরেক্টর বোর্ডে যোগ দিলেন রণজিৎ ও অমিয়নাথ রায়, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের রসায়নশাস্ত্রী প্রফেসর এন. সি. নাগ এবং কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের বর্তমান চীফ এঞ্জিনীয়ার মুরশিদাবাদ-নিবাসী জনাব মহম্মদ ইসমাইল সাহেব।

ভারতের প্রথম সায়ান্টিফিক কাচ তৈরীর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলো। গোবরা অঞ্চলের ক্রিস্টোফার রোডে একটি বাড়ি ও জমি ভাড়া করে ১৯৩৮ সালের গোড়ায় কাজ আরম্ভ হলো। তোড়জোড় করতে না করতেই বছর দেড়েকের মধ্যে হিটলারের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইয়োরোপে যুদ্ধ বাধিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নিউট্র্যাল আর হীটরেজিস্ট্যান্ট কাচের আমদানি বন্ধ হলো। ফলে নবপ্রতিষ্ঠিত সিগকল-এর মালের চাহিদা হলো উৎপাদনের অনুপাতে অনেক বেশি। ভারতে অবস্থিত বৃটিশ সেনাবিভাগ তখন সেই মাল কেনবার জন্যে সর্বদাই ব্যগ্র হয়ে থাকতো। শুধু তাই নয়, সিগকল-এর কারখানা সম্প্রসারণের জন্যে গভর্নমেণ্ট ক্রিস্টোফার রোডের সেই ভাড়া বাড়ি সহ ১৯ বিঘা জমি ননীবাবুদের খুব সস্তায় কিনিয়ে দিলেন।

নতুন ফ্যাক্টরি ও আনুষঙ্গিক ঘরবাড়ি তৈরি, মেশিন কেনা, চুল্লি বসানো, কাঁচামাল সংগ্রহ আর শ্রমিক ভর্তি করা—সিগকলে কাজের ধুম লেগে গেল। সেও যেন এক যুদ্ধের প্রস্তুতি। নামের মর্যাদা রেখে রণজিৎ রায় সে লড়াইয়ে জয়লাভ করলেন। তাঁর প্রধান সেনাপতি ছিলেন ননীগোপাল। পাত্রদের মধ্যে ছিলেন ডিরেক্টরবর্গ এবং মিত্রদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন বাঙালী ওষুধের কারখানা 'স্ট্যান্ডার্ড ড্রাগ'-এর কর্তা ডাঃ হেমেন ঘোষ, 'বেঙ্গল ইমিউনিটি'র ডাঃ উমাপ্রসন্ন বসু, ডাঃ শৈলেশ চৌধুরী, স্বর্গীয় ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত এবং স্বর্গীয় অমূল্য বিশ্বাস।

এই অমূল্য বিশ্বাস মশায়ের কথা বিশেষ করে বলতে হয়। ইনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক প্রতিভাসম্পন্ন এক অভিজাত ব্যক্তি। তিনি বহু পূর্বে তাঁর কলকাতার নিজস্ব মেশিন-শপে নানা জটিল সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করতেন। এখন থেকে ৩৪।৩৫ বছর আগে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায়ের অনুরোধে শান্তিনিকেতন আশ্রমের জলাভাব দূর করার কাজে সাহায্য করেছিলেন এবং উত্তর-কালে ছাতকের আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট কম্পানির চীফ এঞ্জিনীয়ারও হয়েছিলেন।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রবিক্রেতা ইন্ডো-জার্মান প্রতিষ্ঠান 'অ্যাডেয়ার ডাট' কম্পানির

ম্যানেজার শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য মশায়ও সিগকলের প্রস্তুতি পর্বে নানাভাবে সাহায্য করে-ছিলেন এবং উৎপাদন শুরু হবার পর অ্যাডেয়ার ডাট কম্পানি সিগকলের এজেন্সিও করেছিলেন।

সিগকল-এর প্রথম কয়েক বছরের অগ্রগতি আমি নীচে কয়েকটি অঙ্ক দিয়ে দেখাচ্ছি :

সাল	উৎপন্ন দ্রব্যের দাম	কম্পানির লাভ	মূলধন	ডিভিডেন্ড
১৯৩৯	১৩,৭০০ টাকা	১,১৭৫ টাকা	১৬,৫০০ টাকা	
১৯৪০	১,৯৬,০০০ টাকা	২৭,০০০ টাকা	১,৩৫,০০০ টাকা	১৫% (আয়কর বাদে)
১৯৪১	৫,২৫,০০০ টাকা	৭২,০০০ টাকা	ঐ	২৪% ঐ
১৯৪২	৭,৬০,০০০ টাকা	৮৭,০০০ টাকা	ঐ	২৪% ঐ

ইংরেজী ১৯৪৩, মানে বাংলা ১৩৫০—বাংলা দেশে মন্বন্তরের বছর; সেই সঙ্গে সিগকলের ওপর দিয়ে বয়ে গেল ভয়ঙ্কর এক ঝড়, অপূরণীয় এক ক্ষতি।

১৯৪১/৪২-এ জাপানীরা বর্মা ও আন্দামান দখল করে প্রায় বাংলার দরজায় পেঁছে গিয়েছিল। বৃটিশ সরকার তাই অত্যাবশ্যাক যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরীর প্রতিষ্ঠানদের বলছিলেন যে তাঁদের কারখানার অংশ কলকাতা থেকে যেন অন্তত ১৫০ মাইল দূরে তুলে নিয়ে যান অথবা সেই দূরত্ব বজায় রেখে তাঁদের দ্বিতীয় ইউনিট চালু করেন। সিগকলের প্রতিও সেই নির্দেশ ছিল। রণ রায় তেমন একটি জায়গা খুঁজছিলেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা বাহাদুর এবং তাঁর দেওয়ান শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মশায় (পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী) অনেক সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রণ রায়কে ময়ূরভঞ্জে সিগকলের দ্বিতীয় কারখানা স্থাপন করতে আহ্বান করলেন।

সিগকল-এর বদলে ময়ূরভঞ্জ গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ নাম দিয়ে রণজিৎ রায় অল্পদিনের মধ্যেই এক কম্পানি গঠন করে ফেললেন। সিগকল থেকে ৬।৭ লক্ষ টাকা নিয়ে আর বাইরে কিছু শেয়ার বেচে অনতিবিলম্বে ফ্যাক্টরি তৈরী হয়ে মেশিনারি বসে গেল। ননীগোপাল, অমিয়নাথ, এ'রা সব রইলেন সিগকল ও 'রায় অ্যান্ড রায়'-এর তত্ত্বাবধানে এবং রণ রায় নিজে গেলেন ময়ূরভঞ্জের দেখাশোনা করতে।

রণ রায় যে-কোনো কাজ হাতে নিতেন তার প্রযুক্তিগত অংশতেও নিজে হাত লাগিয়ে শিখে নিতেন। কোনো শিক্ষাই অসম্পূর্ণ রাখতে চাইতেন না। সিগকলের কারখানায় বা ল্যাবরেটরিতে ননীগোপাল যখন একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোনো জটিল কাজে লিপ্ত থাকতেন রণ রায়ও পাশে থাকতেন; পদ্ধতিটা বুঝে নিতেন অসীম একাগ্রতা দিয়ে। কাজটা শেষ হচ্ছে না, ননীগোপালের খাবার সময়ও কখন উৎরে গেছে—রণ রায় বেরিয়ে গিয়ে নিজের হাতে টিফিন কেরিয়ার বয়ে এনে বলতেন, "সরকার খেয়ে নাও, আমি ততক্ষণ হাত লাগাই।"

ময়ূরভঞ্জে ননীগোপাল ছিলেন না। আধপাকা হাতে রণজিৎ রায় একা একাই কঠিন টেকনিক্যাল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতেন। সেদিন কীসের জন্যে যেন পেট্রল-গ্যাসের দরকার পড়েছিল। রণ রায় নিজেই গ্যাস তৈরীর পাত্রটিতে আগুন দিয়ে প্রয়োজন মেটাতে গেলেন। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ হলো। রণ রায়ের সর্বাঙ্গে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো।

বালির স্তূপ কাছেই ছিল তার ওপরে গড়াগড়ি দিয়ে আগুন নিবিয়ে ফেললে বেঁচে যেতেন। কিন্তু ভুল করে তা করলেন না, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বোধ হয় তখন অসাড় হয়ে গিয়েছিল। তিনদিন অসহ্য যন্ত্রণার পর মারা গেলেন। ডাক্তার বিধান রায়ও খবর পেয়ে ঘটনার দিনেই ময়ূরভঞ্জে গিয়ে চিকিৎসা করেছিলেন, কিন্তু লাভ কিছু হয়নি।

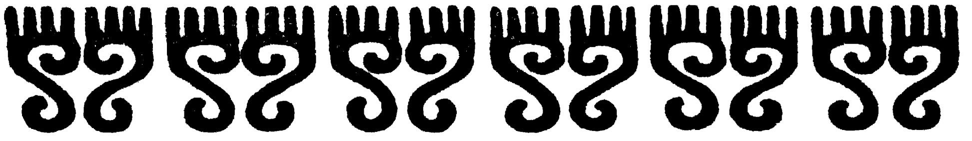
তারপরে পঁচিশ বছর কেটে গেছে। রণজিৎ রায় না থাকাতে ময়ূরভঞ্জ গ্লাস ওয়ার্কস-ও লিকুইডেশনে গেছে। সিগকল-এর মালের চাহিদা অবশ্য কমেনি, অনেক বেড়েই গেছে। ১৯৬৭ সালে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকার মাল বিক্রি হয়েছে। কিন্তু একদিকে শ্রমিক আন্দোলন এবং অন্যদিকে সরকারের দয়ায় কাঁচামালের দাম অনেক বেড়ে যাওয়াতে উৎপাদনশক্তির অর্ধেকের বেশি কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

শুনলাম যে, বোরাক্স অর্থাৎ সোহাগার মতো কাচশিল্পের অতি প্রয়োজনীয় কেমিক্যালটি শোধিত অবস্থায় আমেরিকা থেকে এখনো যে দামে আমদানি করা যেতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার তা না করতে দিয়ে ব্যবস্থা করেছেন যে, বোম্বাইয়ের বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠান সেই বিদেশ থেকেই অশোধিত সোহাগা এনে এখানে একটু নাড়াচাড়া করার পর আমেরিকান শোধিত সোহাগার চাইতে শতকরা ৪০ টাকা বেশি দামে বাজারে ছাড়তে পারেন। কালিকা টাইপ ফাউন্ডরী বিষয়ক প্রবন্ধে অনুরূপ একটি উদাহরণ দিয়েছি—সীসে, টিন ও অ্যান্টিমনি আমদানির ব্যাপারে। সেখানেও আছে এক বোম্বাই কম্পানি। এ হলো সরকারের অনুপ্রাণিত ব্ল্যাক মার্কেটিং-এর দৃষ্টান্ত।

ননীগোপাল বললেন যে, তাঁর উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র অরূপ জার্মেনী থেকে কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং পাস করে এসে ফ্যাক্টরির সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে কাজ একরকম ভালোই চালাচ্ছেন। মধ্যম অনুপ ইংল্যান্ডে গ্লাস টেকনোলজিতে বি. এস-সি. পাস করে শীঘ্রই দেশে ফেরার কথা। ছোট ছেলে স্বরূপও যাদবপুর থেকে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে এম. এস-সি. দিচ্ছেন। শ্রীমতী চিন্ময়ী সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক আর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী নীনা পুত্তুন্ড এম. এস-সি. ফিজিওলজিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। শিক্ষিত কৃষ্টিবান পরিবার। শিল্পোদ্যোগে ব্যাপৃত থাকলে ননীবাবুর বংশধররা এই পারিবারিক ঐতিহ্যে পুষ্ট হয়ে বাঙালীর ও বাংলার মঙ্গল ঘটাতে পারবে।

সমস্যার কথা হচ্ছিল। ননীগোপাল বললেন, "যেখানে আমার মতো অভিজ্ঞ লোকও এইসব সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে সেখানে এই ছেলেমানুষরা চালাবে কী করে?" একটু থেমে আবার বললেন, "এক পারতেন রণ রায়। আজ রোগশয্যায় শুয়ে কেবলই তাঁর কথা মনে হচ্ছে। তিনি যদি আজ থাকতেন—"

৮ জুন, ১৯৬৮



কুঁড়ি

আটষট্টির মার্চ মাসের শেষভাগে হায়দ্রাবাদে 'ইনস্টিটিউট অব এঞ্জিনীয়ার্স' ভবনে সর্ব-ভারতীয় কাচশিল্প সমিতির ২৪তম বাৎসরিক সভার অধিবেশন হয়। সভাপতি ছিলেন বাঙালীর বৃহত্তম এবং ভারতের অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান কৃষ্ণা সিলিকেট অ্যান্ড গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার।

প্রাঞ্জল ভাষণের প্রণিধানযোগ্য কয়েকটি তত্ত্ব ও তথ্য নীচে লিপিবদ্ধ করার সংগে সংগে প্রতি অনুচ্ছেদে আমার নিজস্ব মন্তব্যও কিছু কিছু জুড়ে দিলাম।

(১) অভিভাষণের গোড়াতেই সভাপতি মশায় ভারতে কাচশিল্পের ক্রমবিকাশের বিবরণ দিয়েছেন। ১৯৫০ সালে আমাদের উৎপাদিত কাচ পণ্যের ওজন ছিল ৫০ হাজার টন। ১৯৬৬-তে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ টনে।

(ভারতে কাচের উৎপাদন এখন কেবল যে চাহিদা-বরাবর তাই-ই নয়, কয়েকটি কাচপণ্যের উৎপাদন প্রয়োজনের অতিরিক্তও হচ্ছে। রামায়ণের কাল থেকে আজ পর্যন্ত রমণীকুলের আদরের পুঁতি তৈরি থেকে শুরু করে শিশিবোতল, গেলাস-বাটি, হ্যারিকেন লণ্ঠনের চিমনির মতো হলোওয়্যার; কাচের পাত ও আয়নার মতো শীট বা ফ্ল্যাট কাচ; বীক্ষণ ও চশমার কাচ এবং নিউট্রাল ও উচ্চতাপসহ কাচ--সবই এখন ভারতে প্রস্তুত হচ্ছে। কাচ-শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প। অধিকাংশ কাচের কারখানাই বাংলা, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। ১৯৬৬ সালে ১২৩টি ভারতীয় গ্লাস ফ্যাক্টরিতে মোট ১২ কোটি টাকা ন্যস্ত ছিল আর উৎপাদিত কাচের দাম দাঁড়িয়েছিল ১৮ কোটি টাকায়। এই হিসেবের মধ্যে আবার কলকাতার গরানহাটা, গ্রে স্ট্রীট এবং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলের হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কিংবা আতরের শিশি তৈরির বস্তিশিল্পের পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত নয়। উত্তরপ্রদেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের পুঁতি তৈরীর কুটিরশিল্পের হিসেবও ধরা হয়নি। আরও কিছু কিছু হয়তো বাদ পড়ে গেল--তা-ও তো আমি সরকারি পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভর না-করেই লিখছি। সেটা করলে পরিসংখ্যানে অনেক বেশী ভুল থাকার সম্ভাবনা হতো)।

(২) সভাপতি মহাশয় বলছেন যে বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে মাত্র বছর বিশেকের মধ্যে ভারতীয় কাচশিল্পের বিরাট সম্প্রসারণ হলো বটে, কিন্তু তা হতে না হতেই এল মন্দা ও শিল্পসংকট।

(সম্প্রসারণের মধ্যে আবার প্রধান একটি গলদ রয়ে গেল। স্থাপনার সময়ে বর্তমান কাচশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই ছিল আয়তনে ক্ষুদ্র, যন্ত্রপাতিতে সেকেলে, অথচ সংখ্যায় অনেক। কাজেই অল্পকালের মধ্যেই ঊর্ধ্বগতি পড়তার সঙ্গে তাল রাখা এইসব ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। সংকট আরও ঘনীভূত হলো ১৯৫৬-র পাক-ভারত যুদ্ধকালে। পরিণামে ভারত থেকে পাকিস্তানে রপ্তানি গেল বন্ধ হয়ে। উদাহরণ: শুধু কৃষ্ণা গ্লাসেরই হলো-ওয়্যার কাচের পাকিস্তানে রপ্তানি বছরে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা কমে গেল। সায়ান্টিফিক কাচ অথবা শীট-গ্লাসের মতো দামী জিনিসের রপ্তানি ৯ লক্ষ টাকা কম হলে তেমন কিছু হতো না, কিন্তু শিশিবোতলের বেলায় এই হ্রাস দারুণ ক্ষতির ব্যাপার হলো। কৃষ্ণা গ্লাস শ্রেণীর আধুনিক যন্ত্র সংবলিত প্রতিষ্ঠানগুলির কম পড়তার জন্যে এই চোট সামলে নিল, কিন্তু ছোটদের প্রায় শ্বাসরোধের উপক্রম হলো)।

(৩) সাগরপারে রপ্তানির অন্তরায় সম্বন্ধে সভাপতি বিভূতি সরকার মশায় বিশেষ যে কারণের উল্লেখ করেছেন তা হলো আন্তর্জাতিক জাহাজ-ভাড়া বৃদ্ধি। মাসুল, বীমা খরচ ইত্যাদি খুব বেশী বেড়ে গেছে। তাই ডিভ্যালুয়েশনের পরেও ভারতীয় কাচের দাম এত বেশি হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জেতা আমাদের বড় বড় গ্লাস ফ্যাক্টরির পক্ষেও অসম্ভব।

(লোহার রপ্তানিতে যেমন সরকারী সাহায্য আছে, কাচেও তেমনি আছে, কিন্তু বিশ্বের বাজারে এই কড়া প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে ফরেন এক্সচেঞ্জ ঘরে আনতে হলে কাচ-শিল্পের সাহায্য বেশ খানিকটা বাড়াতে হবে। সুবিধা দরে ভারতীয় কাচ পেলে আফ্রো-এশীয় দেশেরা ইওরোপীয় কাচ না কিনে নিশ্চয়ই তাই-ই কিনবে। বিশেষ করে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তিগুলির জন্যেই এতে তাদের বেশি আগ্রহ; কিন্তু অন্যায্য দরে তো তারা কিনবে না)।

(৪) বিভূতিবাবু তাঁর ভাষণে আরও বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের (এক্সসাইজের) নাকি একমাত্র কাজ হলো যে, গ্লাস ফ্যাক্টরিগুলি যতদিন ধুঁকে ধুঁকে টিকে থাকে ততদিন জিজিয়া-করের মতো করে ছোট বড় সকলের কাছ থেকে ১৫ পারসেন্ট শুল্ক আদায় করে যাওয়া। শুল্কনীতির নিয়মকানুনের পরিবর্তন খুবই জরুরী। অন্যান্য শিল্পে যেমন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের শুল্কের হারে কম বেশি আছে কাচশিল্পে সে-সব নেই। ফেডারেশন এই অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টা করছেন।

(কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম যখন কাচের ওপর এক্সসাইজ ডিউটি বসান, তখন হিসেব করেছিলেন যে, এই খাতে বড় জোর বিশ-ত্রিশ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে; এখন কিন্তু আড়াই কোটি টাকার বেশি পেয়েও সরকার বাহাদুর কিছুটা ছেড়ে দেওয়ার কথায় কর্ণপাত করতে নারাজ)।

(৫) ইমপোর্টেড কেমিক্যালের ব্যাপারে সভাপতি মশায় একটি উদাহরণ দিয়েছেন। কাচ-শিল্পে অত্যাবশ্যক সোডিয়াম নাইট্রেট-এর আমদানি ও বিতরণের একচেটিয়া অধিকার হলো এস. টি. সি. অর্থাৎ 'স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন' নামক আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের। আমদানিতে এস. টি. সি-র যা পড়তা দাঁড়ায় ভারতের গ্লাস ফ্যাক্টরিগুলি খোলা বাজার থেকে তার বেশ কয়েক গুণ বেশী দামে সেই কেমিক্যাল কিনতে বাধ্য হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কাচশিল্পকে এতকাল সরাসরি সোডিয়াম নাইট্রেট আমদানি করার লাইসেন্স দেননি। ফেডারেশন আশা করছেন যে, এবারে তাঁরা কিছু কিছু 'অ্যাকচুয়্যাল ইউজার্স লাইসেন্স' পাবেন। এই সোডিয়াম নাইট্রেট-এর বদলে দেশে উৎপন্ন পোটাসিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করা যেতে পারতো, কিন্তু তার বাজার দরও যে কেন খুব উঁচু সে কথা বিভূতিবাবুরা বুঝতে পারেন না।

(বোঝা খুব শক্ত নয় বোধ হয়; এটা হলো সরকার উৎসাহিত কালোবাজারী কারবার)।

উপসংহারে সভাপতি মশায় 'কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগার' অর্থাৎ সি. জি. সি. আর. আই-এর কর্মসূচীর সাধুবাদ করে বলেছেন যে, কর্তৃপক্ষ কাচ, চীনেমাটি ও এনামেলের পণ্য উৎপাদন বিষয়ে নীরবে যে কাজ করে এসেছেন ও করছেন তা অতুলনীয়। পড়তা কমের দিকে রেখে উৎপাদনের উৎকর্ষসাধনের জন্য তাত্ত্বিক ও প্রযুক্তিগত বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সি. জি. সি. আর. আই. ভারতীয় কাচশিল্পকে সর্বদাই সাহায্য করেন।

সি. জি. সি. আর. আই.-এর উৎপত্তি হয়েছিল ১৯৫০ সালের অগাস্ট মাসে। ডঃ শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মশায় তখন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী ছিলেন। প্রথমে এই গবেষণাগারটিকে বোম্বাইয়ে স্থাপনার জন্যে পশ্চিম ভারত থেকে ভীষণ চাপ দেওয়া হয়েছিল। অনেক টানাপোড়েন সত্ত্বেও শ্যামাপ্রসাদ খুব শক্ত হয়ে থেকেছিলেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ডক্টর মেঘনাদ সাহা ও ডাক্তার বিধান রায়। তার ফলে গবেষণাগারটি কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হলো। যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁদের জমি থেকে এই সংস্থাকে কয়েক বিঘা জমি দেবার পর সেখানে এর ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হলো। এটিকে গড়ে তোলার কাজে এর প্রথম ডিরেক্টর ('কাউন্সিল অব সায়ান্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়্যাল রিসার্চ'-এর বর্তমান ডিরেক্টর-জেনারেল) ডঃ আত্মারামের অবদান উল্লেখযোগ্য। শ্রী কে ডি শর্মা এখন এর ডিরেক্টর। এই গবেষণাগারের বর্তমান কার্যকলাপ সম্বন্ধে গত প্রবন্ধেও আপনাদের কিছু বলেছি এবং ভবিষ্যতেও বলার সম্ভাবনা আছে।

এইসব সুপরিচালিত গবেষণাগারের কথা শুনলে মনে হয় যে, সরকার বাহাদুর এটুকু করেই ক্ষান্ত হন না কেন—শিল্প-বাণিজ্যে হাত পাকাতে গিয়ে দেশের এত ক্ষতি করেন কেন! গবেষণাগার সুপরিচালিত হবার কারণ হলো যে, স্বধর্মে অধিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিকরা এখানে কাজ করেন। আই-সি-এস কিংবা আই-এ-এস হয়ে ইস্পাতের কারখানা বা শিল্প-প্রকল্প চালানো—মানে, আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখার চেষ্টা, বৈজ্ঞানিকরা সাধারণত করেন না। অবশ্য সরকারী সংস্থার পরিচালকের স্থলাভিষিক্ত সব সিভিলিয়ানকেই অকর্মা বললে অন্যায় হবে; দু'চারজন অপূর্ব কর্মক্ষম ব্যক্তিকেও আমরা সেই গোষ্ঠীতে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মতো হঠাৎ হঠাৎ পেয়ে যাই।

এক বিদ্যায় পাণ্ডিত্য লাভ করে অন্য ক্ষেত্রে উদ্যম ও অধ্যবসায় দ্বারা সফল হওয়ার গুণ সচরাচর দেখা যায় না। এইরকম গুণী লোকের সংখ্যা খুব কম।

কৃষ্ণা গ্লাস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার সেই ক্বচিৎ দৃষ্ট ব্যক্তিদের একজন।

বিভূতিভূষণ চট্টগ্রামের লোক—অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম, যেখানে এককালে বাঙালী হিন্দু হয়ে জন্মানো যেমন পরম গৌরব ছিল, তেমনি ছিল বিভীষিকা। স্কুলের উঁচু ক্লাসে উঠতে না উঠতেই ব্রিটিশ পুলিসের গোয়েন্দারা প্রতিটি ছেলে ও মেয়ের ওপর শ্যেন দৃষ্টি রাখতো। তা সত্ত্বেও অবশ্য সূর্য সেন আর প্রীতি ওয়াদেদার-রা ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে স্ফুরজ্জ্যোতির্ময় স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিলেন।

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ছাত্রনেতা হিসেবে বিভূতিভূষণ পুলিসের নির্যাতন ভোগ করতে আরম্ভ করেন। 'অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের' সময়ে তাঁর বয়স ছিল মাত্র দশ কি এগারো। আরেকটু বড় হলে বিভূতিভূষণ কি করতেন তা আন্দাজ করা যায়। তার তিন বছর পরে ১৯৩৩ সালে কৈশোরে উপনীত হওয়ামাত্রই তিনি গ্রেপ্তার হলেন। তেত্রিশ থেকে ছত্রিশ সাল পর্যন্ত তিনি বর্মার আকিয়াব শহরে থারাওয়াডি সেণ্ট্রাল জেলে আটক রইলেন অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পলাতক আসামী হরিপদ মহাজনের সঙ্গে ব্রহ্মদেশে যোগাযোগ রাখার অপরাধে। জেলের মধ্যেও বিভূতিভূষণ এক আন্দোলন চালালেন। কারাগারের মধ্যেই তাঁকে পড়াশোনা করতে দিতে হবে। সেই অধিকার আদায়ের জন্যে তিনি অনশন-ও করেছিলেন।

১৯৩৬-এ জেল থেকে বেরোবার দু' মাস পরেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে বিভূতিভূষণ ভালোভাবেই পাস করলেন। মেধাবী ছাত্র ছিলেন; তাই পর পর আই. এস-সি-তে দ্বিতীয়, বি. এস-সি-তে প্রথম ও এম. এস-সি-তে দ্বিতীয় হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ হবার পর তিনি আই-সি-এস ও ফাইনান্স পরীক্ষা দেবার অনুমতি প্রথমটায় পেয়েছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক অপরাধী ছিলেন বলে পরীক্ষার অব্যবহিত আগে ব্রহ্ম সরকারের বিরুদ্ধ-রিপোর্ট পৌঁছবার জন্যে সেই অনুমতি নাকচ হয়ে গেল। রাজদ্রোহীর হাতে রাজকার্যের ভার দিতে কোন্ সম্রাট চাইবে? ব্রিটিশ সরকারকে দোষ দেওয়া চলে না।

কিন্তু যার প্রতিভা আছে ভাগ্য তার অনুকূল হলে কে তার উন্নতি রুখতে পারে?

চট্টগ্রামের বাঙাল বিভূতিভূষণ খাস কলকাতার বাসিন্দা এক বিশিষ্ট চিকিৎসক স্বর্গীয় ডাক্তার কুমুদনাথ ঘোষের নজরে পড়ে গেলেন। বিভূতিবাবু কুমুদনাথের ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষকতা করতেন। সুদর্শন বিদ্বান্ ছেলেটিকে কুমুদবাবু এবং তাঁর পরিবারের সকলে ভালোবেসে ফেললেন। বিদ্যা বুদ্ধি ও দীপ্তিমান চেহারা ছাড়া বিভূতিবাবুর আর কোনো সম্বল তখন ছিল না।

কুমুদবাবু তাঁকে চাকরির মায়া ত্যাগ করে কাচশিল্পে উৎসাহ দিলেন। চিকিৎসক কুমুদবাবুর একাধিক চেম্বারের মধ্যে ক্যানিং স্ট্রীট অঞ্চলে একটি চেম্বার ছিল। তার আশেপাশে অসংখ্য কাচের ব্যাপারীদের দোকানপাট ছিল আর রোগীদের মধ্যেও অনেকে কাচের ব্যবসা করতেন। তাঁদের কাছ থেকেই কুমুদনাথ কাচের বাজার সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছিলেন এবং

এই শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যেই কুমুদবাবু বিভূতিবাবুকে উৎসাহ দিলেন। কেবল বাচনিক অনুপ্রেরণাই নয়, কুমুদনাথ বিভূতিবাবুকে নগদ ছ' হাজার টাকা ধার দিলেন এবং যাদবপুরে তাঁর নিজের জমিতে একটা গ্লাস ফ্যাক্টরি স্থাপনার পরামর্শ দিলেন। ১৯৪৩ সালে বিভূতিভূষণ কৃষ্ণা গ্লাস কম্পানির গোড়াপত্তন করলেন জনা বিশেক কর্মী নিয়ে।

'কৃষ্ণা' নামটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। বিভূতিবাবুর স্ত্রী, কুমুদনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা কৃষ্ণা দেবীই এই নামের উৎস। অবশ্য গ্লাস কম্পানিটির উৎপত্তি বিভূতিবাবুর সঙ্গে কৃষ্ণা দেবীর বিবাহের আগে; অতএব নামকরণটি পূর্বরাগরঞ্জিত না অনুরাগসিঞ্চিত তা আমার জানা নেই, কারণ বর্তমান প্রবন্ধ রচনাকালে বিভূতিবাবু এবং কৃষ্ণা দেবী, উভয়েই কলকাতায় অনুপস্থিত। তবে ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ শুনে মনে হয় আগেরটাই ঠিক।

অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সে এম. এস-সি আর কাচশিল্পে একেবারে আনাড়ী বিভূতি সরকার সামান্য ৬০০০ টাকা ঋণ এবং অসামান্য প্রেরণা সম্বল করে কাজে নেমে পড়লেন। প্রেরণার উৎস ছিলেন কুমুদনাথ, যিনি নিজে ব্যবসায়ী না হয়েও বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে বিভূতিভূষণকে সর্বদাই উৎসাহিত করতেন। বস্তুত কুমুদনাথ বিভূতিভূষণের পিতার স্থান নিয়েছিলেন।

বিভূতিভূষণের পিতা স্বর্গত ডাঃ ব্রজমোহন সরকার বর্মায় ডাক্তারি প্র্যাকটিস করতেন। তাঁর ওপরে বৃহৎ পরিবারের বোঝা ছিল বলে বিভূতিবাবু আর্থিক ব্যাপারে তাঁকে বিব্রত করতেন না।

এই সময়ে দুজন পরিশ্রমী বুদ্ধিমান যুবক বিভূতিবাবুর সহকারী হলেন। রামকুমার ঘোষ (বর্তমানে কৃষ্ণা গ্লাস-এর বোম্বাই শাখার ম্যানেজার) এলেন উৎপাদনের তত্ত্বাবধানে, আর শ্যামাপদ বল (বর্তমানে কম্পানির সেলস্ ম্যানেজার) যোগ দিলেন বিক্রির সাহায্য করতে।

দুপুরবেলায় কম্পানির ঠেলাগাড়িতে মাল চড়িয়ে বিভূতিভূষণ আর শ্যামাপদ যেতেন মুর্গিহাটায় মাল বেচতে। ফেরবার সময়ে কাঁচামাল সওদা করে সেই ঠেলাগাড়িতেই চাপিয়ে দেওয়া হতো। রাত্রে বিভূতিভূষণ যাদবপুরেই থাকতেন। কাচ তৈরির সেই ছোট চুল্লি অনির্বাণ জ্বলতো, তাই কখনই কাজের বিরাম থাকতো না।

এঁরা কঠোর পরিশ্রম করে দিনে দিনে কৃষ্ণা গ্লাসকে বাড়াতে লাগলেন। অবশেষে প্রতিষ্ঠানের কিছুটা শ্রীবৃদ্ধি হবার পর ১৯৪৬ সালে কৃষ্ণা গ্লাস লিমিটেড কম্পানিতে পরিণত হলো; নাম হলো কৃষ্ণা সিলিকেট অ্যান্ড গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড।

এর পরে আর এক ব্যক্তি ডিরেক্টর হিসেবে যোগ দিলেন। তাঁর নাম শ্রীবিভূতিভূষণ মৌলিক। কাচের বাণিজ্যিক দিকটায় এঁর অভিজ্ঞতার জন্যেই বিভূতি সরকার এঁকে ডেকে নিলেন। আর এলেন বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রীশান্তিময় সরকার, যিনি কৃষ্ণা গ্লাসের গোড়া থেকেই প্রধান কাঁচা মাল ভাঙা কাচের সরবরাহে নানাভাবে সাহায্য করতেন। ১৯৪৮ নাগাদ কম্পানির বর্তমান সেক্রেটারি শ্রীহিমাংশুবিমল সেন যোগ দিলেন। আরও পরে যোগ দিলেন বর্তমান ডিরেক্টর বোর্ডের অন্যতম সভ্য শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ। শ্রীমতী সরকারও ডিরেক্টর বোর্ডে এলেন।

কম্পানির প্রথম যুগের বিশ্বস্ত পরিশ্রমী কর্মীদের কর্তৃপক্ষ ভোলেননি। তাঁদের মধ্যে অন্তত একশ' জন আছেন যাঁরা এখন কম্পানির অংশীদার। কম্পানি থেকে তাঁদের বিনামূল্যে শেয়ার উপহার দেওয়া হয়েছে তাঁদের অতীত শ্রমের পুরস্কার হিসেবে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ বিভূতি সরকার মশায় প্রথম থেকেই করেছিলেন। তিনি একটি নীতি স্থির করে নিয়েছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তু আর যাদবপুরের স্থানীয় বাঙালী যুবকদের কাজে ভর্তি করে কাচ তৈরি শিখিয়ে পাড়িয়ে নিতে হবে।

কাচের শ্রমিক বলতে প্রাধান্য ছিল বিহারী ও উত্তরপ্রদেশের লোকের। এ'রা পুরুষানুক্রমে মুখ দিয়ে ফুঁকে অর্থাৎ গ্লাস ব্লোয়িং করে হলো-ওয়্যার কাচ তৈরি করতে অভ্যস্ত। উত্তর-প্রদেশে যে এখন থেকে আড়াই হাজার বছর আগেও কাচ তৈরি হতো সে বিষয়ে পরে বলছি। তখন যাঁরা কাচ-শ্রমিক ছিলেন এ'রা হয়তো তাঁদেরই উত্তরপুরুষ।

এখন অবশ্য কৃষ্ণা গ্লাসের তিন কারখানার অটোম্যাটিক ও সেমি-অটোম্যাটিক মেশিনের কাজে শ্রমিকদের সেই প্রাগৈতিহাসিক ফোঁকার কাজ আর করতে হয় না। কিন্তু সাধারণ ব্যবহারের জিনিস তৈরিতে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি যতই কাজের হোক না কেন, কাচের কারুশিল্পীকে এখনো আদি প্রণালীর উপর নির্ভর করে চলতে হয়। সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত কাট্-গ্লাস ইত্যাদি বা সায়ান্টিফিক কাচের নানা প্রিসিশন কাজ এই বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের যুগেও নাকি ফুঁকে তৈরি করা ছাড়া উপায় নেই।

যাদবপুরের সেই ছোট্ট ফুঁকো শিশি-বোতলের কারখানাটি আজ প্রকাণ্ড রূপ নিয়ে ১৩০০ শ্রমিকের অন্নসংস্থানের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় ইউনিট, বোম্বাই শাখা ১৯৬০ সালে চালু হয়েছিল; সেখানে কৃষ্ণা গ্লাসের ফ্যাক্টরি ৬৫ বিঘা জমির ওপর অবস্থিত। বারুইপুরের অটোম্যাটিক ইউনিটটি ১৯৬৪ সাল থেকে চালু হয়েছে। সেখানেও জমি আছে প্রায় ৩০ বিঘা। তিন ইউনিটের কর্মিসংখ্যা এখন ২০০০-এরও বেশি আর তার মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা শতকরা ৭০।

সেদিন কৃষ্ণা গ্লাসের বারুইপুর শাখার বিরাট কারখানায় ১৪০০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড-এর গরম চুল্লির পাশে দাঁড়িয়ে কাচমণির জন্মপ্রস্তুতি দেখছিলাম—যেন জরায়ুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট তপ্তবীর্য ভ্রূণের প্রাণসঞ্চারে ব্যাপৃত।

কাচমণি—'ভারতকোষ' বলছেন সংস্কৃত শাস্ত্রানুসারে কাচকে মণি বিশেষ বলিয়া গণনা করা হয়। কাচ ও স্ফটিক একই দ্রব্য (?)। স্ফটিকমণি সম্বন্ধে সংস্কৃত গ্রন্থে আছে : হিমালয়ে সিংহলে চ বিন্ধ্যাটবীতটে তথা/স্ফটিকং জায়তে চৈব নানারূপং সমপ্রভম্। (লেখকের মন্তব্য : স্ফটিক আর কাচ এক নয়। প্রথমটি কোয়ার্টজ, দ্বিতীয়টি সিলিকা-জাত)।

অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়ের 'হিস্ট্রী অব কেমিস্ট্রি ইন এনশেণ্ট অ্যান্ড মিডিয়েভাল ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের ৭৩।৭৪ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি : "কৌটিল্যের উক্তিতে কাচের পুঁতির উল্লেখ আছে। সুশ্রুত কাচ ও স্ফটিকের প্রভেদের উল্লেখ করেছিলেন। প্রাকৃতিক ইতিহাসের প্রণেতা রোম

শহরের জ্যেষ্ঠ প্লাইনি (প্লাইনি দি এল্ডার) খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মাঝামাঝি লিখেছিলেন যে ভারতবর্ষে তৈরী সাদা ও রঙীন কাচ সকল কাচের সেরা। মহাভারতেও কাচের উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে স্থাপিত একটি কাচের কারখানা আবিষ্কৃত হয়েছে উত্তর-প্রদেশের কোপিয়া নামক স্থানে। উজ্জ্বল রঙীন ছোট ছোট কাচের পুঁতি এবং ১৮ × ১৯ × ১২ ইঞ্চি মাপের একখন্ড কাচও কোপিয়ার সেই কাচের কারখানায় পাওয়া গেছে" ইত্যাদি।

রামায়ণের কালেও কি কাচ ছিল? আমার এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু সেদিন আমাকে সুন্দর একটি মারাঠী গান গেয়ে শোনালেন। তার কয়েক লাইন বাংলায় বলি :— এক বছরের খোকা শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণিমার চাঁদ দেখে আব্দার ধরলেন যে সেটা এনে তাঁর হাতে দেওয়া চাই। কিছুতেই কান্না থামে না, প্রাসাদে মহা অশান্তি। খবর পেয়ে রাজা দশরথের অষ্ট অমাত্যের মধ্যে চতুরতম, অর্থসচিব সুমন্ত্র ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে তিনি নির্দেশ দিলেন রামের সামনে একটি আয়না ধরে চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখাতে। হাতে চাঁদ পেয়ে খোকা রাম খুশিতে হেসে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যা নগরীতেও উঠল আনন্দের রোল।

তাহলে তো শ্রীরামচন্দ্রের কালেও কাচের আয়না তৈরি হতো।

একটি বিদেশী কিংবদন্তী :—আধুনিক সিরিয়ার সংলগ্ন পাহাড়ে জায়গার অতীতে নাম ছিল ফিনিশিয়া। সেখানকার বাসিন্দারা ছিল জাত-বণিক। তারা বাণিজ্যতরী নিয়ে ভূমধ্যসাগরের বন্দরে বন্দরে বাণিজ্য করে বেড়াতো খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকেও। একদা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে নৌকা ভিড়িয়ে তাদের একদল সাগরবেলার বালির ওপরে দুটি চুনাপাথরের ঢিবি কুড়িয়ে এনে রান্না চড়িয়েছিল। রন্ধনপর্বের পরে লোকগুলি দেখে যে চুল্লির উত্তপ্ত পায়া দুটির সঙ্গে গলিত বালুকণা মিশে কী যেন এক স্বচ্ছ বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। সেটাই নাকি প্রথম কাচ। ফিনিশীয়রা সেই কাচের প্রচলন করে দিল মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকাতে।

প্রাচীন অ্যাসিরিয়া ও মিশরে কাচের বহুল প্রচলন ছিল বলেও ঐতিহাসিকরা বলেন।

ইতিহাস বাদেও কিংবদন্তীরও সবটাই সত্যি হতে পারে; কারণ, সাধারণ কাচ তৈরি করা খুব কঠিন কাজ নয়। বালি অর্থাৎ সিলিকাই হলো কাচের প্রধান উপাদান। সঙ্গে লাগে চুনাপাথর ও সোড়া। এমন কি, শুধু বালিকেও যদি প্রচন্ড ২০০০ সেণ্টিগ্রেড তাপে গালানো যায় তো তার থেকে একরকম অনচ্ছ কাচ তৈরি হয়ে যায়। অতটা তাপসঞ্চার করা কঠিন বলে উল্লেখিত অন্য উপাদান, সোহাগা (বোর‍্যাক্স) ইত্যাদি মেশানো হয়। তাতে তাপ কম লাগে।

রঙীন কাচ করার জন্য ব্যবহৃত হয় নানা রঙের অক্সাইড।

ভারতে সওয়া-শ' আর বাংলা দেশে গোটা কুড়িক কাচের কারখানার মধ্যে এই মুহূর্তে পুরোপুরি বাঙালীর মালিকানায় আছে মাত্র ৬টি। সিগকল এবং নিউ ইণ্ডিয়া গ্লাস ওয়ার্কসের

কথা আগের প্রবন্ধে লিখেছি আর কৃষ্ণার বিষয়ে তো বলছি-ই। এগুলি বাদে আরও যে তিনটি বাঙালী প্রতিষ্ঠান আছে তার নাম ও বাৎসরিক উৎপাদনের একটি ছোট হিসেব নীচে দিচ্ছি :—

নাম	**বার্ষিক উৎপাদনের আনুমানিক দাম**
ক্যালকাটা গ্লাস অ্যান্ড সিলিকেট ওয়ার্কস (১৯৩৬) প্রাঃ লিঃ	৩০ লক্ষ টাকা
গীতা গ্লাস ওয়ার্কস	১২ লক্ষ টাকা
মেট্রো গ্লাস ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ	১৮ লক্ষ টাকা

এদের মধ্যে প্রথম দুটি প্রতিষ্ঠান সাধারণ শিশি-বোতল প্রভৃতি হলো-ওয়্যার-এর কারখানা। মেট্রো গ্লাসে নিউট্র্যাল অর্থাৎ অম্ল ও ক্ষারের প্রভাবমুক্ত কাচ তৈরী হয়। নিউট্র্যাল কাচে ইনজেকশনের অ্যামপিউল, ব্লাড ব্যাংকের রক্তের বোতল প্রভৃতি তৈরী হয়।

প্রাচীনতম বাঙালী প্রতিষ্ঠান ধীরেন্দ্রনাথ ও ফণীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের নিউ ইণ্ডিয়ান গ্লাস-এর বার্ষিক উৎপাদন আনুমানিক ১৯ লক্ষ টাকার।

বেংগল ল্যাম্পও এক হিসেবে কাচের কারখানা। বিজলী বাতির খোল তৈরি করেন বলে আংশিকভাবে এঁদেরও গ্লাস ফ্যাক্টরি বলতে হয়।

কৃষ্ণা গ্লাস-এর ক্রমবিকাশের রূপ নিম্নলিখিত অংকগুলি থেকেই প্রতীয়মান :—

সাল	**বিক্রি**	
১৯৪৬-৪৭	৩,৯০,০০০ টাকা	(কেবল যাদবপুরের উৎপাদন)
১৯৫৮-৫৯	২৪,১৭,০০০ টাকা	(কেবল যাদবপুরের উৎপাদন)
১৯৬৩-৬৪	১,৩৫,৪২,০০০ টাকা	(তিন কারখানার উৎপাদন)
১৯৬৬-৬৭	১,৪৬,৫০,০০০ টাকা	(তিন কারখানার উৎপাদন)

সর্বভারতীয় ১৮ কোটি টাকার কাচ বিক্রির মধ্যে এক কৃষ্ণা গ্লাস-এরই হচ্ছে ১½ কোটি টাকা; আর ৩ লক্ষ টনের মধ্যে কৃষ্ণার বার্ষিক উৎপাদন হচ্ছে প্রায় ১৮,০০০ টন।

কৃষ্ণা গ্লাস সম্বন্ধে তথ্যগুলি পেলাম এঁদের তরুণ প্রচার সচিব শ্রীশিশির গুহর কাছ থেকে।

অটোম্যাটিক মেশিনে কাচ উৎপাদন দেখার লোভে সেদিন কৃষ্ণা গ্লাসের বারুইপুর ফ্যাক্টরি পরিদর্শনে গেলাম। এই অতি আধুনিক কারখানার পরিচালনায় আছেন ম্যানেজার শ্রীসত্যরঞ্জন ঘোষ। ইনি জার্মেনী ও বেলজিয়ামে গ্লাস টেকনোলজি শিখে এসেছেন। বয়সে ইনিও তরুণ। এঁর সহকারী হিসেবে আছেন দক্ষিণ ভারতীয় গ্লাস-টেকনোলজিস্ট শ্রী এস আর সীতারাম আর আছেন চীফ এঞ্জিনীয়ার শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

অতিকায় স্বয়ংক্রিয় মেশিনগুলির বৃহত্তমটি আমেরিকান যন্ত্র। এই মেশিনে মিনিটে ৩।৪ ডজন করে শিশিবোতল তৈরি হয়। পাশের ছোট মেশিনগুলির কিছু কিছু পার্টস ছাড়া বাকী সবই এ'দের নিজস্ব মেশিনশপ-এ তৈরি। অনেকগুলি লেদ ও অন্যান্য মেশিনে ভরা এই বিভাগটিও দেখতে সুন্দর। সঙ্গে আবার একটি ঢালাই বিভাগও আছে।

নানা রঙের নানা মাপের শিশিবোতলগুলি তৈরি হয়ে বেরোতে না বেরোতেই তার মধ্য থেকে কয়েকটা তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোয়ালিটি কণ্ট্রোল বিভাগে। খারাপ জিনিস যেন খরিদ্দারের ঘরে না পৌঁছয় তার জন্যেই এই সতর্কতা।

কিন্তু সত্যরঞ্জনকে এইসব মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা বিষয়ে বিশেষ প্রশ্ন করাতে তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। সংক্ষেপে বললেন, "গত বছর থেকে এখানে গো-স্লো, স্ট্রাইক, ঘেরাও—সবই শুরু হয়েছে। একশ'-টার জায়গায় এখন মাল তৈরি হচ্ছে পঞ্চাশটা।"

কৃষ্ণা গ্লাস-এর একুশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন শান্তি চুরমার করে দিয়েছে সাতষট্টির শ্রমিক আন্দোলন আর ঘেরাও। বহুদিন ধরে যাদবপুর ও বারুইপুরের দুটি ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলাতে কৃষ্ণা গ্লাস উন্নতি করতে পেরেছিল। সেখানে আজ গজিয়েছে আরও তিনটি ইউনিয়ন—সবাই উগ্র বামপন্থী। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্টরা দুই কারখানায় নতুন দুই ইউনিয়ন গড়েছেন আর সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেণ্টার বারুইপুরে অতিরিক্ত একটি ইউনিয়ন চালু করেছেন। পাঁচ সঙ্ঘের প্রতিদ্বন্দ্বিতা রসায়ন শুধু যে কর্তৃপক্ষকে জেরবার করছে তাই নয়, শ্রমিকগোষ্ঠীকে করে তুলেছে আর এক যদুবংশ।*

গত বছর সত্যরঞ্জন একদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত ১৭ ঘণ্টা ঘেরাও হয়েছিলেন। হেড অফিস থেকে আদালতে দরখাস্ত করে পুলিশের সাহায্যে তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন শ্রমমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেউই এই অত্যাচার দমনের কোনো চেষ্টাই করেননি।

সেই থেকে কৃষ্ণা গ্লাস-এ নিরানন্দ বিরাজ করছে। সাহিত্য ও নাট্যপ্রিয় বিভূতি সরকার মশায় এবং তাঁর সহধর্মিণী কৃষ্ণা দেবীর উৎসাহে কৃষ্ণার নাটুকে দল 'মঞ্চমুগ্ধ' এ'দের যাদবপুর কারখানাতে বিশেষভাবে নির্মিত প্রকাণ্ড অডিটোরিয়ামের পারমানেণ্ট স্টেজ-এ মহা আড়ম্বরে বছর বছর যে নাটক মঞ্চস্থ করেন তাতে কৃষ্ণা দেবী, বিভূতিবাবু ও তাঁদের পরিবার এবং সহকর্মীরা সকলেই অংশ নেন। সেখানে শ্রমিক মালিকের কোনো প্রভেদ থাকে না। কৃষ্ণা গ্লাস-এর মুখপত্র 'ওরা কাজ করে' পত্রিকার সৌষ্ঠব দেখেও মুগ্ধ হলাম। কারখানার শ্রমিক এবং ওই অঞ্চলের দুস্থের সেবায় নিযুক্ত 'কুমুদনাথ সেবাকেন্দ্রে' বছরে ৪৪।৪৫,০০০ রোগী নিয়মিত চিকিৎসা হয়; এই সেবাকেন্দ্রের নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্সও দেখলাম। কো-অপারেটিভ স্টোর্স আছে, রিক্রিয়েশন ক্লাব আছে। সবই গড়ে উঠেছিল শ্রমিক ও মালিকের মিলিত চেষ্টায়।

---

* যদুবংশ এখনও তৎপর: আজ উনসত্তরের জুন মাসে কৃষ্ণা গ্লাসের আদি যাদবপুর কারখানা আবার অচল হয়েছে। দুই শ্রমিক ইউনিয়নের সংঘর্ষে কারখানায় অফিসে অগ্নিকাণ্ড হয়ে কাজকর্ম বন্ধ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নিজেই আমাকে সেদিন বললেন, যে এবারকার গোলাযোগের হেতু আন্তঃইউনিয়ন রেষারেষি—কর্তৃপক্ষের কোনো দোষ নেই। পক্ষান্তরে বিভূতি সরকার আমাকে বললেন যে এই মুহূর্তে কম্পানির হাতে এত অর্ডার, যে কারখানা চালু থাকলে এখন দিবারাত্র কাজ করেও কুল পাওয়া যেত না।

কিন্তু সাতষট্টির ওইসব নোংরা ঘটনার পরে (অবশ্য তার জন্যে কারখানা-দুটি মাত্র ৯।১০ দিনের জন্যেই বন্ধ ছিল) কৃষ্ণা গ্লাসের উৎপাদন থেকে শুরু করে জনহিতকর কাজ, সব কিছুতেই যেন ভাটা পড়ে গেছে। গত বছরে দুর্গোৎসব নমো নমো করে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর নাট্যোৎসব হয়ইনি। উৎপাদনের শ্লথতার কথা তো আগেই বলেছি। যে-সব শ্রমিক নেতারা এই সুখের সংসারে ঘৃণা ও অশান্তির বীজ বপন করেছেন, একটা বড় বাঙালী প্রতিষ্ঠানের সর্বনাশ ডেকে আনছেন, আমাদের অতীত দিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবুর মতে তাঁরা বা তাঁদের দল উপদলগুলি নাকি অ্যান্টি-ন্যাশান্যাল নয়।

জাতীয়তাবাদের এক জ্বলন্ত উদাহরণ দেখে এলাম! শোনা কথা নয়, নিজের চোখে কাগজকলমে এক অত্যাশ্চর্য ন্যাশান্যালিজমের প্রমাণ দেখে এলাম। বছরের গোড়ায় শ্রমিকদের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করে কর্তৃপক্ষ সারা বছরের কারখানা ছুটির তালিকা প্রস্তুত করেন। এবারে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি চালিত ইউনিয়ন বারুইপুরে যে লিস্ট দাখিল করেছেন তাতে ২৩ জানুয়ারী (নেতাজীর জন্মদিন), ২৬ জানুয়ারী ও ১৫ অগস্টের উল্লেখ নেই। কর্তৃপক্ষ বিস্মিত হয়েছিলেন; ভেবেছিলেন ভুল হয়েছে। কিন্তু মার্ক্সিস্ট ইউনিয়ন বললেন, না- ঠিকই আছে; ২৬ জানুয়ারী আর ১৫ অগস্ট জাতীয় দিবস নয়; আর নেতা তো অনেক ছিলেন ও আছেন; কাকে বাদ দিয়ে কার জন্মদিনে উৎসব পালন করবে লোকে?

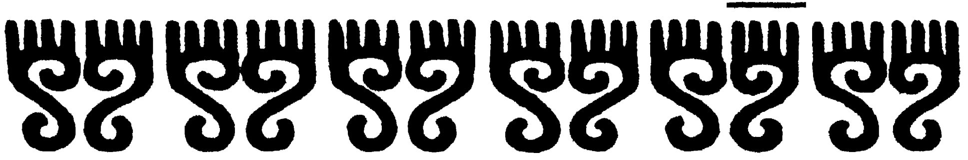
কয়েকদিন আগে কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি মশায় বলেছিলেন যে, তিনি যুক্তফ্রন্টের কোনো দলকেই 'অ্যান্টি-ন্যাশান্যাল' মনে করেন না। তবে কি 'বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'-এর বারুইপুর ইউনিট মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত নয়? সেটা কি একটা জাল ইউনিয়ন, না ভুঁইফোঁড়?

এত সত্ত্বেও আশাবাদী বিভূতি সরকার আর কৃষ্ণা গ্লাস-এর আদিকালের কর্মীরা সোদ্যমে কাজ করে চলেছেন—'ওরা' কাজ করুক বা নাই করুক।

বিভূতিভূষণ 'ডেভেলপমেণ্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল'-এর কাচশাখার চেয়ারম্যান-রূপে দলনেতা হয়ে ১৯৬২-তে আমেরিকায় বাণিজ্যিক সফর করে এসেছিলেন। ১৯৬৮ সালের গোড়াতেও ভারতীয় কাচের রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নের জন্য বিভূতিবাবু ও আর কয়েকজন শিল্পপতি মধ্যপ্রাচ্য ও সিংহলে যোগাযোগ করে এলেন। এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

অল ইন্ডিয়া গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারার্স ফেডারেশনের সভাপতিত্ব করা ছাড়াও বিভূতি সরকার মশায় 'বেঙ্গল গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রাক্তন সভাপতি। এই সঙ্ঘের বিষয়েও দু'চার কথা লেখবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কী হবে লিখে—রাজনৈতিক ও শ্রমিক নেতারা যা করে চলেছেন তাতে বাঙালীর ও বাংলার কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠানই বাঁচবে না, তায় আবার তাদের সঙ্ঘ আর তার কার্যবিবরণ!

১৫ জুন, ১৯৬৮



একুশ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী'* পত্রিকার ১ ভাদ্র, ১৩১০ সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিশেষ খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল—"সত্যসুন্দর দেব দীক্ষার্থী হইয়া জাপান গমনের পূর্বে মহর্ষির (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া এইভাবে উপদেশ দেন : তুমি ধর্মের বংশীয়। যিনি ধর্মের সেতু ও ধর্মের হেতু, সর্বতোভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হও......তুমি ধর্মপরায়ণ হইয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে ও দেশের কল্যাণসাধনে রত হইবে। আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার বিঘ্নবিপত্তি দূর হউক এবং তুমি সদুদ্যমে কৃতকার্য হও।" (আংশিক উদ্ধৃতি)।

আজকের অষ্টাশি বছর বয়স্ক মহাস্থবির শ্রীসত্যসুন্দর দেব মহাশয়ের জীবনী লেখা আর ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের 'পার্সিলেন' শিল্পের ইতিহাস রচনা প্রায় একই কথা। বর্তমানে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলা দেশে যে ক'টি উল্লেখযোগ্য পটারি আছে, তার অনেকগুলিই ভারতীয় পার্সিলেনের এই নায়ক সত্যসুন্দরের স্পর্শধন্য। ভারতের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম 'বেঙ্গল পটারিজ্ লিমিটেড'-ও তাঁরই হাতে গড়া। ১৯০৩ সাল থেকে শুরু করে সত্যসুন্দরের ৬০ বছর বিস্তৃত কর্মজীবনের সংক্ষিপ্তসার নীচে লিপিবদ্ধ করছি।

১৯০৩—১৯০৫.. জাপানের টোকিও শিল্পবিদ্যালয় ও কিয়োটো সেরামিক গবেষণাগারে শিক্ষালাভ। জাপানে অন্যতম প্রথম ভারতীয় ছাত্র।

১৯০৬ .মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের উদ্যোগে স্থাপিত ভারতের প্রথম পটারি 'ক্যালকাটা

* ধর্মসম্প্রদায়বিশেষের মুখপত্ররূপে সাময়িক পত্রিকা তত্ত্বকৌমুদী একাদিক্রমে ৯০ বছর নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশের গৌরব করতে পারে। ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ২ জ্যৈষ্ঠ অর্থাৎ ১৫ মে, ১৮৭৮-এ প্রথম প্রকাশের পর বহু দশক ধরে এর চেহারা ছিল একই রকম; বিশেষ আকর্ষণীয় প্রকাশনা ছিল না। কয়েক বছর আগে খ্যাতনামা সংকলয়িতা ও সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন-এর সুদক্ষ পরিচালনায় পত্রিকাটির প্রকাশন সৌষ্ঠবের দিকে শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

শ্রীসত্যসুন্দর দেব
ভারতে পার্সিলেন শিল্পের পথিকৃৎ,
২৬/৩, গড়িয়াহাট রোড
কলিকাতা ১৯

পটারি ওয়ার্কস'-এর বিশেষজ্ঞ ও জেনারেল ম্যানেজার পদে নিয়োগ। (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আত্মজীবনীতে সত্যসুন্দরের কার্যাবলীর সুদীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি দৈনিক 'বেঙ্গলী' কাগজের ১৬ আগস্ট, ১৯০৬ সংখ্যাতেও ক্যালকাটা পটারি এবং সত্যসুন্দরের বিষয়ে বিশেষভাবে লিখিত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল)।

১৯০৯—১৯১০...চীন ও জাপানের মৃৎশিল্পে অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভের জন্য দ্বিতীয়বার বিদেশ যাত্রা।

১৯১১—১২...ব্রহ্মদেশের ইনসিনে অবস্থিত বার্মা পটারি ওয়ার্কস-এ বিশেষজ্ঞের পদে নিয়োগ।

১৯১৩—১৪...ইয়োরোপ যাত্রা। জার্মেনী ও ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ গবেষণাগার ও পটারিতে শিক্ষা ও চাকরি।

১৯১৬—১৭...মহীশূর ও বরোদা-রাজের আমন্ত্রণে স্থানীয় পটারি স্থাপনা এবং চায়না-ক্লের খনি বিষয়ে উপদেষ্টার পদে নিয়োগ।

১৯১৯...কলকাতায় সদ্যপ্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল পটারিজ্ লিমিটেড'-এর ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার পদে নিয়োগ।

১৯২৭...বিহার প্রদেশে 'বিহার পটারিজ্ লিমিটেড'-এর স্থাপনা।

১৯২৮...'ইণ্ডিয়ান সেরামিক সোসাইটি'র প্রথম সভাপতি পদে নির্বাচিত।

১৯২৯...ত্রিবাংকুর ও কোচিন-রাজের আমন্ত্রণে উপদেষ্টারূপে ত্রিবাংকুরের কুন্দারা নামক স্থানে চায়না-ক্লে খনি বিষয়ে এবং কোচিনের চালুকুড়িতে সরকারী 'পটারি' স্থাপনা বিষয়ে পরামর্শদান।

১৯৩০—৩১...মহীশূরের মল্লেশবরমে সরকারী পর্সিলেন ইনসুলেটার কারখানা স্থাপনার তত্ত্বাবধায়ক পদে নিয়োগ।

১৯৩৭—৩৮...বাংলা সরকারের অনুরোধে বেলঘরিয়াতে 'আর্ট অ্যাণ্ড ইউনাইটেড পটারিজ্'-এর স্থাপনা ও পরিচালনা।

১৯৩৯...বেলঘরিয়াতেই 'বেঙ্গল পর্সিলেন কোং লিমিটেড'-এর স্থাপনা ও পরিচালনা।

১৯৫২—৫৪ বোম্বাইয়ের 'নবভারত পটারিজ্'-এর স্থাপনায় সহায়তা এবং পরিচালনা।

১৯৫৮—৬০...রাঁচী শহরের নিকটস্থ রাই নামক স্থানে 'রাই রিফ্র্যাকটরিজ লিমিটেড'-এর স্থাপনা ও পরিচালনা।

ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের নিবাস চব্বিশ পরগনার ন্যাতড়ার কাছে কর্ণপুর গ্রামটি হলো সত্যসুন্দরের দেশ। তাঁর পিতৃদেব ত্রৈলোক্যনাথ দেব মশায় ছিলেন ভারতবর্ষের কাঠ-খোদাই ব্লকের এক প্রাচীনতম শিল্পী। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় ভারতবর্ষে আধুনিক ব্লক-মেকিং প্রবর্তন করার আগে পর্যন্ত গ্রন্থচিত্রণের একমাত্র উপায় ছিল এই উড-এনগ্রেভিং। আজ থেকে ১১০/১৫ বছর আগে ত্রৈলোক্যনাথ এই উড-এনগ্রেভিং-এর কাজ করতেন এবং উপেন্দ্রকিশোর মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ার আগে বাংলা দেশের উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক ও পত্রপত্রিকার প্রায় সব ছবিই ছিল ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পকর্ম।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পৌরোহিত্যে হিন্দুমতে বিবাহের কিছু কাল পরে ত্রৈলোক্যনাথ ও তাঁর পত্নী বিরাজমোহিনী দেবী উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ প্রচারকদের অনুপ্রেরণায় ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন আচার্য শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (উত্তরকালের বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু) এবং সপরিবার ত্রৈলোক্যবাবু কলকাতার ঝামাপুকুর অঞ্চলের একটি বাড়িতে একই সঙ্গে বসবাস করতেন। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত অর্থাৎ পরবর্তীকালের স্বামী বিবেকানন্দ মাঝে মাঝে বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে ঝামাপুকুরের সেই বাড়িতে পদধূলি দিতেন। এ হলো বিজয়কৃষ্ণের ধর্মান্তর ও নরেন্দ্রনাথের রামকৃষ্ণ-শিষ্যত্ব গ্রহণের আগের কথা। ব্রাহ্মভাবাপন্ন নরেন্দ্রনাথ নিয়মিত ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় যোগ দিতেন।

সত্যসুন্দর নামটি আচার্য বিজয়কৃষ্ণের দেওয়া। সত্যসুন্দর বড় হয়ে তাঁর মায়ের কাছে এ ও শুনেছিলেন যে, রামকৃষ্ণদেব তাঁদের ঝামাপুকুরের বাড়িতে এলেই শিশু সত্যসুন্দরকে কোলে নিয়ে বসতেন। আর নরেন্দ্রনাথ এলেই বিরাজমোহিনী তাঁকে গানের ফরমাশ করতেন এবং নরেন্দ্রনাথ তাঁর উদাত্ত সুরেলা গলায় গানের পর গান গেয়ে শোনাতেন।

এ এক অশ্রুতপূর্ব সমন্বয় ও পরিবেশ। সত্যসুন্দর আমাকে অতি প্রাচীন একটি বাঁধানো খাতা দেখতে দিলেন। মা বিরাজমোহিনীর নিজের হাতের লেখা সত্তর-আশি বছরের আগেকার একটি ডায়েরী। বিরাজমোহিনী ভালো বাংলা জানতেন এবং চলনসই ইংরেজীও শিখেছিলেন। আর কী সুন্দর তাঁর হাতের লেখা! কালি চোপসানো একটি পাতায় মুক্তাক্ষরে লেখা আছে : "শিশু সন্তানদের সরল প্রাণে যে সাধুতার বীজ পড়েছিল, কালে তাতে মধুময় ফল লাভ করিয়াছি।"

এমনি এক সুন্দর ছেলেবেলার পরে সত্যসুন্দর বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে।

এক্সপার্ট হিসেবে শ্রীসত্যসুন্দর দেব হলেন ভারতীয় পার্সিলেন শিল্পের অবিসংবাদিত পথিকৃৎ। অবশ্য সত্যসুন্দর যোগ দেবার আগেই ভারতের প্রথম পার্সিলেন ফ্যাক্টরি 'ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'লাইফ এণ্ড এক্সপিরিয়েন্স অব এ বেঙ্গলি কেমিস্ট' (চক্রবর্তী চ্যাটার্জি, ১৯৩২) বইটিতে দেখতে পাচ্ছি যে, কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ সেন (অধুনা কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সেনের পিতামহ) এবং তাঁর কনিষ্ঠ স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ সেন (নিউ ইণ্ডিয়ান গ্লাস ওয়ার্কসের শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেনের পিতা)—এই তিনজনের মিলিত চেষ্টায় ১৯০১ সালে 'ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস'-এর স্থাপনা হয়েছিল। কিন্তু প্রথমটায় এক অপটু ব্যক্তির পরিচালনায় সেই অতি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাতেই প্রচুর লোকসান হয়ে যায়। সত্যসুন্দর এই প্রতিষ্ঠানের কার্যাধ্যক্ষ পদে যোগ দেন ১৯০৬ সালে জাপান থেকে ফিরে।

বাঙালীর প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের জনকল্যাণমূলক কীর্তি সকলেরই মোটামুটি জানা আছে। বাংলার শিল্পোন্নতির জন্যেও তিনি নানা প্রচেষ্টাতে অর্থ

বিনিয়োগ করে নিজে একাই যেন একটি ফিনান্সিয়্যাল কর্পোরেশন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। উক্তিটি আমার নয়। এটি সি. জি. সি. আর. আই. অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কাচ ও সেরামিক গবেষণাগারের 'গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক বুলেটিন'-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের মূল বক্তব্য (১৯৬৫-র দ্বাদশ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। ক্যালকাটা পটারি স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজা স্যার মণীন্দ্র এবং তাঁর তিনজন অংশীদার মিলে একটি চায়না-ক্লে'র খনি নিয়ে 'রাজমহল কোয়ার্টজ, স্যান্ড অ্যান্ড ক্যাওলিন কোং' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করেন। তারপর ১৯১৯ সালে বিহার সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নিয়ে সিংভূম অঞ্চলে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত করেন বর্তমানে তার নাম 'মহারাজা কাশিমবাজার চায়না-ক্লে মাইনস'। বিদেশী বিশেষজ্ঞের সাহায্যে বহু অর্থব্যয় ও দুস্তর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মণীন্দ্র নন্দী মহাশয় এই কম্পানিটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। এই বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে তিনি কয়েকটি বাঙালী যুবককে বৃত্তি দিয়ে বিদেশেও পাঠিয়েছিলেন। আজ এই বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের চীনেমাটি কাপড়ের কল, পটারি, রাবার শিল্প, রঙ তৈরি, ওষুধ তৈরি প্রভৃতি বিবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। স্যার মণীন্দ্রের স্বনামধন্য সাহিত্যিক পৌত্র মহারাজকুমার সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী এখন এর কর্তা।

সম্প্রসারণের জন্য মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালে 'ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস'-কে লিমিটেড কম্পানিতে পরিণত করা হলো। নামটিও বদলে এর নতুন নামকরণ হলো 'বেঙ্গল পটারিজ্ লিমিটেড'। ঠিকানা একই রইলো—৪৫নং ট্যাংরা রোড। (বর্তমান বিরাট ফ্যাক্টরীটি এখনও সেখানেই অবস্থিত)। পরিচালনারও পরিবর্তন হলো। পি এন দত্ত এবং এস এন দত্ত নামে দুই ভাই এর ভার নিলেন। সেই ম্যানেজিং এজেন্সী কম্পানির নাম ছিল 'পি এন দত্ত অ্যান্ড কোং'।

কিন্তু এত করেও শেষ পর্যন্ত বেঙ্গল পটারিজ বাঙালীর হাত থেকে বেরিয়ে গেল ১৯৩২।৩৩ সালে। সত্যসুন্দর দেবের হাতে গড়া বেঙ্গল পটারিজ আজ বছরে প্রায় ৩২ কোটি টাকার মাল বিক্রি করে। আমাদের ঘরে ঘরে আজ এই প্রতিষ্ঠানের বাসন শোভা পাচ্ছে। এখন এঁরা উন্নত ধরনের বোন চায়নার (হাড়ের গুঁড়ো মিশ্রিত) বাসনও তৈরি করেন।

প্রায় ২৫০০ বছর আগে বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এর একটি বাক্য : Then I went down to the Potter's house and behold he was making a work on the wheels. (জেরেমিয়া-র অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ থেকে উদ্ধৃত)।

কিন্তু বাইবেলের যুগ হলো মৃৎশিল্পের যৌবনকাল। মৃৎশিল্প বা পটারি-র আনুমানিক জন্ম সময় হলো প্রস্তর যুগের শেষ ভাগ, অর্থাৎ এখন থেকে ৬।৭ হাজার বছর আগে। চীন দেশেই এর উৎপত্তি—যে চীন আমাদের কাগজ দিয়েছে, আর দিয়েছে আমাদের গৈরিক-সুধা, যাকে আপনারা বলেন 'চা'। (চীন আবার আমাদের এখন দিয়েছে নকশাল-তন্ত্র)।

চৈনিক মৃৎশিল্পী বোধ হয় প্রথমে করেছিলেন স্টোনওয়্যার অর্থাৎ কালো ফায়ার-ক্লে জাতীয় মাটির তৈরী বাসন। এখনো আমরা সস্তা কাফে রেস্তোরাঁ-তে যেসব মোটা পেয়ালা পিরিচ ব্যবহার করি, কখনো যদি তার ভাঙা টুকরোর ভিতরটা পরীক্ষা করেন তো দেখবেন

তা সরন্ধ্র এবং অসমান কালচে পোড়ামাটি। এটা হলো স্টোনওয়্যার-এরই জাত। আর করেছিলেন লাল মাটি পোড়ানো আর্থেনওয়্যার এবং মেজলাইকা। তাঁদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো সম্পূর্ণ চায়না-ক্লে'-র তৈরী দুগ্ধফেননিভ দামী চায়নাওয়্যার।

ভারতবর্ষ-ও যে বেশী পিছিয়ে থাকেনি তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি হাজার পাঁচেক বছর আগেকার মৃত জনপদ মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত উচ্চমানের মৃৎপাত্রের নমুনা দেখে। মিশরেও তাই।

পারস্যের উজ্জ্বল নীল ও সবুজ রঙের মৃৎপাত্রের জন্মকাল হলো খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক নাগাদ। একাদশ শতাব্দীর নৈশাপুরে জ্যোতির্বিদ কবি ওমর খৈয়াম যে পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিন কাটাতেন আর সাকী যে পাত্র থেকে সেই পেয়ালায় সুরা ঢেলে দিত, মনে হয় তার দুটোই ছিল সেই ইরানী পার্সিলেন।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও পার্সিলেনের প্রচলন ছিল। ক্রমশ সারা ইয়োরোপে এবং ব্রিটেনেও তা ছড়িয়ে পড়লো।

ইয়োরোপের পার্সিলেন এখন বোধ হয় সবচেয়ে ভালো। তার কারণ হলো যে, সেখানে পৃথিবীর সেরা চায়না-ক্লে খনির চীনেমাটি দিয়ে গবেষণাজাত উন্নত প্রণালীতে পার্সিলেন নির্মিত হয়। চেকোস্লভাকিয়ার কার্লোভি-ভেরি অঞ্চলের জেটলিটশার জায়গাটিতে পৃথিবীর সর্বোত্তম চীনেমাটি পাওয়া যায়। তারপরেই হচ্ছে ফ্রান্সের লিমোজের নিকটস্থ সেন্ট ইরিজের খনির আর ইংল্যান্ডের কর্ণওয়ালের খনির মাটি। সত্যসুন্দরবাবুর মতে আমাদের কেরল ও রাজমহলের চীনেমাটির গুণ এর ধারেকাছেও নয়।

কিন্তু ইয়োরোপীয় পার্সিলেন এখন যত ভালোই হোক না কেন, আসল হার্ড-পেস্ট অর্থাৎ খাঁটি (ট্রু) পার্সিলেন আবিষ্কারের কৃতিত্ব হলো সপ্তম থেকে নবম খ্রীষ্টীয় শতকের চৈনিক মৃৎশিল্পীর। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চৈনিকদের মন্ত্রগুপ্ত এর নির্মাণকৌশল চীনেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল। সেই বছর য়োহান বটগার নামে এক জার্মান মৃৎশিল্পী তাঁর ড্রেসডেন শহরের কারখানাতে এর গুপ্ত কৌশলটি বের করে ফেললেন। তাঁর কারখানার কর্মীরাই পরে সারা ইউরোপে এর প্রচলন করে দেন। ড্রেসডেন চায়না ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

সত্যসুন্দরের কাজের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রতিষ্ঠান গড়ে যাওয়া—একের পর এক, তারপর আর এক। আরম্ভেই দেখিয়েছি যে, ভারতের মৃৎশিল্পকুলের এই পিতামহ 'ক্যালকাটা' ও 'বেঙ্গল' ছাড়া বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘ সম্বন্ধ রাখেননি। যদি রাখতেন তাহলে তাঁর ব্যক্তিগত উপার্জন ও সঞ্চয় হয়ত অনেক হতো, কিন্তু তাতে ভারত-বিস্তৃত পার্সিলেন শিল্পের প্রবর্তন ও সমৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটতো—সত্যসুন্দরের সাধনা ব্যতিরেকে অন্য দশজনের লক্ষ্মীলাভ হতো না।

সায়ান্টিস্ট ও টেকনিশিয়ান আবিষ্কার করেন, অর্থনীতিবিদ্ উপার্জন ও সঞ্চয়ের পথ-নির্দেশ দেন, আর তার সুযোগ নিয়ে অন্যে হয় ধনপতি—এই-ই হলো সাধারণ নিয়ম।

এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো বাঙালীর, তথা সত্যসুন্দর দেব মহাশয়ের সাধনা। পার্সিলেন শিল্পে কিন্তু মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র বা আর কারোই, যাকে বলে লক্ষ্মীর কৃপালাভ

তা হয়ে ওঠেনি। অনেক বাঙালী পটারি-মালিকই লাভ করতে না পেরে সরে এসেছেন, আর যাঁরা আছেন তাঁদের প্রতিষ্ঠানও বিরাটত্বের মহিমা অর্জন করতে পারেনি।

এই প্রসঙ্গে সত্যসুন্দরের সমসাময়িক স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কথাও উল্লেখ্য। দেবমহাশয়ের জাপান যাবার কয়েক বছর পরে দীনেশবাবুও সে দেশ থেকে পর্সিলেন শিল্পে পারদর্শিতা লাভ করে এসেছিলেন। তিনি বেশী কাজ করেছিলেন সাদা ও রঙীন আর্থেনওয়্যার পটারির ওপরে। গোয়ালিয়র-রাজ প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত 'গোয়ালিয়র পটারিজ্' দীনেশ-চন্দ্রেরই অবদান।

বাঙালীর মধ্যে এ'দের পরেই উল্লেখযোগ্য হলো সত্যসুন্দরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসরল দেব-এর নাম। তিনি পিতার ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। প'য়ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সরল দেব ও ভারতীয় মৃৎশিল্পের এক মহোপাধ্যায়। প্রায় চব্বিশ বছর বাঙালী প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল পর্সিলেন প্রাইভেট লিমিটেডে জড়িত থাকার পর সরলবাবু এখন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'অ্যাসোসিয়েটেড পর্সিলেন প্রাঃ লিঃ' নামে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি পটারির ডিরেক্টর হিসেবে পরিচালনা করছেন। কিন্তু ক্রোড়পতি পটারি-মালিকের চেয়ে কোনো অংশে এই পর্সিলেন-পণ্ডিত সরল দেবের সম্মান এই শিল্পের জগতে কম নয়।

কেবল বাণিজ্যেই নয়, সরল দেব কিছু দিন আগে পর্যন্ত প্রাচ্যের কয়েকটি দেশের রোটারি ক্লাবের সর্বোচ্চ আসন 'ডিস্ট্রিক্ট গবর্নর'-এর পদ অলংকৃত করেছিলেন। কুশলী ক্রিকেটার হিসেবে যৌবনে তিনি ও তাঁর বিখ্যাত কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমিয় (কানি) দেব মোহনবাগান ক্লাব-এর নামী খেলোয়াড় ছিলেন। অবশ্য ফুটবলার হিসেবেই অমিয়ের খ্যাতি বেশী ছিল। সরলবাবুর আর দুই ভাই, শিশির ও সুশান্ত দেবও কৃতী ক্রীড়াবিদ্ ছিলেন এবং এখন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জয়ন্ত হকি ও ক্রিকেটে খ্যাতি অর্জন করেছেন। খেলাতেও যে এই পরিবারের মহান ঐতিহ্য আছে, সে কথাটি না জানিয়ে পারলাম না। আর আছে সঙ্গীতচর্চাতে। এ বাড়ির কনিষ্ঠবধু অসীমা দেবী 'গীতশ্রী' উপাধি-ভূষিতা এবং কন্যা সবিতা দেবী ও সত্যসুন্দরের নাতিনাতনী সকলেই সুকণ্ঠের অধিকারী।

ত্রিশ দশকের বাংলার ব্রিটিশ রাজ্যপাল স্যার জন অ্যাণ্ডারসন মুক্ত রাজবন্দীদের ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনীতি থেকে সরিয়ে এনে পুনর্বাসন করার উদ্দেশ্যে বাংলার তদানীন্তন ডিরেক্টর অব ইণ্ডাস্ট্রিজ সতীশ মিত্র মশায়ের পরামর্শে সরকারী সাহায্যে 'আর্ট অ্যাণ্ড ইউনাইটেড পটারিজ্' নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়ে দেন, শ্রীসরল দেব ছিলেন তার 'টেকনিক্যাল এক্সপার্ট'। কতিপয় মুক্ত রাজবন্দী ছিলেন এর যৌথ মালিক।

সম্পূর্ণভাবে বাঙালীর মালিকানায় এখন যে-সমস্ত পটারি চালু আছে, শ্রীসরল দেব মহাশয়ের সাহায্যে তার একটি তালিকা সংকলন করেছি।

প্রতিষ্ঠানের নাম		বর্তমান কর্মকর্তা বা স্বত্বাধিকারী
বেঙ্গল পার্সিলেন প্রাঃ লিঃ	—	শ্রীইন্দুভূষণ বিদ
ইণ্ডিয়া পটারিজ্ লিমিটেড	—	শ্রীসুধীর ঘোষ
অ্যালায়েড সেরামিক্স প্রাঃ লিঃ	—	শ্রীসুবোধ ঘোষ
হিন্দুস্থান পটারিজ্	--	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাঁ
বি. ডি. সেরামিক্স	--	শ্রীপ্রাণগোপাল দত্ত
নান পটারিজ্	--	শ্রীসুধীর নান
আরকো সেরামিক্স	--	শ্রীসুশীল রায়
আর্ট পটারিজ্ প্রাঃ লিঃ	--	শ্রীসেনগুপ্ত ও শ্রীসাহা

এঁরা টেবলওয়্যার মানে বাসনপত্র, স্যানিটারিওয়্যার অর্থাৎ ওয়াশ-বেসিন, প্যান, কমোড ইত্যাদি, এবং বিদ্যুৎ সরবরাহে জরুরী ইনসুলেটর, ফিউজ, ক্লীট, রীল প্রভৃতি নানা শ্রেণীর পার্সিলেন তৈরি করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা ও সংকট সত্ত্বেও এঁদের মালের চাহিদা আছে প্রচুর। কিন্তু একদা বাঙালীর সম্পত্তি বেঙ্গল পটারিজের বার্ষিক ৩½ কোটি টাকার বিক্রির সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না।

ওপরে যাঁদের নাম করলাম, তাঁরা তৈরি করেন, যাকে বলে আটপৌরে কাজের জিনিস; কিন্তু সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে যাঁরা আমাদের নিত্যপ্রয়োজনের জিনিসকে নয়ন-ভুলানো রূপ দেন, সেইসব কারুশিল্প প্রতিষ্ঠানের পথিকৃৎ ছিলেন স্বর্গীয় রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। তাঁর প্রচেষ্টায় বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে চীনেমাটির বদলে লালমাটি পুড়িয়ে সুন্দর চিত্রিত সব আর্থেনওয়্যার তৈরি শুরু হয়েছিল, যত দূর মনে পড়ে, ত্রিশ দশক থেকেই।

এখন সারা ভারতে এই আর্ট পটারির প্রচলন হয়েছে। কলকাতার বর্তমান আর্ট-পটারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'কলেজ অব সেরামিক টেকনোলজি'র অধ্যাপক শ্রীআশিস জানা ও তাঁর সহধর্মিণীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'ভ্যালির সারামিক্ দ্য আর্ট' প্রতিষ্ঠানটির নাম। এঁরা এবং আরও দু'চারটি প্রতিষ্ঠান শ্রীনিকেতনের চাইতে উন্নততর আধুনিক পদ্ধতিতে চায়ের সরঞ্জাম, ফুলদানি, ছাইদানি, পুতুল ও আরও নানা রকম সুন্দর সুন্দর জিনিস করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প অধিকারের সেরামিক বিভাগের কর্তা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর শ্রীজ্যোতির্ময় সান্যালের কাছ থেকে যে ক'টি জ্ঞাতব্য তথ্য পেলাম, আংশিকভাবে তাও আমি এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

কলকাতার পূর্বাঞ্চলে পাগলাডাঙাতে অবস্থিত পুরনো সরকারী গবেষণাগার 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ল্যাবরেটরি'র সেরামিক বিভাগটির (সরল দেব মহাশয়ও এককালে এর ছাত্র ছিলেন) নাম বদলে ১৯৪১ সালে 'বেঙ্গল সেরামিক ইনস্টিটিউট' গঠিত হয়। ১৯৬২-তে পুনর্বিন্যাসের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এই শিক্ষায়তনটির নাম হয়েছে 'কলেজ অব সেরামিক টেকনোলজি'। এখন প্রায় ৫০ জন ছাত্র এই কলেজে বি এস-সি টেক (সেরামিক্স)-এর চার বছরের কোর্সে শিক্ষালাভ করছেন। শ্রীশশধর রায় এই কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ।

জ্যোতির্ময়বাবু বললেন যে, তাঁদের ডায়রেকটোরেট কলকাতা ও শহরগুলির প্রায় ৮০টি ক্ষুদ্র মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠানকে সস্তা পেয়ালা-পিরিচ থেকে বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর প্রভৃতি বিবিধ পণ্য নির্মাণে যান্ত্রিক সহায়তা করেন। তা ছাড়াও এই শ্রেণীর কোনো কোনো কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারি পটারিগুলির কাছ থেকেও অনুরূপ সাহায্য নেন। সরল দেবও বললেন যে, এইসব ছোট ছোট ১০।১২ জন কর্মী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেশ কয়েক হাজার পুরুষ ও মহিলার (বিশেষ করে বাস্তুহারার) অন্নসংস্থান হয়।

বিশ্ববিখ্যাত 'বাঁকুড়ার ঘোড়া'র উৎপত্তির স্থান সোনামুখীর ২০০/৩০০ পরিবারের এবং মাটির পুতুল ও প্রতিমা তৈরির আদি জায়গা কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি অঞ্চলের শ' তিনেক মৃৎশিল্পী পরিবারের কথা জ্যোতির্ময়বাবু বিশেষ করে উল্লেখ করলেন। কলকাতার কুমারটুলি অঞ্চলের প্রসিদ্ধ মৃৎশিল্পীদের বিষয়ে ডায়রেকটোরেট থেকে সঠিক কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া গেল না।

বছর খানেক আগে শ্রীসরল দেব সি. জি, সি, আর, আই-এর বিশেষ একটি অনুষ্ঠানে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সারাংশ অনুধাবন করলেই ভারতবর্ষের সেরামিক শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়।

প্রথমেই বলা দরকার যে, এ দেশের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র মৃৎশিল্পে খুব কম করেও ১ লক্ষ শ্রমিক ও কর্মীর অন্নসংস্থান হয়। সরলবাবুর বক্তৃতার অন্তর্ভুক্ত পরিসংখ্যানে বৃহৎ শিল্পের মোট কর্মিসংখ্যার যে হিসেব দেওয়া আছে তাতে সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫,০০০-এ। তার মধ্যে কুড়ি হাজারেরও বেশী লোক খাটছে গ্লেজড্ টাইলস (চীনেমাটির টালি) এবং সাধারণ রানীগঞ্জ বা কোটরাং-এর লালমাটির টালি নির্মাণে। উপরন্তু ফায়ারব্রিকস্ ইত্যাদি ফার্নেসের মালমশলা তৈরিতে খাটছে প্রায় ৩০,০০০ লোক। বৃহৎ শিল্পের শ্রমিক ও কর্মীরা প্রায় ২½ কোটি টাকা মাইনে পান সারা বছরে। বার্ষিক জাতীয় উপার্জনের মধ্যে কেবল মৃৎশিল্পের আয় (ফায়ার-ব্রিক্স ও টালি-সহ) হলো ১৪ কোটি টাকা আন্দাজ। গত বছর দশেকের মধ্যে উৎপাদন কিভাবে বেড়ে গেছে তার একটা ছোট হিসেব পাচ্ছি স্যানিটারিওয়্যার-এর বেলায়। ১৯৫৬ সালে ভারতে এই বস্তুটি উৎপাদিত হয়েছিল ২৮০০ টন আন্দাজ, আর আজ হচ্ছে ১২,০০০ টনেরও বেশী। চীনেমাটির টালি তৈরি হচ্ছে আন্দাজ ৭০০০ টন। পেয়ালা-পিরিচের উৎপাদন বৃদ্ধির হিসেব আর নাই দিলাম। সরলবাবু বলেছেন যে, রপ্তানি কিছুটা বাড়াতে পারলে শীঘ্রই এমন অবস্থা হবে যে, বেঙ্গল পটারির মতো ১৫টি বৃহৎ পটারি বাজারে মাল যুগিয়েও কুলিয়ে উঠতে পারবে না। ভারতীয় টেবল-ওয়্যার ২৩টি দেশে রপ্তানি হয়েছে এবং স্যানিটারি-ওয়্যার হয়েছে ৭টি দেশে। বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসেবে অনতিবিলম্বে ভারতেই প্রায় ৪০ কোটি পেয়ালা-পিরিচের চাহিদা হবে বলে সরলবাবু মনে করেন; এখন সেখানে মাত্র ৫½ কোটি আন্দাজ তৈরি হচ্ছে।

সমস্যার মধ্যে সর্বপ্রথম হলো পর্যাপ্ত পরিমাণ চীনেমাটির সহজ সরবরাহ। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের ১০ লক্ষ টন চায়না-ক্লের প্রয়োজন। তার ব্যবস্থা আমাদের নেই—ভালো কোয়ালিটির তো প্রায় নেই-ই। দেশী চীনেমাটির দামও বেড়ে যাচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

১৯৬৫-তে যে 'রাজমহল'-এর দাম ছিল ১৬৫ টাকা টন, এখন তা এসে দাঁড়িয়েছে ২৩০।২৪০ টাকা টনে। তা বাদেও আমাদের প্রচুর ভালো কোয়ালিটির চায়না-ক্লে ইমপোর্ট করতে হয়। মজার কথা যে, তার দাম নাকি পড়ে নিকৃষ্টতর দেশী ক্লের চাইতে কম। চীনেমাটি ছাড়াও পার্সিলেন শিল্পে লাগে কোয়ার্টজ, ফেল্ডস্পার, প্ল্যাস্টিক-ক্লে, ফায়ার-ক্লে, প্রভৃতি, আর লাগে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের জন্য (ইনসুলেটর ইত্যাদি) আবশ্যিক তামা, পেতল, দস্তা, সীসা প্রভৃতি ধাতু। আমাদের আবার এই ধাতুগুলির বিশেষ অভাব। কিন্তু সেই অভাব মেটাবার সাধ্য আমাদের সরকারের আছে কোথায়?

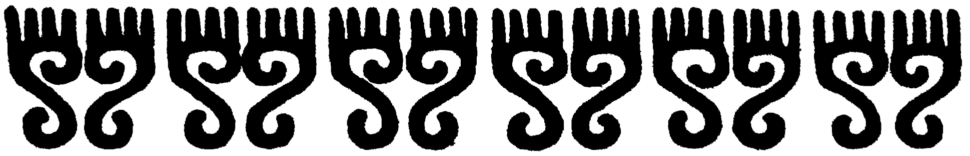
আর বেশী পরিসংখ্যান নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। মূল তত্ত্বটি আমরা এখন ভালো করেই বুঝতে পেরেছি; অবিলম্বে আমাদের পার্সিলেন শিল্পের বিরাট সম্প্রসারণের প্রয়োজন।

কিন্তু মহামান্য সরকার বাহাদুর কি এ বিষয়ে অবহিত? না বোধ হয়—সরকারের অত সময় কোথায়? কি দক্ষিণ, কি বামপন্থী, আমাদের নেত্রী ও নেতাদের সকলের পেয়ালায় ভরা আছে শুধু রাজনীতির আরক। সেই সুরাসারের তীব্র নেশায় চুর হয়ে যমুনা-গঙ্গার তীরে বসে নেতারা আমাদের ছন্দহীন 'রুবাই'-এর গুচ্ছ উপহার দিচ্ছেন বক্তৃতা আর পত্রিকার মাধ্যমে।

বলিহারি সত্যসুন্দরের ভাগ্য! তিনি ঊনবিংশ শতকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোলে বসেছিলেন, আবার এই বিংশ শতকে দেখে যাচ্ছেন আজকের মহাভারতে নিবাতকবচ-কুলের পুনর্জন্ম।

২২ জুন, ১৯৬৮





বাইশ

হৈমবতীর ব্যগ্র আহ্বানে কিশোরী সখীর দল ছুটে এসে ছাদের আলসের ওপর ঝুঁকে পড়লো। পথ দিয়ে অতি সুন্দরকান্তি এক যুবাপুরুষ চারিদিক নিরীক্ষণ করতে করতে ধীর পদে হেঁটে চলেছেন। গৌরবর্ণ উন্নতনাসা মুখমণ্ডলে অনুসন্ধিৎসা। মনে হয় বিদেশী অভ্যাগত। প্রাংশু সুঠাম দেহ; নগ্নবক্ষের পেশী পদক্ষেপের তালে তালে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হচ্ছে। স্কন্ধে আলম্বিত উত্তরীয়ের আড়ালে উপবীত দেখা যাচ্ছে।

হৈমবতী ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপরেই বিম্বাধরে কৌতুকের হাসি ফুটিয়ে সখীদের বললেন, "বাবা তো দেশময় পাত্র খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন; এদিকে যে আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমার আঙিনা দিয়া!"

সখীরা এ-ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে খিল-খিল করে হেসে উঠলো। (অবশ্য যুবক বহু পূর্বেই দৃষ্টির বাইরে চলে গেছেন)। মনোরমা হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, "চল্ দামিনি, রানীমাকে খবর দিই গিয়ে—হৈম আমাদের স্বয়ংবরা হতে চায়।"

দামিনী বললো রানীমাকে, আর রানীমা বললেন কর্তামশায়কে। খবর আনলেন পূজারি ঠাকুর, যুবকের নাম মাণিকলাল মুখোপাধ্যায়, দেশ বর্ধমান, পালটি ঘর, জীবিকান্বেষণে বেরিয়েছেন। সবই ভালো, কিন্তু তিনি বিবাহিত এবং এক স্ত্রী বর্তমান।

তবুও বাকুলিয়ার জমিদার বাড়িতে মাণিকলালের ডাক পড়লো। সৎপাত্রের সন্ধান করতে করতে রূপসী কন্যা হৈমর আজ চৌদ্দ বছর বয়স হলো। কুলীন কুল হলেও আর তো অপেক্ষা করা যায় না। তাছাড়া দুলালীর নিজের মনে যখন ধরেছে—প্রস্তাব শুনে মাণিকলাল অসম্মতি জানালেন। তিনি বহু বিবাহের বিরোধী। দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার মহাশয় এবারে মাণিকলালের হাত দুটি ধরে মিনতি করলেন। বললেন, মাণিকলাল সম্মত হলে বিষয়আশয়ও দেবেন। মাণিকলাল আসন থেকে উঠে বললেন, "বেশ তাই হোক, কিন্তু এক শর্তে—বছরের ছ'মাস আমি এখানে থাকবো আর বাকি ছ'মাস থাকবো বর্ধমানে নিজ গ্রামে, প্রথমা পত্নীর কাছে।"

শঙ্খ বেজে উঠলো, পুরনারীরা হুলুধ্বনি দিলেন। হুগলি জেলার বাকুলিয়া গ্রামের প্রখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশের উৎপত্তি হলো।

মূল কাহিনীটি সত্য ঘটনার সংক্ষেপ; তবে আঙ্গিকে সম্পূর্ণতা আনার জন্য আমার দ্বারা কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত। মনোরমা ও দামিনীর সংলাপ আমার কল্পনাপ্রসূত। হৈমবতীর উক্তিটিও।

অতিবৃদ্ধপিতামহ-পিতামহীর এই দুষ্মন্ত-শকুন্তলা পর্বটি সরসভাবে বললেন, বাকুলিয়ার মুখোপাধ্যায় বংশাবতংস এবং বাঙালীর আদি প্রতিষ্ঠান জি-ডি-ব্যানার্জি অ্যান্ড কোং লিমিটেড-এর বর্তমান কর্তা শ্রীমোহনকুমার মুখোপাধ্যায় এবং তস্য পিতৃব্যপুত্র প্রিয়ভাষী শ্রীনীরদগোপাল। নীরদবাবু হলেন বাঙালীর আর এক গর্বের বস্তু ন্যাশান্যাল রাবার ম্যানু-ফ্যাকচারার্স লিমিটেডের অন্যতম ডিরেক্টর।

হৈমবতী ও মাণিকলালের মিলনের বেশ কয়েক দশক (এমন কি, শতক-ও হতে পারে) কেটে যাবার পর ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে মুখার্জি পরিবারে এক কৃতীপুরুষের জন্ম হলো। তাঁর নাম বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়। সেকালের প্রথা অনুসারে মাত্র পনেরো বছর বয়সে বিশ্বেশ্বর শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক কলকাতার এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর কন্যাকে বিবাহ করেন। ধনী শ্বশুরের বাসনা ছিল যে, জামাতা তাঁর ব্যবসাতেই যোগ দেন, কিন্তু বাকুলিয়ার জমিদার বংশের ছেলের পক্ষে তা হতো আত্মসম্মানের হানি। বিশেষ কোনো কারণে বড় ভাইয়ের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়াতে তেজস্বী বিশ্বেশ্বর বাকুলিয়ার জমিদারী পরিচালনাতেও অংশ নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি চাকরি নিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির ফোর্ট উইলিয়মে।

ওদিকে গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে শিবচন্দ্রের এক দূর সম্পর্কীয় ভাগনে মামার সেরেস্তায় হিসাবরক্ষকের কাজ করতেন। মামার মৃত্যুর পর মামাতো ভাইয়েরা তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করাতে গঙ্গাধর কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন। বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। গঙ্গাধর তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে নতুন একটা ব্যবসা আরম্ভ করার প্রস্তাব করলেন, কারণ একক ব্যবসা করার মূলধন গঙ্গাধরের ছিল না। প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত হয়ে নতুন ফার্মটির নাম হলো 'গঙ্গাধর ব্যানার্জি অ্যান্ড কম্পানি'। মূলধন যদিও বিশ্বেশ্বরেরই ছিল, কিন্তু কয়েকটি কারণে তাঁর নামটা প্রচ্ছন্ন রইলো। প্রথম কারণ হলো বিশ্বেশ্বরের আত্মপ্রচারে আপত্তি; দ্বিতীয়, সেকালের ব্রাহ্মণ জমিদার-নন্দনের ব্যবসাতে লিপ্ত হওয়াটাকে সমাজে হেয় বৃত্তি বলে ধরা হতো; তৃতীয়ত, বিশ্বেশ্বর ঠিক সেই সময়টিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির চাকরিতে বহাল ছিলেন।

মোহনকুমার ও নীরদগোপাল আমাকে এইসব তথ্যও যোগালেন।

এর পরেই শুরু হলো জি-ডি-ব্যানার্জি কম্পানির বিরাট সমৃদ্ধি। ইতিহাসের পাতায় এই প্রতিষ্ঠানের নামের স্বাক্ষর অঙ্কিত হলো।

"It was part of a contract for petty stores to be supplied to the arsenal at Fort William for two years from the 15th August, 1856 entered into by

Gungadhar Banerjee & Co." . . (Kaye—in his History of Sepoy War, Vol C, page 519, Footnote).

এইসব মিলিটারি সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করে অল্পকালের মধ্যেই গঙ্গাধর ও বিশ্বেশ্বর অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হলেন। বিশ্বেশ্বর কলকাতা শহর ও তার আশেপাশে বিপুল ভূসম্পত্তিও করে ফেললেন। আর প্রকাণ্ড বসত বাড়িটি করলেন কেল্লার অদূরে খিদিরপুরে। নিজের জন্মস্থানের নামে তিনি এই বাড়ির নাম রাখলেন 'বাকুলিয়া হাউস'। যে রাস্তাটিতে এই বাড়িটি আছে তার এখন নাম বিশুবাবু লেন—বিশ্বেশ্বরের স্মারক।

এ যুগের আত্মকেন্দ্রিকতার ব্যতিক্রম করে বিশ্বেশ্বরের দুই জীবিত পৌত্র ধনগোপাল ও প্রাণগোপাল এবং প্রপৌত্রবর্গ, অর্থাৎ ন্যাশান্যাল রাবার, ইনচেক টায়ার ও আদি জি ডি ব্যানার্জি কম্পানির বর্তমান কর্মকর্তা কেদারনাথ, মোহনকুমার, নীরদগোপাল, মিলনকুমার ও বীরেশ্বর প্রমুখ ভ্রাতারা বাকুলিয়া হাউসে আজকের দিনেও একান্নবর্তী জীবন যাপন করছেন।

বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বিশ্বেশ্বর গৃহদেবতা নারায়ণ শিলার সঙ্গে বাণেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠাও করে গিয়েছিলেন। সে যুগের ধর্মপ্রবণ ধনী ব্যক্তিদের মত বিশ্বেশ্বরও নিয়মিত অন্নকূট, এমন কি অন্নমেরু অনুষ্ঠানও করতেন। একালে আমরা আর সেইসব মহোৎসব দেখতেই পাই না। আমাদের অন্নের যা অবস্থা তাতে অন্নমেরু তো দূরের কথা, অন্নঢিবি করার কথাও আমরা ভাবতে পারি না। ধর্মাচরণের মাধ্যমে সেইসব অনুষ্ঠান সামাজিক সংহতি বিধানেও অপূর্ব সহায়তা করতো। তার মধ্যে কেবল একটি বড় দোষ ছিল—জাতি বিচার।

মাত্র ৪৯ বছর বয়সে পুরুষসিংহ বিশ্বেশ্বর দেহত্যাগ করলেন। শেষের ক'টা দিন কাশীবাস করবার পর সেই মহাতীর্থেই তিনি দেহ রাখলেন। সেটা ছিল বোধ হয় ১৮৭০ সাল।

একটা কথা বলা হয়নি—মোহনবাবু বলেছিলেন যে, বিশ্বেশ্বরের মৃত্যুর কিছুকাল আগে গঙ্গাধর স্ব-ইচ্ছায় জি-ডি-ব্যানার্জিতে তাঁর অংশ বিশ্বেশ্বরকে বিক্রি করে দিয়ে গিয়েছিলেন।

এখন ব্যবসার সম্পূর্ণ স্বত্ব ও ভার এসে পড়লো বিশ্বেশ্বরের বড়ো ছেলে রায় বাহাদুর অখিলচন্দ্রের ওপর। অখিলচন্দ্রের দুই বিবাহ। দ্বিতীয়ার নাম ছিল অন্নপূর্ণা দেবী। অখিল-চন্দ্রও (১৮৫০-৯৯) যখন তাঁর বাবার মতো মাত্র ৪৯ বছর বয়সেই মারা গেলেন তখন এক পুত্রের বিমাতা ও সাত পুত্রের জননী অন্নপূর্ণার নিজের বড় ছেলেটির বয়স ১৭।১৮ আর কোলেরটির বয়স মাত্র ১৪।১৫ দিন।

এই অন্নপূর্ণা দেবী, যাঁর রাশ নাম ছিল দুর্গা। তিনি কুইন ভিক্টোরিয়া না হয়েও একটি মাতৃশাসিত 'ডায়নাস্টি'র উৎসস্বরূপা হলেন। অকাল বৈধব্য ও এতগুলি অপোগণ্ডের ভারে এই সাহসিকা ভেঙে তো পড়লেনই না, চোখের জল মুছে আরও যেন শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। ঈশ্বর-প্রেমের সঙ্গে তাঁর মনের বলের প্রাচুর্য ছিল। পাখি যেমন ভয়ের কারণ ঘটলে তার শাবকদের নিজের ডানার আশ্রয়ে টেনে নেয়, অন্নপূর্ণাও তেমনি নাবালক ছেলেদের কলকাতা শহরের ধনিকসুলভ পাপ ও প্রলোভন থেকে আড়াল করে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে রাখলেন। তা না হলে পরিবারের কারও কারও ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তাই হতে পারতো; বিপুল বৈভবের জোয়ারে

এরাও ভেসে যেতে পারতো। আর তাহলে আজ হয়তো বাঙালীর গৌরবের একটি অধ্যায় অকথিত থেকে যেত।

মাণিকলাল থেকে অখিলচন্দ্র পর্যন্ত মুখোপাধ্যায় পরিবারের সকল গৃহকর্তারই অবদান নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আমার মতে এই মহীয়সী নারীর মহিমা ব্যতীত বাকুলিয়ার মুখার্জিদের ঐতিহ্য বজায় রাখা বোধ হয় সম্ভব হতো না। ভরা সংসার সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে ১৯৩৭ সালে আটাত্তর বছর বয়সে অন্নপূর্ণা মহাপ্রয়াণ করলেন।

রায় বাহাদুর অখিলচন্দ্রের সাত ছেলের মধ্যে সকলের কথা আমি এই প্রবন্ধে লিখছি না। তাঁদের মধ্যে যাঁরা এন. আর. এম. অর্থাৎ ন্যাশান্যাল রাবার ম্যানুফ্যাকচারার্স লিমিটেড-এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন বা আছেন আমি কেবল তাঁদেরই উল্লেখ করছি।

তাঁরা হলেন কেদারনাথের পিতা ক্ষীরোদগোপাল, মোহনকুমার ও মিলনকুমারের পিতা রায়বাহাদুর বিনোদগোপাল, নীরদগোপালের পিতা রামগোপাল, ও বীরেশ্বরের পিতা ধনগোপাল। শ্রীধনগোপাল ও কনিষ্ঠ শ্রীপ্রাণগোপাল ছাড়া অখিলচন্দ্রের আর সব ছেলেরাই এখন গত হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে কেদারনাথও অল্প-বয়সেই ডি-ডি-ব্যানার্জি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তারপরে যোগ দিলেন বর্তমান কর্তা মোহনকুমার ও নীরদগোপাল। সর্বশেষে এলেন মিলনকুমার ও ডক্টর বীরেশ্বর মুখার্জি। মিলন-কুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এস-সি এবং বীরেশ্বর ডক্টরেট পেয়েছেন প্রাণিবিদ্যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শ্রীমোহন মুখার্জি মশায় কয়েক বছর আগে কলকাতার শেরিফ ছিলেন এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারত চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ছিলেন। বাঙালীর অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ'-এরও ইনি এখন ডিরেক্টর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কলকাতার এ আর পি (এয়ার রেইড প্রিকশান) বিভাগের আবশ্যকীয় সরঞ্জাম, মানে বোমাবর্ষণ হলে আগুন নেভাবার জলের জন্য রাবারের হোজ পাইপ, স্টীল হেলমেট-এর ভেতরে লাগানোর জন্যে রাবারের টুকিটাকি ইত্যাদি নির্মাণের এক বাঙালী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। তার নাম ছিল এ-কে-সরকার রাবার ওয়ার্কস। স্বর্গীয় এ-কে-সরকার এবং তাঁর জামাতা শ্রীশচীন্দ্রনাথ ঘোষ এর কর্তা ছিলেন। এঁদের আরও কয়েকটি শিল্পোদ্যোগ ছিল। লোকপরম্পরায় এ-ও শুনেছি যে, মূল কারখানাটি এ-কে-সরকার মহাশয়ের সৃষ্টি নয়। তিনি এটা কিনেছিলেন কোন মুসলমান মালিকের কাছ থেকে—অবশ্য খুবই ক্ষুদ্রাবস্থায়।

এইসব তথ্য আমাকে যোগালেন ডঃ বীরেশ্বর মুখার্জি। তাঁর মুখেই শুনলাম যে, ১৯৪৬ সালে এ-কে-সরকার মশায় চিংড়িহাটায় অবস্থিত তাঁর রাবারের কারখানাটি বিক্রি করা ঠিক করলেন। খবরটি বাকুলিয়া ভবনে পৌঁছতে কেদারনাথের উৎসাহে তাঁর পিতৃস্থানীয়রা সেটি কিনে নেওয়া স্থির করলেন। কেদারনাথের বেশি উৎসাহ ছিল শিল্পে; নিছক বাণিজ্য ব্যাপারে তাঁর ততোটা স্পৃহা ছিল না বোধ হয়। তাই রাবার ওয়ার্কসটি পরিচালনার ভার তাঁর ওপরেই ন্যস্ত হলো।

রাবারের পণ্য উৎপাদন কাজটি কিন্তু অসাধারণ; যাকে বলে 'হাইলি টেকনিক্যাল'। সেই কাজে সুনিপুণ ও বিশেষজ্ঞ এক ব্যক্তি এ-কে-সরকারের আমল থেকেই ওই কারখানাতে কাজ করতেন। তাঁর নাম ডক্টর দাশরথি ব্যানার্জি। রাবার সায়ান্সে বিলিতী ডক্টরেট-প্রাপ্ত এই তরুণটির সহায়তা পাবেন বলেই কেদারনাথের এমন একটি কঠিন শিল্পোদ্যোগের ভার নেবার সাহস বেড়ে গেল।

আধুনিক ভারতীয় রাবারশিল্প বিশারদদের চূড়ামণি এই ডঃ ব্যানার্জি শুধু যে এন. আর. এম-এর 'টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার' তাই নয়, এখন তিনি এর ডিরেক্টর বোর্ডেও আছেন। ছাত্রাবস্থায় ডঃ ব্যানার্জির অর্থসাচ্ছল্য ছিল না-ছিল জ্ঞানের পিপাসা। কৃতিত্বের সঙ্গে কলকাতার এম এস-সি পাবার পর বৃত্তি পেয়ে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত গেলেন। মেধা ও অধ্যবসায় দিয়ে রাবার সায়ান্সে তিনি লন্ডনের ডক্টরেট পেলেন; তারপর একে একে এফ. আর. আই. সি; এফ. আই. আর. আই. প্রভৃতি উপাধি পেলেন। ১৯৬৫ সালে ডঃ ব্যানার্জি রাবার বিশেষজ্ঞের উচ্চতম সম্মান ইংল্যান্ডের 'ইনস্টিটিউশন অব রাবার ইন্ডাস্ট্রি'র 'হ্যানকক্' পদকেও বিভূষিত হয়ে এলেন। গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়ে ভারতীয় মানকসংস্থা গত বছরে এঁকে 'ফেলো' হিসেবে নির্বাচন করেছেন। তা ছাড়াও ইনি সরকারী দুর্গাপুর কেমিক্যালস ও বেসরকারী ইন্ডিয়া অ্যালক্যালিজ লিমিটেডের ডিরেক্টর।

কেদারনাথ ও দাশরথি ব্যানার্জির উদ্যোগী যুবকদের একনিষ্ঠতার ফলে চিংড়িহাটার সেই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি আজ এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ১৯৪৬ থেকে ৫৬ পর্যন্ত দশ বছরে উৎপাদনের প্রচুর বৃদ্ধি হওয়াতে পরের বছরে ১৯৫৭তে ন্যাশান্যাল রাবারকে পাবলিক লিমিটেড করা হলো। উদ্দেশ্য, সম্প্রসারণের জন্য মূলধন সংগ্রহ। বাজারে ৫২ লক্ষ টাকার শেয়ার ছাড়া হবে বলে প্রচারিত হতেই ক্রয়েচ্ছু জনসাধারণ দরখাস্ত করে বসলো ২ কোটি টাকার। এক 'ইন্ডিয়ান আয়রনের' শেয়ার ছাড়া আর কারও ক্ষেত্রেই সাধারণের এত আগ্রহ দেখা যায়নি। এ হলো মুখার্জি পরিবার ও ডঃ ব্যানার্জির নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠানের ছোটবড় সকল কর্মীর কৃতিত্ব। এইসব কৃতী ডিরেক্টর, ম্যানেজার ও কর্মীদের মধ্যে কয়েকজনের কথা এবারে বলছি।

ডিরেক্টরদের মধ্যে নীরদবাবু ও মিলনবাবু এখন আছেন হেড অফিস 'লেসলি হাউস' এ বড়দাদা কেদারবাবু ও দাশরথিবাবুর সঙ্গে, আর ৬০বি চৌরঙ্গী রোডের সেলস অফিসের ভার নিয়ে আছেন এঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ ডঃ বীরেশ্বর মুখার্জি, সেলস ডিরেক্টর।

আর এইসব স্তম্ভরাজির পাশে অন্যান্য যেসব বলিষ্ঠ অবলম্বন আছেন তাঁরা হচ্ছেন এ-কে-সরকার কম্পানির আমলের শ্রীঅমূল্য দত্ত এবং পরবর্তীকালের ডঃ মাখনলাল ভৌমিক (রাবার সায়ান্সে ডক্টরেট) এবং ডঃ অমিয় গুপ্ত (অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট)। এঁরা হলেন যথাক্রমে এন. আর. এম-এর প্ল্যান্ট ম্যানেজার, প্রোডাকশন ম্যানেজার ও টেকনিক্যাল ম্যানেজার পদাভিষিক্ত। অমূল্যবাবু আবার ইনচেক টায়ার্সেরও প্ল্যান্ট ম্যানেজার।

কিন্তু কেবল পণ্য উৎপাদনের কথাই গেয়ে চললে অন্যায় হবে। প্রতিষ্ঠানের ভিত্তির দৃঢ়তা এবং পরিচালনায়, অর্থাৎ কম্পানি ম্যানেজমেন্ট-এ পটুত্ব না থাকলে ও বিপণনে দক্ষতার অভাব ঘটলে কোনো উৎপাদনই সম্ভব নয়। সে কাজের জন্যেও চাই দক্ষ ও বিশ্বস্ত কর্মচারী।

এন. আর. এম-এর সঙ্গে সঙ্গে ইনচেকের সেই শ্রেণীর কর্মীদের মধ্যে উল্লেখ্য ব্যক্তিত্রয় হলেন সেক্রেটারি শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট শ্রীসুশীত রায় এবং সেলস বিভাগের অন্যতম কর্তা শ্রীরমেন্দ্রনাথ বসু।

রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১৯৪৫ সালে বি. ডি. ব্যানার্জি-তে যোগ দিয়েছিলেন এবং ছেচল্লিশে মুখোপাধ্যায় পরিবার এ. কে. সরকার-এর কাছ থেকে রাবার কারখানাটি কেনার সময়ে সব কিছু বুঝে নিয়ে প্রতিষ্ঠানের নবকলেবর দানে রবিবাবুই কেদারনাথকে সর্বাধিক সাহায্য করেছিলেন। অদ্যাবধি রবিবাবু এই কম্পানির সেক্রেটারি।

কিন্তু এইটুকুই তাঁর যথার্থ পরিচয় নয়। মূলতঃ রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মশায় শিক্ষাব্রতী। তিনি ১৯৪৩ থেকে ৫৬ সাল পর্যন্ত সিটি কলেজ কমার্স (সান্ধ্য) বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন এবং ১৯৫৪ থেকে এখনও তিনি কলকাতা ইউনিভার্সিটির লেকচারার ও কোয়েশ্চেনপেপার সেটার। তাঁর রচিত গ্রন্থ বি কম ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক। অধিকন্তু তিনি ইংল্যান্ডের চার্টার্ড ইন্সটিটিউট অব সেক্রেটারিজ-এর 'ফেলো'। অতীতে সেই সংস্থার ভারতীয় শাখার চেয়ারম্যান-ও ছিলেন।

প্রধান হিসাবরক্ষক শ্রীসুশীত রায় এই প্রতিষ্ঠানে আছেন ১৯৫৭ সাল থেকে, অর্থাৎ ন্যাশান্যাল রাবার লিমিটেড কম্পানিতে পরিণত হওয়ার সময় থেকে।

আর আছেন ডঃ বীরেশ্বর মুখার্জির সহকর্মী শ্রীরমেন্দ্রনাথ বসু, যাঁর নিপুণতা এই প্রতিষ্ঠানের বিশাল বিপণনে এক উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছে।

রাবার শিল্পের প্রতিটি পর্যায়ে রসায়নের প্রয়োগ। এই বিষয়টিতে আমি আবার এত বেরসিক যে, তাই নিয়ে আলোচনা পরিহার করে আমার পক্ষে যেটি সহজ কাজ সেইটি করি। অর্থাৎ রাবারের ইতিহাসটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি।

আমার প্রবন্ধমালার প্রায় সব বিষয়বস্তুরই তথ্য ও ইতিহাস সংগ্রহের ব্যাপারে আমি সাধারণত জাতীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর অধস্তন কর্মীদের শরণ নিয়ে থাকি; কিন্তু এন. আর এম এবং ইনচেক-এর সুযোগ্য প্রচার সচিব শ্রীদিলীপ চৌধুরী তাবৎ তথ্য সরবরাহ করে এ যাত্রা আমার ও চিত্তবাবুর পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিলেন।

পঞ্চদশ শতকের প্রায় শেষে কলাম্বাস জলপথে ভারতবর্ষ আবিষ্কার করতে বেরিয়ে তাঁর তিনটি জাহাজ নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছলেন। হেইটি দ্বীপে দেখলেন যে, সেখানকার 'রেড ইন্ডিয়ান' ছেলেরা গোলাকার কী একটা খেলনা নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। সেই খেলনাটা মাটিতে পড়ে নিজে থেকেই লাফিয়ে উঠছে। খবর নিয়ে জানলেন যে, ওদেশের ভাষায় কাঁদুনে গাছ, মানে উইপিং ট্রি থেকে উৎপন্ন আঠা জমিয়েই বস্তুটি তৈরী হয়েছে। দ্বীপের আদিম অধিবাসীরা এই আঠা তরল অবস্থায় ওষুধে মিশিয়েও খায়।

কলাম্বাস এবং তাঁর উত্তরসাধক অভিযাত্রীরা আরও জানলেন যে, রেড ইন্ডিয়ানরা এই আঠাকে বলে 'কাহুচু', দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর লোক বলে 'জেবি' আর ব্রেজিলের বাসিন্দারা বলে 'বোরাচা'। ১৬১৫ সালে বিজিত দেশ থেকে আমদানি করে স্পেনের লোকরা

ক্যানভাসের অঙ্গবস্ত্রে এই আঠালো জিনিসটির আস্তরণ দিয়ে সেকালের ওয়াটারপ্রুফ তৈরি করলেন। আর এক ফরাসী পর্যটক আট বছর ধরে দক্ষিণ আমেরিকার অ্যামাজন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়ে ১৭৪৪-এ দেশে ফেরার সময়ে এই স্থিতিস্থাপক বস্তুটির নমুনা নিয়ে ফিরলেন। স্পেনীয়দের আবিষ্কারের প্রায় ২০০ বছর পরে রাবারের দিকে নানা দেশের লোকের দৃষ্টি পড়ছিল।

'রাবার' নামটি রেখেছিলেন ইংল্যান্ডের এক রসায়নশাস্ত্রী ডঃ জোসেফ প্রিস্টলি (১৭৩৩-১৮০৪)। সালটা বোধ হয় ছিল ১৭৭৪। একমাত্র পেন্সিলের লেখা মোছবার অর্থাৎ রাব্ করে উঠিয়ে ফেলবার কাজেই এর ব্যবহার হতো বলে নেহাত খেয়ালের বশেই ডঃ প্রিস্টলি এর নাম রেখেছিলেন রাবার। আর এর 'ইন্ডিয়া রাবার' আখ্যা এই জন্যে হলো যে, এর আবিষ্কারের সময়ে ইয়োরোপীয়রা ওয়েস্ট ইন্ডিজ-কে ভারতবর্ষের উপকূলে অবস্থিত দ্বীপ বলে ধরে নিয়েছিল। রাবারের ব্যবহারের বিবর্তনের কোনো এক সময়ে তরল, দুধের মত সাদা রাবারের আখ্যা হলো 'ল্যাটেক্স'।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে স্যামুয়েল পেল নামে এক ইংরেজ সর্বপ্রথম রাবার বস্তুটিকে শিল্পোৎপাদনের কাজে লাগালেন। তিনি রাবারের সঙ্গে তার্পিন তেল মিশিয়ে মোটা কাপড়ের ওপর লেপে ত্রিপলের মত এক জিনিস তৈরি করলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন যে, কাঁচা জমানো রাবারকে যদি কোনো যন্ত্র দিয়ে 'চিবিয়ে' অর্থাৎ মাড়াই করিয়ে নেওয়া যায় তাহলেই এর থেকে অনেক কাজের জিনিস তৈরি হতে পারে। এইভাবেই বোধ হয় রাবার তৈরির গোড়ার পর্বে 'ম্যাসটিকেটর' মেশিনের উদ্ভব হয়। কিন্তু দেখা গেল যে, রাবার আচ্ছাদিত বারিনিরোধক বস্ত্রখন্ড থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়ে বমি আসে। আরও দেখা গেল যে, এই ওয়াটারপ্রুফ কাপড় খুব চটচটে হয়। কিন্তু ১৮২৩ সালে স্কটল্যান্ডের চার্লস ম্যাকিনটশ ন্যাপথেলিন মিশিয়ে এই সমস্যার সমাধান করে সর্বপ্রথম গায়ে দেবার ওয়াটারপ্রুফ কোট-এর সৃষ্টি করলেন। সেই জন্যে ইংল্যান্ডে রাবারের তৈরি বর্ষাতির চলতি নাম হয়ে গিয়েছিল ম্যাকিনটশ। এখনও সে দেশে বর্ষাতিকে লোকে 'রেইনকোট' বা 'ম্যাকিনটশ' বলে থাকে।

ভারতবর্ষে রাবারের চাষের প্রবর্তন হলো ১৯০২ সালে। অতীতের ত্রিবাংকুর অর্থাৎ বর্তমান কেরল রাজ্যের 'পেরিয়ার' রাবার বাগিচাতেই ভারতীয় রাবার-চাষের শুরু। সেই বছরেই মালাবারের 'পুনুর' বাগিচাতেও গুটিকয়েক রাবার গাছের চারা রোপণ করা হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে কেরল, মাদ্রাজ ও মহীশূরের রাবার বাগিচাগুলির মোট আয়তন ছিল আন্দাজ ৪ লক্ষ একর এবং উৎপন্ন রাবারের ওজন ছিল প্রায় ৫০,০০০ টন। সেই বছরে আমরা প্রায় ১৮,০০০ টন গাছের-রাবার ও ৩০০০ টন 'সিনথেটিক' রাবার আমদানি করেছিলাম ঘাটতি পূরণের জন্য। আর ১৯৬৭ সালে ইমপোর্ট হয়েছিল ২২,০০০ টন স্বাভাবিক রাবার ও ২৫০০ টন সিনথেটিক।

এন. আর. এম-এর ডঃ ব্যানার্জি ও ডঃ ভৌমিকের একটি যুক্ত প্রতিবেদনে পেলাম যে, ১৯৭০-৭১ সালে ভারতীয় বাগিচার রাবারের উৎপাদন বেড়ে ৮০,০০০ টন পর্যন্ত পৌঁছবে। তখন আবার আমাদের চাহিদাও বেড়ে যাবে; কৃত্রিম ও স্বাভাবিক রাবার দরকার হবে ১ লক্ষ

টনের ওপর। কিন্তু ইতিমধ্যে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান কিলাচাঁদ গোষ্ঠী ও আমেরিকান ফায়ারস্টোন কম্পানির যৌথ-উদ্যোগ 'সিনথেটিক অ্যান্ড কেমিক্যালস্' কম্পানি তাঁদের বেরিলি-র কারখানাতে কৃত্রিম রাবার উৎপাদন আরম্ভ করে দিয়েছেন। তাঁদের ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের জোরে সম্ভবত ঘাটতির সবটাই পূরণ হতে পারে।

স্বাভাবিক রাবারের উৎপাদনে দক্ষিণ ভারতের রাবার বাগিচা মালয়েশিয়ার বাগিচার তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। আমাদের প্রতি একরের উৎপাদন ক্ষমতা মাত্র ১৬০ কেজি, আর তার জায়গায় মালয়ে উৎপন্ন হয় তার ছ' গুণ বেশী—একর পিছু ১০০০ কেজি। ব্রিটিশ রাজত্ব-কালে ইংরেজ প্ল্যান্টাররা মালয়ের উর্বর মাটিতে বৃক্ষরোপণ করে এক বিশাল রাবার-সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। মালয়ের সরল দরিদ্র জনসাধারণের ওপর খুবই অত্যাচার অনাচার করতেন, কিন্তু ইংরেজ প্ল্যান্টারদের নিজেদের কষ্টসহিষ্ণুতাও কম ছিল না। আত্মীয় স্বজন থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরের শ্বেতাঙ্গসমাজ থেকেও বিচ্ছিন্নপ্রায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে তাঁরা এই 'সোনার খনি' রাবার বাগিচাসমূহের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের বিচিত্র জীবনযাত্রা কাহিনীর আঙ্গিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে স্বনামধন্য ইংরেজ ঔপন্যাসিক সমরসেট মম-এর সুন্দর সুন্দর গল্প আছে।

দক্ষিণ ভারত এবং সিংহলের রাবার বাগিচাগুলিও প্রধানত ইংরেজের অবদান।

ভারতীয় রাবার গাছের উৎপাদন বৃদ্ধির খুব চেষ্টা চলছে। এই উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ শহরের অদূরে তিরুভোত্তিয়ূর-এ সম্প্রতি একটি রাবার গবেষণাগারের স্থাপনা হয়েছে বলেও শুনলাম।

দক্ষিণ ভারতের রাবার বাগিচার শ্রমিক সংখ্যা আনুমানিক ১½ লক্ষ এবং নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১১০/১১৫ কোটি টাকা।

ভারতের রাবার শিল্পের অপূর্ব কৃতিত্ব এই যে, ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ভারতে উৎপন্ন রাবার রপ্তানি হতো দেশে রাবার শিল্পোদ্যোগের অভাবে, আর তার বদলে আজ এই শিল্পের প্রসার এতটা হয়েছে যে স্বদেশের উৎপন্ন রাবারেও কুলোয় না—আমদানি করতে হয় ২০/২২,০০০ টন করে।

সর্বভারতীয় শিল্পোৎপাদনের ক্রমিক বর্ধনের হার যেখানে মাত্র বার্ষিক ২½ পারসেণ্ট আন্দাজ, একা রাবার শিল্পের বর্ধনের হার সেখানে ১০ পারসেণ্ট। আমাদের রপ্তানির বাজারও ধীরে ধীরে বাড়ছে; ১৯৬১-৬২তে রাবার পণ্যের রপ্তানি হয়েছিল প্রায় ৮৬ লক্ষ টাকার, আর ১৯৬৬-৬৭তে হয়েছে ৫½ কোটির।

একেই বলে শিল্পযোজনা। মাত্র বছর পঁচিশেকের মধ্যে এই যুগান্তকারী ঘটনাটা ঘটে গেল, আর তাতে এক বৃহৎ অংশ নিল কেদার মুখার্জি মশায়দের ন্যাশান্যাল রাবার ও ইনচেক টায়ার্স।

তথ্যের বোঝা এখন পর্যন্ত যতটা চাপালাম তাতেই আপনাদের অবস্থা প্রায় নাবিক সিন্দবাদ-এর মত করে তুলেছি। পরে-প্রকাশ্য আরও অনেক রয়েছে। কিন্তু বিশেষ একটি তথ্য

ঠিক করে কেউ সরবরাহ করতে পারলেন না; মানে, পরিবার পরিকল্পনার গুহ্য সমস্যার সমাধানে রাবারের যে সমস্ত বস্তু আবশ্যক তার উৎপাদনের পরিসংখ্যান এন.আর.এম-এর কেউই দিতে পারলেন না। বললেন, বোম্বাইয়ে একটু বেশী এবং কলকাতা প্রভৃতি শহরে কিছু কিছু 'হাই-জিনিক রাবার গুডস্' তৈরী হচ্ছে বটে ছোট ছোট কারখানায়, কিন্তু তার সঠিক সংখ্যা বা ওজন বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বারও নাকি জানেন না। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক চেষ্টা করেও এখন পর্যন্ত কোনো বড় প্রতিষ্ঠানকে পাতলা রাবারের ওই বিশেষ জিনিসের উৎপাদনে রাজী করাতে পারেননি। এ বড় পরিতাপের বিষয়।

এন.আর.এম-এর বিরাট উৎপাদনের মধ্যে সাইকেলের টায়ার টিউব এবং কনভেয়র বেল্টিং-এর কথাই প্রথমে উল্লেখযোগ্য। এখন দিনে ২০,০০০ করে টায়ার এবং টিউব তৈরী হয়। ইন্ডাস্ট্রিয়্যাল রাবার, মানে নানাবিধ শিল্পের পক্ষে জরুরী রাবারের পণ্যের মধ্যে এ'দের বেল্টিং-এর উৎপাদনে ভারতজোড়া সুনাম। বিদেশেও কিছু কিছু রপ্তানি হচ্ছে।

এ'দের কনভেয়র বেল্টিং-এর যতটা উৎপাদন হয় তার অধিকাংশই কিনে নেন ভারতে অবস্থিত অ্যামেরিকান প্রতিষ্ঠান 'গুডইয়ার ইণ্ডিয়া লিমিটেড'। সেই অংশটি গুডইয়ারের মার্কাতে বাজারে বিক্রি হয়। আর যেটুকু বাকি থাকে সেটুকু এন.আর.এম. বেচেন নিজের ছাপে। গুডইয়ারের মোটর টায়ার-টিউব তৈরী হয় তাঁদের বল্লভগড়ের (হরিয়ানা) নিজস্ব ফ্যাক্টরীতে; কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়্যাল রাবারের কোনো কোনো জিনিস, যেমন বেল্টিং, তাঁরা নিজেরা না করে এন.আর.এম-কে দিয়ে তৈরি করিয়ে নেবার চুক্তি করেছিলেন ১৯৫৪ সালে। সেই চুক্তি আজও বলবৎ রয়েছে।

ন্যাশান্যাল রাবারের ক্রমিক উন্নতির চমকপ্রদ হিসেবটি আমি নীচে লিপিবদ্ধ করছি :—

সাল	কর্মিসংখ্যা	বিক্রীত মালের দাম
১৯৪৭	২৫০ আন্দাজ	২৪ লক্ষ টাকা
১৯৫৫		১০১ লক্ষ টাকা
১৯৬৪		৫৪৪ লক্ষ টাকা
১৯৬৭	৩৫৭০ "	৮৩২ লক্ষ টাকা

১৯৬৮ সালে বিক্রির টারগেট (লক্ষ্য) হলো ৯½ কোটি আন্দাজ।

বর্তমানে ভারতের প্রধান প্রধান শহরে এন.আর.এম-এর ১৬টি বিক্রয় কেন্দ্র আছে। এ'দের প্রচার পদ্ধতিও প্রশংসনীয়। নিজেদের সচিত্র হাউস-বুলেটিন 'এন.আর.এম. নিউজ' প্রকাশনা সৌষ্ঠবে অনবদ্য।

এই প্রতিষ্ঠানের পেড-আপ ক্যাপিট্যাল এখন ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। সাতষট্টি সালে আয়কর সাপেক্ষ নীট লাভ হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা। কর্মীরা বেতন পেয়েছেন ১ কোটি ২৮ লক্ষ

টাকা। এ'দের সম্প্রসারণ সূচীর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে কল্যাণীতে ১০০ বিঘা জমির ওপরে বৃহৎ কারখানা বসিয়ে পুরনো রাবার থেকে ব্যবহারযোগ্য ভালো রাবার উদ্ধার করার পরিকল্পনা।

চিংড়িহাটা অঞ্চলে ৬০ বিঘা জমির ওপর অবস্থিত এই বিশাল ফ্যাক্টরির সর্বত্রই কর্ম-তৎপরতা। সাইকেল টায়ার তৈরির শেষ পর্ব বিল্ডিং মেশিনে যাঁরা মাল চড়ানোর প্রস্তুতি করছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনের ক্ষিপ্রতায় আমি মুগ্ধ হলাম। বাঙালী ছেলে, নাম সতীশ দাস, তিনি নিজেই যেন একটি মেশিন। বাহবা না দিয়ে পারলাম না।

দোতলা ল্যাবোরেটরি বাড়িটিতে দামী দামী টেস্টিং মেশিনের যান্ত্রিক পরিবেশে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল পুরনো দিনের বিখ্যাত এক গায়কের সঙ্গে—একাধারে রাবার কেমিস্ট ও রবীন্দ্র-সংগীত বিশারদ শ্রীসুনীল রায়। অনেক গানের মধ্যে একটি গান উনি বড় ভালো গাইতেন—'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে/সে যে বাসা বাঁধে নীরব মনের কুলায়ে'। বেদনামধুর সেই অনুভূতিটিকে ইংরেজীতে যেন কী বলে—'নস্ট্যালজিয়া'? পুরনো কথা মনে পড়ে আমার যেন তাই হলো।

সুনীলবাবু এন.আর.এম-এ আছেন এ-কে-সরকার আমল থেকে; আর আছেন অরুণ সেনচৌধুরী, মনোহর ব্যানার্জি, দেবকুমার সরকার এবং আরও কতজন তরুণ রাসায়নিক ও যান্ত্রিক; কেমন সুন্দর উজ্জ্বল সব ছেলেরা!

কাঁকিনাড়ার ইনচেক টায়ার্স-এর কারখানাতেও সেদিন ভারী ভালো লাগলো। হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন শ্রীনির্মল বসু—শুধু সুপুরুষ নয়, বুদ্ধি ও তারুণ্যে সমুজ্জ্বল এক যুবক। ইংরেজী ভাষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ নির্মল বসু ইনচেক-এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজার।

ভেতরে গিয়ে দেখলাম, এখানেও সেই অভিজ্ঞ অমূল্য দত্ত, ক'দিন আগে যাঁর সঙ্গে এন.আর.এম-এ পরিচয় হলো। অমূল্যবাবু ইনচেক-এরও প্ল্যাণ্ট ম্যানেজার। অমূল্যবাবু ও নির্মলবাবু, দুজনেই আবার 'ইনস্টিটিউট অব ওয়ার্কস ম্যানেজমেণ্টের' অ্যাসোসিয়েট মেম্বার, অর্থাৎ ফ্যাক্টরি পরিচালনা শাস্ত্রে পণ্ডিত। কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ার শ্রীপরেশ নন্দী মশায়ের সঙ্গে শুধু মুখ দেখাদেখি হলো। কী একটা জরুরী কাজে তিনি কলকাতা চলে গেলেন যেন!

আর আলাপ হলো টেকনিক্যাল রিসার্চের (গবেষণাগারের) কর্তা সুরথলাল মুখার্জি মশায়ের সঙ্গে। এ'র সৌজন্যে ও সাহচর্যে আমি বিস্তীর্ণ কারখানাটির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ দেখে বেড়ালাম। এন.আর.এম-ও বৃহৎ, কিন্তু ইনচেক-এর মত আধুনিকতা ও বিশালত্বের মহিমা তাতে নেই। সেটা সম্ভবও নয়, কারণ এন.আর.এম. প্রাচীন, আর ইনচেক অর্বাচীন।

ডানলপ, ফায়ারস্টোন, সিয়াট ও গুডইয়ার-এর মত অর্বুদ মুদ্রা মূলধনের ভারতে অবস্থিত ইংরেজ, অ্যামেরিকান ও ইটালিয়ান প্রতিষ্ঠানের পরেই হলো বাঙালী ও চেকোস্লভাকীয় সহযোগিতায় স্থাপিত এই ইনচেক টায়ার্স লিমিটেড। এ'রা বাদেও ভারতে আরও দুটি টায়ার কম্পানি আছে—ম্যাড্রাস রাবার কোং অর্থাৎ 'ম্যান্সফিল্ড' টায়ার নির্মাতা এবং 'প্রিমিয়ার'।

ইনচেক-এর স্থপতি হলেন শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়। অবশ্য ভাইয়েরা, ডঃ দাশরথি ব্যানার্জি আর অমূল্যে দত্তরা সঙ্গে না থাকলে একা তাঁর পক্ষে এই বিশাল শিল্পসৌধটি গড়ে তোলা সম্ভব হতো না। আর কায়িক পরিশ্রমে এ'দের যাঁরা শক্তি ও সফলতা যোগাচ্ছেন ইনচেক-এর সেই ১১০০ শ্রমিক ও কর্মীর কথাও একই সঙ্গে উল্লেখ্য।

১৯৬০ সালে যখন চেকোস্লভাকিয়ার রাষ্ট্রীয় সংস্থা টেকনোএক্সপোর্টের সঙ্গে কেদারনাথ সহযোগিতার চুক্তি সই করে কম্পানি রেজিস্ট্রি করালেন ইনচেক-এর তখন নামকরণ হয়েছিল 'জেনারেল টায়ার্স লিমিটেড'। কিন্তু পূর্ব প্রতিষ্ঠিত একটি বিদেশী কম্পানির নামের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকাতে কেদারবাবু কম্পানির নামান্তর করতে বাধ্য হলেন। ১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি এর নতুন নাম হলো 'ইনচেক টায়ার্স লিমিটেড'। সূচনায় ৩ই কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনের মধ্যে ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকার শেয়ার বাজারে ছাড়া হলো। এখন এর পেড-আপ ক্যাপিট্যাল ২ কোটি টাকার সামান্য কম।

বর্তমানে ইনচেক-এ দিনে ৪৫০ বড় (অর্থাৎ লরি ও মোটরবাসের উপযোগী) টায়ার-টিউব এবং ৫৫০ মোটরকার, মোটর-সাইকেল ও স্কুটারের ছোট সাইজের টায়ার-টিউব তৈরী হচ্ছে। সম্প্রসারণ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। দু'চার মাসের মধ্যেই বর্তমান দৈনিক ১০০০ টায়ার-টিউবের উৎপাদন বেড়ে গিয়ে ১২০০-তে দাঁড়াবে। গতবারের ব্যালেন্স-শীটে এর বিক্রি দেখানো হয়েছিল ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার; চলতি বছরে সেটা ৭ কোটি টাকায় পে'ছিবে। অমূল্যবাবু বললেন যে, এন. আর. এম. ও ইনচেক-এর মোট বিক্রি ১৯৬৮-৬৯ সালের মধ্যে বাৎসরিক ২২ কোটি টাকা না হওয়ার কোনো কারণ নেই।*

তাহলে এখন যে দুই কারখানা আর অনেকগুলি অফিস নিয়ে ৫৬০০ কর্মী কাজ করছেন, তাঁদের সংখ্যাও দ্বিগুণের কাছাকাছি হওয়া উচিত। আরও কত বাঙালীর অন্নসংস্থানের পথ প্রশস্ত হবে!

কর্মসংস্থানের ব্যাপারে ভারতের টায়ার শিল্পের মহৎ কীর্তির ছবিটি দেখিয়ে আজকের প্রবন্ধের উপসংহারে আসি। ১৯৫৭ সালে ভারতবর্ষে অটোমোবাইল টায়ার-টিউবের উৎপাদন ছিল সংখ্যায় ৯ই লক্ষ আন্দাজ, এখন সেটা এসে পে'ছিছে ২৫ লক্ষের ঘরে; আর সাইকেলের টায়ার-টিউবের উৎপাদন এই ১০ বছরে ৭১ লক্ষ থেকে ২ কোটি ১৫ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। এর থেকেই কর্মসংস্থানের ক্রমিক বৃদ্ধিটি বোঝা যাবে।

ন্যাশান্যাল রাবার এবং ইনচেক টায়ার্সের মাধ্যমে বাকুলিয়ার মুখোপাধ্যায় বংশ এই অপূর্ব শিল্পোন্নয়নে এক বৃহৎ অংশ নিয়ে বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

* ১৯৬৮-৬৯ সালে এই অঙ্ক ২৪ কোটি টাকায় পে'ছেছে। উপরন্তু ১৯৭০-৭১ সালে ইনচেক টায়ারের উৎপাদন দ্বিগুণ হতে চলেছে। বর্তমানে ইনচেকে বছরে তিন লক্ষ টায়ার ও তিন লক্ষ টিউব উৎপন্ন হয়। গভর্নমেন্ট এই উৎপাদন বাড়াবার অনুমতি দেওয়াতে শীঘ্রই সেই সংখ্যা গিয়ে পে'ছিবে ছয় লক্ষ টায়ার ও ছয় লক্ষ টিউবে। ফ্যাক্টরির সম্প্রসারণ শুরু হয়েছে এবং নতুন যন্ত্রপাতির জন্য ইমপোর্ট লাইসেন্সও দাখিল করা হয়েছে। —জুন, ১৯৬৯

তাঁদের নেতা কেদারনাথ নানাভাবে তাঁর সার্থক নেতৃত্বের জন্য অভিনন্দিত হয়েছেন। তিনি দুর্গাপুর প্রকল্প, কল্যাণী স্পিনিং, পশ্চিমবঙ্গ ফিনানশিয়্যাল করপোরেশন প্রভৃতি বহু সরকারী সংস্থার চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর পদে বৃত হয়েছেন; আর বেসরকারী সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানেও তাঁর সমধিক সম্মান। কেদারনাথ বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সেরও প্রাক্তন সভাপতি।

কেদারনাথ ও তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ নিজেরাই কেবল লক্ষ্মীর বরপুত্র হননি, তাঁদের মেধা, কর্মক্ষমতা ও সংগঠনশক্তি হাজার হাজার বাঙালীর ঘরে স্বস্তি ও শান্তি এনে দিয়েছে।

হৈমবতী-মাণিকলাল যে বংশের সৃষ্টি করেছিলেন, বিশ্বেশ্বরের প্রতিভা যে বংশে সমৃদ্ধি এনেছিল, আর অন্নপূর্ণার প্রজ্ঞা যাকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করেছিল, সেই বংশ যেন অক্ষয়-বটের মত বাঙালীকে ছায়া দিতে থাকে, এই প্রার্থনাই করি।

৯ জুন, ১৯৬৮





তেইশ

মনটা আমার বেশ কিছুদিন ধরেই ছটফট করছিল; কর্তব্যে ত্রুটি হলে যে অস্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ ভোগে সেই রকম একটা কষ্ট হচ্ছিল। ইন্দিরা গান্ধী হিভিয়া ব্রেজিলিয়েনসিস-এর দেশ ব্রেজিল যাবার পরে চিত্তচাঞ্চল্যটা বেড়ে গেল।

এতগুলি বাঙালী প্রতিষ্ঠানের কথা আপনাদের আমি বলেছি, স্বর্গীয় সুরেন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের কথাও একাধিক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি, অথচ তাঁর নিজের গড়া বাঙালীর আর একটি গর্বের বস্তু বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কসের কাহিনী এখনও বলিনি, এটাই আমার মনঃকষ্টের কারণ।

ব্রেজিলের প্রসঙ্গে আমার ভাবানুষঙ্গ (অ্যাসোসিয়েশন অব থটস্) এই রকম হলো : ইন্দিরা দেবী—ব্রেজিল—হিভিয়া ব্রেজিলিয়েনসিস্, মানে আগে কেবল ব্রেজিল অঞ্চলে গজাতো বলে রাবার গাছের এই ল্যাটিন নাম—সেই গাছের রস হলো ল্যাটেক্স—ল্যাটেক্স জমে গেলে হয় রাবার—রাবার থেকে ওয়াটারপ্রুফ (টায়ার টিউবের কথা এন. আর এম.-ইনচেক-এর প্রবন্ধে আগেই লিখেছি)—এদেশে ওয়াটারপ্রুফ প্রথম তৈরি হয়েছিল বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফে, যাঁদের 'ডাকব্যাক' মার্কা বর্ষাতির ভারত-জোড়া নাম—অথচ সে বৃত্তান্ত আমার লেখা হয়ে ওঠেনি।

নানা কারণে সেটা হয়ে ওঠেনি। প্রধান হেতুটি হলো লেখার মালমশলা যোগাড়ের তোড়-জোড় করতে না করতেই শ্রমিকের অস্থিরতায় গত ২০ মে তারিখ থেকে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের কারখানাটি বন্ধ হয়ে যাওয়া। সুখের বিষয়, এই প্রবন্ধ লেখার ঠিক আগে খবর পেলাম, শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিষ্পত্তি হয়ে ১৪ অক্টোবর থেকে কারখানা আবার খুলছে।

স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ এবং বিখ্যাত বিপ্লবী স্বর্গত ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সুরেন্দ্রমোহন বসু মশায়ের ব্যক্তিগত ইতিহাস আরম্ভ করি। এই শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে যে সমস্ত তেজস্বী যুবক পৃথিবীর সব দেশে ছড়িয়ে পড়ে ভারতবর্ষের

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড
৪১, শেক্সপীয়ার সরণি
কলিকাতা-১৭

স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন সুরেন্দ্রমোহন তাঁদের অন্যতম। তিনি তখন আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইনডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি'-তে এ, বি, (স্নাতক) ডিগ্রি পেয়ে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এস-সি পড়ছেন। ভূপেন্দ্রনাথ 'আমেরিকায় প্রচেষ্টা' শীর্ষক অনুচ্ছেদে লিখেছেন : "...১৯১৩ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দুস্থান স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন' নামে ছাত্রদের মধ্যে নিখিল আমেরিকা সঙ্ঘ গঠন করা হয়। এই সঙ্ঘের পক্ষ হইতে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করা হইয়াছিল। ডক্টর সুধীন্দ্রনাথ বসু ইহার প্রথম প্রেসিডেন্ট হন এবং প্রত্যেক স্টেটে ইহার শাখা গঠিত হয়।...এই সময়ে ১৯১২ হইতে ১৯১৪ পর্যন্ত *সুরেন্দ্রনাথ (স্পষ্টতই নামে একটু ভুল থেকে গেছে) বসু, *বসন্তকুমার রায়, *ডঃ সুধীন্দ্রনাথ বসু ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। ফলে তিনজনই ইংরেজ গভর্নমেন্টের রোষে পতিত হন এবং এক প্রকারের নির্যাতন ভোগ করেন।..."

ভূপেন দত্ত মশায়ের এই উল্লেখটুকু খুবই অসম্পূর্ণ। সুরেন্দ্রমোহন ও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু খগেন্দ্রচন্দ্র দাশ (ক্যালকাটা কেমিক্যালের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা), খগেন্দ্রচন্দ্রের ভাগ্নে সত্যেন সেন, শ্রীভাটাল নামে এক পাঞ্জাবী ছাত্র এবং রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সারদানন্দের ভাই নরেশ চক্রবর্তী ইউ, এস, এ সরকারকে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করার বিষয়ে রাজী করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বৃটিশ ও আমেরিকান সরকারের মিতালির জন্যে তাঁরা যে সে চেষ্টায় সফল হননি তা বলা বাহুল্য।

কাহিনীটি আমি যেভাবে আরম্ভ করেছি তা পড়ে মনে হবে যে সুরেন্দ্রমোহন উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ভারতবর্ষ থেকে সোজা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা নয়। গয়া জিলাস্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং ভাগলপুর টি. এন. জুবিলী কলেজ থেকে এফ-এ পাস করে তিনি ঢাকা কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে বি-এ ক্লাসে ভর্তি হন। সে সময়টা ছিল বাঙালীর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জাগরণের প্রথম প্রহর। বিপ্লব ধূমায়িত হচ্ছিল; বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানোর মন্ত্রে আবালবৃদ্ধবনিতা দীক্ষিত হচ্ছিলেন। কেবল তাই নয়, বিদেশ থেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করে স্বদেশের সেবায় নিয়োজিত করাও ছিল সেই বিপ্লবীদের কার্যক্রমের অন্তর্গত। স্বদেশী যুগের এই চিন্তাধারা সুরেন্দ্রমোহনকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

তাই তিনি ১৯০৫ সালে সুযোগ পাওয়ামাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ অসমাপ্ত রেখেই জাপান যাত্রা করলেন (যোগীন্দ্রচন্দ্র) ঘোষ-স্কলারশিপ নিয়ে। এই 'স্কলারশিপ'-এর বিষয়ে আমি ক্যালকাটা কেমিক্যাল বিষয়ক প্রবন্ধে লিখেছি।

জাপানে তিনি প্রায় দেড় বছর থেকে হাতেকলমে রঞ্জনশিল্প ও কাপড় ছাপাই, অর্থাৎ dyeing and calico printing শিক্ষা করেন। জাপানীদের আন্তরিকতায় এবং তাদের কর্মদক্ষতায় তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীন ভারত সরকার যখন জাপানের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের কথা ভাবছিলেন তখন সুরেন্দ্রমোহন তার বিরোধিতা করে রাষ্ট্রপতির কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং রাষ্ট্রপতি তাঁর যুক্তি মেনে নেন।

সুরেন্দ্রমোহন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এস-সি পাস করে বছরখানেক শিকাগোর বিখ্যাত 'ইন্টারন্যাশানাল হারভেস্টার' কম্পানিতে কাজ করেছিলেন। দেশে ফিরে আসার পরেও দাগী বিপ্লবী হিসেবে তিনি অনেক বছর ধরে সরকারি উৎপাত সহ্য করেছিলেন। গদর-পার্টির সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একবার গ্রেপ্তার হয়ে ছাড়া পাবার কথা অন্য প্রবন্ধে লিখেছি। জাপানী জাহাজ 'কোমাগাটা-মারু'তে গদরপার্টির সঙ্গে শিখের ছদ্মবেশে একজন বাঙালীও ছিলেন। তাঁর নাম ছিল সত্যেন সেন। এই অসমসাহসী যুবক আমেরিকা থেকে 'কোমাগাটা-মারু'-তে কলকাতায় পৌঁছবার কিছুদিনের মধ্যেই অনুশীলন পার্টির অন্যতম নেতা হয়ে উগ্র সন্ত্রাসবাদী হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি সুরেনবাবু ও খগেনবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন। এইসব যুবকদের দমন করার উদ্দেশ্যেই ১৯১৯* সালে ভারত গভর্নমেন্টের কুখ্যাত রাওলাট অ্যাক্ট পাস হয়েছিল।

গদর-পর্বের কিছুদিন পরে শিল্পায়নে উচ্চশিক্ষিত সুরেন্দ্রমোহন করদ রাজ্য রেবা স্টেটের শিল্পোন্নয়নের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন ভারত সরকারের ওই ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট-এর খড়্গ তাঁর ওপরে পড়লো। তিনি যুক্তপ্রদেশের (অধুনা উত্তরপ্রদেশের) হামীরপুরে অন্তরীণ হলেন। গদর আন্দোলন ছাড়াও নিউ ইয়র্কের ডঃ তারকনাথ দাস, প্যারিসের মাদাম কামা ও সর্দার অজিত সিং, জেনিভার ডঃ শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে যে সুরেন্দ্রমোহনের যোগাযোগ ছিল বৃটিশ সরকারের সেটা অজানা ছিল না।

এই হলো সুরেন্দ্রমোহনের চরিত্রচিত্র যার শেষ অভিব্যক্তি আমরা নতুন করে আবার দেখেছিলাম ১৯৪৬ সালে তাঁর মৃত্যুর বছর দুই আগে। নেতাজীর আই এন এর সৈন্যরা যখন গান্ধীজী ও কংগ্রেসের চেষ্টায় বৃটিশের কবল থেকে ছাড়া পেলেন তখন তাঁদের মধ্যে অনেককে সুরেন্দ্রমোহন ডেকে ডেকে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফে কাজ দিলেন জাতিধর্ম নির্বিশেষে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও কাজ করছেন। কম্পানির একটি গাড়ির ড্রাইভার পাঞ্জাবের শ্রীবুটা সিং-এর সঙ্গে আমার আলাপ হলো। তিনি আই এন এ-তে আর্মি-ড্রাইভার ছিলেন। বাইশ বছর বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফে কাজ করে বার্ধক্যের জন্য এবারে তিনি রিটায়ার করছেন।

সেকালে দুর্লভ বিদেশী ডিগ্রির জোরে সুরেন্দ্রমোহন মুক্তি যুদ্ধে সক্রিয় অংশ না নিয়ে বৃটিশ ভারতে মোটা মাইনের সরকারি চাকরি কিংবা কৃতী অধ্যাপক হতে পারতেন। কিন্তু ঢাকা সদরের বামনতিতা গ্রামের সুরেন্দ্রমোহন সে রকম নরমপাকের ধাতুতে গড়া ছিলেন না, দেশপ্রেমের ব্যাপারে তিনি ছিলেন ইস্পাত।

হামীরপুরে বন্দী অবস্থায় সুরেন্দ্রমোহন খবরের কাগজে পড়লেন যে রেইনকোট আর

---

* বিশেষ করে বাঙালী টেররিস্টদের কার্যকলাপে উদ্ব্যস্ত হয়ে ১৯১৮ সালে ভারত সরকার স্যার সিডনী রাওলাট-এর সভাপতিত্বে কুমারস্বামী শাস্ত্রী এবং প্রভাসচন্দ্র মিত্রকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। সেই কুখ্যাত রাওলাট কমিটির সুপারিশে ১৯১৯-এর মার্চ মাসে যে আইন পাস করানো হয়েছিল তাতে ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট "were given powers to arrest persons reasonably believed to be connected with certain offences, the commission of which threatened public safety and to confine them in such places and under such conditions as were prescribed. Further, dangerous characters already under control or in confinement could be continuously detained under the Act".

ওয়াটারপ্রুফ ক্যানভাসের অভাবে পল্টনের (ইণ্ডিয়ান আর্মির) ভারতীয় সেনাদের দুর্গতির শেষ নেই। যুদ্ধের জন্যে বিলেত থেকে ওইসব জিনিসের আমদানি বন্ধ; যেটুকু আসে তাও যায় এখানকার গোরা সৈন্যদের ব্যবহারে, আর ভারতবর্ষে ওয়াটারপ্রুফের কোনো ফ্যাক্টরীই নেই তখন। সুরেনবাবুর বৈজ্ঞানিক মন সজাগ হয়ে উঠলো। কষ্টেসৃষ্টে একটা ছোট ল্যাবোরেটরির সরঞ্জাম যোগাড় করে হামীরপুরেই তিনি রাসায়নিক পদ্ধতিতে (কেমিক্যাল প্রুফিং) ওয়াটারপ্রুফ কাপড় ও ক্যানভাস তৈরির গবেষণা নিয়ে মেতে উঠলেন। গবেষণায় তিনি সফল হলেন বটে, কিন্তু তা কাজে লাগাবেন কী করে সেই অন্তরীণ অবস্থায়! যুদ্ধবিরতি পর্যন্ত তাঁকে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হলো।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছু পরে সরকার তাঁকে মুক্তি দিলেন। সুরেন্দ্রমোহন বাংলাদেশে ফিরে এলেন।

সুরেন বসুর বাবা মোহিনীমোহন শিক্ষাব্রতী হিসেবে সেকালের পূর্ববঙ্গের লোকের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। সুরেন্দ্রমোহন ছিলেন তাঁর চার ছেলের মধ্যে বড়। অন্য তিনজনের নাম যথাক্রমে যোগীন্দ্রমোহন, অজিতমোহন ও বিষ্ণুপদ। এই তিন ভাইয়েরই সাহচর্যে সুরেন্দ্রমোহন ১৯২০ সালে তাঁদের কলকাতার বাসাবাড়িতেই 'বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস'-এর স্থাপনা করলেন।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের প্রাথমিক কার্যসূচীর অন্তর্গত ছিল কেমিক্যাল-প্রুফিং প্রণালীতে জিনিস তৈরি করা। রাবারের ব্যবহার তখনো তাঁরা আরম্ভ করেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভালো কোয়ালিটির ওয়াটারপ্রুফ ইত্যাদি কেমিক্যাল প্রুফিং প্রণালীতেই হয়ে থাকে, কিন্তু তার পড়তা ও বিক্রির দাম রাবারের তৈরী জিনিসের চেয়ে বেশ কিছুটা বেশি। সুরেনবাবু ভালো জিনিসই তৈরি করে বাজারে ছাড়লেন। তার মার্কা হলো 'ডাকব্যাক'—যে নামের আজ ভারতজোড়া খ্যাতির। বাঙালী ডাকব্যাক-কে আদর করে নিলো।

কলেজ স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের মোড়ের বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের বড় দোকানটার কথা ভাবলেই আমার নিজের স্কুল লাইফের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বর্ষাকালে ছাতা মাথায় দিয়ে স্কুলে যাওয়া আসা একটা উৎপাতের মতো মনে হতো। তখন সতৃষ্ণ নয়নে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের দোকানে ঝোলানো বর্ষাতির দিকে চেয়ে চেয়ে পথ চলতাম। আহা, ওইরকম একটা রেইনকোট যদি আমার হতো, আর সঙ্গে একটা রেলওয়ে গার্ডের টুপির মতো টুপি। কলেজে উঠে দেখলাম চৌরঙ্গীতেও ডাকব্যাকের একটা দোকান আছে হরেকরকম জিনিসে ভরা—ত্রিপল, হটওয়াটার ব্যাগ আর আইসব্যাগ, গামবুট প্রভৃতি কত কি! তখন আবার রেইনকোটকে চালের মাথায় বলতে শিখেছি 'ম্যাকিনটশ'। (১৮২৩ সালে স্কটল্যাণ্ডের চার্লস ম্যাকিনটশ ওয়াটারপ্রুফ কোটের উদ্ভাবনা করেছিলেন বলে তাঁর নামেই এই নাম)। কলকাতার রাস্তায় জল জমলেই বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম যে ডাকব্যাক-এর একটা গাম-বুট থাকলে বেশ হতো।

চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপাদনের তাল রাখার জন্যে এবং কেমিক্যাল-প্রুফিং করা দামী জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে কম দামী রাবারের রেইনকোট ইত্যাদি তৈরি করার প্ল্যান করলেন বসু

ভ্রাতারা। এইবারে তাঁরা হিভিয়া ব্রেজিলিয়েনসিস অথবা উইপিং ট্রি-র জমাট বাঁধা অশ্রুর, অর্থাৎ স্বাভাবিক রাবারের ব্যবহার শুরু করলেন।

জ্যেষ্ঠ সুরেন্দ্রমোহন (১৮৮২-১৯৪৮) বীজ বপন করে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু যোগীন্দ্রমোহন (১৮৮৬-১৯৬৪), অজিতমোহন (১৮৯৬-১৯৬০) এবং কনিষ্ঠ বিষ্ণুপদ (১৮৯৯-১৯৬১) যদি অগ্রজের যথার্থ সহায়তা না করতেন তবে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ আজ এই অবস্থায় উপনীত হতে পারতো কিনা সন্দেহ। এঁরা প্রত্যেকেই কম্পানির সক্রিয় ডিরেক্টর ছিলেন।

যোগীন্দ্রমোহন ছিলেন প্রতিষ্ঠানের জেনারাল ম্যানেজার। অফিস সংক্রান্ত কাজের পরিচালনার দায়িত্ব প্রধানত তাঁর ওপরেই ন্যস্ত ছিল।

সেলস প্রমোশনের ভার ছিল অজিতমোহনের ওপর। বিশেষ করে বোম্বাই অঞ্চলে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের প্রচার ও প্রসারে তিনি অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠানের বোম্বাই শাখা অফিস তাঁর সৃষ্টি।

উৎপাদনের গুরুদায়িত্ব ছিল ফ্যাক্টরি ম্যানেজার বিষ্ণুপদর উপর। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের প্রাচীনতম দুই কর্মী, চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র দাস এবং সেক্রেটারি শ্রীসুধেন্দুকুমার দাস আমাকে বললেন যে, উৎপাদনের উৎকর্ষ বজায় রাখার জন্য বিষ্ণুপদ, বলতে গেলে, প্রাণপাত করেছিলেন। অত্যধিক পরিশ্রম না করলে তিনি হয়তো আরও অনেকদিন বাঁচতেন।

আর এঁদের সঙ্গে ছিলেন তদানীন্তন চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট স্বর্গত নলিনীমোহন ঘোষ মহাশয়। সম্পর্কে নলিনীবাবু ছিলেন তাঁদের মামা। সেই ১৯২০ সাল থেকে তাঁর হিসাবরক্ষায় দূরদর্শিতার জন্যই বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় রাখা সম্ভব হয়েছিল।

পথিকৃৎবৃন্দ সকলেই একে একে চলে গেছেন। পুরাতনের স্থানে আজ নতুন যাঁরা রথের রশি ধরে রয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন অভিজ্ঞ সেক্রেটারি শ্রীসুধেন্দুকুমার দাস এবং বর্তমান চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র দাস—যাঁদের কথা একটু আগে বললাম। এঁদের বুদ্ধি-পরামর্শ ছাড়া কম্পানির চলা ভার। সঞ্জীববাবু প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৪০ সালে এবং সুধেন্দুবাবু একচল্লিশে।

ইনচেক ও ন্যাশানাল রাবার বিষয়ক প্রবন্ধ লেখার সময়ে আমি হিভিয়া ব্রেজিলিয়েনসিসের কথা জানতাম না; সেটা জেনেছি তার কিছু পরে। ইতিহাস নিয়ে চিরকালই এইরকম বিভ্রমে আমরা পড়ে এসেছি। 'ইতি হ আস' অর্থাৎ 'এইরকম ছিল' বলে শুরু করে বৈদিক যুগের মুনি-ঋষিরা শিষ্যদের নানান গল্প শোনাতেন; তারই নাম হলো 'ইতিহাস'। এক এক মুনি একই বিষয়ে রকম রকম করে বলে আমাদের বিভ্রান্ত করে গেছেন। বেদে যা আছে পুরাণে তা অন্য রূপ নিয়েছে; দুই পুরাণে একই কাহিনী বলা হয়েছে, কিন্তু তাতেও যথেষ্ট প্রভেদ আছে। আজও ইতিহাস রচনায় অনেক ক্ষেত্রে তাই ঘটে। কে যে কখন কোন্ কথা চেপে যান কিংবা রঙ চড়িয়ে কোন্‌টা জুড়ে দেন তা বলা প্রায় অসম্ভব।

ভাগবত-পুরাণের মতো না হলেও রাবারের ইতিহাসে কিছু কিছু গরমিল আছে বলে মনে হয়। 'ইনচেকের' কাহিনী লেখার সময়ে দেখছি ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনা বাদ পড়ে গেছে।

একটা বড় স্মাগলিং-এর গল্প, যাকে বলে আজকের যুগোপযোগী গল্প, তখন আমার জানাই ছিল না।

ইংরেজ একটা জাত বটে। একদিকে ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রীর মতো 'বৃটিশ জুরিস্-প্রুডেন্স'-এর আইনে প্রজাবৃন্দকে শৃঙ্খলা পাশে বন্ধ করেন আবার অন্যদিকে আইন ভাঙতে উৎসাহ দেন। তাও যদি কোনো যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে হতো তো এক কথা। ১৮৭০-৭৫ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অপার শান্তিময় রাজত্বকালের একটি ঘটনা এটা। লন্ডনের 'রয়্যাল কিউ গার্ডেনস'-এর ডিরেক্টর স্যার জোসেফ হুকার খবর পেলেন যে হেনরি উইকহ্যাম নামে এক বনজ-বিশারদ দক্ষিণ আমেরিকার অ্যামাজন এবং ওরিনোকো উপত্যকা পরিক্রমা করে হিভিয়া ব্রেজি-লিয়েনসিস বিষয়ে অনেক কিছু জেনে এসেছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি উইকহ্যামকে ডেকে পাঠালেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ইন্ডিয়া-সেক্রেটারি লর্ড সলসবেরির সনদ নিয়ে উইকহ্যাম সেই গাছের বীজ সংগ্রহের অভিযানে যাত্রা করলেন। ব্রেজিল রাজ্য থেকে রাবার গাছের বীজ বা চারা রপ্তানি আইনত নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সে হলো অন্য দেশের আইন, ইংল্যান্ডের তো নয়! উইকহ্যাম সব বাধা ভেঙে পাকেপ্রকারে ৭০,০০০ রাবার গাছের বীজ স্মাগল করে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ১৮৭৬ সালের ১৬ জুন তিনি সেই বীজ হুকার সাহেবের কব্জায় পোঁছে দিয়ে ভারত সরকারের তহবিল থেকে প্রকান্ড পারিশ্রমিক আদায় করলেন। শুধু তাই নয়, স্মাগলিং-এ অদ্ভুত কৃতকার্যতার কারণেই বলুন বা স্বদেশের হিতকর্মের জন্যেই বলুন উইকহ্যাম সত্বর মহারাণীর কাছ থেকে 'স্যার' উপাধি, মানে নাইটহুড পেয়ে গেলেন। (সোনাচাঁদির চোরাচালানের রাজা ওয়ালকটকে মোরারজী ভাই পদ্মবিভূষণ খেতাবে বিভূষিত করুন, এই আমার প্রস্তাব। ওয়ালকট আর ডোঙ্গ— না ডোঙ্গে -তো আমাদের অতি প্রয়োজনীয় সোনাই এনে দিচ্ছেন)।

কিন্তু স্যার হেনরি উইকহ্যাম সত্যিই স্বদেশের পরম উপকার করলেন। 'কিউ গার্ডেনস'-এ বপন করা সেই বীজের চারা উত্তরকালে মালয়, সিংহল, ভারত ও সিঙ্গাপুরে রোপণ করে বৃটিশের বিশাল রাবার সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল।

'ডাকব্যাক' মার্কা রাবারের হাসপাতাল-সরঞ্জাম, এয়ারবেড এবং বালিশ-ও সারা ভারতবর্ষের বাজারে বাজারে ছড়িয়ে পড়লো। ভারত সরকার-ও বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের অন্যতম প্রধান গ্রাহক হয়ে দাঁড়ালেন। সেটা সম্ভব হলো কলকাতার আর এক প্রসিদ্ধ বাঙালী প্রতিষ্ঠান ইনচেক ও ন্যাশান্যাল রাবারের জননী জি ডি ব্যানার্জি অ্যান্ড কম্পানির কর্ণধার স্বর্গীয় রায় বাহাদুর বিনোদগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায়। সেই প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের মাল রেলওয়ে, মিলিটারি প্রভৃতি সরকারি সব বিভাগেই চালু করে দিল। জি ডি ব্যানার্জির বর্তমান কর্ণধার শ্রীমোহনকুমার মুখোপাধ্যায় এখন বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের অন্যতম ডিরেক্টর।

১৯৩১ সালে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কসকে প্রাইভেট লিমিটেড কম্পানিতে পরিণত করা হলো। এই বছরেই স্থানাভাব মেটাবার জন্যে কারখানাটিকে কলকাতার ১২ মাইল দূরে পানিহাটির বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর কাছে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। ফ্যাক্টরির আয়তনও অনেক বেড়ে গেল।

১৯৪০ সালে মূলধন আরও বাড়িয়ে কম্পানি পুরোপুরি পাবলিক লিমিটেড হলো।

প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কর্ণধার সুরেন্দ্রমোহনের বড় ছেলে দেবব্রত তখন দশ এগারো বছর বয়সের ছেলে। পারিবারিক শিক্ষা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পা ফেলে তিনি ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবেশটি গড়ে উঠেছিল একদিকে মোহিনীমোহন ও সুরেন্দ্রমোহনের জন্যে, অন্যদিকে দেবব্রতর মাতৃকুলের ঐতিহ্যে। সুরেন্দ্রমোহন বিবাহ করেছিলেন বিখ্যাত হোমিও-প্যাথ ডাঃ ডি এন রায়ের কন্যা মালতী দেবীকে। সেই সম্পর্কে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন তাঁর আপন মেসোশ্বশুর এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন নিকট সম্পর্কীয় মামাশ্বশুর—সুরেন্দ্রমোহনের শাশুড়ি শৈলবালা দেবীর আপন জেঠতুতো ভাই। নিজের বংশধারা আর এই কুটুম্বিতায় সুরেন্দ্রমোহনের পরিবার সেদিনের কলকাতার খাঁটি কালচার্ড সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিবার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু আজকাল যেমন 'কালচার্ড' মা-বাবা হতে গেলে ইংরেজী বা মিশনারী স্কুলে আর সেন্ট জেভিয়ার্স বা প্রেসিডেন্সী কলেজে ছেলেমেয়েকে পড়াতে হয়, খাঁটি বাঙালী সুরেন্দ্রমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী সে রকম ছিল না। তিনি তাঁর বড় ছেলে দেবব্রতকে ভর্তি করলেন আর এক আদর্শ-বাদী শিক্ষাব্রতীর স্কুল 'বয়েজ ওন হোম'-এ। সেই বিদ্যালয়ে ছেলেরা বিদেশীর অনুকরণ না শিখে নিজের দেশের, নিজের জাতির গুণগ্রাহী হওয়ার শিক্ষা পেত। দেবব্রত কিছুদিন সেই স্কুলে পড়বার পর সুরেন্দ্রমোহন ছেলেকে ভর্তি করলেন দার্জিলিং-এর 'নর্থ পয়েন্ট' স্কুলে। দেশী ও বিদেশী দুই ধারার সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে দেবব্রত সাদা চশমা পরেই বিদেশী শিক্ষা-প্রণালীর ভালোটুকু নিতে পারলেন, অন্ধ অনুকরণ এড়িয়ে। তাছাড়া বড়লোকের ছেলে বলে মনে যাতে দম্ভ বা বিলাসিতা স্থান না পায় সেইজন্যে সুরেনবাবু প্রথম থেকেই দেবব্রতকে তৈরি করছিলেন। বয়েজ ওন হোম-এ পড়বার সময়ে দেবব্রতর পকেটমানি ছিল দৈনিক দু আনা, মানে বারো নয়া পয়সা।

বাপ-মায়েরা ছেলেমেয়ের কাঁচা মনকে যে পথে পরিচালিত করেন সাধারণত তারা বড় হয়ে সেই দিকটাই বেছে নেয়। দেশপ্রেমিক সুরেন্দ্রমোহন শুধু যে ছেলের মনে জাতীয়তাবোধটাই জাগিয়ে তুললেন তাই নয়, বিজ্ঞানী সুরেন্দ্রমোহনের প্রভাবে সেই বাল্যকাল থেকেই দেবব্রতর মনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পিপাসা জন্মালো। সহপাঠীদের মতো খেলাধুলো আমোদপ্রমোদ তিনি ভালো-বাসতেন বটে, কিন্তু তার চেয়েও তাঁর কাছে অধিকতর প্রিয় হয়ে উঠলো তড়িৎ-বিজ্ঞানের নেশা। মাইকেল ফ্যারাডে কেমন করে ডায়নামো আবিষ্কার করলেন, এডিসন কি করে ফনোগ্রাফ তৈরি করলেন আর অ্যালেকজান্ডার গ্রেহাম বেল টেলিফোনের উদ্ভব করলেন, সেইসব জিজ্ঞাসাই দেবব্রতর কাছে গানবাজনা খেলাধুলোর চাইতে প্রবল হয়ে উঠলো।

কেবল বৈদ্যুতিক ব্যাপারই নয়, দেবব্রত একটু উঁচু ক্লাসে ওঠার পর থেকেই বাবার নির্দেশে গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতে কলকাতায় এসে তাঁকে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের ফ্যাক্টরিতে রীতিমতো শিক্ষা-নবিসী করতে হতো।

সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করার পর কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হয়ে দেবব্রত কেবল কলেজের পড়া নিয়েই খুশি রইলেন না; তড়িৎ বিজ্ঞানের নেশাটা তাঁর তখন বেশ দানা বেঁধেছে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে 'ইলেকট্রনিকসের' আবির্ভাব ভালো করেই হয়েছে। কলেজের

ছুটির পর তিনি তখন প্রতিদিন তাঁর নিকট আত্মীয়, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন অধ্যাপক এবং 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'-এর অধ্যাপক স্বর্গীয় নগেন্দ্রচন্দ্র নাগের কাছে যাতায়াত করতে শুরু করলেন। প্রফেসর নাগের সব বিজ্ঞানেই পান্ডিত্য ছিল; ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সব কিছুতেই তিনি চৌকস ছিলেন। কিন্তু তাঁর চোখ দুটি খারাপ হয়ে আসছিল; নিজে দেখে দেখে ল্যাবোরেটারির কাজ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। দেবব্রত হয়ে দাঁড়ালেন তাঁর চোখ, তাঁর ডান হাত। তাঁর বাড়িতে সম্পূর্ণ একটি ল্যাবোরেটরি ছিল। সেখানে বসে তিনি দেবব্রতকে নির্দেশ দিতেন আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেবব্রত তাঁকে ফলাফল জানাতেন। সেই গবেষণার ভিত্তিতেই অধ্যাপক নাগ তাঁর বিখ্যাত থিসীস এবং রিসার্চ-পেপারস (গবেষণামূলক নিবন্ধ) তৈরি করতেন। লেখার কাজটাও শিষ্যকে দিয়েই করাতেন।

তার ফলেই আজ এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, মস্ত বড় একটা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সর্বেসর্বা হয়ে সারাদিনের ধকল সামলাবার পরেও সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে তাঁর নিজের ল্যাবোরেটারিতে বসে দেবব্রত ইলেকট্রনিকস নিয়েই মেতে থাকেন, আর সেইজন্যেই আজ উনচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত ক্ষণপ্রভার প্রেমে মশগুল দেবব্রতর বিয়ে করে সংসারী হওয়াটাই ঘটে উঠলো না।

উচ্চতর শিক্ষার জন্যে দেবব্রতর ইচ্ছে ছিল আমেরিকা যান, কিন্তু সুরেন্দ্রমোহন সেটা নামঞ্জুর করে ছেলেকে পাঠালেন ইংল্যান্ডের 'নর্দার্ন পলিটেকনিক'-এ। এটা হলো ১৯৪৮-এর কথা।

দেবব্রত সবে সেখানে পড়াশোনায় মন দিয়েছেন এমন সময়ে দেশ থেকে নিদারুণ এক দুঃসংবাদ এলো। সেই বছরের ১১ অক্টোবর সুরেন্দ্রমোহন দেহত্যাগ করলেন। মায়ের আদেশে শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখেই দেবব্রত কলকাতায় ফিরে এলেন।

তারপরে একে একে কাকারাও গেলেন—অজিতমোহন গেলেন ১৯৬০-এ, বিষ্ণুপদ একষট্টিতে আর যোগীন্দ্রমোহন চৌষট্টি সালে। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের গুরুদায়িত্ব এসে পড়লো ৩৫ বছর বয়স্ক দেবব্রতর ওপর। সেটা কিন্তু এমন সময়ে এসে পড়লো যখন একটানা দশ বছর ধরে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের লোকসানের পর লোকসান হয়ে মোটা রিজার্ভ ফান্ডের সবটাই ধুয়ে মুছে গেছে।

আরও পরে মোড় ফিরে মন্থর অগ্রগতিতে ১৯৬১ পর্যন্ত না-লোকসান না-লাভ এই পরিস্থিতিতে কাজ চললো। উল্লেখযোগ্য লাভ আবার হতে আরম্ভ হলো ১৯৬২ থেকে। এই বিষয়ে দেবব্রতবাবুর যোগানো তথ্যের কিছুটা আমি লিপিবন্ধ করছি। বিক্রির অঙ্কগুলি আমি নিয়েছি ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠান যখন 'বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড'-এ পরিণত হলো তখন থেকে, আর কম্পানির বর্তমান আর্থিক অবস্থা মোটামুটি বোঝাবার জন্য কয়েকটি অঙ্ক নিয়েছি চৌষট্টি ও সাতষট্টির ব্যালেন্স-শীট থেকে।

বিক্রির অঙ্ক

১৯৪১	...	...	...	৪০,৪২,০০০৲ টাকা
১৯৬০	...	...	...	৬০,০৫,০০০৲ টাকা
১৯৬৫	...	...	...	১,০৫,২১,০০০৲ টাকা
১৯৬৭	...	...	...	১,১৮,৬০,০০০৲ টাকা

ব্যালেন্স-শীটের ছবি

সাল	পেড-আপ্ ক্যাপিট্যাল	রিজার্ভ ও উদ্বৃত্ত	নীট লাভ
১৯৬৪	১৪,০০,০০০৲	১৪,৭০,০০০৲	৫,৫৪,০০০৲
১৯৬৭	১৪,০০,০০০৲	২০,০০,০০০৲	৭,০৫,০০০৲

উল্লেখ্য বিষয় এই হলো যে, অর্ডিনারি শেয়ারের ওপর ৮।১০ পারসেন্ট ডিভিডেন্ড দিয়ে এ'রা রিজার্ভ ফান্ড বাড়াবার দিকেই নজরটা বেশী রেখেছেন। এইভাবে সোনার ডিম-পাড়া হাঁসটিকে জিইয়ে রাখাটাই কৃতী শিল্পপতিত্বের লক্ষণ। অদূরদর্শীদের হাতে পড়ে এই রকম কাঠামোর কম্পানির ডিভিডেন্ড অনেক বেশী দেওয়া হতো। এই বছরেই বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফে শ্রমিক আন্দোলনের জন্য পাঁচমাস বন্ধ থেকে নতুন করে যে কত লক্ষ টাকা লোকসান হলো তা কে বলতে পারে : তা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত রিজার্ভ ফান্ড এ'দের রক্ষাকবচ।

কেউ বলতে পারে না যে, কখন কীভাবে কোন্ প্রতিষ্ঠানের বিপদ ঘটতে পারে। আজকাল শ্রমিক মালিক বিরোধের মহামারী তো লেগেই আছে, মন্দা বাজারের ব্যাধিও কঠিন রূপ নিয়েছে, উপরন্তু সেদিন যে ধ্বস আর প্লাবনে উত্তরবঙ্গে এক খণ্ড-প্রলয় হয়ে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারালো আর শত শত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়ে গেল সে রকম আকস্মিক বিপদের জন্যেও প্রাজ্ঞ শিল্পপতির হুঁশিয়ার থাকা কর্তব্য। যতদূর মনে পড়ে বেশ কয়েক বছর আগে আসামের একটি প্রকাণ্ড স' মিল (করাত-কল) ব্রহ্মপুত্রের প্রবল বন্যায় এইভাবে প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শুনেছিলাম যে, সেই পুরনো লিমিটেড কম্পানির ইংরেজ ম্যানেজিং এজেন্সী বহুকাল ধরে এত বড় রিজার্ভ ফান্ড জমিয়ে রেখেছিলেন যে কারখানাটা প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও অংশীদাররা ক্ষতিগ্রস্ত হননি; অথবা তাঁদের ক্ষতি হলেও তা সামান্যই হয়েছিল।

মানুষের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সবকিছুর বিরুদ্ধেই লড়বার ক্ষমতা রাখতে গেলে বাংলা দেশের বিজ্ঞ শিল্পপরিচালকদের এখন আরও সাবধান হতে হবে। (কাগজে পড়লাম যে ভবিষ্যতে প্লাবনের প্রকোপ থেকে বাঁচতে হলে জলপাইগুড়ি শহরটিকেই স্থানান্তরিত করতে হবে। কিছুটা সি এম পি ও-র লবণ হ্রদ পরিকল্পনা এবং খানিকটা ভারত সরকারের তিনটি পাঁচসালা সেচপরিকল্পনার কল্যাণে আমাদের সাধের কলকাতা আর বাংলা দেশের কতকগুলি বড় বড় শহরকেও না শেষে বন্যার ভয়ে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়!)

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় কিন্তু খাদ নেই। হঠাৎ একটা বিরাট প্ল্যান করে কাজ করতে গিয়ে সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার মতো নির্বোধ তাঁরা নন। বাজার বুঝে, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিচার করে কর্তৃপক্ষ এগিয়ে চলেছেন। আগে তাঁরা যে অ্যান্টি-করোসিভ রাবার কম্পাউন্ড তৈরি করে বাজারে বিক্রি করতেন এবং সেই রাসায়নিক দ্রব্যটি ব্যবহার করে অন্যরা ট্যাংক-লাইনিং করে প্রচুর লাভ করতেন, এখন বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ সোজাসুজি সেই ট্যাংক-লাইনিংয়ের পুরো কাজটিই শুরু করেছেন।

নানারকমের রাবার রোলার (যেমন, ছাপাখানার রোলার) তৈরিও তাঁদের বর্তমান কার্য-সূচীর অন্যতম।

বাতাসে ফোলানো রাবারের ভেলা বা নৌকো, সামরিক প্রয়োজনে নির্মিত ভাসমান সেতুর পনটুন—অর্থাৎ সহজ ভাষায় যাকে বলা হয় ইনফ্লেটেবল্ রাবার গুডস্—সেইসমস্ত জিনিসও এখন এখানে তৈরি হচ্ছে।

মোট কথা এ'রা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রাবার গুডস্ তৈরিতে দ্রুত এগোচ্ছেন।

ভারতবর্ষে বর্তমানে কাঁচামালের, মানে রাবারের অপ্রতুলতার কথা আমি তুলেছিলাম। উত্তরে সেক্রেটারি দাস মহাশয় বললেন যে, সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টায় কৃত্রিম রাবার তৈরি যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে শীঘ্রই কাঁচামালের অভাব মোচন হবে। অবশ্য, বেরিলির সিনথেটিক অ্যাণ্ড কেমিক্যালস্ কম্পানি এখন যে সুগার অ্যালকোহল থেকে কৃত্রিম রাবার তৈরি করেন, নতুন নতুন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তা হবে না। সেই সিনথেটিক রাবার হবে পেট্রল বেজ্‌ড্ অর্থাৎ পেট্রো-কেমিক্যাল শ্রেণীর রসায়নসঞ্জাত।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের ভালো ব্যালেন্স শীটের জন্যে শ্রীদেবব্রত বসু ছাড়াও বাকী তিনজন ডিরেক্টর প্রশংসার যোগ্য। তাঁরা হলেন জি ডি ব্যানার্জি কম্পানির কর্ণধার শ্রীমোহনকুমার মুখোপাধ্যায়, সেন-র‍্যালে ও ন্যাশান্যাল ট্যানারির শ্রীসঞ্জয় সেন এবং এস টি এম-এর শ্রীঅমিতাভ পালচৌধুরী।

সঙ্গে আছেন সুরেন্দ্রমোহনের ভ্রাতৃব্যত্রয় শ্রীঅসীম, শ্রীঅজয় ও শ্রীমোহিত বসু, আর আছেন কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মচারী, যাঁদের সহায়তা ব্যতিরেকে ডিরেক্টরবৃন্দ বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের সুষ্ঠু পরিচালনায় সফল হতে পারতেন না।

ব্যক্তিগতভাবে আমি দু'জন কর্মচারীর কাছেও কৃতজ্ঞ—শ্রীপূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীজয়রামন: প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে বিবিধ তথ্য সংগ্রহে এ'রা আমাকে খুব সাহায্য করেছেন। তার মধ্যে একটা হলো শ্রীদেবব্রত বসুর নানা বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান এবং জনকল্যাণমূলক সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার বিবরণ। তিনি 'ইণ্ডিয়ান রাবার ইণ্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রাক্তন সভাপতি, গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ও কলেজের পরিচালক সমিতির সভ্য, সেন অ্যাণ্ড পণ্ডিত ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রভৃতি একাধিক কম্পানির ডিরেক্টর এবং রোটারি ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সভ্য।

আপাতত এই পর্যন্তই থাক। এই সব প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে বলার অনেক কিছু বাকী থেকে যায় এবং এ'দের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বক্তব্যও গড়ে ওঠে দিনে দিনে। তবু আমি মনে শান্তি পেলাম এই জন্যে যে, অকথিত একটি রমণীয় কাহিনী—সুরেন্দ্র-মোহন বসুর কীর্তিকাহিনী এতদিনে আমি বলতে পারলাম।

২৬ অক্টোবর, ১৯৬৮



চব্বিশ

হোমো স্যাপিয়েনস্—চিন্তাশীল মানুষ, অর্থাৎ বস্তুবিচারের বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষ, পৃথিবীতে ঠিক কবে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেটা পণ্ডিতরাও হলফ করে বলতে পারেন না। মনে হয় লাখ পাঁচেক বছর আগে 'এপ' বা লাঙ্গুলহীন বানরজাতির কোনো কোনো অংশ বিবর্তনের ধারায় উপমানবের রূপ নিয়েছিল। সোজা শিরদাঁড়া, পুরু মাথার খুলি আর এক বিন্দু মেধা নিয়ে সেই উলঙ্গ বানরমূর্তি 'নিয়ার-মেন' বা পাইথেক্যানথ্রোপ জীবনধারণ ও আত্মরক্ষার জন্য বানরসুলভ নখদন্ত ব্যবহার বর্জন করে পাথর ভেঙে কুঠারের মতো হাতিয়ার তৈরি করলো। সে হাতিয়ারের হাতল ছিল না; কারণ সেই বনমানুষের যেটুকু জ্ঞানের উন্মেষ হয়েছিল তা দিয়ে বেশি কিছু উদ্ভাবনের সামর্থ্য তার ছিল না। সেই হাতল-বিহীন পাথরের কুঠারই উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগের প্রথমতম টুল বা হাতিয়ার। প্রত্নতাত্ত্বিক আর নৃতাত্ত্বিকরা চীন দেশে 'দি পিকিং ম্যান'-এর এবং যবদ্বীপে 'দি জাভা ম্যান'-এর এই আদি কারিগরীর নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন। (কী বিচিত্র এই চীন দেশ, কী বিবর্তন! পিকিং ম্যান থেকে মাওৎসেতুং—ভাবলেও অবাক হতে হয়।)

আমাদের ভারতবর্ষ, তথা বাংলা দেশও কম যায় না। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে গন্ধেশ্বরী নদীর শুষ্ক বক্ষ সংলগ্ন ভূমিতে প্রত্নপ্রস্তর যুগের (ওল্ড স্টোন এজ-এর) যে-সব পাথরের কাটারি-কুঠার আবিষ্কৃত হয়েছে, সে সমস্তও লক্ষাধিক বছরের পুরনো বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন।

তারপর এলেন 'দি ডন পিপ্‌ল', 'ঊষার মানব'—প্রায় পাইথেক্যানথ্রোপের মতো ছোট মাথার পুরু খুলিতে আরও কয়েক বিন্দু মস্তিষ্ক নিয়ে তাঁদের আবির্ভাব হলো। অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক জন্তু জানোয়ারের এবং ভিন্ন গোষ্ঠীর আদি মানবের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা, আহার্যের জন্য শিকার আর গুহার দেয়ালে চিত্রকলার জন্য তাঁরা নিয়ার-মেন-এর মোটা হাতিয়ারের চাইতে কিছুটা উন্নত ধরনের অস্ত্র আর যন্ত্র সেই পাথর ভেঙেই করলেন।

মানবজাতির ব্রাহ্মমুহূর্তের এইসব আবিষ্কারের আনুমানিক কালও নির্ণীত হয়েছে। কাল—আড়াই লক্ষ বছর আগে প্রথম ও দ্বিতীয় তুষার যুগের অন্তর্বর্তী গ্রীষ্মকাল। স্থান—পৃথিবীর নানা অঞ্চল।

'নিয়ানডার্থাল' মানবের উৎপত্তি হয়েছিল বর্তমান জার্মেনীর রাইন নদের অববাহিকায়। মাথায় তাঁদের ঘিলুর ওজন আরও একটু বেড়েছিল। কত হবে, এক কাঁচ্চা? তাই দিয়ে তাঁরা আরেকটু ভালো করে যন্ত্রপাতি তৈরি করলেন।

অতঃপর, মানে হাজার বিশেক বছর আগে, ক্রোমানিয়ন মানবজাতি জন্ম নিলেন। চেহারা, বুদ্ধি আর স্বভাবগুণে তাঁরাই আমাদের নিকটতম বলে কেউ কেউ বলেন; আবার একদল নৃতাত্ত্বিক বলেন যে ক্রোমানিয়নরা ছিলেন পশমী চুলঅলা নিগ্রয়েড শ্রেণীর। আফ্রিকা, আন্দামান (উলঙ্গ জারোয়া আর অর্ধোলঙ্গ ওংগে অধ্যুষিত) এবং অস্ট্রেলীয় ও নিউগিনির (মেলানেশিয়ান) আদি মানবরা এই ক্রোমানিয়ন কুলের বংশধর কিনা তা পণ্ডিতরা বলতে পারেন। দক্ষিণ আমেরিকাতেও এখনো কিছু কিছু আদিমানব আছেন যাঁরা লজ্জানিবারণের কথা আদৌ ভাবেন না। বন্যপশুর জন্য সংরক্ষিত বনাঞ্চলে কোনো কোনো গোষ্ঠীর বসতি বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। নৃতাত্ত্বিকদের পর্যবেক্ষণ ছাড়া আর কোনোরকমে তাঁদের জ্বালাতন করা হয় না। দক্ষিণ আমেরিকার এই আদিম জাতির নারীরা সুন্দরী ও সুদেহী। আজকের সভ্যজগতের উঠতি রেওয়াজ টপ-লেস্‌কে হার মানিয়ে এঁরা সম্পূর্ণ নগ্নিকা; কিন্তু সেই নগ্নতায় ইতরতার লেশমাত্র নেই।

ক্রোমানিয়ন মানুষই বোধ হয় ফ্লিন্ট অর্থাৎ চকমকি পাথরের ব্যবহার করলেন সর্বপ্রথম--অস্ত্র ও হাতিয়ার তৈরি আর আগুন জ্বালানোর কাজে।

তারপরে, হাজার আষ্টেক বছর আগে নব-প্রস্তরযুগে (নিউ স্টোন এজ-এ) পাথরের আরও সব 'স্মল টুলস্' চালু হলো। সিরিয়ার রাজধানী ডামাস্কাস হলো অতীতের 'শাম্'। (সেখানকার প্রাচীন সভ্যতার অপূর্ব এক নিদর্শন হচ্ছে আমার লোলুপরসনার প্রিয় শাম্-ই-কাবাব)। মাসখানেক আগে ডামাস্কাসের কাছ 'তাল রামাদ' নামে এক পাহাড়ী জায়গায় সাত আট হাজার বছরের পুরনো প্রাগৈতিহাসিক মানবের এক বসতির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে। ফরাসী আবিষ্কারক আঁরি দ্য কংতাস বলেছেন যে, তাল-রামাদের মানুষ স্থাপত্য ও যন্ত্রপাতির প্রবর্তনে সে যুগের চরম উৎকর্ষে উপনীত হয়েছিল।

ছ' হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়ার আদম ও হবা-র ইডেন উদ্যানের কাছাকাছি তামা ধাতুটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। তামার সঙ্গে সীসে ও টিন মিশিয়ে তৈরি হলো ব্রোঞ্জ। এই সময়েই মনে হয়, হাতিয়ার নির্মাণে ধাতুর ব্যবহার হলো সর্বপ্রথম। প্রত্নতাত্ত্বিকরা সে কালটির নাম দিয়েছিলেন 'ব্রোঞ্জ এজ'। সে যুগের কুশলী যাযাবর শিল্পীরা দেশে দেশে ঘুরে ধাতুর হাতিয়ার তৈরি করে দিয়ে আসতেন। সব দেশেই তাঁদের সমান আদর ছিল। কোনো দেশের স্থানীয় লোক সেই ওস্তাদদের নেকনজরে পড়লে ওস্তাদরা তাঁদের গুপ্ত মন্ত্র এই পেটোয়া

লোকদের শিখিয়ে দিয়ে যেতেন—খানিকটা রামপুরের উজীর খাঁ সাহেবের কুমিল্লার আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবকে সঙ্গীত শিক্ষা দেবার মতো, অনাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও।

কিন্তু পাথর তামা ব্রোঞ্জকে হারিয়ে দিল তিন হাজার বছর আগেকার লোহা আবিষ্কার। তারপরে এলো ঢালাই-লোহা, ইস্পাত, হাইস্পীড স্পেশাল স্টীল, কত কি! আমরা এখনও লৌহযুগেই আছি। (কেবল ধাতুটির জন্যেই নয়, হিটলার, সার্থকনামা স্ট্যালিন, এস্. কে. পাতিল, অতুল্য ঘোষ প্রমুখ লৌহমানবদের জন্যেও; মোরারজীভাইও আছেন, তবে তিনি কোন জাতের লোহা সেটা আমরা ইতরজনেরা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না)।

বাংলা দেশে নব-প্রস্তরযুগের পাথরের হাতিয়ার আবিষ্কারের উদাহরণ হলো অজয় নদের তীরে 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' আর আমাদের অজয় মুখুজ্যে মশায়ের দেশ মেদিনীপুরে পাওয়া পাথরের যন্ত্রপাতি। এই কালচারের নাম হয়েছে 'চাঁপাখাল বা চম্পাখাল সভ্যতা', সম্ভবত যার পরিণতি হয়েছিল তাম্রলিপ্তে অর্থাৎ বর্তমান তমলুকে।

আজকের মানুষ তার সুমহৎ এবং ভয়ংকর মনীষায় যান্ত্রিকতার চরমে পৌঁছেছে। একদিকে ইঞ্চির ১০,০০০ ভাগের এক ভাগ মাপের সূক্ষ্মতা বজায় রেখে জগতের হিতে যন্ত্রাংশ তৈরি করছে, আবার অন্যদিকে অশুভ ডেকে আনছে মহাপ্রলয় ঘটাবার ক্ষমতাযুক্ত মারণাস্ত্র নির্মাণ করে।

এত সব তত্ত্বকথা আমি ভাবছিলাম 'এস টি এম' অর্থাৎ 'স্মল টুলস্ ম্যানুফ্যাকচারিং কম্পানি অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের' ভি-আই-পি রোড মাণিকতলার কারখানা পরিদর্শনের সময়ে। স্ট্রীম্‌লাইনড্ গ্রাইণ্ডিং মেশিনের কার্বোরেণ্ডাম্ পাথরের চাকায় নির্মীয়মান যন্ত্রপাতির সংঘর্ষে উড়ন্ত আগুনের ফুলকি আমাকে আদিমানবের চকমকি পাথরের কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছিল; আর সেই স্মৃতিমন্থনের জন্যেই আমি আমার ভীষণ অল্পবিদ্যা দিয়ে ভূমিকাতেই আপনাদের পেছু হটিয়ে নিয়ে গেলাম সৃষ্টির আরম্ভযুগের স্তম্ভিত অন্ধকারের দিকে।

কলকাতায় একটি পুরনো বাঙালী প্রতিষ্ঠান আছে। তার নাম 'অ্যাংগাস্ কীথ্ অ্যাণ্ড কোং'। এই শতকের গোড়ার দিকে এটির মালিক ছিলেন দুজন স্কটল্যাণ্ডের বণিক। তাঁদের ব্যবসা ছিল জুট মিলের স্টোর্স সাপ্লাই। সে কালে বাংলা দেশের অধিকাংশ পাটকলেরই মালিক ছিলেন স্কচ্। স্কচরা খুব স্বজাতিবৎসল। অতএব দেশের লোকের পৃষ্ঠপোষকতায় অ্যাংগাস কীথ-এর ব্যবসা বেশ ভালোই ছিল।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধবার পর দেশপ্রেমিক অ্যাংগাস আর কীথ সাহেব স্বদেশের হয়ে লড়াই করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানটি বিক্রি করে চলে যাওয়া স্থির করলেন। তাঁদের এক পুরনো বাঙালী কর্মচারী স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র দত্ত তখন টাকার যোগাড় করে কম্পানিটা কিনে নিলেন।

প্রকাশবাবুর ছোট ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স তখন বছর চব্বিশ। তিনি বছর দুই আগে 'অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল সেণ্ট্রাল রেভিনিউ'-এর অফিসের সরকারি চাকরিতে ঢুকেছিলেন। যুদ্ধের

বাজারে অভিজ্ঞ প্রকাশচন্দ্রের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা যখন বেশ বেড়ে গেল, তখন একার পক্ষে কাজ সামলানো কঠিন হয়ে পড়লো বলে, ১৯১৬ সালে প্রকাশচন্দ্র ছোট ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথকেও চাকরি ছাড়তে রাজী করিয়ে অ্যাংগাস কীথে টেনে নিলেন।

দুই ভাই ব্যবসা আরও বাড়ালেন। জুট মিলের সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াও অ্যাংগাস-কীথ তখন থেকে রেঞ্চ-হাতুড়ি, ডাই-স্টক প্রভৃতি স্মল টুলস্ আমদানি করতে লাগলেন। এটা তাঁদের একটা নতুন লাইন হলো।

১৯৩৬ সালে প্রকাশচন্দ্রের মৃত্যুর পর দ্বিজেন্দ্রনাথই অ্যাংগাস-কীথের কর্ণধার হলেন। বিশ বছর ধরে স্মল টুলস্ ঘেঁটে ঘেঁটে দ্বিজেনবাবু তখন পাকা লোক হয়ে উঠেছেন; আর মনে জেগেছে তাঁর আর একটি বাসনা—আমদানির ওপর নির্ভর না করে একটা যন্ত্রনির্মাণের কারখানা খোলার আগ্রহ। কিন্তু বৃটিশ আমলে তার সম্ভাবনা প্রায় ছিলই না বলে তাঁর ইচ্ছেটা মনে মনেই রয়ে গেল। দেশ স্বাধীন হবার পরে দ্বিজেন্দ্রবাবু নতুন উদ্যমে এতদিনের চেপে রাখা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি 'স্মল টুলস্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং অব ইণ্ডিয়া' নামে একটি লিমিটেড কম্পানি স্থাপনা করে কাজ শুরু করে দিলেন।

আটাত্তর বৎসর বয়স্ক প্রবীণ দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বর্তমান পরিচালকদের সমস্যা সমাধানে মাঝে মাঝে পরামর্শ দেওয়া ছাড়া আজ আর আইনত এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নেই। কিন্তু বাঙালীর কর্তৃত্বে বাংলা দেশের এক বিশিষ্ট 'স্মল টুলস্'-এর ফ্যাক্টরির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে এই শিল্পোদ্যোগের ইতিহাসে তাঁর নাম সসম্মানে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি স্মল টুলস্ বিষয়ে বাঙালী কির্লোস্কার। আমার আজকের প্রবন্ধের আখ্যানভাগে সেইজন্যে তাঁর কথাই প্রথমে লিখলাম।

প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসটা আমাকে বলতে শুরু করেছিলেন এস টি এম-এর টেকনিক্যাল ডিরেক্টর শ্রীদেবপ্রসাদ রায়। ইনি কলকাতার বি. এস-সি. এবং শিবপুরের মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার। ১৯৪৮ থেকে ৫০ সাল পর্যন্ত দু বছর ম্যাঞ্চেস্টারের 'ইংলিশ স্টীল' ও 'লেমন আর্চার অ্যাণ্ড লেন' এবং সুইজারল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ রাইস্হাওয়ার টুল ওয়ার্কস-এ দেবপ্রসাদ যন্ত্রবিদ্যায় উঁচু ঘরানার তালিম নিয়ে এসেছিলেন। বিলেত যাবার আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দেবপ্রসাদ কিছুদিন বাংলা সরকারের 'হোম ট্রান্সপোর্ট' ডিপার্টমেণ্টেও কাজ করেছিলেন।

তখন মোটরের পেট্রলের খুব অভাব পড়েছিল বলে সরকার পেট্রল রেশনিং করেন। বড় বড় গাড়ি পিছু মাসে ১২ গ্যালন (৬০ লিটার আন্দাজ) পেট্রল পাওয়া যেতো: সেইসব গাড়ির পক্ষে ওই ১২ গ্যালন ছিল ৩।৪ দিনের খোরাক। অনেক ধনীলোক এবং বড় সরকারি চাকুরে তখন গাড়ি গ্যারাজে তুলে রেখে সাইকেল বা ট্রামে বাসে চলাফেরা করতেন। 'সেন-র‍্যালের' স্বর্গীয় সুধীর সেন মশায় তাঁর ৫০।৫২ বছর বয়সেও যে সেদিন সাইকেল করে দিনে ১৩।১৪ মাইল যাতায়াত করতেন সে কাহিনী আপনাদের আমি ইতিপূর্বে শুনিয়েছি। লোকসভার কমিউনিস্ট সদস্য শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত মশায়ের দাদা, তখনকার নামজাদা সিভিলিয়ান রণজিৎ গুপ্ত, আই. সি. এস. মহাশয়কেও আমি প্রায়ই দেখতাম রাইটার্স বিল্ডিং থেকে বিকেলবেলা সাইকেলে

করে ফিরছেন রেড রোড ধরে। তাই বলে ভাববেন না যে কলকাতার পথ চলা নিরাপদ ছিল। অসংখ্য মিলিটারি গাড়ি আর লরির তীর বেগে শহরে দৌড়ে বেড়ানোর জন্যে এখনকার চাইতে তখন রাস্তাঘাট বেশি বিপজ্জনক ছিল।

সেই সময়ে পেট্রলের বদলে মোটরকার চালাবার এক বিকল্প ব্যবস্থা হলো। গাড়ির পেছনে কাঠকয়লার চুল্লি বসিয়ে তার গ্যাসে মোটরের এঞ্জিন চালানো হতো। তাকে বলা হতো 'প্রোডিউসার গ্যাস প্ল্যান্ট'। বেশ চলতো গাড়িগুলো এই গ্যাসে। দুম্বা ভেড়ার অতিরিক্ত মাংস-পিণ্ডের মতো পশ্চাতে এই প্রোডিউসার গ্যাসের বাক্স বয়ে বয়ে কলকাতায় তখন অনেক গাড়ি বাস আর লরি ছুটে বেড়াতে শুরু করলো।

এই প্রোডিউসার গ্যাস প্ল্যান্টের কথা, একটু অবান্তর হলেও, এখানে উল্লেখ করার কারণ আছে। কলকাতায় তিনটি প্রতিষ্ঠান এই কলটি তৈরি করতেন। তার মধ্যে দুটি ছিল বাঙালীর। একটি হলো কংগ্রেস নেতা খগেন দাশগুপ্ত মশায়ের 'ইন্ডো-সুইস ট্রেডিং কম্পানি'; আরেকটি স্বর্গীয় জে. আর. ঘোষ মশায়ের 'আইডিয়াল গ্যাস প্ল্যান্ট', যাতে আর্থিক সহযোগিতা করেছিলেন বিখ্যাত সংগীত পরিচালক জ্ঞানপ্রকাশ এবং যশস্বী অভিনেতা চারুপ্রকাশ ঘোষ মহাশয়রা চার ভাই। তাঁদের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান 'রেডিও সাপ্লাই স্টোর্স' আইডিয়ালের সোল ডিস্ট্রিবিউটর ছিলেন। বাঙালীর মাথায় চিরকালই যে কত কিছু খেলে এসেছে তারই এক নিদর্শন এটা।

দেবপ্রসাদের ওপর লরি আর বাসে ব্যবহৃত গ্যাস-প্ল্যান্ট সরকারিভাবে পরীক্ষা করে ছাড়পত্র দেবার ভার ছিল।

দ্বিজেন দত্ত ছিলেন দেবপ্রসাদের পিতৃবন্ধু। আটচল্লিশ সালে দ্বিজেনবাবু বন্ধুপুত্রকে এস টি এম-এ নিলেন এবং তার অল্প পরেই দেবপ্রসাদ স্মল টুলস্ বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত গেলেন। তাঁর জ্ঞান ও অধ্যবসায়ের জন্যেই তিনি আজ এস টি এম-এর উৎপাদন বিভাগের কর্তা। তাঁর সঙ্গে আছেন ওয়ার্কস ম্যানেজার শ্রীপ্রভাস মিত্র এবং প্রোডাকশন ম্যানেজার শ্রীহিমাংশু ব্যানার্জি। প্রভাসবাবুও শিবপুরের মেটালার্জির (ধাতুবিদ্যার) স্নাতক এবং ইংল্যান্ড, জার্মেনী ও সুইজারল্যান্ডে স্মল টুলস্ বিষয়ে শিখে এসেছেন। আর হিমাংশুবাবু সরকারি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে এইসব টুলস্ নির্মাণে হাত পাকিয়ে এখানে এসেছিলেন। উপরন্তু তিনি মেরিন এঞ্জিনীয়ার হিসেবে কয়েক বছর জাহাজেও কাজ করেছিলেন।

১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে বিদেশ থেকে সামান্য কয়েকটা মেশিন আনিয়ে দ্বিজেনবাবু কাজ আরম্ভ করলেন। সেই বছরেই এক মণিকাঞ্চন যোগ হলো। আমাদের মাননীয়া ইলা পালচৌধুরী, এম. পি. মহোদয়ার পরলোকগত স্বামী অমিয় পালচৌধুরী মহাশয় এস টি এম-এর অনেক শেয়ার কিনে ডিরেক্টর হিসেবে যোগ দিলেন। সঙ্গে তাঁর ছোট ভাই শ্রীরণজিৎ পালচৌধুরীও এলেন।

কৃষ্ণনগর-মহেশগঞ্জের পালচৌধুরী বংশের বিশদ পরিচয় বাঙালী পাঠকের কাছে নিষ্প্রয়োজন, কারণ ইলা দেবীর পরিচিতির মাধ্যমে তার বহুল প্রচার হয়ে গেছে। ব্যবসাজগতে

বাঙালী চা-করদের মধ্যে এ'দের বিশিষ্ট আসন। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং-এর পথে পা বাড়ালেই ছোট গাড়ির রেল লাইন আর মোটরের রাস্তার ডানহাতি, সকলের চোখে-পড়া মোহরগং চা-বাগিচাটি, তার সংলগ্ন গুল্মা বাগান এবং ডুয়ার্সের ওয়াশাবাড়ি বাগিচা পালচৌধুরীদের পারিবারিক সম্পত্তি। তিনটির মোট আয়তন ২৩০০ একর অর্থাৎ প্রায় ৭০০০ বিঘা।

এস টি এম-এর পরিচালনায় এই পালচৌধুরীরাই হলেন দ্বিজেনবাবুর উত্তরসাধক। এখন স্মল টুলস্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড-এর ৮২ পারসেন্ট শেয়ারেরই মালিক এ'রা। ব্যক্তিগত কারণে দ্বিজেনবাবু বাহান্ন সালে এস টি এম-এর শেয়ার পালচৌধুরীদের কাছে বিক্রি করে কেবল তাঁর 'অ্যাংগাস কীথ' নিয়েই রইলেন।

এমনিতেই এস টি এম-এর তৈরী জিনিসের বাজারে বেশ চাহিদা হয়েছিল, পালচৌধুরীদের হাতে আসার পরে উন্নতির গতি আরও বেড়ে গেলে। ১৯৬৭-র ৩০ জুনের ব্যালেন্স শীটের কয়েকটি অঙ্ক থেকেই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা বোঝা যায়।

পেড-আপ ক্যাপিট্যাল	১৪,৫৩,০০০ টাকা
রিজার্ভ	৩২,২৯,০০০
ধার দেনা	৩৩,০০,০০০
সম্পত্তির (জমিবাড়ি, মেশিনারী ইত্যাদির) ক্রয়মূল্য	৯১,৮০,০০০
* ঐ—ডেপ্রিসিয়েশনের পর এখন	৪৫,৪৩,০০০

ইনকাম-ট্যাক্স ইত্যাদি বাদ দিয়ে সংরক্ষণ ও বণ্টনের জন্য লাভের অঙ্ক—৫ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা

স্বর্গীয় অমিয় পালচৌধুরী ও শ্রীমতী ইলা দেবীর দুই ছেলে। বড় অমিতাভ এখন এস টি এম-এর কর্ণধার। দার্জিলিং সেণ্ট পলস্ স্কুল এবং কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র অমিতাভ ধাতুবিদ্যায় (মেটালার্জিতে) ইংল্যাণ্ডের ওয়েলস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি। কৃষ্টিবান ধনী পরিবারের সন্তান—উচ্চশিক্ষার সুযোগের পুরোটাই কাজে লাগিয়েছেন, সেটা বড় কথা নয়। যেটা আমার মনে দাগ কাটলো, তা হলো শ্রীমান অমিতাভের সৌজন্য আর সহজ ভাষায় কথাবার্তা। এই উনচল্লিশ বছর বয়স্ক যুবকটির দম্ভ তো নেই-ই উপরন্তু, রসিকতা ও রসগ্রাহিতা—সহজ বাংলা ভাষায়, চিবোনো দাঁতভাঙা ইংরেজীতে নয়—অমিতাভের সহজাত গুণ বলেই মনে হলো। এর আগে অমিতাভেরই সমগোত্রীয় দুচারজন কৃতী বাঙালী যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে যাঁরা বাংলা ভাষাটাকে সেকেণ্ড কেন, ফিফথ্ ল্যাংগুয়েজের মতো ব্যবহার করে থাকেন, আর নমস্কারের উত্তরে 'নড্' করেন। তাঁরাও গুণে বা সৌজন্যে কম ন'ন, কিন্তু তবুও তাঁদের সান্নিধ্যে এই গণ্ডারের-চামড়া আমিও যেন স্বচ্ছন্দ হতে পারি না। কিন্তু ইনি ইলা দেবীর ছেলে তো! এ'র ব্যবহারই আলাদা।

* ডিভ্যালুয়েশনের পর আজ এমন একটি কারখানা বসাতে খরচ হবে এর তিনগুণের কাছাকাছি।

শ্রীঅমিতাভ পালচৌধুরী এখন ইন্ডিয়ান এঞ্জিনীয়ারিং অ্যাসোসিয়েশনের মেশিন টুলস্ ও স্মল টুলস্ বিভাগের উপ-সভাপতি, এঞ্জিনীয়ারিং এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিলের কর্ম-সমিতির সভ্য, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার স্থানীয় ডিরেক্টর বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বারের কর্ম-সমিতির সভ্য, সেন অ্যান্ড পণ্ডিত, বেঙ্গল ল্যাম্প এবং বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ কম্পানির ডিরেক্টর। তার মানে, তিনি বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যজগতে উদিত ভানু এবং ভারতের এক উদীয়মান তারকা।

এস টি এম-এর যে একটি কন্যা আছে সে কথাটা আমার জানা ছিল না। তার নাম ট্যাপস্ অ্যান্ড ডাইজ লিঃ। অমিতাভের কাছেই সেটা শুনলাম। কন্যা মানে, সেই কম্পানির অনেক শেয়ার এস টি এম-এর কেনা এবং উৎপাদনের ব্যাপারেও দুই সংস্থা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ১৯৫৭ সালে পালচৌধুরীরা এই কম্পানির স্থাপনা করেছিলেন। দেবপ্রসাদ রায় এটারও ডিরেক্টর। এঁদের কারখানাটি কৃষ্ণনগরে। তার তত্ত্বাবধান করেন অমিতাভের ছোট ভাই শ্রীঅনীক পালচৌধুরী। তাঁর বয়স চৌত্রিশ। দাদার মতো তিনিও দার্জিলিং সেণ্ট পলস্ ও কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ে বিলেত গিয়েছিলেন। মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হয়ে দেশে ফিরেছিলেন।

শ্রীঅনীক পালচৌধুরী 'ইন্ডিয়ান এঞ্জিনীয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন'-এর 'টি মেশিনারি' বিভাগের কমিটি মেম্বার ছাড়াও কয়েকটা চা-কম্পানির ডিরেক্টর। সৌজন্যে তিনিও দাদার মতন।

টি এ ডি-র (ট্যাপস্ অ্যান্ড ডাইজ-এর) কারখানাটি ছবির মতো। বিস্তৃত এক আমবাগানের শ্যামল পরিবেশে এই ফ্যাক্টরির অবস্থান। কর্মীরা অনেকেই স্থানীয় কৃষক পরিবারের সন্তান। তাই ধান বোনা আর কাটার সময়ে কারখানা প্রায় ফাঁকা হয়ে যাবার উপক্রম হয়। রেঞ্চ হাতুড়ি আর মেশিন ফেলে তাঁরা সকলে নিড়েন আর কাস্তে হাতে মাঠে ছোটেন। তখন লোকাভাবে কর্তারা বেশ মুশকিলে পড়ে যান।

টি এ ডি-র কার্যক্রমে স্মল টুলস্ তৈরি ছাড়াও একটি বিশেষ মেশিন তৈরিও আছে। সেটা হলো চা-বাগিচার জন্যে সি. টি. সি. মেশিন নির্মাণ। সি. টি. সি. অর্থাৎ চা-এর পাতা শুকিয়ে সেঁকে নেবার পর ক্রাসিং, টিয়ারিং এবং কার্লিং করার প্রণালীটি বেশি দিনের নয়। মাত্র বছর বিশ-পঁচিশ আগে এর প্রবর্তন হয়েছে। তার আগে এই পদ্ধতি অজানা ছিল। আদি প্রণালীতে তৈরী চা-কে এখন বলে অর্থোডক্স অর্থাৎ 'সনাতনপন্থী' চা। সি, টি, সি-র চা-তে লিকার হয় গাঢ়, কিন্তু ফ্লেভার তেমন নয়। এই চা-এর প্রধান খদ্দের হলো ইংল্যান্ড। ইংরেজ জনসাধারণ কম খরচে বেশি লিকারের জন্যে এটি কেনেন। ভারতে তো প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়ই, পাকিস্থান, সিংহল, পূর্ব আফ্রিকা, নিউগিনি, আর্জেণ্টিনা প্রভৃতি দেশেও সি, টি, সি-র বেশ চল হয়েছে। টি এ ডি-র সি, টি, সি মেশিন এই সব দেশের মধ্যে অনেকেই কেনেন; ভারী সুনাম এই মেশিনের।

স্মল টুলস্ তৈরিতে এস টি এম এবং টি এ ডি ছাড়াও আরও কয়েকটি বাঙালী প্রতিষ্ঠান নাম করেছে। তাঁদের মধ্যে শ্রীপ্রণব নাগ পরিচালিত 'হিন্দুস্থান স্মল টুলস্' এবং শ্রী এস কে মজুমদারের 'স্টীল অ্যান্ড অ্যালায়েড প্রোডাক্টসের' কথা অমিতাভ বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন।

এস টি এম-এর মস্ত বড় কারখানার এপাশ থেকে ওপাশ পরিক্রমা করে বেড়ালাম। সারি সারি মেশিন—রকমারি লেদ, ড্রিল, থ্রেডিং, মিলিং ও গ্রাইন্ডিং মেশিন।

নাম শুনে যতটা 'বস্তু বিশ্ববক্ষোদংশ ধ্বংস-বিকট-দন্ত' মনে হয়, দেখতে কিন্তু আসলে তা নয়। ফ্যাক্টরির ভিতরে স্ট্রীমলাইনড্ মেশিনের বিন্যাস—সবই খাকির কাছাকাছি একটা রঙের। যেন ইউনিফর্মপরা এন. সি. সি-র মেয়েরা কুচকাওয়াজের জন্যে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। (মেশিনকে আমি নারীর সঙ্গে তুলনা করি, কারণ তারা পণ্যের জননী)।

চার্জহ্যান্ডদের (বিভাগীয় ইন-চার্জদের) মধ্যে প্রৌঢ় সমর বসু ও লোকেন জানা আর নানা বয়সের যুবক রাধাকান্ত প্রামাণিক, গুণেন ঘোষ, সুরেন সামন্ত, অমল রায়—সকলের সঙ্গেই আলাপ হলো। হীট ট্রিটমেন্ট-এর রতন দাস আবার রাজনীতি করেন; এ পাড়ার কংগ্রেসকর্মী। ভ্রাতৃগর্বে গর্বিত লোকেন জানার এক ভাই এম, এস-সি (টেক), জি ই সি-র উচ্চপদস্থ অফিসার এবং আর এক ভাই, তিনিও এম. এস-সি (টেক), সরকারি কাজে উচ্চপদে আছেন শুনে খুব ভালো লাগলো। দু'জনেই লোকেনবাবুর ছোট ভাই।

কারখানা রাতদিন চলে : তাই এক এক বেলার জন্যে একজন করে ফোরম্যান আছেন। তরুণ ফোরম্যান শ্রীরথীন দাশগুপ্তের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি সুশিক্ষিত; ফিজিক্সে কলকাতার এম. এস-সি আর ইংল্যান্ড জার্মেনীতেও উচ্চতর শিক্ষা লাভ করে এসেছেন।

হিমাংশু ব্যানার্জির সঙ্গে কারখানা পরিক্রমার সময়ে কর্মীদের দু' একটা কথা কানে আসছিল। মেল অ্যান্ড ফীমেল থ্রেডিং নিয়ে তাঁরা পরস্পর কী একটা টেকনিক্যাল আলোচনা করছিলেন। মেল ও ফীমেল থ্রেডিং কাকে বলে তা জানতে চেয়ে আমার জ্ঞানবৃক্ষের আরও একটি শাখা গজালো। হিমাংশুবাবু ব্যাখ্যা করে বললেন যে, নাট-বল্টুর মধ্যে নাট্-এর থ্রেডিং, অর্থাৎ ভেতরে প্যাঁচ কাটা হয়, তা হলো 'ফীমেল', আর নাটের মধ্যে যে বল্টু ঢুকিয়ে প্যাঁচে প্যাঁচে মিল খাওয়াতে হয় সেই বল্টুর প্যাঁচ কাটাকে বলে 'মেল' থ্রেডিং। যান্ত্রিক সেকসুওলজিটা আমার কাছে জলের মতো সহজ হয়ে গেল।

প্রতিষ্ঠানের আরও কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে পরিচয় হলো। স্টোরের সুবোধ মল্লিক এবং তাঁর ভাই, অন্যতম ফোরম্যান সুনীত মল্লিক; আর, এস টি এম-এর গোড়াপত্তন থেকেই যিনি আছেন সেই নরেশ সেন। নরেশবাবু নাকি ভালো গাইয়ে।

আমার যে আবার গাইয়ে বাজিয়েদের প্রতি দুর্বলতা আছে সেটা আপনারা জানেন। এস টি এম-এর সেক্রেটারি শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তীর কার্যসূচীতে আইনকানুন আর কম্পানি মিটিং-এর সঙ্গে সঙ্গে মাথুর আর নৌকাবিলাসও চলে শুনে তাঁর প্যান্ট শার্ট পরা নধর অথচ বলিষ্ঠ দেহটিতে মনে মনে আমি ধুতি-উত্তরীয় চড়িয়ে, কপালে চন্দন তিলক পরিয়ে, হাতে তুলে দিলাম ভারী এক জোড়া করতাল—হ্যাঁ, মানায় বটে!

'স্মল টুলস্' এবং 'ট্যাপস্ অ্যান্ড ডাইজ'-এর কারখানা ও অফিস মিলিয়ে যথাক্রমে ৪৭৫ ও ১৭৫ কর্মীর মধ্যে শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জনই বাঙালী। লোকে বলে বাঙালী অক্ষম, অপদার্থ—কিন্তু সে অপবাদটা যে কত বড় মিথ্যা তা প্রমাণিত হচ্ছে অমিতাভ-দেবপ্রসাদ-

অনীকদের নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রিসীশন যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, ট্যাপ, ডাই, চেজার ও ড্রিল, যে পুরোপুরি বাঙালী কারিগরের হাত দিয়ে বেরোচ্ছে, সেই সত্যটির মধ্য দিয়ে।

তবে হ্যাঁ, 'ব্ল্যাকমার্কেট-ওরিয়েনটেড' শিল্প ও বাণিজ্যে বাঙালী যে বড্ড পিছনে পড়ে আছে সে কথাটা ঠিক।

১৯৫১ সালে এস টি এম-এর বিক্রি হয়েছিল সাকুল্যে ২৫,০০০ টাকার; সেই জায়গায় ১৯৬৭-তে বিক্রির অঙ্ক দাঁড়িয়েছিল ৬৩,৫০,০০০্ টাকায়।

১৯৬০ সালে টি এ ডি-র বিক্রি ছিল ১০,০০০্ টাকার, আর চৌষট্টি থেকে সাতষট্টি পর্যন্ত প্রতি বছরে গড়ে বিক্রি হয়েছিল ১৮ লক্ষ টাকার।

তারপরেই এলো মন্দা আর সঙ্কটের চোট। এস টি এম-এর বিক্রি নেমে গেল ৪৬ লক্ষ টাকায়, আর টি এ ডি-র ১৪ লক্ষ টাকায়। এখন আবার রপ্তানির উন্নতি হচ্ছে; তাই এ'দের বিক্রিও বাড়বে বলে মনে হচ্ছে।

এস টি এম-এর কারখানায় যে যন্ত্রপাতি আছে তা দিয়ে বছরে এক কোটি টাকার মাল হেসে খেলে তৈরি হতে পারে; সেই জায়গায় মন্দার বাজারে এখন হচ্ছে তার অর্ধেক। উৎপাদন না বাড়ালে পণ্যের পড়তা কমানো যাবে না; অতএব ভারত সরকারের 'এঞ্জিনীয়ারিং এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল'-এর পক্ষে রপ্তানি বৃদ্ধির বর্তমান গতিবেগ বজায় রাখলেই চলবে না, অনেক বাড়াতে হবে; আর বাংলা দেশকে সেই পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রেখে চলতেই হবে। নাহলে পিছু হটতে হটতে আমরা বাঙালীরা আবার অজয় মুখুজ্যে মশায়ের দেশের চাঁপাখাল সভ্যতার যুগে ফিরে যাবো।

১৯ অক্টোবর, ১৯৬৮





পঁচিশ

ভারতবর্ষের গ্রামের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার। সরকারি পরিসংখ্যান বলে যে, তার মধ্যে এখন কিঞ্চিদূর্ধ্ব ষাট হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। পাঁচ লক্ষ গ্রাম এখনও প্রদীপ ও লণ্ঠনের ম্লান আলোয় নিষ্প্রভ; আর মাঝে মাঝে যখন কেরোসিন আর রেড়ির তেলের অভাব পড়ে—অপবণ্টন ও কালোবাজারীর জন্যে প্রায়ই তাই হয়—তখন গ্রামের ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যে হতে না হতেই কুলুঙ্গিতে বইখাতা তুলে রেখে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। অনেক গাঁয়ের ছেলেমেয়ে উদয়াস্ত মাঠে-ঘাটে কাজ করে। তাদের বর্ণপরিচয়ের সময় ওই সন্ধ্যেটুকু। সেই সন্ধ্যেটাও যদি হয় অন্ধকার, তবে তাদের নিরক্ষরতা ঘোচাবার উপায় কী? বিশেষ করে সেই জন্যেই বোধ হয় স্বাধীনতার একুশ বছর পরেও আমাদের এই উন্নতিশীল ভারতবর্ষের শতকরা মাত্র চব্বিশ জনের অক্ষর পরিচয় হয়েছে; ছিয়াত্তর জন থেকে গেছে নিরক্ষর।

নিরক্ষর মানুষের মনে সমাজতন্ত্রের মূল্যবোধ থাকতে পারে না। সংখ্যালঘু শিক্ষিত লোক নিজেদের মর্জি মতন যে-পথে নিয়ে যাচ্ছেন সেই পথেই সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরক্ষর আর অর্ধশিক্ষিতদের চলতে হচ্ছে। নিরক্ষরতাজনিত বিচারবুদ্ধির অভাবে পীড়িত জনমানসের কাছে ডেমক্র্যাসি, মার্কসবাদ সব কিছুই ইম্পীরিয়্যালিজমের সামিল। তাঁদের দাসত্ব কোনো দিনও ঘুচবে না—কংগ্রেস রাজত্ব করুন, কি বাম কমিউনিস্ট গদি দখল করুন সকলের সঙ্গেই এই নিঃসহায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের সম্বন্ধ হবে রাজা ও প্রজার।

কুলজিয়ান করপোরেশন (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড-এর ভাষাসমৃদ্ধ সুবিন্যস্ত প্রচার গ্রন্থাবলী পড়ে বস্তুতান্ত্রিক আমি প্রায় দার্শনিক হয়ে উঠলাম। কুলজিয়ানের কার্যসূচীতে এ যাবৎ থার্ম্যাল (তাপবিদ্যুৎ) পাওয়ার স্টেশন এবং নিউক্লিয়ার (আণবিক) পাওয়ার স্টেশনের পরিকল্পনায় কনসাল্টিং এঞ্জিনীয়ারের (উপদেষ্টার) দায়িত্ব পালন করাটাই প্রধান স্থান পেয়ে এসেছিল। উনিশ-কুড়িটা থার্ম্যাল এবং দুটি নিউক্লিয়ার প্রকল্প-রূপায়ণের কাজে কুলজিয়ান-ইণ্ডিয়া গোষ্ঠী দেশের শিল্পোন্নয়নে কতটা সহায়তা করেছেন এবং করছেন কেবল তারই মনোরম

বিবরণ ওই লিটারেচারে। কিন্তু তাঁদের পরিকল্পিত এক-একটা শক্তিশালী পাওয়ার স্টেশন কত হাজার গ্রাম আলোকিত ক'রে নিরক্ষরতা মোচনে কতটা সাহায্য করেছেন তার কোনো উল্লেখ নেই। সেটা থাকা উচিত ছিল।

উচ্চমার্গের তত্ত্ব নিয়ে কচকচি করা গেল বেশ খানিকটা। এবারে তথ্যে নেমে আসি। মনোহারিত্বে সে তথ্য রঙিন।

অ্যামেরিকার সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'টাইম'-এর ১০ নভেম্বর, ১৯৬১ সংখ্যার 'বিজনেস্ অ্যাব্রড' শীর্ষক সংবাদে 'ম্যান টু এনভি' (ঈর্ষার পাত্র) অনুচ্ছেদের সবটাই আলোচনার যোগ্য।

"বারো বছর আগে (১৯৪৯-এ) ফিলাডেলফিয়ার হ্যারি আসডার কুলজিয়ানের সঙ্গে সাধনচন্দ্র দত্ত নামে এক উদ্যোগী ভারতীয় তরুণের (বয়স ২৮) পরিচয় হয়েছিল। ছেলেটি বেনারেস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এ বি. এস-সি পাস করার পর অ্যামেরিকার জেনারাল ইলেকট্রিক কম্পানিতে উচ্চশিক্ষা নিতে এসেছিলেন। সাধন দত্ত সাহসী যুবক। জি-ই-সিতে ট্রেনিং-এর পরে তিনি বৃদ্ধ কুলজিয়ানকে প্রস্তাব করে বসলেন যে তাঁকে কয়েক বছরের জন্যে ভারতবর্ষে 'কুলজিয়ান করপোরেশন অব ফিলাডেলফিয়ার' প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হোক। কিন্তু এ কথাটাও হ্যারি কুলজিয়ানকে বুঝতে দিলেন যে তিনি চির-কাল কুলজিয়ান-অ্যামেরিকার তাঁবেতে থাকবেন না; কুলজিয়ানেরই সহায়তায় ও সহযোগিতায় ভারতবর্ষে অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন। সাধন দত্তের দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব হ্যারি কুলজিয়ানকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি রাজী হলেন।

বছরখানেক ফিলাডেলফিয়া অফিসে কাজ শিখিয়ে ১৯৫০ সালে সাধনচন্দ্রকে কুলজিয়ান-অ্যামেরিকার ভারতীয় শাখার কর্ণধার করে পাঠালেন।

শ্রীসাধন দত্তের পারিবারিক পরিচয়টা এখানে দিয়ে নেওয়া দরকার। ইনি ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় বিধানসভার সহ-সভাপতি এবং সেকালের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা কুমিল্লার স্বর্গীয় অখিলচন্দ্র দত্তের দৌহিত্র। গৌহাটি কটন কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ময়মনসিংহ নিবাসী স্বর্গত সুরেশচন্দ্র দত্তের পুত্র। শান্তিনিকেতনের ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয় সাধনবাবুর আপন কাকা। ধীরেনবাবুও দর্শন শাস্ত্রে বহুকাল অধ্যাপনা করেছেন এবং ভারতীয় ও ভারতের বাইরের দর্শনশাস্ত্রী মহলে সুপরিচিত।

সাধনবাবু বিবাহ করেছেন বসুশ্রী সিনেমার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীফণীভূষণ বসুর কন্যা ভারতী দেবীকে। সুগৃহিণী ও সুশিক্ষিতা ভারতী এবং সাধনচন্দ্রের একটিই সন্তান--কন্যা শান্তা।

ভালো কাজ দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধন দত্ত ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় এলেন। ধর্মতলার ম্যাডান স্ট্রীটে ছোট একটা এক-কামরার অফিস ভাড়া করে বসলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই আশায় ভরপুর মন শূন্য হয়ে গেল। কাজ মেলে না। সাধন দত্ত রোগীর

অপেক্ষায় সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়ে আসা ডাক্তারের মতো নিষ্ফলা দিন গুণে কাটাতে লাগলেন। হ্যারি কুলজিয়ান বলেছিলেন, "তুমি আমার ঈর্ষার পাত্র; তুমি নবীন, তোমার নবজাগ্রত দেশও এগোবার পথ খুঁজছে—এমন যোগাযোগ কোথায় মেলে?" কিন্তু সাধনচন্দ্রের অদৃষ্টে সে যোগাযোগ আর ঘটে না যেন। পুরো পাঁচটা বছর সাধনবাবু নতুন কাজের চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে কাটালেন আশাহত মনে।

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সুদিন এলো। ১৯৫৬ সালে সাধন দত্ত দুর্গাপুরের ডি. ভি. সি. তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কনসালট্যান্টের কনট্রাক্ট পেলেন। প্রায় ১২ কোটি টাকার প্রকল্প। এ যাবত এই ধরনের বিশাল কাজে উপদেষ্টার পদটি দখল করে বসে থাকতেন বিদেশীরা। সাধনচন্দ্র ডি. ভি. সি. কর্তৃপক্ষের দেশাত্মবোধে ঘা দিয়ে বললেন যে দক্ষ ভারতীয় এঞ্জিনীয়াররাই প্রকল্পটির রূপ দিতে চান। সঙ্গে সঙ্গে বিজাতি-পূজারী আমলাতন্ত্রকে অভয় দিয়ে বললেন যে, কুলজিয়ানের অ্যামেরিকান বিশেষজ্ঞরাও পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, দরকার হলেই তাঁদের সাহায্যও নেওয়া হবে।

সাধন দত্ত সফলতার প্রথম সোপানে পা দিলেন। ছোট্ট এক-কামরার অফিস উঠে এলো চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে একটু বড় একটা অফিসে। ম্যাডান স্ট্রীটের অফিসে থাকার সময়েই সাধন দত্ত দু'জন কৃতী বাঙালী এঞ্জিনীয়ারকে পাশে টেনে এনেছিলেন। প্রথমে এসেছিলেন সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং-এ পণ্ডিত ডক্টর অসীম মুখোপাধ্যায়। (শিবপুরের কৃতী ছাত্র এবং অ্যামেরিকার মিনেসোটা ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিধারী ডঃ মুখার্জি এখন কম্পানির অন্যতম ডিরেক্টর)। তারপরে এলেন দক্ষ মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য। ইনি বেনারেস ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং বর্তমানে ইনিও ডিরেক্টর। (অসীম মুখোপাধ্যায়ের পত্নী তুহিনা দেবী এবং অশোকজায়া ঊষারাণী দেবী দুজনেই কৃতী বঙ্গললনা। শ্রীমতী তুহিনা মুখোপাধ্যায় এক কালে কুলজিয়ানের আর্কিটেক্ট ছিলেন এবং ডক্টর ঊষারাণী ভট্টাচার্য এখন বেথুন কলেজে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপিকা)।

ডি. ভি. সি. দুর্গাপুরের প্রকাণ্ড কাজটির সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্যে এই তিন যুবক তখন উঠে পড়ে লাগলেন উপযুক্ত কাজের লোকের সন্ধানে। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁদের পাশে জড়ো হলেন সারা ভারতের সেরা এঞ্জিনীয়াররা—প্রায় সবাই নবীন, সবাই তাজা। তাঁদের কেউ বিদ্যুৎ-বিশারদ, কেউ স্থপতি, কেউ যান্ত্রিক, ভূতাত্ত্বিক আর ধাতু-বিদ্যায় পণ্ডিত। ভারতের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম থেকে তাঁরা এলেন দেশী ও বিদেশী বিদ্যার পসরা নিয়ে। সাধন দত্তের নেতৃত্ব বরণ করে তাঁরা প্রযুক্তিবিদ্যার এক বিশ্বভারতী গড়ে তুললেন, যেখানে প্রাদেশিকতা আঞ্চলিকতা নেই, আছে কেবল গুণীর আদর।

কোনো পণ্য উৎপাদন বা বিপণনের প্রতিষ্ঠান হলে অবাঙালী নিয়োগ বিষয়ে আমার মন্তব্য যে স্বভাবতই বিরূপ হতো সেটা আমার রচনার নিয়মিত পাঠকের জানা আছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান সে শ্রেণীতে পড়ে না—কুলজিয়ান করপোরেশন একটি 'ব্রেন ব্যাঙ্ক'। সেখানে আঞ্চলিকতা নেহাত বোকামি ও ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছু হতো না। তুলনা করে আমাদের অর্থমন্ত্রিত্বের কথা বলা চলে। একুশ বছরের অবিমৃষ্যকারিতা দেখে আমার মনে এই বিশ্বাস

জন্মেছে যে আমাদের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর পদে যদি জার্মেনীর সেই যাদুকর ডক্টর শাখ্‌ট বা তেমন আর কোনো বিদেশীকে প্রকাণ্ড মাইনে দিয়েও রাখা যেত তাহলে আজ হয়তো আমাদের অর্থনীতির এমন দুর্দশা হতো না।

কুলজিয়ান-ইণ্ডিয়ার কাণ্ডারী সাধন দত্ত ছোট পরিসরে সেই নীতির অনুসরণ করেই আজ কৃতকার্য হয়েছেন। তিনি কাশ্মীর থেকে এনেছেন ডক্টর হরিকৃষ্ণ মুথুকে, গুজরাট থেকে শ্রীমতী জ্যোতি দেশাই ও শ্রীপ্রাণশঙ্কর ডাভেকে, দক্ষিণ থেকে শ্রীশুভকৃষ্ণকে, যাঁরা কুলজিয়ান আর বাংলা দেশকে ভালোবেসে, আর কুলজিয়ানের পরিচালকবৃন্দ শ্রীসাধন দত্ত, ডঃ মুখার্জি, শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য এবং শ্রীসুনীল ঘোষ মহাশয়দের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্য দিয়ে আজ বাঙালিত্বে আমার মতো কট্টর বাঙালীকেও হার মানিয়েছেন।

ওপরে যাঁদের নাম করলাম তাঁরা সকলেই বিজ্ঞানী। কিন্তু কেবলমাত্র প্রযুক্তিবিদ্যায় কুশল মানুষদের নিয়েই একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে না। সঙ্গে চাই অফিস সংক্রান্ত কাজের পরিচালনায় দক্ষ সহকারিবৃন্দ। কুলজিয়ানের অফিসে তেমন ব্যক্তি যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সাধনবাবুর প্রথম যুগের সাথী শ্রীলালমোহন দাঁ-র নাম। ইনি কুলজিয়ানের ম্যাডান স্ট্রীটের আমল থেকে কম্পানির স্টেনো-সেক্রেটারির কাজ করেছেন। এমন দিনও গেছে যখন কম্পানির হাতে কোনো কাজ নেই, অথচ অফিস চালু রাখতে হয়েছে। তখন অন্ধকার থেকে আলোকে যাবার প্রত্যাশায় প্রতিষ্ঠানে ছিলেন মাত্র দুজন—সাধন দত্ত এবং লালমোহন দাঁ।

লালমোহন এখনো আছেন, কিন্তু তাঁর এখন আর না থাকলেও চলে। তিনি উচ্চাভিলাষী মানুষ, স্বাধীন ব্যবসা করাই তাঁর মন্ত্র। তাই প্রথম থেকেই চাকরি করার সঙ্গে সঙ্গে কাবুলিওয়ালার কাছে ধার করেও নিজের ব্যবসা ফাঁদার চেষ্টা করতেন। তাতে বারেবারে তিনি ঘা খেতেন। কখনো কখনো সাধনবাবুও লালমোহনকে সেইসব রহমত খাঁদের কবল থেকে মুক্ত করে এনেছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি কৃতকার্য হলেন। লালমোহন আজ নিজেই এক সফল শিল্পপতি। তাঁর এখন মেশিনশপ ইত্যাদির দুটো কারখানা—একটি দুর্গাপুরে ও একটি কলকাতায়। তবুও নাড়ির সম্পর্ক তিনি কাটিয়ে উঠতে না পেরে কুলজিয়ানেই থেকে গেছেন। নিজ প্রতিষ্ঠানের কাজ চালান আত্মীয়স্বজনের সাহায্যে।

কাজপাগল লোক কুলজিয়ানে আরও অনেকে আছেন—যেমন, অফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীগোবিন্দগোপাল ঘোষ। অ্যামেরিকান ইংরেজীতে একটি শব্দ আছে—ট্রাবল্‌শুটার, যার মানে বিপদবারণ। গোবিন্দগোপাল, ওরফে জি-জি, কুলজিয়ানের ট্রাবল্‌শুটার। এত বড় অফিসটিকে সিজিলমিছিল রাখা, কম্পানির দেশী ও বিদেশী অতিথি অভ্যাগতের আদর আপ্যায়ন করা, অফিসের সহকর্মীদের কাজের ব্যাপারে দেশ বিদেশে ছুটোছুটিতে বিধিব্যবস্থা করে দেওয়া, কলকাতা অফিসের ৩৫।৩৬টা মোটরকারের রক্ষণাবেক্ষণ করা—সবটাতেই জি-জির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ আছেই। অবশ্য তাঁর একজন দক্ষ সহকারীও আছেন। মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের ছেলে শ্রীচঞ্চল ঘোষ জি-জিকে সব কাজে সাহায্য তো করেনই, দরকার হলে গাড়ির ড্রাইভারিও করে থাকেন।

আর আছেন সাধন দত্তের পি. এ. শ্রীমতী রমনা ঘোষ। রমনার বাবা ছিলেন স্পেন দেশের লোক। শৈশবে বাপ মা হারিয়ে বারো তেরো বছর বয়স পর্যন্ত তিনি অনাথাশ্রমে মানুষ হয়েছিলেন। পরে নিকট আত্মীয়রা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বটে কিন্তু স্বাধীনচেতা মেয়েটি মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে কানপুর শহরে টেলিফোন অপারেটারের কাজ নিয়ে স্বাবলম্বী হয়েছিলেন। বীরচক্র উপাধিভূষিত এক বাঙালী যুবকের সঙ্গে বিবাহিতা হয়ে তিনি এখন মিসেস রমনা ঘোষ। জীবনসংগ্রামে জয়ী রমনা নিজেও বীরচক্র পাওয়ার উপযুক্ত।

১৯৫০ থেকে এগারো বছর কুলজিয়ান করপোরেশন অব ফিলাডেলফিয়ার প্রতিনিধিত্ব করবার পর শ্রীহ্যারি কুলজিয়ানের অনুমোদনে ১৯৬১ সালে সাধন দত্ত কুলজিয়ান করপোরেশন অব ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর স্থাপনা করলেন। এক লক্ষ টাকা মূলধনের কম্পানির ৫১ পারসেন্ট শেয়ারের মালিক হলেন সাধন দত্ত, অসীম মুখার্জি প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের আদি কর্মীরা, আর ৪৯ পারসেন্ট-এর অংশীদার রইলেন হ্যারি কুলজিয়ান গোষ্ঠী। কিন্তু এখন থেকে মস্তিষ্ক অর্থাৎ 'ব্রেন ব্যাংক'-এর পুরো মূলধনটাই হয়ে গেল বাঙালীর। কুলজিয়ান-অ্যামেরিকা এখন ধীরে ধীরে পটভূমিকা থেকে সরে যাচ্ছেন। শীঘ্রই তাঁদের ৪৯ পারসেন্টও সাধনবাবুদের হাতে আসবে। টেকনিক্যাল নো-হাউয়ের ব্যাপারে কিন্তু সাধনবাবুরা এখনো উন্নত নানা দেশের অগ্রগামী কনসালট্যান্ট ফার্মের বিজ্ঞানী এবং এঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে পূর্ণ সংযোগ রেখেই চলেন। বিজ্ঞান জগতে প্রতিদিনই নতুন নতুন প্রণালী, নব নব আবিষ্কার হয়ে চলেছে; তার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলতে পারার জন্য এই সংযোগ অবিচ্ছেদ্য।

অফিস বড় হতে লাগলো; চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের অফিসে আর কুলোয় না—তাই এবারে কুলজিয়ান ইন্ডিয়া ২৪-বি পার্ক স্ট্রীটের মস্ত ম্যানসন বাড়ির ছ' তলাটি দখল করলেন। আরও কাজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তেতলাটা ভাড়া নিলেন এবং সব শেষে নিলেন এক তলাটা। একে একে দিল্লী, বোম্বাই আর পাটনাতেও কুলজিয়ানের ব্রাঞ্চ খোলা হলো।

কুলজিয়ানের ছ'-তলার অফিসের দরজায় রিসেপশনিস্ট শ্রীমতী বিজলী চক্রবর্তী। (এঁদের দেখছি বিদ্যুতের প্রতি বেজায় দুর্বলতা- অভ্যাগতকে স্বাগত জানাবার জন্যেও বিজলী নামের সুন্দরী মেয়েটিকে রেখেছেন!)

বিজলীর সঙ্গে আছেন শ্রীমতী কমলকলি দত্ত। (কমলকলি! আহা, এমন নামটি যিনি রেখেছিলেন তাঁকেও আমার জানতে ইচ্ছে করে; কত যুগ পরে এমন সুন্দর, এমন নরম একটি নাম শুনলাম--যেন এই সুদর্শনার জন্যেই এই শব্দ রচিত হয়েছিল)। শ্রীমতী দত্ত-ও কুলজিয়ানের অন্যতমা রিসেপশনিস্ট।

এঁদের দুজনের ক্ষিপ্র টেলিফোন অপারেশন দেখে আর স্মার্ট ও দ্রুত কথাবার্তা শুনে ভেবেছিলাম যে, অফিসের ভেতরেও দেখবো সকলেই দ্রুত লয়ে কাজ করছেন। কিন্তু ঢুকে দেখলাম অনুমানের একটা মিলছে, অন্যটা নয়। নবীনতায় সমস্ত অফিসটা ঝলমল করছে ঠিকই, কিন্তু কেমন যেন একটা শান্ত, বিলম্বিত ভাব। এক টাইপরাইটার মেশিনের খটখট আর মাঝে মাঝে ফোনের আওয়াজ ছাড়া বিশেষ কোনো শব্দ নেই। শুনেছিলাম খাস অ্যামেরিকান প্যাটার্নের

অফিস, তাই ধারণা নিয়ে এসেছিলাম যে এখানে সবাই হলিউডের ছবির মতন পঞ্চমে গূঢ় আলোচনা করেন, ধৈবতে হালকা কথা বলেন, আর হাসেন সপ্তমে। কিন্তু সাধন দত্তের ভাবে ধীরতা, কথা বলার স্বরে মৃদুতা। মনে হয়েছিল যে ভদ্রলোকের খুব আস্তে আস্তে কাজ করা অভ্যেস, কিন্তু তাঁর টেবিলে মিনিট পাঁচেক বসেই বুঝলাম যে, 'হি হারিজ্ স্লোলি', যেটা হলো নেতৃত্বের সবচেয়ে বড়ো গুণ। আমার সঙ্গে সৌজন্য বজায় রেখে কথা বলা, রমনা ঘোষকে কাজের নির্দেশ দেওয়া আর মাঝে মাঝে টেলিফোন অ্যাটেন্ড করা, সবেতেই একটা লালিত্য আছে। পরদিনই কয়েক দিনের জন্যে ব্যাঙ্কক যাচ্ছেন থাইল্যান্ডে একটা দেড় কোটি ডলারের নিউজপ্রিন্ট (কাগজের) মিলের পরিকল্পনা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে। তাই আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই হাতের কাজগুলি সারছেন। বললেন, "এটাও এক্সপোর্টের কাজ, তবে যন্ত্রপাতির নয়-- বুদ্ধি পরামর্শের রপ্তানি। এতেও ভালো ফরেন এক্সচেঞ্জ আসে।" (এই প্রবন্ধটি লিখে শেষ করার আগেই সাধন দত্ত ব্যাঙ্কক থেকে খুশি মনে ফিরে এসেছেন। এবারে বললেন যে, কেবল কনসালট্যান্টের সাময়িক কাজই নয়, নিউজ-প্রিন্ট মিলটা গড়ে তোলা এবং চালু হবার পরেও স্থায়ীভাবে তার পরিচালনার ভারও কুলজিয়ান-ইন্ডিয়া পেয়েছেন; অর্থাৎ বিড়লারা যেমন অ্যাবিসিনিয়াতে কটন মিল বসিয়েছেন, সেইরকম। এই সিরিজের প্রবন্ধ লেখা শুরু করার সময়ে আমার বাঙালী পাঠকরা বলতেন যে, বাঙালীর ব্যবসা কোথায় যে তা নিয়ে আমি লিখবো। গোটা ত্রিশেক ব্যবসার হিসেব এই দশ মাসে দেবার পর তাঁরা বলছেন যে, ছোট আর মাঝারি কারবারে থাকলেও বাঙালী 'বিগ বিজনেসে ফেলিওর'। এখন সাগর পাড়ি দিয়ে সাধন দত্ত-অসীম মুখার্জিরা ১১ কোটি টাকার মিল চালাতে যাচ্ছেন শোনার পর আশা করি আমাদের নৈরাশ্যবাদী বাঙালী পাঠকরা তাঁদের মত বদলাবেন)।*

এক সুদর্শন যুবক সাধনবাবুর ঘরে ঢুকলেন। আলাপ হলো—ইনি কুলজিয়ানের সেলসের অন্যতম কর্তা ডক্টর হরিকৃষ্ণ মুথু। এবারে আমার ভার নিলেন সাধন দত্ত-র এই চৌকস সহকারী।

সোজা কাজের কথায় আসাটাই দেখলাম হরিকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য। নিজের চেম্বারে আমাকে নিয়ে গিয়ে বসতে না বসতেই বলতে আরম্ভ করলেন যে, কনসাল্টিং এঞ্জিনীয়ারের এমন কোনো কাজ নেই যা কুলজিয়ান-ইন্ডিয়া এই ১২ বছরে করেনি। শেষ যে কাজটা হাতে এসেছে সেটা হলো ১০০০ মেগাওয়াট (মানে, ১০ লক্ষ কিলো-ওয়াট) বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারের ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুলিয়া-সাঁওতালডিহির 'মহা-থার্ম্যাল পাওয়ার স্টেশন'।

কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ হরিকৃষ্ণ মুথু গড়গড় করে বাংলা বলেন, ব্যাকরণে উচ্চারণে ভুল হলেও পরোয়া করেন না। এটা কিন্তু নতুন ভাষা শেখার ভালো রাস্তা। এর চেয়েও ভালো আর একটা উপায় আছে—যে-ভাষাটি শেখার ইচ্ছে সেটা যার মাতৃভাষা তেমন একটি মেয়েকে বিয়ে করা। তাহলে উচ্চারণ, ব্যাকরণ, ইডিয়াম সব তাড়াতাড়ি রপ্ত হয়ে যায়। তা হরিকৃষ্ণকে আমি এই সব পার্সন্যাল ও প্রাইভেট কথা প্রথম আলাপেই বলতে কুণ্ঠা বোধ করলাম। তাছাড়া উনি বিবাহিত কিনা তা-ও জিজ্ঞেস করা হয়নি।

* ১৯৬৯ সালে কুলজিয়ান-ইন্ডিয়ার কর্মক্ষেত্র মধ্যপ্রাচ্যেও বিস্তৃত হয়েছে। এখন তাঁরা সিরিয়াতে একসঙ্গে তিনটি সরকারি সিমেন্ট কারখানা নির্মাণের কাজে উপদেষ্টা হয়েছেন। প্রত্যেক ফ্যাক্টরিতে দিনে এক হাজার টন করে সিমেন্ট তৈরি হবে। এই বৃহৎ কাজটির তত্ত্বাবধান করছেন কুলজিয়ানের এঞ্জিনীয়ার শ্রীনারায়ণ চৌধুরী।

সাধন দত্তের সঙ্গে ইতিপূর্বে আলোচিত একটি কথা হরিকৃষ্ণ রিপিট করলেন : "আই-ডি-বি-আই, আই-এফ্-সি প্রভৃতি আমাদের অতিকায় সরকারি বিনিয়োগ সংস্থা আর ভারত সরকার মক্কার দিকেই তাকিয়ে আছেন। পশ্চিম ভারতের শিল্পোন্নয়নের জন্যে, যোজনার জন্যে তাঁদের ধনভাণ্ডার খুলে রেখেছেন। পূবের আমরা বহু চেষ্টায় পেয়েছি দুর্গাপুর ফার্টিলাইজার, হলদিয়া আর সাঁওতালডিহি প্রকল্প। আগে হুমায়ুন কবীরের টাইমে তাঁর চাপে দুর্গাপুর ফার্টিলাইজার আর হলদিয়া পাওয়া গিয়েছিল। এখন পশ্চিম বাংলার জন্যে কথা বলার কেউ যেন নেই সেণ্ট্রাল ক্যাবিনেটে।" হরিকৃষ্ণ বাংলা আর বাঙালীকে আপন করে নিয়েছেন।

ডঃ মথুর নির্দেশে তাঁর পি. এ. অঞ্জলি চ্যাটার্জি (টানা টানা কালো চোখের শ্রীমতী একটি মেয়ে) ঝকঝকে দামী আর্ট পেপারে ছাপা কুলজিয়ানের একটা প্রচার পুস্তিকা আমাকে দিলেন। এ'দের প্রচার সচিবের কৃতিত্বের নিদর্শন এটা।

কোথায় আসামের নাহারকাটিয়া আর গৌহাটি থার্ম্যাল পাওয়ার স্টেশন, চন্দ্রপুরার ৪নং ইউনিট, বারাউনি, গুজরাটের ধুবরণ আর মধ্যপ্রদেশের সাতপুরা (বাংলার দুর্গাপুর, ব্যাণ্ডেল আর নির্মীয়মান সাঁওতালডিহি তো আছেই), ভারতের এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে কুলজিয়ান-ইণ্ডিয়ার কীর্তি। কুলজিয়ানের ড্রয়িং অফিসে প্রধানত বাঙালী দিগ্‌গজ ছেলে-মেয়ের হাতে টানা নকশা আর কার্যসূচীর নির্দেশ অনুসরণ করে ভারতবর্ষের ১৯।২০টা থার্ম্যাল পাওয়ার স্টেশনের উৎপত্তি হয়ে চলেছে।

আর হচ্ছে ডিরেক্টর অশোক ভট্টাচার্য এবং 'নিউক্লিয়ার পাওয়ার'-এর মহাকাণ্ডে ব্যুৎপন্ন কুমিল্লার ছেলে তপোব্রত ভরদ্বাজের তত্ত্বাবধানে নির্মীয়মান বোম্বাইয়ের তারাপুর এবং দক্ষিণের মাদ্রাজ 'অ্যাটমিক পাওয়ার প্রোজেক্ট' দুটি। এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা।

তপোব্রতের সহকর্মী মেকানিক্যাল বিভাগের শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীও অসাধারণ। মানবেন্দ্র আই. এস-সি পরীক্ষার পর ড্রাফটসম্যানশিপ পাস করেছিলেন মাত্র। দারুণ মেধা এই তরুণের; বিশেষত ইনস্ট্রুমেনটেশন-এ তিনি বিশেষ পারদর্শী। ইনি কুলজিয়ানের জুনিয়র এঞ্জিনীয়ারদের ট্রেইনিং-ও দিয়ে থাকেন। মানবেন্দ্রবাবুর প্রতি সকলের এত শ্রদ্ধা যে কিছুদিন আগে যখন কুলজিয়ান-ইণ্ডিয়ার একটি দল বিশেষ কাজে অ্যামেরিকা গেল তখন পাস-করা এঞ্জিনীয়াররাও এ'র নেতৃত্ব মেনে নিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।

সরকার বাহাদুরকে যতই দোষারোপ করি না কেন অগ্রগতির মন্থরতার জন্যে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্রমিক উন্নতির ছবিটা মোটের ওপর ভালোই। ভারতবর্ষে ইলেকট্রিসিটির ইতিহাসটা প্রাচীন নয়। সংক্ষেপে বলা যায়।

১৮৯৯ সালে, অর্থাৎ নিউ ইয়র্ক ও লণ্ডনের মাত্র ১৭ বছর পরে ভারতবর্ষে প্রথম বৃহদায়তন থার্ম্যাল জেনারেটিং সেট বসানো হয়েছিল। তার শক্তি ছিল ১০০০ কিলোওয়াট। তার দীর্ঘদিন পর ১৯২৫ সাল অবধি আর উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি হয়নি। আমরা তখন ইংরেজের জমিদারিতে কৃষক আর বেনে। শিল্প-টিল্প নেই, বিদেশে চা-পাট এই সব রপ্তানি করি। তবুও আস্তে আস্তে অনেকটা বাড়লো। তারপর ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময়ে আমাদের ভাগে পড়লো আন্দাজ ১৪ লক্ষ কিলোওয়াট। প্রথম পাঁচসালা যোজনার গোড়ায় অর্থাৎ

১৯৫১ সালে ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট থেকে দ্বিতীয় যোজনার শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছিল ৫৭ লক্ষতে। সেই জায়গায় বর্তমানে আমাদের শক্তি হয়েছে আন্দাজ ১ কোটি ৩০ লক্ষ কিলোওয়াট।

এই বিদ্যুৎ শক্তিতেই আমাদের শহরে শহরে আর ৬০।৬৫ হাজার গ্রামে আলো জ্বলছে, ইলেকট্রিক ট্রেন চলছে আর যাবতীয় শিল্প প্রচেষ্টা শ্লথগতিতে হলেও এগোচ্ছে।

ডক্টর মুথু ছাড়া ভারতের নানা অঞ্চল থেকে অভ্যাগত আর যে-ক'জন কৃতী এঞ্জিনীয়ার আছেন তাঁদের মধ্যে আমার অল্পবিস্তর আলাপ হলো ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ার শ্রীমতী জ্যোতি দেশাই, স্ট্রাকচার্যালের শ্রীপ্রাণশঙ্কর ডাভে এবং শ্রী ভি কে কানসাগারা (এ'রা তিনজন গুজরাটী), শ্রীকৃষ্ণমূর্তি, শ্রীশেষাদ্রি ও শ্রী জি কে সুব্রহ্মনিয়ম (দক্ষিণের), শ্রীরণধীর সিংহ এবং শ্রী জি এল কিষণ (বিহারী) প্রমুখ কয়েকজনের সঙ্গে।

এ'রা সবাই হলেন সাধন দত্তের ঘরের লোক—কুলজিয়ান-ইণ্ডিয়ার কর্মী, যাঁরা একবার এই বাঙালী নেতৃত্বকে বরণ করে নিয়ে আর কোনো দিনও স্বেচ্ছায় অন্যত্র যান না, যেতে চান-ও না।

হরিকৃষ্ণের টেবিলে আমার পাশে এসে বসলেন ছত্রিশ বছর বয়স্ক মেটালার্জিস্ট শ্রীবিমলগতি রায় (শিবপুর ও শেফিল্ড)। আলোচনা আরও জমে উঠলো পশ্চিম ঘাটের খোপোলি-তে অবস্থিত 'মাহিন্দ্র-ইউজিন অ্যালয় স্টীল প্ল্যান্ট'-এর পরিকল্পনায় কুলজিয়ানের কাজের এবং 'ওড়িষ্যা ইণ্ডা-স্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন'-এর ফেরোভ্যানাডিয়াম প্ল্যান্ট গঠনে এ'দের উপদেষ্টা পদের কথায়। পরে এই বিষয়ে বিশদভাবে আরও আলোচনা হয়েছিল এ'দের আর এক তরুণ মেটালার্জিস্ট শ্রীঅনিল ব্যানার্জির (লণ্ডনের ডিগ্রীধারী) সঙ্গে, যিনি কাজের পরেও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখেন আর সেসব নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় বিখ্যাত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পত্র-পত্রিকায়।

অনিলবাবু এবং তাঁর আরেক সহকর্মী মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার শ্রীঅসিত চক্রবর্তী (শিবপুর ও ইউ এস এ) শুধু যে তাঁদের ভদ্রতায় মুগ্ধ করলেন তাই নয়, আমাকে দুপুরের খাওয়াটাও সেরে আসতে বাধ্য করলেন। আমি নিঃসংশয়ে একটা শংসাপত্র কুলজিয়ান-ইণ্ডিয়ার ক্যানটিন-সুপারভাইজার শ্রীরামচন্দ্র রায়কে ইসু করতে পারি। তিনি ভালো খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন কম্পানির সাহায্যে পরিচালিত এই ক্যানটিনে, যেখানে পিয়ন-ড্রাইভার থেকে ডিরেক্টর পর্যন্ত সকলেই একই রকমের আহার্য ভক্ষণ করে থাকেন।

অসিতবাবুরা বললেন কেমন করে কুলজিয়ান-ইণ্ডিয়ার এক্সপার্টিজ্ (বিশেষজ্ঞের উপদেশ) আদর করে নিয়েছেন দূর প্রাচ্যে প্রকাণ্ড মেকং সিমেণ্ট প্রোজেক্ট আর কেনিয়ার (পূর্ব আফ্রিকা) ২০ কোটি টাকার পেপার-মিলের প্রতিষ্ঠাতাবর্গ। শ্রীবিজন দাশগুপ্ত নামে কুলজিয়ানের এক তরুণ পেপার টেকনোলজিস্ট প্রধানত দ্বিতীয় কাজটির তত্ত্বাবধান করছেন।

বৈদ্যুতিক বিভাগের কর্তা শ্রীমন্মথরঞ্জন গুপ্ত কম্পানির কাজে কলকাতার বাইরে গেছেন। মন্মথরঞ্জন আরেকজন স্বয়ংসিদ্ধ বাঙালী। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগের পর তিনি কোনোরকমে আই. এস-সি. পাস করে জীবিকানির্বাহের তাগিদে দশ আনা রোজে টাটা ইস্পাত কারখানায় কুলির কাজ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিছুদিন পরে হলেন ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে টাটার টেকনিক্যাল স্কুলে শিক্ষালাভ করে ধীরে ধীরে তিনি কনস্ট্রাকশন

এঞ্জিনীয়ারের পদে উন্নীত হলেন। এর পরে তিনি টাটা কম্পানি ছেড়ে দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের বোকারো তাপ-বিদ্যুত প্রকল্প গড়ে তোলার কাজে একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার হলেন। কিন্তু এঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রির অভাবে সেখানে তাঁর আর পদোন্নতি হলো না।

'পাওয়ার এঞ্জিনীয়ারিং' বিষয়ে মন্মথরঞ্জন আজ ভারতের অন্যতম বিশারদ।

কুলজিয়ানের বৈদ্যুতিক বিভাগের ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখযোগ্য।

নানা কথার মধ্যে বৈদ্যুতিক বিভাগের তরুণ সহকারী শ্রীআশিস ভৌমিক ব্যাখ্যা করলেন যে কেমন করে সায়ান্টিফিক (সাম্প্রতিক বিতন্ডার স্রষ্টা অ্যাকাউন্টিং যন্ত্র নয়) কমপিউটার যন্ত্রের মাধ্যমে শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহ তাঁদের উৎপাদনের উন্নতি করতে পারেন। উপাদানের মান নির্ণয়ে এই যন্ত্রের কতটা কার্যকরতা সেই সব মহাতত্ত্ব আশিসবাবু আমার নিরেট মাথায় ঢোকাতে চেষ্টা করলেন।

ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের শ্রীদীপক মজুমদার ইংল্যান্ডের এম. এস-সি। এ'রা ছাড়াও আরও কয়েকজন কৃতী যুবক এই বিভাগে আছেন। সকলের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ আমার হয়নি।

কুলজিয়ান-ইন্ডিয়ার ড্রয়িং অফিস (যার ছোট একটু অংশ ছবির পাতায় মুদ্রিত হয়েছে) দুটির মধ্যে যেটি প্রধান সেটি যেন প্রকান্ড একটা পরীক্ষার 'হল'। সেখানে সারি সারি টেবিলে ট্রেসিং-পেপার, স্কেল আর তুলি-পেনসিল নিয়ে নীরবে কাজ করে চলেছেন প্রায় পঞ্চাশ জন তরুণ ও তরুণী চিত্রকর। চিত্রকর শব্দটাই ব্যবহার করছি, কারণ তাঁরা এ'কে চলেছেন ভারতবর্ষের শিল্পায়নের ছবি। 'মাস্টার মশাই' সদৃশ দু'-একজন প্রৌঢ় এ-টেবিল থেকে সে-টেবিলে ঘুরে ঘুরে কাজ দেখছেন; আবার কেউ কাজ করছেন হলঘরের পাশে কাঁচে ঘেরা ছোট ছোট চেম্বারে।

পরীক্ষার-হল বললাম বটে, কিন্তু শিল্পীরা সবাই উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম পরীক্ষা পাস করেই এখানে এসেছেন। এখানে কিন্তু সরকারি গ্রেড-ওয়ান-টু-থ্রি-ফোর-এর মতন কিছু নেই যে, একজন গদি আঁটা রিভলভিং চেয়ারে বসবেন, আরেকজন বসবেন টুল-এ। যিনি ডক্টরেট-বিভূষিত, নির্বিচারে সকলের সঙ্গে তাঁরও আসন টুল।

এই ভারী ভারী ডিগ্রিধারী 'শিল্পীদের' মধ্যে মেয়েদের কথাটাই আগে বলি। এ'দের দেখলে গর্ব হয়।

দুজন আর্কিটেক্ট (স্থপতি) শ্রীমতী দেবযানী মজুমদার (শিবপুর ও ইউ এস এ) এবং শ্রীমতী কৃষ্ণা সেনগুপ্ত (দিল্লি পলিটেকনিক ও ইউ এস এ), আর দুজন 'ড্রাফট্সম্যান' শ্রীমতী নিলু দত্ত (ইলেকট্রিক্যাল) ও শ্রীমতী প্রণতি গুপ্তর (মেকানিক্যাল) নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী জ্যোতি দেশাইয়ের কথা আগেই বলেছি।

বিশ্বকর্মা হলেও আমি আমার রাইভ্যাল ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাতা ময়দানবের অ্যাডমায়ারার। তাই আর্কিটেক্টদের প্রতি আমার একটু দুর্বলতা আছে। দেবযানীর স্বামী আর্কিটেক্ট শ্রীদীপক মজুমদার স্ত্রীর কাছাকাছি আর একটা টেবিলে বসে গভীর মনোযোগে কাজ করছেন। শিবপুরে এ'রা

দুজন একসঙ্গে পড়তেন আর পালা করে ফার্স্ট-সেকেন্ড হতেন। দুই আর্কিটেক্ট মিলে নিশ্চয়ই দুর্দান্ত প্ল্যানের একটি ভালো বাসা তৈরি করেছেন বা করবেন নিজেদের জন্যে। কৃষ্ণা আর তাঁর স্বামী, এখানকার প্রাক্তন আর্কিটেক্ট শ্রীসুহাস সেনগুপ্তর ইতিহাসও খানিকটা একরকমের। তবে তাঁরা দুজনে এখানে কাজ করার সময়েই মন দেওয়া-নেওয়া করেছিলেন বলে শুনলাম।

বিশাল সরকারি প্রকল্পই হোক, আর প্রাইভেট সেক্টরের কোনো বিরাট কারখানাই হোক, প্রচেষ্টার কার্যকরতা (ফিজিবিলিটি) বিষয়ে নিঃসংশয় হবার পর রূপায়ণের কুশীলবদের মধ্যে অন্যতম প্রধান অংশে মঞ্চে অবতীর্ণ হন আর্কিটেক্ট আর সিভিল এঞ্জিনীয়াররা। তাঁদের মিলিত প্রয়াসে প্রকল্পের বহিরঙ্গ গড়ে ওঠে। সরেজমিনে প্রকল্পের পটভূমিকা পরিদর্শনের পর টাউন-প্ল্যানিং আর যন্ত্রশালার পরিকল্পনা নিরূপিত হয়। তাঁদের নকশাকে ভিত্তি করে সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করেন স্ট্রাকচার্যাল, মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারবর্গ। 'দরপত্র' অর্থাৎ টেন্ডার ডাকা হয়। টেন্ডার এলে তার থেকে উপযুক্ত টেন্ডারারকে বাছাই করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে শেষ পর্যন্ত প্রকল্প বা ফ্যাক্টরিকে সম্পূর্ণ রূপ দিয়ে উৎপাদন আরম্ভ করানো হয়। খুব সংক্ষেপে বলা চলে যে, এযুগের কনসাল্টিং এঞ্জিনীয়াররা এই কষ্টসাধ্য কর্মসূচীর শুরু থেকে শেষ সমস্ত কাজের দায়িত্ব নিয়ে মেশিন পর্যন্ত চালু করে মালিকের হাতে তৈরি জিনিসটি তুলে দেন। মালিক চাবিটি ঘোরালেই কারখানা চলতে থাকে বলে এই কার্যসূচীকে আজকাল বলা হয় 'টার্ন-কি' প্রণালী।

আর্কিটেক্টদের মধ্যে আরও দু'একজনের কথা শুনলাম। তাঁরা হলেন শ্রীদয়ানাথ সেনগুপ্ত, সুশান্ত বিশ্বাস এবং শ্রীঅতীন দত্ত (খড়্গপুর আই আই টি এবং ফিনল্যান্ড)। অতীন শান্তি-নিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র এবং বিশ্বভারতীর নবনির্মিত বিজ্ঞানভবন, গ্রন্থাগার এবং দর্শন-ভবনগুলির নির্মাণের তত্ত্বাবধান তিনিই করেছিলেন কুলজিয়ানের হয়ে। সাঁওতালডিহি মহাথার্ম্যাল পাওয়ার স্টেশন (এশিয়ায় বৃহত্তম) নির্মাণের মহাব্যাপারেও সর্বাধ্যক্ষ শ্রী এন. সি চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে অতীন, দয়ানাথ প্রমুখ তরুণ স্থপতিবৃন্দের প্রচুর কৃতিত্ব।

কুলজিয়ান-ইন্ডিয়া বিশ্বভারতীর একাধিক বাড়ি তৈরি করায় উপদেশ দেওয়া ছাড়াও কলকাতার আর্মেনিয়ান কলেজ এবং জয়পুরিয়া কলেজ বিল্ডিং নির্মাণেও উপদেষ্টার কাজ করেছেন। ইন্ডিয়ান অক্সিজেন কম্পানির নূতন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংটাও কুলজিয়ানের এক মনোরম কীর্তি।

ডিরেক্টর শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য আরও দুজন কৃতী তরুণ বাঙালী এঞ্জিনীয়ারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন। পেপারপ্রোজেক্ট ও পাওয়ার-স্টেশন বিশারদ শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ (শিবপুর) এবং বয়লার ও বাষ্পবিশারদ শ্রীগণেশচন্দ্র নন্দী। দ্বিজেন্দ্রলাল এক মিনিয়েচার টমাস এডিসন। তাঁর পরিকল্পিত ৬টা যন্ত্রের পেটেন্ট নেওয়া হয়েছে; অথচ ভদ্রলোকের বিলিতী ডিগ্রি নেই—সহজাত যান্ত্রিক মেধার অধিকারী তিনি।

ড্রয়িং অফিসের 'মাস্টার মশাই'দের কথা বলা হয়নি। শ্রীসুহাস রায়চৌধুরী (শিবপুর ও ইংল্যান্ড) এবং শ্রীসমীর রায় (শিবপুর ও ইংল্যান্ড) প্রমুখ কয়েকজন।

প্ল্যানিং ও প্রোগ্রেস বিভাগের ইন-চার্জ শ্রীশান্তিভূষণ মজুমদার (শিবপুর ও ইংল্যান্ড), যিনি একদা শিবপুর বি-ই কলেজে অধ্যাপনাও করেছিলেন, আমাকে কুলজিয়ানের অন্যান্য কাজেরও বিবরণ দিলেন। কানপুরে ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভস্-এর ৬০ কোটি টাকার কৃষি-সার উৎপাদন প্রকল্প, গুজরাট স্টেট ফার্টিলাইজার কম্পানি, বিহার স্টেট সিমেন্ট প্রোজেক্টের পরিকল্পনা এই সবের কথা শুনলাম। অনেক অনেক কাজ—যার পূর্ণ বৃত্তান্ত এখানে বলা অসম্ভব—কুলজিয়ান-ইন্ডিয়া দুরন্ত বেগে করে চলেছেন।

বয়সে প্রবীণতম দুজন অফিসারের মধ্যে একজন শ্রীঅমিয়বন্ধু বসু অতীতে মালয়ে সরকারি এঞ্জিনীয়ার ছিলেন। পরে দিল্লি ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর চীফ এঞ্জিনীয়ারের পদে কাজ করে ১৯৬৪তে রিটায়ার করেন। সেই সময় থেকেই তিনি কুলজিয়ানে আছেন। আর একজন প্রবীণ অফিসার-এঞ্জিনীয়ার আছেন—শ্রী এন কে চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য আমার হয়নি।

সাধনবাবু বলেছিলেন যে, 'ভায়েবিলিটি' (টিকে থাকার ক্ষমতা) যে-কাজে নেই কুলজিয়ান-ইন্ডিয়া সে-কাজে সরকারি বে-সরকারি সব প্রতিষ্ঠানকেই এগোতে বারণ করেন। সেক্ষেত্রে মোটা পারিশ্রমিকের লোভেও এঁরা কাজটা হাতে নেন না।

একটা কথা বিশেষ করে আমার মনে জাগছে—সাধনবাবুকে একটি অনুরোধ করতে চাই। অনেক মধ্যবিত্ত বাঙালী পত্রযোগে আমার কাছে 'উপদেশ' চান যে, ৮/১০ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে কোন্ স্বাধীন ব্যবসাতে নামলে তাঁরা পরিবার প্রতিপালনের পক্ষে পর্যাপ্ত উপার্জন করতে পারেন। কুলজিয়ান বিনা পারিশ্রমিক বা যৎসামান্য নিয়ে এই শিল্পোৎসাহী ক্ষুদ্রশক্তি বাঙালীদের টেকনিক্যাল-নো-হাউ এবং সৎপরামর্শ যোগাবার মতো ছোট একটি বিভাগ খুলুন। সামান্য পুঁজির বাঙালীরা যেন অন্ধের মতো ব্যবসা করতে নেমে মার না-খান।

সাধনচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার উপসংহারে কুলজিয়ান-ইন্ডিয়ার বিরাট প্রচেষ্টাতে কম্পানির লাভ, রিজার্ভ ফান্ড ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর দিলেন, "ওই যে আমাদের নবীন ও প্রবীণ কর্মীদের আপনি দেখছেন, ওঁরাই আমাদের রিজার্ভ ফান্ড।"

কুলজিয়ান-ইন্ডিয়া ডিভিডেন্ড দিক বা না দিক, গোত্রপতি সাধন দত্তের নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ভারতবর্ষের ব্রেনট্রাস্টের গিল্ট-এজ্ড্ রিজার্ভ—কুবেরের ভাণ্ডার যার কাছে হার মানে। পরিবেশ অনুকূল হলে এই প্রতিভার ভাণ্ডার দেশের কোটি কোটি লোকের আর্থিক ও আত্মিক উন্নয়নে অর্বুদ মেগাওয়াটের শক্তি সঞ্চার করাতে পারবে, এমন এক ডেমোক্র্যাসি, এমন এক করপোরেট ইকনমি ভারতে গড়ে তুলতে পারবে যা দেখে বিশ্বানন্দরাও স্তব্ধ হয়ে যাবেন।

৯ নভেম্বর, ১৯৬৮



ছাব্বিশ

মস্ত বড় বিজ্ঞাপনটার বয়ান ছিল :

> "Announcing! Announcing! Announcing!
> First Ever Air-Circulators Made in India
> By Calcutta Fan Works Pvt. Limited".

দেশের কাগজে কাগজে ছবিওয়ালা ওই বিজ্ঞাপন 'ফ্ল্যাশ' করতে না করতেই 'ক্যালকাটা ফ্যান'-এর দুই কর্তা পত্রাঘাতে নাজেহাল হবার উপক্রম। চিঠির পর চিঠি আসতে লাগলো--"আপনাদের 'অ্যানাউন্সিং' ফ্যানের মাপজোক দরদাম এবং ডেলিভারির টাইম জানিয়ে অতিসত্বর জবাব দিন।" এইরকম কয়েকটা চিঠি পেয়ে তরুণ ম্যানেজিং ডিরেক্টর সৌরেন চক্রবর্তী আর তাঁর শান্তিদা, অর্থাৎ ডিরেক্টর শান্তিময় গঙ্গোপাধ্যায়, হাসবেন না কাঁদবেন, ভেবে পেলেন না। বিজ্ঞাপনের 'কপিতে' কোনো ভুল আছে কি? না-তো!

এটা আর এমন কি—ইংরেজী তো আমাদের মাতৃভাষা নয়! অ্যানাউন্সিংওয়ালাদের মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হওয়া সত্ত্বেও এখনো কতজনের মুখে শুনি 'করোবোরেশন' (মানে, কোল্যাবোরেশন)।

'লক্ষ্মীর কৃপালাভ : বাঙালীর সাধনা' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি যখন 'দেশ' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল তখন একটা সময়ে বিশেষ এক শ্রেণীর পাঠক আমাকে ভর্ৎসনা করে চিঠি লিখেছিলেন যে ব্যবসাবাণিজ্যের কথা লিখতে গিয়ে আমি যে গল্প ফেঁদে রসালাপ করি অথবা শিল্পপতিদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের ছবি আঁকার চেষ্টা করে 'সাবজেক্টিভ রিপোর্টিং' করে থাকি তা অতি গর্হিত কাজ—আমার উচিত 'অবজেক্টিভ রিপোর্টিং' করা। আবার এক বৃহদংশ পাঠক, এমন কি বহু পাঠিকাও, এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করার জন্য আমাকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েও বাধিত করেছিলেন। অতএব মেজরিটির রায় গ্রাহ্য করে আমি আমার

ক্যালকাটা ফ্যান ওয়ার্কস লিমিটেড
৩০ জওহরলাল নেহরু রোড
কলিকাতা—১৬

'সাবজেক্টিভ রিপোর্টিং'-এর আশ্রয়েই পরে আরও অনেক প্রবন্ধ 'দেশ' পত্রিকায় এবং 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' সিরিজে আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখেছিলাম। শুনেছি যে সেই লেখাগুলিও পাঠকসমাজ সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন।

'অবজেক্টিভ রিপোর্টিং'-এর রসহীন রাজ্যে বিচরণ করতে গেলে আজ লেখা চলে না যে, ক্যালকাটা ফ্যানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীসৌরেন চক্রবর্তীর বি-এ পাস করা মেয়ে বনানীর মা আরতি দেবী এককালে অ্যাথলেটিকসে অর্থাৎ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অসংখ্যবার জয়ী হয়ে কাপ মেডেল ও সার্টিফিকেটে বিভূষিতা হয়েছিলেন এবং সাঁতার কাটতেনও বেশ ভালোই; লেখা চলে না যে, তাঁর বড় ছেলে অভিজিৎ বি-কম পড়তে পড়তে বাবার অফিসে কনিষ্ঠ কেরানীর আসনে বসে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং নিচ্ছেন, আর ছোট ছেলে কুনাল বছর সতেরো বয়সেই 'যুদো' পণ্ডিত হয়ে পাঁচ ছ'জন ষণ্ডাকে ঘায়েল করতে পারেন, আর সৌরেনবাবুর বিদুষী ভগিনী ডাক্তার অজিতা চক্রবর্তী বিলিতী ডিগ্রি নিয়ে এসে এখন পি জি হাসপাতালে মনোরোগচিকিৎসক পদে অধিষ্ঠিতা। তরুণ বয়সে অজিতা দেবী সৌরেন, শান্তিময়ের সঙ্গে মুক্তিসংগ্রামেও যোগ দিয়েছিলেন।

অথবা এই কম্পানির আর একমাত্র ডিরেক্টর শান্তিবাবুর পিতা শ্রীবিমলামোহন গঙ্গোপাধ্যায় মশায় যে এককালে অনুশীলন সমিতির ঢাকা শাখার কর্মী ছিলেন, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ মশায়ের পোলিটিক্যাল সেক্রেটারি ছিলেন এবং পরবর্তীকালে আমাদের আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড-এর সারকুলেশন ম্যানেজারের পদ থেকে অবসর নিয়ে আজ ৭৫।৭৬ বছর বয়সেও কর্মঠ রয়েছেন—বিড়লাদের জুটমিল বিভাগে শ্রম-উপদেষ্টারূপে; শান্তিময়ের সহধর্মিণী শ্রীমতী স্নেহ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ বি-টি, বিবাহপূর্ব যুগে শান্তিময়ের সঙ্গে নেতাজীর 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' দলে যুক্ত থেকে কারাবরণ করেছিলেন এবং এখন কলকাতার এক বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা; আর এঁদের একমাত্র সন্তান ইন্দ্রাণী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ক্লাসের ছাত্রী—সে-সব কথাও আজ লেখা চলতো না।

এই সমস্ত বাণিজ্য-বহির্ভূত বিবরণ দিয়ে যে আমি পারিবারিক ঐতিহ্যের রূপটি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করি, আশা করি অধিকাংশ পাঠককে সেটা বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু এইসব ইন্টারেস্টিং কথা ছেড়ে ওই ধোঁয়াটে 'অবজেকটিভ' রিপোর্টিং-টিপোর্টিং আমাকে দিয়ে হবে না। আমি সোজা কথা দিয়েই যতটা পারি এগোই।

সৌরেন্দ্রের পিতা স্বর্গীয় ক্ষীরোদবিহারী চক্রবর্তীর নিবাস ছিল নারায়ণগঞ্জের নদীর ওপারের গ্রাম 'বন্দর'-এ। বারো তেরো বছর বয়সে তিনি জলপাইগুড়িতে তাঁর দিদির কাছে চলে যান। এনট্রান্স পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম হয়ে এক বিশেষ প্রাইজ নিতে গিয়ে দেখেন সভায় পুরস্কার বিতরণ করছেন ইংরেজ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। ক্ষীরোদবিহারী ইতিপূর্বেই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন; কাজেই ইংরেজ জেলা শাসকের কাছ থেকে প্রাইজ না-নিয়ে তিনি সটান বাড়ি ফিরে এলেন। পরে তিনি কলকাতায় এসে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে

বি-এ পাস করেন। গোয়েন্দা পুলিস এমন করে পেছনে লেগে থাকতো যে ক্ষীরোদবিহারী কিছুদিনের জন্য দেশ ছেড়ে পালানো ঠিক করলেন। পালালেন এক জাহাজে পে-মাস্টার বা পার্সার-এর কাজ নিয়ে। সেটা ছিল কার্গো-বোট। ক্ষীরোদবাবু কাজ বাদে অবসর সময়টা বই পড়ে কাটাতেন; বন্দরে জাহাজ ভিড়লেও নামতেন না দেখে ক্যাপ্টেন ঠাট্টা করে তাঁকে বলতেন জাহাজের চাকরি ছেড়ে মাস্টারি করতে। ঘটনাচক্রে হয়েও দাঁড়ালো তাই। দেশে ফিরে তিনি স্বর্গীয়া সরোজিনী নাইডুর বাড়িতে প্রাইভেট টিউটরের কাজ পেলেন। সরোজিনী দেবীর মেয়ে আমাদের প্রাক্তন রাজ্যপালিকা পদ্মজা-ও বোধ হয় ক্ষীরোদবিহারীর ছাত্রী ছিলেন বলে সৌরেনবাবু আমাকে বললেন।

কিছুদিন সেই কাজ করার পর ক্ষীরোদ চক্রবর্তী কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্সে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যত্ব নিলেন। তখন তাঁর গুরুভাইদের মধ্যে ছিলেন স্বর্গীয় নলিনীরঞ্জন সরকার এবং পরবর্তীকালে বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় জে সি দাশ। তাছাড়া মুরারিপুকুরে ন্যাশান্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের (অধুনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) স্থাপনার সময়ে তার সঙ্গেও ক্ষীরোদবাবু অল্পবিস্তর জড়িত ছিলেন।

এর মধ্যে এক সময়ে তাঁর মাথায় ঢুকলো স্বাধীন ব্যবসা করার বুদ্ধি। কলকাতার 'এলিট' সিনেমার সামনে হলদে রঙের যে প্রকাণ্ড বাড়িটা আছে সেটা তখন হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স কম্পানি নিজেদের অফিসের জন্য তৈরি করাচ্ছেন। সুরেন ঠাকুর মশায়ের অনুমতি নিয়ে ক্ষীরোদ-বিহারী সেই 'সমবায় ম্যানশন'-এর ইলেক্‌ট্রিক ওয়্যারিং-এর কাজটি নিলেন।

সেই কাজ থেকে যে প্রতিষ্ঠানটির উৎপত্তি হলো তার নাম 'ক্লাইড এঞ্জিনীয়ারিং কম্পানি লিমিটেড'। সেটা ছিল ১৯১৮ সাল।

মোটা মূলধন নিয়ে ডিরেক্টর হলেন ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের মহারাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর, পাইকপাড়ার কুমার অরুণ সিংহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কুমার অরুণ সিংহ একাই এতে সাত লক্ষ টাকা যুগিয়েছিলেন। এই ক্লাইড এঞ্জিনীয়ারিং থেকেই বেরোলো ভারতে তৈরী প্রথম ফ্যান— ক্লাইড ফ্যান।

সমবায় ম্যানশনেই এই প্রতিষ্ঠানের অফিস এবং ওয়ার্কশপ হলো আর বকুলবাগানের একটা দোতলা বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হলো ক্লাইড ইঞ্জিনীয়ারিং-এর অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং স্কুল। প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস নেওয়া হলো ছেলেদের। তাঁদের কেউ কেউ পরে নিজের কারখানাও করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর্মেচার-ওয়াইন্ডিং-এর সূক্ষ্ম কাজে মেয়ে শিক্ষানবিস নেওয়া হলো।

ক্লাইড এঞ্জিনীয়ারিং-এর তখন ব্যবসাতে, যাকে বলে রমরমা। দিনে ৪০,০০০ টাকার বিক্রিও হতো ফ্যানের সীজনে। বাঙালীর ক্লাইড ফ্যানের যুগ সেটা। কল্লোল গোষ্ঠীর স্বর্গীয় দীনেশ দাস তখন কম্পানির সেলস্‌ ম্যানেজার। শো-রুম ছিল নিউ মার্কেটের দক্ষিণে লিণ্ডসে স্ট্রীটে। (এখনো সেখানেই আছে, কিন্তু মালিকানা বদল হয়ে গেছে বহুদিন আগে। এখন ক্লাইড ফ্যানের কর্তা হচ্ছেন বসুশ্রী সিনেমার মালিক বসু মহাশয়রা)।

ত্রিশ দশকের প্রচণ্ড মন্দায় ক্লাইড এঞ্জিনীয়ারিং লিকুইডেশনে গেল। অরুণ সিংহ মশায়

নানা কারণে আগেই ব্যক্তিগত ইনসলভেন্সি নিয়েছিলেন। ক্লাইড-এর লিকুইডেশনের সময়ে ক্ষীরোদবিহারী যখন হিসেবপত্র নিয়ে কুমার সাহেবের কাছে গেলেন তখন অরুণ সিংহ বললেন, "বড়বাবু (ক্ষীরোদবাবুকে ওই বলেই তিনি সম্বোধন করতেন), যুদ্ধে হেরে গেছি, কী হবে হিসেব দেখে!"

ক্লাইড এঞ্জিনীয়ারিং-এর পতনে ক্ষীরোদবাবু কিন্তু ভেঙে পড়লেন না। তিনি সুদিনে কিছু জমি কিনেছিলেন। এখন যেখানে বাটা কম্পানির গড়িয়াহাটের দোকান আর ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের প্রকাণ্ড বাড়ি সেখানে তাঁর প্রায় ১১ বিঘা জমি ছিল পুকুর সুদ্ধ। পুকুরটা ছিল বাটার দোকানের জমিটাতে; লোকে সেখানে মাছ ধরতো। ক্ষীরোদবিহারী তাঁর জমির অধিকাংশই বিক্রি করে ৭নং হিন্দুস্থান পার্কে বসালেন নতুন এক ফ্যানের কারখানা, আর আবার একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল স্কুল। কারখানার নামকরণ হলো 'ক্যালকাটা ফ্যান' আর স্কুলের 'চক্রবর্তী ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল স্কুল'। এটা হলো ১৯৩২ সালের কথা।

ক্ষীরোদ চক্রবর্তীর অন্তরঙ্গ বন্ধুমহলে ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকা এবং অধুনালুপ্ত বাংলা দৈনিক 'ভারত'-এর মাখনলাল সেন, প্রথিতযশা সাংবাদিক স্বর্গীয় সত্যেন মজুমদার এবং বর্তমানে দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। সেই সুবাদেই ক্ষীরোদবাবুর তিন ছেলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সমরেন্দ্র খুব অল্পবয়সেই আনন্দবাজার পত্রিকায় ঢুকেছিলেন।

কনিষ্ঠ সৌরেন্দ্র তখন প্রায় বালক। (মধ্যম শঙ্কর ১৯৪০ সালে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে যোগ দিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কোহাটে প্রাণ হারিয়েছিলেন এক এয়ার-ক্র্যাশে)। হঠাৎ একদিন জানা গেল যে, সমরেন্দ্র নিরুদ্দেশ। ব্যবসায়ীজীবনে ক্ষীরোদবিহারী বড় ধাক্কা খেয়েছিলেন, কিন্তু পারিবারিক ক্ষেত্রে এগুলিই প্রথম। ক্যালকাটা ফ্যান-এর ব্যবসাতে ঢিলে পড়তে পড়তে প্রায় সর্বনাশ ডেকে আনলো শঙ্করের অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ। তখন ক্ষীরোদবিহারীর জীবন থেকে রূপরস সবই বিদায় নিলো।

বিমলামোহনের ছেলে শান্তিময় গঙ্গোপাধ্যায়, যে অতীতের 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' (সুভাষচন্দ্রের বি ভি) পার্টির কর্মী ছিলেন তা আগেই বলেছি। কৈশোর থেকেই কারাগার হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর ঘরবাড়ি। ১৯৩১-এ ম্যাট্রিক পাস করার পরেই কারাবাস; বেরিয়ে আই-এ পাস করেই আবার দীর্ঘ বন্দীজীবন। শান্তিময় ডেটেনিউ হিসেবে জেলে থেকে বি-এ এবং পরের কিস্তিতে সেই জেল থেকেই ১৯৪৪-এ এম-এ পাস করেছিলেন ইংরেজীতে। তখন তাঁর বাবা বিমলামোহনও কংগ্রেসকর্মী হিসেবে বন্দী ছিলেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কাবুলের পথে সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগের পর আফগানিস্থানে অবস্থিত জার্মান ও ইটালিয়ান ভারতবন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য পার্টি থেকে ১৯৪১-এই তরুণ শান্তিময়কে গোপনে কাবুল পাঠানো হয়েছিল।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটি তথ্য পরিবেশনের যোগ্য। মাস কয়েক আগে বারুইপুরের রাস্তায় রাজপুরে 'বিপ্লবী নিকেতন' নামে যে ভবনটির দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছে এবং যার প্রধান হোতা হলেন জলপাইগুড়ির বিখ্যাত চা-কর শ্রীভক্ত ঘোষ, সেই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা

ব্যাপারে শান্তিময় ও সৌরেন্দ্রের অংশও নগণ্য নয়। এর অফিস হয়েছে ক্যালকাটা ফ্যানের অফিসের এক অংশে। এর প্রেসিডেন্ট ময়মনসিংহের শ্রীনগেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী, ভাইস-প্রেসিডেন্ট শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় এবং সেক্রেটারি হয়েছেন শ্রীশৈলেন নিয়োগী। এই মণ্ডলীর ট্রাস্টি হয়েছেন ভক্ত ঘোষ এবং নয়নাঞ্জন দাশগুপ্ত। এখন বিপ্লবী নিকেতনে ন' জন বৃদ্ধ এবং অতিবৃদ্ধ পরম শ্রদ্ধাভাজন বিপ্লবী আশ্রয় নিয়েছেন। প্রফেসর জ্যোতিষ ঘোষ (মাস্টার মহাশয়) 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীসুকুমার মিত্র, শ্রীনির্বাণ স্বামী এবং যুগান্তর পার্টির শ্রীযুগল দত্ত প্রমুখ অগ্নিযুগের অলাতখণ্ডরা এখন সেখানে আছেন।

বেঙ্গল ভলানটিয়ার্সে শান্তিময়ের রেক্রুটদের মধ্যে ছিলেন শ্রীসৌরেন চক্রবর্তী এবং তাঁর ছোট বোন অজিতা। (স্নেহ বসুকেও তিনি পার্টিতে রেক্রুট করেছিলেন কিনা বললেন না, তবে পরে যে ফ্যামিলিতে রেক্রুট করলেন তা তো দেখাই যাচ্ছে)। বিয়াল্লিশ সালে সৌরেনবাবুকেও পুলিস গ্রেপ্তার করলো। আট ন' মাস রাজবন্দী থাকার পর ছাড়া পেয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। বাড়িতে তখন দৈনন্দিন বাজার খরচও চলে না এমনি দুরবস্থা। ক্ষীরোদবিহারী একেবারেই ভেঙে পড়েছেন।

সৌরেন চক্রবর্তী বাবার হাত থেকে রথের রশি নিজে টেনে নিলেন। অবশ্য তাঁর সঙ্গে রইলেন তাঁর বড় বোন চন্দ্রিমা দেবীর স্বামী শ্রীসুধাকর মুখোপাধ্যায়। ভগ্নিপতি সুধাকরবাবু এঞ্জিনীয়ার ছিলেন এবং ওয়ার্কস ম্যানেজার হিসেবে উৎপাদনের ভার তাঁরই ওপরে ছিল। কিছুকাল আগে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। যুদ্ধের বাজার—এক পল্টনের প্রয়োজনেই ফ্যানের প্রচুর চাহিদা ছিল। প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাতে হবে, পরিবারকে রক্ষা করতে হবে বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সৌরেন চক্রবর্তী বৃটিশ পল্টনকে 'ফ্যান' সাপ্লাই আরম্ভ করলেন। বছর দুয়েকের মধ্যেই ক্যালকাটা ফ্যান-এর লক্ষ্মীশ্রীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলো বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে ১৯৪৪-এ ক্ষীরোদবিহারীর মৃত্যু হলো।

সুন্দরকান্তি সৌরেন্দ্রের মধ্যে আমি এক রসিক পুরুষকে খুঁজে পেলাম, যিনি জীবনটা রঙ্গমঞ্চের পর্যায়ে ফেলে দুঃখকেও বিলাস বলে ধরে নিতে পেরেছেন। কথায় কথায় হাসেন, হেঁয়ালি করেন বাক্যালাপে, আর এইসবের মাঝে মাঝে ব্যবসা সংক্রান্ত দামী দামী কথা বলেন দু'চারটে। বয়স মাত্র ছেচল্লিশ কি সাতচল্লিশ কিন্তু তাঁর চেহারায় একটা ক্লান্তি। এটা কেন হলো তা আমি জানি না, কারণ তিনি তো কৃতকাম শিল্পপতি।

সম্ভবত তিনি কর্মীদের ব্যবহারে হতাশ্বাস। যতটা কাজ করে ক্যালকাটা ফ্যানের কর্মীরা এই বাঙালী প্রতিষ্ঠানটিকে বৃহত্তরের দিকে আরও ঠেলে দিতে পারেন তা তাঁরা করেন না। ১৯৬৫ সাল থেকেই এই প্রতিষ্ঠান ভ্রান্ত শ্রমিক আন্দোলনের বলি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উগ্র-বামপন্থী শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে মহড়া নিতে হয়েছিল বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স-এর শান্তি গাঙ্গুলি ও সৌরেন চক্রবর্তীকে : পঁয়ষট্টিতে 'গো-স্লো' (শ্লথ উৎপাদন) নামক দুর্নীতির বিষ ছড়াতে ছড়াতে সাতষট্টিতে ইউ-এফ সরকারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই স্ট্রাইক হলো। ইউনিয়নের নেতা তখন হয়েছেন শ্রমমন্ত্রী, অতএব স্ট্রাইকে সরকারি সহায়তার ভরসা ছিল। দেড় মাস পরে স্ট্রাইক শেষ হলো বটে, কিন্তু ছড়ানো বিষটা থেকেই গেল। আজও উৎপাদনের গতি মন্থর। মাসে যেখানে

হাজার বারশো বা তারও বেশি ফ্যান তৈরি হতে পারে, সেখানে এখন হচ্ছে পাঁচ ছ' শো। ক্যালকাটা ফ্যানের কারখানার কর্মসংখ্যা আন্দাজ ১৬৫।

ফ্যান বলতে আমাদের প্রথমেই মনে হয় ঘরের সিলিং-এ ঝুলন্ত অথবা টেবিলে বসানো যন্ত্রটির কথা, যার স্নিগ্ধ বাতাসে আমাদের নিদাঘপীড়িত দেহ শীতল হয়। কিন্তু ক্যালকাটা ফ্যানের কার্যক্রমে সেই সাধারণ ফ্যানের স্থান এখন গৌণ।

শান্তি গাঙ্গুলি ছেচল্লিশ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বিড়লা ব্রাদার্সে একটা চাকরি পেয়েছিলেন। মাঝে মাঝে সৌরেনের সঙ্গে দেখা হতো পথে ঘাটে; দুই পোলিটিক্যাল ফ্রেন্ডের আড্ডাও জমতো কখনো সখনো। সৌরেন শান্তিময়কে প্রায়ই বলতেন চাকরি ছেড়ে ক্যালকাটা ফ্যানে যোগ দিতে। অবশেষে ১৯৪৮-এ শান্তিময় এখানে যোগ দিলেন। তিনি নিলেন অফিসের ভার, আর সৌরেন রইলেন উৎপাদন নিয়ে। (আজও তাই আছে। সৌরেন অন্দর মহলে থাকতেই ভালোবাসেন, মিটিং কনফারেন্স ভালোবাসেন না। তাই সেদিকটা শান্তিময়ই দেখাশোনা করেন। শান্তি গঙ্গোপাধ্যায় মশায় এখন এঞ্জিনীয়ারিং এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিলে আছেন, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার এবং ফ্যানমেকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়াতে আছেন, আর আছেন এঞ্জিনীয়ারিং অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য পদে)।

সৌরেনের মাথার ওপরে তো ঘুরতোই, মাথার মধ্যেও সর্বক্ষণ পাখা ঘুরতো। সিলিং আর টেবিল ফ্যানের মতো আটপৌরে জিনিসে তাঁর আর রুচি ছিল না। উপরন্তু তার বাজারও বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের বিপণন কেন্দ্র কলকাতার এজরা স্ট্রীটের ব্যবসায়ীরা বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল দিয়েও 'ক্যালকাটা ফ্যান' ছুঁতে চাইতেন না। সৌরেন্দ্র-শান্তিময় দেখা করতে গেলে তাঁরা তাচ্ছিল্যই করতেন।

এক সন্ধ্যায় চৌরঙ্গী ওয়াই-এম-সি-এর সামনে দিয়ে যাবার সময়ে সৌরেনবাবু হঠাৎ গাড়ি থামালেন। পাশে শান্তিময়। 'শিকাগো রেডিও'-র শো-রুমে সৌরেন একটা অ্যামেরিকান এয়ার-সারকুলেটার ক'দিন ধরেই লক্ষ্য করছিলেন। গাড়ি থেকে দুজনে নেমে ঢুকে গেলেন ওয়াই-এম-সি-এর নীচের তলায় শিকাগো রেডিওর দোকানে। পাখাটাকে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করলেন। দাম জিজ্ঞেস করে জানলেন ১৯০০ টাকা। অতো টাকা খরচ করার সামর্থ্য নেই। দোকানের ইন-চার্জকে ইতস্তত করে বললেন, "পাখার একটা স্পেয়ার ব্লেড বিক্রি করবেন?" ইন-চার্জ অবাক হলেন, কিন্তু মুখে বললেন, "দিতে পারি অমন একটা ব্লেড, কিন্তু দাম পড়বে ৭৫ টাকা"। সৌরেন চক্রবর্তী তৎক্ষণাৎ ব্লেডটি কিনে বগলে পুরে শান্তিবাবুকে টানতে টানতে গাড়িতে উঠলেন। তাঁর ভাবখানা যেন মৃতসঞ্জীবনী বিশল্যকরণী হাতের মুঠোয় পেয়েছেন।

এর পরের ঘটনা দ্রুত। ক্যালকাটা ফ্যানের চণ্ডী-মিস্তিরি আর সৌরেনবাবুদের শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীর (ত্রিশ দশকে লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস'কে যে চারজন বাঙালী শিল্পী অলংকৃত করেছিলেন সুধাংশুবাবু তাঁদের একজন) সঙ্গে বসে সৌরেন্দ্র ভারতের প্রথম এয়ার-সারকুলেটারের ডিজাইন করে ফেললেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই ওই 'অ্যানাউনসিং' ফ্যানের জন্ম হলো। বিদেশী পাখার একটি ডানা থেকে এক ইতিহাসের সৃষ্টি হলো।

ক্যালকাটার এয়ার-সারকুলেটার—ভারতে তৈরি প্রথম এয়ার-সারকুলেটার—সারা ভারতের ঘরে ঘরে হোটেলে ক্লাবে বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে আরম্ভ করলো। সেটা হলো ১৯৫১।৫২ সালের কথা।

এই সময়ের বহুপূর্বে ১৯৪৬ থেকেই এক ভদ্রলোক নিয়মিত অর্থানুকূল্য করে এঁদের অপরিসীম সহায়তা করতেন। তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণসখা সেন।

এজরা স্ট্রীটের ব্যাপারীরা এবারে ঘন ঘন সৌরেন্দ্র-শান্তিময়ের কুশল জিজ্ঞাসা আরম্ভ করলেন, আর অনির্দিষ্ট ডেলিভারির সময় সত্ত্বেও অগ্রিম টাকা জমার লোভ দেখিয়ে এয়ার-সারকুলেটার চাইতে লাগলেন। ক্যালকাটা ফ্যানের কর্তারা সে পথ না মাড়িয়ে গেলেন প্রাচীন বাঙালী প্রতিষ্ঠান এন বি সেন ব্রাদার্সের বিভূতি সেন ও ফণী সেন মশায়দের কাছে। তাঁরা এবং সি সি সাহার চন্ডী সাহা মশায় (হিন্দুস্থান রেকর্ড-এর মালিক) ক্যালকাটা ফ্যানের এয়ার-সারকুলেটারের সুষ্ঠু মার্কেটিং-এর ভার নিলেন।

সৌরেন্দ্রের মাথার মধ্যে কিন্তু পাখা ঘুরেই চলেছে। আরও নতুন নতুন জিনিস তৈরি করতে হবে। বিদেশ থেকে যেসব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যানের আমদানি হয় সেই সমস্তই দেশে তৈরি করার পরিকল্পনায় সৌরেন্দ্রের মন তখন অধীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু সৌরেন্দ্র শান্তিময় কারুরই টেকনিক্যাল বিদ্যা বলতে কিছু নেই।

এমন সময়ে ১৯৫৫।৫৬ সালে ডক্টর জ্যোৎস্নাকুমার চৌধুরী নামে যাদবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের এক কৃতী অধ্যাপকের সঙ্গে এঁদের আলাপ হলো। পরিচয়টা হয়েছিল প্রসিদ্ধ 'গেস্ট কীন উইলিয়ামস্' কম্পানির বর্তমান সেক্রেটারি শ্রীসুখেন্দু রায়ের মাধ্যমে। সুখেন্দু রায় এঁদের কমন ফ্রেন্ড।

ডঃ চৌধুরীর তখন মাত্র ৩৫।৩৬ বছর বয়স। সেই বয়সেই তাঁর উদ্ভাবিত বৈদ্যুতিক যন্ত্রের বেশ কয়েকটা পেটেন্ট কিনেছেন বিলাতের কয়েকটা কম্পানি। আমরা বিদেশ থেকে টেকনিক্যাল-নো-হাউ আনি অজস্র অর্থ ব্যয়ে, এদিকে আমাদের দেশের পন্ডিত বিজ্ঞানীদের 'নো-হাউ' বিকোয় বিদেশে। আমরা ভালো করে তার খবরই করি না।

মাস্টার মশায় (সৌরেন্দ্র থেকে ক্যালকাটা ফ্যানের সবাই ডঃ চৌধুরীকে এই সম্বোধনই করেন) কলকাতা আর ম্যাঞ্চেস্টারের ছাত্র। একান্নো সাল থেকে যাদবপুরে পড়াচ্ছেন। মাঝে কেবল একটা বছর, সাতান্নোতে, ক্যালকাটা ফ্যানেই সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যাদবপুর কর্তৃপক্ষের নির্বন্ধাতিশয্যে পরের বছর আবার অধ্যাপনায় ফিরে যান বটে, কিন্তু বাকী সময়টা তিনি কাটান ক্যালকাটা ফ্যানের নব নব উৎপাদন পরিকল্পনায়।

কিন্তু ক্যালকাটা ফ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাখা উৎপাদন পর্বের গোড়ার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে আরেকজন তীক্ষ্ণ মেধাবী এঞ্জিনীয়ারের বিষয়ে উল্লেখ না করলে। তিনি হলেন কলকাতা কনভেন্ট রোডের কে ই এম এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত কেশব মিত্র। ফ্যান তৈরির শাস্ত্রে অধ্যাপক চৌধুরীর ব্যুৎপত্তি থাকলেও প্রযুক্তিবিদ্যায় তিনি তখন কেশব মিত্রের মতো পারদর্শী ছিলেন না। সৌরেন, শান্তিময় ও জ্যোৎস্না চৌধুরী যখন এই প্রকান্ড যন্ত্রের মতো পাখাগুলি তৈরির ব্যাপারে পদে পদে বাধা পাচ্ছিলেন তখন মুশকিল আসানের জন্য গেলেন কেশববাবুর কাছে। কেশব মিত্রের দৃঢ় আশ্বাস এবং সক্রিয় সহায়তায় ক্যালকাটার

ইন্ডাস্ট্রিয়্যাল পাখা তৈরি হলো—যে পাখা আমদানি-করা বিদেশী পাখার তুলনায় কোনো অংশে কম নয়।

ইমপোর্ট সাব্‌সটিটিউশন-এর দিকে নীরবকর্মী কেশব মিত্রের কীর্তি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। মস্ত মস্ত এঞ্জিনীয়াররা যে সমস্ত কলকব্জা এদেশে তৈরি করা অসম্ভব বলে বলতেন, কেশব মিত্র বলতে গেলে অবলীলাক্রমে তা তৈরি করে অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী জিনিসকেও হার মানিয়ে দিতেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রম করে এই অদ্ভুত যন্ত্রশিল্পী মাত্র পঞ্চাশোত্তর বয়সে পরলোক গমন করেছেন বছর চারেক আগে।

বিজলী বাতি আবিষ্কারের ইতিহাসটি যতটা পরিষ্কার, পাখার ইতিহাস ঠিক ততটাই তমসাচ্ছন্ন। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে অনুসন্ধান করাতে ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান চিত্ত ব্যানার্জি মশায় বেশ দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে আমাকে জানালেন যে, যেটুকু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় যে, ডক্টর হুইলার নামে এক অ্যামেরিকান বিজ্ঞানী ১৮৮২ সালে ছোট একটা প্রপেলারের সঙ্গে এঞ্জিন জুড়ে পাখার প্রচলন বা প্রবর্তন করেন। আর এক সূত্রে শুনলাম যে, স্বর্গীয় স্যার রাসবিহারী ঘোষের উৎসাহে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স বিভাগের অধ্যাপক স্বর্গীয় ফণীভূষণ ঘোষ মহাশয়ের উপদেশে জার্মেনির সিমেন্স কম্পানি সিলিং ও টেবিল ফ্যানের যুগান্তর ঘটিয়েছিলেন। জ্যোৎস্নাকুমারও বলেন যে, তাঁর ছাত্রজীবনে এই পাখাবিজ্ঞানে দেশে বা বিদেশে অধ্যাপক ঘোষের মতো কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে তিনি দেখেননি। বিড়লা মিউজিয়মে আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি; জানি না সেখানে কোনো তথ্য পাওয়া যেত কিনা।

'ফ্যান' যন্ত্রটি পরিবেশকে কেবল ঠাণ্ডা করার কাজেই যে লাগানো হয় তা নয়, শীতপ্রধান দেশে সেন্ট্রাল হীটিং-এও ফ্যান ছাড়া চলে না। এমন কি বরফ জমে রাস্তাঘাট ঢেকে গেলেও এখন শক্তিশালী ফ্যানের ব্যবহার করা হয় বরফ গলানোর জন্যে। মোটরকার তো আছেই আবার ঘর সাফা করার ভ্যাকুয়াম-ক্লীনারেও ছোট্ট ফ্যান লাগে। নানা যন্ত্র, নানা প্রণালীর আবিষ্কার হয়ে ফ্যান-শাস্ত্রটিও হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশাল এক সংহিতা।

উপদেষ্টা স্বর্গত কেশব মিত্র এবং অধ্যাপক জ্যোৎস্নাকুমারের প্রেরণাতেই ক্যালকাটা ফ্যানের কার্যসূচীতে গৃহসজ্জার পাখার চাইতেও ইন্ডাস্ট্রিয়্যাল পাখা বেশী প্রাধান্য পেলো। এগোতে এগোতে আজ তাঁরা ১২৫ রকমের পাখা তৈরি করছেন। সাধারণ 'এক্সজস্ট ফ্যান' ছাড়া, 'রুফ এক্সট্রাক্টর', 'ম্যানকুলার' প্রভৃতি অনেক রকম পাখা তো আছেই, উপরন্তু এই ১৯৬৮ সালে ক্যালকাটা ফ্যান 'ক্যালেয়ার' নাম দিয়ে একটি বিশেষ ধরনের ফ্যান তৈরি করেছেন যার কাজ হলো বন্ধ ঘর থেকে দূষিত হাওয়া বের করে সঙ্গে সঙ্গেই শুদ্ধ হাওয়ায় ঘর ভরে দেওয়া। হাসপাতাল, ল্যাবরেটারি ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে এয়ার-কণ্ডিশণ্ড ঘরের পক্ষেও এর অসাধারণ উপযোগিতা আছে বলে শুনলাম। এয়ার-সারকুলেটারের মতন এইটিও এ'রাই ভারতে প্রথম চালু করলেন।

বিরাট থার্ম্যাল পাওয়ার স্টেশনের গরম হাওয়া বের করে দেওয়ার, খনির বিষাক্ত হাওয়া

টেনে বাইরে আনার, জাহাজের এঞ্জিন রুমের প্রচণ্ড গরম হাওয়া এক্সজস্ট করে দেওয়ার উপযোগী ক্ষুদ্র ও প্রকাণ্ড সব বিচিত্র আকারের পাখা দেখে এলাম ক্যালকাটা ফ্যানের তিলজলায় অবস্থিত মনোরম ফ্যাক্টরিতে। বার্মিজ প্যাগোডার চূড়োর আকারের একটি ফ্রেমে যে বিরাট পাখাটি লাগানো আছে তার কাজ হলো প্রকাণ্ড (দু চারশো ফুট দৈর্ঘ্য প্রস্থের) বন্ধ ঘরের ছাদের ওপর থেকে গরম হাওয়াকে টেনে বের করে ফেলা, যে কাজটি দেয়ালে লাগানো একজস্ট-ফ্যান ভালো করে পারে না।

বেশ লাগছিল সব দেখতে। হঠাৎ মেজাজটা খিঁচড়ে গেল একটি যন্ত্র দেখে। এঁদের তৈরী সাইরেন—এইগুলিই রোজ সকাল ন'টায় কর্কশ চীৎকার করে কলকাতাবাসীর পটহ ভেদ করে মনে করিয়ে দেয় যে আমরা সততই মৃত্যুর দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছি।

কারখানার ভেতরটা কী সুন্দর! উচ্চতায়, দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে কর্তারা এটিকে গড়েছেন শ্রমিকের স্বচ্ছন্দে কাজ করার পক্ষে আদর্শ যন্ত্রশালা। দামী দামী লেদ ড্রিল ইত্যাদি সযত্নে লালিত। টেস্টিং ডিপার্টমেন্টের সরঞ্জামেও একটা বনেদীয়ানা আছে। এর মধ্যে অধিকাংশ যন্ত্রপাতিই এঁদের টেকনিশিয়ানদের সংকলিত—অবশ্য ডক্টর চৌধুরীর নির্দেশে।

একাধারে ফ্যাক্টরির ম্যানেজার ও সেক্রেটারি শ্রীসুধীন বসু নীরব কর্মী। কথাবার্তা কম বলেন, কর্তব্যপালনেও একনিষ্ঠ। ক্যালকাটা ফ্যানে আছেন ১৯৫০ সাল থেকে। ইনিও এক প্রাক্তন বিপ্লবী।

শ্রীশচীন গোস্বামী নামে সপ্রতিভ যুবকটি হলেন ওডহাউস-এর গল্পের স্মিথ্-এর মতো—সকল কাজের-কাজী। ইনিও প্রায় ১৮।১৯ বছর এখানে আছেন।

হেড অফিসেও এইরকম আর এক ব্যক্তি আছেন—শ্রীপঞ্চানন হালদার। চব্বিশ পরগণার এক কৃষক পরিবারের সন্তান পঞ্চানন ম্যাট্রিক পাস করে সামান্য টাইপরাইটিং শিখে কোনো চাকরি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সেটা হলো বছর কুড়ি আগেকার কথা। কাজ না পেয়ে তিনি হাজির হলেন ক্যালকাটা ফ্যানের কারখানায়। সেখানেও লোকের দরকার ছিল না। তবুও তিনি সর্দার মেকানিকদের ধরাধরি করে প্রায় বিনা বেতনেই সহকারী হয়ে ঢুকলেন। একদিন ঘটনাচক্রে তিনি শান্তিবাবুর নজরে পড়লেন। ম্যাট্রিক পাস, কিছুটা টাইপ করতে জানে দেখে শান্তিবাবু ছেলেটিকে পঁচিশ টাকা মাইনেতে অফিসের কাজে বসালেন। সেই বিনা মাইনের ছোট মিস্ত্রী পঞ্চানন হালদার আজ ক্যালকাটা ফ্যানের হেড অফিসের ছোটখাটো এক স্তম্ভ। এখন মাইনে পান শ' চারেক টাকা। শান্তিবাবু বললেন যে পঞ্চানন হলেন সকলের বিপদতারণ। কেউ কিছু অসুবিধেয় পড়লেই, ডাকো পঞ্চাননকে। পঞ্চানন হালদার দায়মুক্তি অভাবমোচন সবই হাসিমুখে করে বেড়ান।

হেড অফিসে মহিলা কর্মী আছেন চারজন। শ্রীমতী গৌরী দাশগুপ্ত, শ্রীমতী আরতি সোম, শ্রীমতী গীতা চক্রবর্তী এবং শ্রীমতী দীপ্তি বসু। সকলেই এখানে অনেকদিন ধরে আছেন—কেউ বারো বছর, আবার কেউ সাত বছর; আর শ্রীমতীরা সকলেই এসেছিলেন কুমারী অবস্থায়। একে একে নীড় বেঁধে ঘরণী হয়েছেন, মা হয়েছেন, আবার ক্যালকাটা ফ্যানের অফিসটিকেও অলঙ্কৃত করছেন। রিসেপশনিস্ট, টাইপিস্ট, করণিকের কাজ করছেন এঁরা

নিজের সংসার করার মতো দারুণ উৎসাহ নিয়ে। পুরুষ কর্মী এখানে অনেক; জনে জনে সকলের কথা লেখা সম্ভব নয়।

ক্যালকাটা ফ্যানের সাজ-সরঞ্জামের ক্রেতাদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকটি সংস্থার নাম না-করলে এ'দের এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যানের প্রয়োজনীয়তা ঠিক বোঝাতে পারবো না। থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের মধ্যে আছে দুর্গাপুর ১, ২ এবং ৩নং ইউনিট, বারাউনি, ব্যাণ্ডেল, ধুবরন, অমরকণ্টক, মহারাষ্ট্রের ভুসওয়াল, মান্দ্রাজের বেসিন ব্রিজ, দিল্লী ইলেকট্রিক প্রভৃতি। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে ইণ্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়মের হীরাকুড ও আল্লুপুরম্ ফ্যাক্টরি, জে-কে'র অ্যালুমিনিয়ম করপোরেশন, কলকাতার ন্যাশান্যাল রাবার ও ইনচেক টায়ার প্রভৃতি।

এখানে আর একটু পরিসংখ্যান দেওয়া দরকার—সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে এই শিল্পের উন্নতি বা অবনতির ছোট্ট একটু ইতিহাসও। যুদ্ধোত্তর যুগের কিছুকাল পরেও পশ্চিম বাংলায় বাঙালীর প্রায় ৭০টি ফ্যানের কারখানা ছিল। এখন কমতে কমতে বাঙালীর কারখানার সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে গুটি চারেকে—ক্লাইড, ক্যালকাটা, ভারত (ট্রপিক্যাল) এবং জি-টি-আর। তার মধ্যে সিলিং ও টেবল-ফ্যান উৎপাদনে ট্রপিক্যাল সবার আগে; তাঁদের মাসিক উৎপাদন ১২।১৪০০ পাখা। ক্যালকাটা মাসে ৬।৮০০ পাখা করে, কিন্তু এর অধিকাংশই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পাখা। ক্লাইডের উৎপাদন এখন মাসে মাত্র ২।৩০০। জি-টি-আর-এর বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ করতে পারলাম না। উপর্যুক্ত তথ্য শান্তি গাঙ্গুলি মহাশয়ের সৌজন্যেই পাওয়া গেল।

মন্দার বিষয়ে আমার প্রশ্নের উত্তরে সৌরেনবাবু ও মাস্টার মশায় সমস্বরে বলে উঠলেন যে, এই শিল্পে 'রিসেশন' তো নেই-ই, উপরন্তু পাঁচগুণ বাড়ালেও গুদামে পড়ে মরচে ধরবে না। অথচ উৎপাদনটা বাড়বে কেমন করে? কাজ করে যাঁরা নিজেদের এবং প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর করবেন তাঁরাই তো শুনলাম শ্রমবিমুখ। নইলে, যে শিল্পে মন্দা নেই তার বিক্রির অঙ্ক বাড়তে বাড়তে এমন করে নেমে আসবে কেন?

সাল	উৎপাদন (পাখার সংখ্যা)	বিক্রয় মূল্য
১৯৬২	১১৬৯	৩৪ লক্ষ টাকা
১৯৬৪	১১৮৭৩	৪৩ লক্ষ টাকা
১৯৬৭	৬৪৯৬	৩০ লক্ষ টাকা

৪ লক্ষ টাকা মূলধনের প্রাইভেট লিমিটেড কম্পানির পক্ষে ৩৫।৪০ লক্ষ টাকার উৎপাদন তো মহা কৃতিত্বের কথা! কর্তা ও কর্মীর যুক্ত প্রয়াসেই যার গতি ছিল শিখরের দিকে তাকে এখন আবার সানুদেশের অভিমুখে মোড় ফেরানো তো বাঙালীর অগৌরবের কথা।

কোয়ালিটির অবনতির জন্যে এটা ঘটে থাকলে এক কথা ছিল। ক্রেতাদের নামধামে তো ক্যালকাটা ফ্যানের উৎকর্ষই প্রমাণিত হয়।

মাস্টারমশায় ও সৌরেনবাবুর সঙ্গে ফ্যাক্টরির চকচকে ঝকঝকে দোতলা অফিসবাড়িটা থেকে বেরোবার সময়ে শান্তিবাবু এবিষয়ে গর্বের সঙ্গে বললেন, "আমাদের ফ্যানের কোয়ালিটি? We may be out-talked, out-priced, out-manoeuvred, but shall never be beaten in quality."

১৬ নভেম্বর, ১৯৬৮





সাতাশ

বাঙালীর প্রাচীন প্রতিষ্ঠান 'সুর-নিয়োগী-কুমার'-এর হীরকজয়ন্তী উৎসব কয়েক দিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে। ঘটনাটা সকল বাঙালীর পক্ষেই সমীক্ষার বিষয়।

বাঙালী আজ পর্যন্ত অনেক ব্যবসাতে হাত লাগিয়েছে, প্রতিষ্ঠান গড়েছে অসংখ্য আর পথিকৃতের মহান দায়িত্বও গ্রহণ করেছে অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু ওই পর্যন্তই; প্রতিষ্ঠানের বার্ধক্য কেন, যৌবনকালে উপনীত হবার আগেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে, হয় সেটার মালিকানা বাঙালীর হাত থেকে চলে গেছে, নয় তো অকালে তার মৃত্যু ঘটেছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বণিকগোষ্ঠীর চেয়ে কম পরিশ্রমী এবং অনেক বেশী ভাবালু বাঙালী ব্যবসায়ীর পক্ষে আয়ব্যয়ের ভারসাম্য না রাখতে পেরে ব্যবসায়িক সাধুতার সীমালঙ্ঘনই বোধ হয় এর প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণটি হলো, এক কথায় যাকে বলা চলে ঈর্ষা। বাঙালী প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ঈর্ষা, বাইরে ঈর্ষা। কর্তৃপক্ষের নিজেদের মধ্যে হানাহানি তো থাকেই, উপরন্তু বাইরে, বিশেষ করে সমব্যবসায়ীদের ঈর্ষাপরায়ণতা বাঙালী প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘজীবনের পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রবন্ধগুলি লেখার ফলে সেটা আমি আরও বেশী করে বুঝতে পারছি। প্রত্যেকটি না হলেও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পরেই বাঙালী সমব্যবসায়ীদের ভদ্র ও অভদ্র পত্রাঘাতে আমি জর্জরিত হয়ে পড়ি। আততায়ীবর্গের প্রধান অভিযোগ হলো যে, একজনের বা এক প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে লেখা মানে বিশেষ প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞাপন করা। কিন্তু একই প্রবন্ধে সকলের সম্বন্ধে লিখলে যে রচনাটি এক বিজনেস ডাইরেক্টরীর আকার ধারণ করে এবং সুখপাঠ্য থাকে না, অভিযোগকারীরা সেটা যেন বুঝেও বোঝেন না। একের বিষয়ে লিখলেই অন্যদের যে ছোট করা হয় না, তা তাঁদের ঈর্ষায় অসাড় মন উপলব্ধি করতে পারে না। অথচ কলকাতার অবাঙালীদের মধ্যেই দেখেছি যে, তাঁদের সমগোত্রীয় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের শ্লাঘা পত্র-পত্রিকায় বেরোলে সেই সমাজের প্রায় সকলেই আনন্দিত হন।

সুর-নিয়োগী-কুমার অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড
৩৯ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা **১২**
৪ রাজা উদমন্ত স্ট্রীট, কলিকাতা **১**

সুর-নিয়োগী-কুমার, তথা সুর পরিবার নিষ্ঠা ও সাধুতার জন্যে এই দীর্ঘ ষাট বছর পার হয়ে হীরকজয়ন্তীর তিলক পরার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের মহত্তর কৃতিত্ব হলো যে, তাঁরা বাঙালী হয়েও এত বছর ধরে নিজেদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্যবন্ধন বজায় রেখে এত পথ এগিয়ে আসতে পেরেছেন অন্যের ঈর্ষার অনল থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে। তাঁদের শতবর্ষ-পূর্তি উৎসবও যেন আরও বড় করে অনুষ্ঠিত হয়, এই কামনাই সর্বান্তঃকরণে করছি।

সুর-নিয়োগী-কুমার অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থাটি যে কেবল নিজেই ষাটের কোঠায় পা দিলো তাই নয়, ইতিমধ্যে তার সন্তানসন্ততির সংখ্যাও হয়েছে বেশ কয়েকটি এবং তার প্রায় প্রত্যেকটিই সুস্থ ও সবল। সুর-নিয়োগীর গল্প বলার মাঝে মাঝে তাদের কথাও এসে পড়বে, কিন্তু হীরকজয়ন্তী যার, তার কথাটাই বেশী করে আজ বলবো।

গত শতকের শেষভাগে হুগলি জেলার নন্দীগ্রামের তারিণীচরণ সুর নামে এক উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি জীবিকার সন্ধানে বিদেশ যাওয়া স্থির করলেন। আজ যেমন মন্ত্রী ও ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে শিল্পী, খেলোয়াড়, অধ্যাপক আর ছাত্র নির্বিঘ্নে, আরামে বিলেত-টিলেত চলে যান, সেকালে দেশেরই এক অঞ্চল থেকে অন্যত্র যাওয়া তার কাছাকাছিও ছিল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বছর বছর হিমালয়ে যেতেন কত আয়োজন উদ্যোগ করে—দীর্ঘদিনের পথ অতিক্রম করতে রেল, স্টীমার, গরুর গাড়ি, নৌকা আর ডাণ্ডি, কোনো বাহনই বাদ পড়তো না। রীতিমত অভিযান ছিল সেই যাত্রা। তারিণী সুর ধনী ছিলেন না, তাই তাঁর বিদেশ যাত্রা অভিযানের পর্যায় ছাড়িয়ে কৃচ্ছ্রসাধনার চূড়ান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৮৮৪ সালে তারিণীচরণ ওড়িশার কটক শহরে পৌঁছে কাঠের ব্যবসা শুরু করলেন যৎসামান্য পুঁজি নিয়ে। কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন এবং ভাগ্যও ছিল সুপ্রসন্ন, তাই তারিণীবাবু ব্যবসাতে দ্রুত উন্নতি করতে পারলেন।

তারিণীচরণের তখন চার ছেলে। জ্যেষ্ঠ শরৎচন্দ্র তারিণীবাবুর ওড়িশা যাত্রার বছর কয়েক পরে বাংলা সরকারের সেচ বিভাগের একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার পদে বহাল হয়েছিলেন। মধ্যম হেমচন্দ্র ১৮৯০ সালে কটকে গিয়ে বাবার ব্যবসাতে যোগ দিলেন। কিছুকাল পরে একক ব্যবসা করার সুযোগ পেয়ে তিনি পৃথক একটি প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করলেন। সেটাও কাঠেরই ব্যবসা। তিনিও পরিশ্রমী ব্যক্তি ছিলেন এবং ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁকেও কৃপা করাতে সেই ব্যবসারও প্রচুর শ্রীবৃদ্ধি হলো।

হেমচন্দ্রের সহোদর ছোট দুই ভাই সতীশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ কয়েক বছরের মধ্যেই কটকে এসে দাদার ব্যবসাতে যোগ দিলেন। বছর দশ-বারো তিন ভাইয়ের বাণিজ্যপ্রচেষ্টা বেশ ভালোই চললো।

সঙ্গে সঙ্গে তারিণীচরণের প্রতিষ্ঠানও উন্নতি করে চলেছিল, কিন্তু উত্তরকালে তার সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন তারিণীবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের দুই ছেলে শ্রীনরেন্দ্রনাথ ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সুর। তাঁরা এখন কটকের বাসিন্দা হয়ে গেছেন এবং তাঁদের প্রকাণ্ড কাঠের ব্যবসা ছাড়াও তাঁরা মস্ত একটি কণ্ট্রাক্টারি ফার্মের মালিক।

১৯০৮ সালে অকালে হেমচন্দ্রের পত্নীবিয়োগের পর তিনি কলকাতায় চলে এলেন। সেই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে বিজয়কৃষ্ণ কুমার ও ক্ষীরোদচন্দ্র নিয়োগী নামে দুই বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়ে হেমচন্দ্র ৩৯নং কলেজ স্ট্রীটে ক্ষুদ্র একটি প্লাম্বিং সামগ্রী সাপ্লাইয়ের দোকান খুললেন। ফার্মের নাম হলো সুর-নিয়োগী-কুমার অ্যান্ড কম্পানি। ইতিপূর্বে ক্ষীরোদচন্দ্রের নিজস্ব একটি প্লাম্বিংয়ের দোকান ছিল এবং তিনি একাধিক সরকারি বিভাগের অ্যাপ্রুভড্ প্লাম্বার ছিলেন।

এই তিনজনের সঙ্গে সুর মহাশয়দের এক নিকট আত্মীয়ও যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর নাম স্বর্গীয় কানাইলাল বিশ্বাস। প্রতিষ্ঠান লিমিটেড কম্পানিতে পরিণত হওয়ার পরে কানাইবাবু কিছুদিনের জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টরের স্থলাভিষিক্তও হয়েছিলেন।

সেই সময়ে এই ধরনের স্যানিটারি, প্লাম্বিং ও টিউবওয়েল সরঞ্জামের ব্যবসাতে প্রায় কোনো ভারতীয়ই ছিলেন না বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। ব্যবসাটিতে সামান্য কয়েকটি বিদেশী কনসার্নের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। সুর-নিয়োগী-কুমারের সাধুতা ও পটুত্বের জন্যে ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগলো। সম্ভবত সেই গতিতেই সুর-নিয়োগী উন্নতির পথে অগ্রসর হতেন, কিন্তু হঠাৎ একটি ঘটনা গতিকে অনেক দ্রুততর করে দিল।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে মিঃ মার্টিন নামে এক ইংরেজ বণিক 'স্লাজার' প্রণালীতে টিউবওয়েল বসাবার জন্য একটি 'পেটেন্ট' পেয়েছিলেন। নানা কারণে তিনি সেটাকে কার্যকর করে তুলতে পারলেন না। তখন অবশ্য এমনিতেই টিউবওয়েলের বিষয়ে সাধারণ মানুষ বিশেষ কিছু জানতেন না। সামান্য যে-কয়জন জানতেন তাঁরাও নলকূপ ব্যবহারের প্রচারে বেশী এগোতে ভরসা পেতেন না, কারণ তখন ব্যাপারটা বেশ ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। নির্মল জলের জন্যে সেকালের পাশাপাশি দু-তিনটি গ্রামের লোক এক হয়ে সুবিধেমত এক-একটি দীঘি কাটিয়ে তাঁদের জলের অভাব মেটাতেন। বহু যুগ ধরে আমাদের বাংলা দেশের গ্রামীণ মহিলারা কলসী কাঁখে করে সেই 'জলকে চল'-এর পর্ব চালিয়ে গিয়েছিলেন। দীঘির ঘাটে মহিলাসমাজের বৈঠকে অংশ নেওয়া, গল্পগুজবে আসর মাতানোর অবসরটি সুখকর হলেও মোটের ওপর পর্বটি এই বর্ষা-প্রধান দেশে বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। তা ছাড়া খরার সময়ে মানুষের যে ক্লেশের সীমা থাকতো না সেটা বলাই বাহুল্য। উপরন্তু এইসব দীঘি, সায়র আর পুকুরের জল মাঝে মাঝে দূষিত হয়ে বাধিয়ে দিত গ্রামকে গ্রাম উজাড় করা মহামারী।

মার্টিন সাহেব অকৃতকার্য হবার অনেক পরে ১৯২৩-২৪ সালে বাংলা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ গ্রামে গ্রামে টিউবওয়েল বসাবার জন্যে এক ইংরেজ প্রতিষ্ঠানকে ১০০০ নলকূপের অর্ডার দেন। কিন্তু এবারের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন হেমচন্দ্র সুর মশায়ের চেষ্টায় সুর-নিয়োগী-কুমারের ওপর এই গুরুভার অর্পিত হলো।

হেমচন্দ্র দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল অসাধারণ। সৌভাগ্যবশত তিনি এক বাঙালী টিউবওয়েল এক্সপার্টকে পেয়েই এই কঠিন কাজটি হাতে নিতে পেরেছিলেন।

তাঁর নাম শ্রীবিপদবরণ সরকার। তাঁর সহায়তাতেই সুর-নিয়োগী দেশে তৈরী সস্তা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে খুব কম খরচে এই বিরাট কাজটিতে সফলতা লাভ করেন।

বিপদবরণের কৃতকার্যতার মূলে কিন্তু ছিলেন হেমচন্দ্র সুর। উপযুক্ত কনট্রাক্টের বহু পূর্ব থেকেই বিপদবরণের পরীক্ষানিরীক্ষায় অকাতরে অর্থসাহায্য করেছিলেন হেমচন্দ্র সুর মহাশয়ই। অধুনা পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা-বিক্রমপুরের দরিদ্র, আদর্শবাদী স্কুল মাস্টার বিপদবরণ দেশসেবার উদ্দেশ্যেই নলকূপ গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। লোকে তাঁকে ছিটগ্রস্ত মানুষ হিসেবেই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু আবিষ্কারের নেশা যাঁদের আছে তাঁদের অধিকাংশই ছিটগ্রস্ত। যেখানে একশো-দেড়শো ফুট গভীর একটি টিউবওয়েল খোঁড়ার কাজে এই শতকের দ্বিতীয় দশকে বিদেশী কম্পানির ইম্পোর্টেড যন্ত্রপাতির দাম পড়তো সেদিনের ২,৫০০ টাকা, বিপদবরণ-বাবু সেখানে এমন সব যন্ত্রের উদ্ভাবনা ও প্রয়োগ করলেন যার দাম এখনও পড়ে ৪০।৫০ টাকা। দরিদ্র দেশকে দরিদ্র বিপদবরণের এই মহান দানের জন্য আমরা বাঙালীরা, তথা ভারতবাসীরা, কৃতজ্ঞ বললে খুবই কম বলা হয়। তিনি আমাদের কাছে ভারতরত্ন। বিশেষ করে এই কারণে যে, আজকের অশীতিপর বৃদ্ধ আদর্শবাদী বিপদবরণ খাটো মোটা ধুতিকেই অঙ্গের ভূষণ রেখে এখনো তাঁর নলকূপ-গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখন তিনি চেষ্টা করছেন লোহার পাইপের বদলে বাঁশের অথবা অ্যাজবেসটসের নলের সাহায্যে টিউবওয়েল তৈরি করার। বিপদ-বরণকে এই প্রয়াসেও হেমবাবুই উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছিলেন।

এ ছাড়াও আর একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। সুর-নিয়োগী-কুমার প্রথম দিকে 'স্লাজার' প্রণালীতে টিউবওয়েল বসাতে গিয়ে বহির্নলহীন গর্ত সংরক্ষণ বিষয়ে ঠেকে পড়েছিলেন। তখন বিপদবরণবাবু বরিশালের চিন্তাহরণ সেন নামে এক ভদ্রলোকের সাহায্যে সেই গর্ত যাতে খোঁড়ার পরে জল ওঠার আগেই বুজে না যায় তারও এক সহজ ও সস্তা উপায় আবিষ্কার করলেন। সেটা করেছিলেন গোবরের ব্যবহার করে।

টিউবওয়েল খোঁড়ার খাতে অভাবনীয় ব্যয়সংকোচ করা ছাড়াও হেমচন্দ্র কলকাতার কারিগর দিয়েই 'ভাগীরথী' হ্যাণ্ড-পাম্প-এর প্রবর্তন করে পথিকৃতের কাজ করেছিলেন। ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হলেও সেই 'ভাগীরথী' পাম্প সুর শিল্প সংগঠনের উন্নতির প্রথম সোপানের বৃহদংশ।

১৯৩০ সালে এই প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের তাগিদে পার্টনারশিপ ফার্ম থেকে 'লিমিটেড' কম্পানিতে পরিণত হলো। এবারেও অংশীদারদের মধ্যে সুর পরিবারের সমধিক প্রাধান্য রইলো। ইতিমধ্যে সতীশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ সুর মহাশয়রাও যে ওড়িশা থেকে কলকাতায় এসে সুর-নিয়োগীর কাজে বহু পূর্ব থেকেই সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন সেটা উহ্য থেকে গিয়েছিল সুর-নিয়োগীর কর্মসূচীর বিবরণ দিতে গিয়ে। সুর পরিবার অন্য দিক দিয়েও শিল্পপ্রসারে লিপ্ত হয়েছিলেন ইতিমধ্যে; সে কথা পরে আসছে।

ক্ষীরোদচন্দ্র নিয়োগী মশায় বিপত্নীক ও নিঃসন্তান ছিলেন। ১৯৫৭ সালে তাঁর মৃত্যুর সময়ে তিনি প্রতিষ্ঠানে তাঁর অংশ এবং সঞ্চিত বেশ কয়েক লক্ষ টাকা 'সদগোপ সভা'-কে দান করে গেছেন। তাঁর শেয়ারগুলি সুর মহাশয়রা কিনে নিয়েছেন। স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ কুমার

মহাশয়ের সামান্য কিছু শেয়ারের এখন স্বত্বাধিকারী হয়েছেন তাঁর একমাত্র সন্তান শ্রীদেবেন্দ্রনাথ কুমার।

সুর পরিবারের শিল্প সম্প্রসারণের সূচিতে সর্বপ্রথমে এলো ১৯১৮ সালে স্থাপিত 'সুর এনামেল অ্যান্ড স্ট্যাম্পিং ওয়ার্কস'। বর্তমান প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থাটি পত্তনের সময়ে ছিল পার্টনারশিপ ফার্ম। ১৯২৯ সালে এটিকে সমিতিভুক্ত করা হয়।

এনামেল শিল্পের ইতিহাস ঘেঁটে যতটা পাচ্ছি তাতে মনে হয় সুর এনামেলই ভারতবর্ষে এই শিল্পের প্রবর্তক। এখন অবশ্য বাংলা দেশ ও অন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সুর এনামেলের বর্তমান ৫০/৬০ লক্ষ টাকার বার্ষিক উৎপাদনের চাইতে অনেক বেশীও করছেন, কিন্তু পথিকৃতের সম্মান সুর মহাশয়দেরই প্রাপ্য। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র সুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমৃগাঙ্কমোহন এই শিল্পে কারিগরি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে ঘুরে এসে তাঁর বড় কাকা হেমচন্দ্রের সহায়তায় এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করেছিলেন। এখন এর কর্তা হলেন স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ সুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশিশিরকুমার এবং মধ্যম শ্রীমিহিরকুমার সুর। সুর-নিয়োগী-কুমারের বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীঅক্ষরকুমার সুরের মধ্যম পুত্র শ্রীমান প্রণব 'সেরামিক্স্' বিষয়ে এম. এস-সি. পরীক্ষায় উচ্চতম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে এখন সুর এনামেলের উৎপাদনের মানোন্নয়নের গবেষণায় লিপ্ত। এই প্রতিষ্ঠানের এনামেলের তৈরী বাসনকোসন এবং স্যানিটারি ফিটিংস প্রভৃতি ভারতবর্ষের বাজারে সমাদৃত।

অক্ষয়বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎপরিচয়ের সূত্রে তাঁর নিজের এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের কথাও জানলাম। জ্যেষ্ঠ প্রণয়কুমার এঁদের সাতান্ন সালে প্রতিষ্ঠিত বিহারের জামতাড়া শহরের নিকটস্থ 'কাশিতাঁড় স্টোন কোয়্যারী'-র তত্ত্বাবধানে আছেন। প্রণবকুমারের কথা ওপরে বলেছি। কনিষ্ঠ রবীন এবং কন্যা শ্রীমতী রিনা পাল বেছে নিয়েছিলেন চিত্রশিল্প এবং সংগীত। অর্থাৎ, পারিবারিক ঐতিহ্যে এঁরা এক নতুন অধ্যায়ের রচনা করেছেন।

এঁরা ছাড়া তারিণীচরণের চতুর্থ পুরুষের সন্তান-সন্ততিদের আর দু-তিনজনের সম্বন্ধে আমার জানার সুযোগ হয়েছে। যাঁদের সম্বন্ধে জানতে পারিনি তাঁরাও নিশ্চয়ই শিক্ষা ও সংস্কৃতিমণ্ডিত হয়ে সুর পরিবারকে অলংকৃত করছেন। কনিষ্ঠদের মধ্যে একজনের নাম উল্লেখ্য। তিনি শ্রীমিহির সুরের পুত্র অমিত। অমিত তেষট্টি সালে হায়ার সেকেন্ডারি সায়ান্সে তৃতীয় স্থান অধিকার করার পর ছেষট্টিতে ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে এবারে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে এম. এস-সি. পরীক্ষা দিচ্ছেন।

অক্ষয়বাবু এবং তাঁর খুড়তুতো-জ্যেঠতুতো ও সহোদর ভাইয়েরা প্রায় সকলেই কটকে মানুষ। ছেলেবেলায় ভালো ফুটবলার ছিলেন বলেই বোধ হয় প্রৌঢ় অক্ষয়কুমার এখনো বেশ শক্তসমর্থ। তিনি কটকের 'র‍্যাভেনশ' কলেজের ফুটবল ক্যাপ্টেন এবং ওড়িশা একাদশে প্রতিনিধিত্ব করা ছাড়াও কলকাতার এরিয়ান্স টীমের খেলোয়াড় ছিলেন। মুক্ত হাওয়ার নেশা তাঁর এখনো যায়নি; সুযোগ পেলেই মৎস্য এবং পশু শিকারে বেরিয়ে পড়েন দক্ষ শিকারী অক্ষয়কুমার।

সুর-নিয়োগী-কুমার কম্পানির বর্তমান চেয়ারম্যান হলেন হেমচন্দ্রের একমাত্র পুত্র শ্রীরামচন্দ্র সুর, যাঁকে অক্ষয়বাবুরা সম্বোধন করেন 'সেজদা' বলে। মৃগাঙ্কমোহন হলেন 'বড়দা', মেজদা শ্রীশশাঙ্কমোহন (শরৎচন্দ্রের মধ্যম পুত্র) শারীরিক অসুস্থতার জন্য বহুদিন আগেই অবসর নিয়েছেন।

শিল্পোদ্যমে মৃগাঙ্কমোহন ও রামচন্দ্রের একটি বিশেষ অবদান হলো চল্লিশ দশকে 'রেফ্রিজারেটার্স ইন্ডিয়া' নামক অ্যামেরিকান প্রতিষ্ঠানটি কিনে ১৯৪৮ সালে 'সুর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড'-এর স্থাপনা। ১৯৪৯-এ মৃগাঙ্কমোহন ও রামচন্দ্রের, তথা সুর পরিবারের অবদানকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দেওয়া যায়। সে বছরের এক শুভ দিনে সুর ইন্ডাস্ট্রিজের কারখানায় সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় এঞ্জিনীয়ারদের কৃতিত্বে বর্তমানে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'সুর-ফ্রিজ' রেফ্রিজারেটার নির্মিত হয়েছিল। এখন এই রেফ্রিজারেটারের যন্ত্রাংশের শতকরা মাত্র তিন ভাগ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। প্রায় পুরোপুরি স্বদেশী মেশিন হওয়া সত্ত্বেও এত ভালো কোয়ালিটি 'ফ্রিজ' তৈরি করার মধ্যে আছে মৃগাঙ্কমোহন, রামচন্দ্র ও তাঁদের সহযোগীদের মুন্সিয়ানা। পরবর্তী কালে সুর ইন্ডাস্ট্রিজের তৈরি রুম-এয়ারকন্ডিশনার, ডীপ-ফ্রীজার, ব্লাড-ব্যাঙ্কের 'ব্লাড-প্লাজমা স্টোরেজ' যন্ত্র, বৈদ্যুতিক কুকিং-রেঞ্জ এবং জল গরম করার ওয়াটার-হীটার সারা ভারতের বাজারে সমাদৃত হয়েছে। আর ভারত সরকার যখন ফরেন এক্সচেঞ্জ বাঁচাবার জন্যে ইমপোর্ট সংকোচনের কথা ভালো করে ভাবেনই নি, সেই ১৯৬০ সালে কোল্যাবো-রেশন ছাড়াই সুর ইন্ডাস্ট্রিজের ফ্যাক্টরীতে 'সুরম্যাটিক' নামে 'সিল্ড ইউনিট' তৈরী হয়ে বাজারে বিক্রি হওয়া শুরু হয়েছিল।

রামচন্দ্রের একক কীর্তি হলো উনপঞ্চাশ সালে সুর আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোং প্রাইভেট লিমিটেডের পত্তন। লোহা ও লৌহেতর ধাতুর 'কাস্টিং' দিয়ে শুরু করে আজ তাঁরা হাই-প্রেসার পাম্প, ফায়ার এঞ্জিন, ওয়েলডিং ট্রান্সফরমার, স্টোন ক্রাশিং ও স্ক্রীনিং প্ল্যান্ট প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের আবশ্যিক যন্ত্রপাতি তৈরি করছেন। সেনাবাহিনীর জন্যে বিশেষ এক ধরনের জেনারেটারও এখানে তৈরী হয়। আর এঁদের সূক্ষ্ম কারিগরির আর একটি নিদর্শন হলো 'ডাম্পিং লেভেল' এবং 'থিয়োডোলাইট' যন্ত্রের নির্মাণ।

প্রথমে হুগলি ব্যাঙ্ক এবং পরে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর হিসেবেও রামচন্দ্র সুর মহাশয়ের খ্যাতি আছে।

রামচন্দ্র সুর মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ার শ্রীমান প্রিয়দর্শন বিলেতের ফ্যারাডে প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা পেয়ে এখন সুর আয়রন অ্যান্ড স্টীলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আশা রাখি যে, কৃতিত্বে তিনি পিতাকেও ছাড়িয়ে যাবেন।

শুধু শিল্প ও বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সুর মহাশয়রা তাঁদের অদ্ভুত কর্মকুশলতা কৃষির সম্প্রসারণেও প্রয়োগ করেছেন। ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'নিরুলিয়া এগ্রিকালচার্যাল ফার্ম'-টি এখন উন্নত জাতের বীজ থেকে ধান, গম, ভুট্টা, আখ, আলু ও চীনেবাদামের চাষ

করছেন। পশ্চিম বাংলা সরকার এই কৃষি ফার্মকে বীরভূমের শ্রেষ্ঠ সংস্থা বলে অভিহিত করেছেন। স্থানীয় বেকার যুবকদেরও এখানে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এবং শিক্ষাকালে তাঁদের সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই সংস্থার পরিচালনায় আছেন সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীসমীর-কুমার সুর।

ওড়িশাতেও সুর মহাশয়দের আর একটি বড় ফার্ম আছে। তার আয়তন ২৫০ একর। অক্ষয়কুমারের ভাই শ্রীঅজিতকুমার সুর মহাশয় পরিবারের ওড়িশায় অবস্থিত নানা সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে এই কৃষি সংস্থাটিরও তত্ত্বাবধান করেন। তা ছাড়া অজিতকুমার 'সুর-নিয়োগী'র কটক শাখারও পরিচালক।

কটক বাদে সুর-নিয়োগী-কুমারের আরও তিনটি শাখা অফিস আছে—কলকাতার ব্রেবর্ন রোডের পশ্চিমাংশ রাজা উদমন্ত স্ট্রীট ও স্ট্র্যান্ড রোডের মোড়ের বিরাট শাখা, গৌহাটি শাখা এবং পাটনা।

হেড অফিসটি আদি দোকান ৩৯নং কলেজ স্ট্রীট ভবনে অবস্থিত হলেও আসলে রাজা উদমন্ত স্ট্রীট শাখাই হলো এঁদের প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র। হেড অফিসের অধ্যক্ষ হলেন সুর-নিয়োগীর এক প্রাচীন কর্মচারী শ্রীদীনতারণ মুখোপাধ্যায়। উদমন্ত স্ট্রীটের কর্মীদের মধ্যে বিক্রয় তত্ত্বাবধায়ক শ্রীঅনিল বিশ্বাস, ক্যাশিয়ার শ্রীধীরেন ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের এবং পাটনার ম্যানেজার শ্রীরবি দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। অনিল বিশ্বাস মশায় স্বর্গত কানাইলাল বিশ্বাসের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শেয়ারহোল্ডার।

উল্লেখ্য আর এক ব্যক্তি হলেন উদমন্ত স্ট্রীট শাখার প্রধান শ্রীসন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্যব্যপদেশে বছর সাত আট আগে আমাকে একবার তাঁর কাছে যেতে হয়েছিল।

সেটা ছিল এক বিকেল বেলা। দোকানে খুব ভিড়; খরিদ্দার ও দালালের প্রবেশ, দরাদরি ও নিষ্ক্রমণ এবং পাইপের গাছা নিয়ে মুটিয়াদের টানাটানি ও ঠনঠন শব্দের তুলকালাম কাণ্ডের কেন্দ্রে শালপ্রাংশু মহাভুজ এক প্রৌঢ় বসে মিনিটে দুটো করে 'ফোনালাপ' চালাচ্ছেন—আধ ইঞ্চি 'এ' ক্লাস পাইপ এত দাম, দেড় ইঞ্চি 'বি' ক্লাস এল্‌বো অত দাম আর তিন ইঞ্চি 'সি' ক্লাস বয়লার-পাইপ তত দাম ইত্যাদি। আমি ঘণ্টাখানেক সামনে বসে তাঁকে অন্তত শ' দুই আইটেমের দাম মুখে মুখে লোককে বলতে শুনলাম—প্রাইস লিস্ট দেখার কোনো প্রয়োজনই মনে করছিলেন না ভদ্রলোক। সেই ষাট একষট্টি সালে আবার পাইপ ইত্যাদির দাম ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওঠানামা করতো। কত আইটেমের কুষ্ঠি তিনি মুখস্থ রেখেছেন জানতে চাওয়াতে সন্তোষবাবু তাঁর স্বাভাবিক নিম্নকণ্ঠে বললেন, "তা হাজার দুয়েক হবে।" প্রথম দিন ওইটুকুই শুনে এলাম।

সুর-নিয়োগীর সম্বন্ধে লিখিত এই প্রবন্ধের খসড়া নিয়ে আলোচনা করতে সন্তোষবাবুর বাড়িতে গিয়ে বাকীটা শুনলাম দিন দশেক আগে।

সন্তোষবাবু প্রবাসী বাঙালী। পড়াশোনার পর কিছুদিন স্বাধীন ব্যবসাও করেছিলেন। ব্যবসা উপলক্ষে ভারতবর্ষের সর্বত্রই প্রায় ঘুরেছেন, উপরন্তু সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দূরপ্রাচ্যের দেশও ঘুরেছেন। উত্তরকালে সুর-নিয়োগী-কুমারের পরলোকগত পরিচালক পূর্ণাঙ্কমোহন সুর মহাশয় (মৃগাঙ্কমোহনের অনুজ) কাশী থেকেই

সন্তোষবাবুকে কলকাতায় ধরে আনেন এবং কালক্রমে উদমন্ত স্ট্রীটের অধ্যক্ষের পদে তাঁকে অধিষ্ঠিত করেন অক্ষয় সুর মশায়।

স্বর্গীয় পূর্ণাঙ্কমোহনের বাহাদুরি বলতে হবে যে, রাষ্ট্রনীতির ছাত্রকে দু'-পাঁচ হাজার প্লাম্বিং সরঞ্জামের সুকঠিন আদ্যোপান্তে রপ্ত করে ছেড়েছেন।

আমার কিন্তু সন্দেহ হয় যে, সন্তোষকুমার কাশীর কোনো অবধূত-আগমবাগীশের চেলা ছিলেন। সেই জন্যেই এই রকমের স্মৃতিধর হয়ে উঠেছেন।

সারা দিন 'কেয়া ভাও' করে সন্তোষবাবু যে আবার গভীর রাত্রে বসে নাটক লেখেন, গল্প লেখেন, আর সেসব মঞ্চস্থ এবং প্রসিদ্ধ দৈনিকে মুদ্রিত হয় তাও আমার জানা ছিল না। সুর-নিয়োগীর বহুমুখী কার্যতালিকার বিবরণ শোনার মাঝে সন্তোষকুমারের ছেলেমেয়ে আর জামাইয়ের রবীন্দ্র-সঙ্গীতে মুগ্ধ হওয়ার অবকাশও হয়েছিল সেদিন।

আমি বাড়ি ফেরার পথে ভাবতে ভাবতে এলাম যে, এত সব সুন্দর সুন্দর পরিবার বাংলা দেশে থাকা সত্ত্বেও আমরা সব বিষয়েই এত পিছিয়ে পড়ছি কেন?

এই তো সুর মহাশয়দের বংশ—শিল্প ও বাণিজ্যে তাঁরা দেশের অগ্রণী, তাঁরা বরেণ্য—উপরন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতিতেও এই পরিবার অভিনন্দিত হওয়ার যোগ্য। পুরুষরা তো বহুকাল থেকেই, এখন এঁদের বাড়ির মহিলারাও অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম দরজা পার হয়ে গেছেন বলে শুনলাম।

এঁরা সব দেশের সম্পদ গড়ে তোলেন, আর আমরা ম্যাকনামারা সাহেবের ওপর রুষ্ট হয়ে জাতীয় সম্পদ ট্রাম বাস সব কিছু পুড়িয়ে ছাই করে ফেলি।

সুর-নিয়োগী-কুমারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীঅক্ষয়কুমার সুর এবং ডিরেক্টর শ্রীসমদর্শন সুরের (ইনি হলেন কম্পানির চেয়ারম্যান শ্রীরামচন্দ্র সুর মহাশয়ের মধ্যম পুত্র) সঙ্গে প্লাম্বিং ব্যবসার বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সমদর্শন মেটালার্জি অর্থাৎ ধাতুবিদ্যায় জার্মেনিতে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে এসেছেন।

অক্ষয়বাবু নতুন কথা কিছু বললেন না; বললেন সেই মন্দা, সেই সঙ্কট আর সেই সরকারী অবিমৃষ্যকারিতার বহুশ্রুত ইতিহাস।

উৎপাদনের জন্য আবশ্যিক বয়লার-এর পাইপ থেকে শুরু করে সাধারণ জল সরবরাহের পাইপ, হিমঘরের পাইপ, কয়লার খনির জল নিষ্কাশন এবং বালি দিয়ে ভরাট করার (স্যান্ড স্টোয়িং-এর) পাইপ এবং খনিজ তেলের লাইনের পাইপ—সর্বত্রই নানা কোয়ালিটি আর নানা বেড়ের পাইপ লাগে। তা মন্দার জন্যে কারখানার বয়লার বন্ধ, আলুর ফসল গত বছর ধসার (ব্লাইট-এর) প্রকোপে সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কোল্ড স্টোরেজ অর্থাৎ হিমঘরের ব্যবসায় ভীষণ মন্দা, আর বার্মা শেল, এসো, ক্যালটেক্স প্রভৃতি বিদেশী তেল কম্পানিদের উৎপাদন সংকোচ—সব মিলিয়ে পাইপের বাজারে একদিক দিয়ে প্রচণ্ড মন্দা এনেছে। অন্যদিকে আছে সরকারী বেকুবি। যেখানে ক্ষুদ্রায়তন সেচ পরিকল্পনা করে স্থানে স্থানে টিউবওয়েল খুঁড়ে আর পাইপ লাইন বসিয়ে শতভাগের পাঁচ দশ ভাগ খরচে কাজ চালানো যেতো, দেশে ফসলের প্রাচুর্য আনা সম্ভব হতো, সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের পর

আমাদের সরকার বাহাদুরের টনক নড়লো। পরিকল্পনার মারাত্মক সব ভুল শোধরাবার চেষ্টায় তাঁরা তখন অবহেলিত 'মাইনর ইরিগেশন'কেও ইজ্জত দিলেন। ততদিনে কত অর্বুদ ডলার, স্টার্লিং, মার্ক আর রুবল মাইথন, পাঞ্চেত, রিহান্ড আর নাংগাল বাঁধের জলে ডুবেছে তার হিসেব সকলেই মোটামুটি জানে।

এদিকে এই পরিস্থিতি, অর্থাৎ দেশে ইতিপূর্বে যে-সমস্ত পাইপ তৈরির পুরনো কারখানা ছিল তাঁদের উৎপন্ন মালের বিক্রি নেই—তাঁদের 'কেপাসিটি'-র অর্ধেক তিন-পোয়ার বেশী ব্যবহার করার ক্ষমতা নেই—আর ওদিকে নির্বোধ শিল্পপতিদের দরখাস্ত পেয়ে তদধিক নির্বোধ সরকার পারমিট লাইসেন্স দিয়ে আরও করেন এক্সচেঞ্জ নষ্ট করার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

এখন শিল্পকে উৎসাহমূল্যে (ইনসেনটিভ) দিয়ে মহাস্থবির সরকারকে পুরনো এবং নতুন কারখানার উৎপন্ন মাল পড়তার চেয়ে অনেক নিচু দরে বিদেশে রপ্তানির রাস্তা করে দিতে হচ্ছে, আর সেই উৎসাহমূল্যে (চিরন্তন ঘাটতি বাজেটের মাধ্যমে) সরকার আপনার আমার কাছ থেকে আদায় করছেন, আওরংজেবের জিজিয়া করের মতন লক্ষ রকম শুল্ক আদায় করে।

সেলস ট্যাক্সের মহিমাটাই ধরা যাক: এক গাছা পাইপের ওপর অনেক ক্ষেত্রেই দু-তিন দফা বিক্রয় কর আমরা দিয়ে থাকি এক রাজ্যের পাইপ ফ্যাক্টরী থেকে বিভিন্ন রাজ্যের বাজারে যাবার পথে।

তাতেও ক্রেতার, মানে আপনার আমার, রেহাই নেই। পাইপের দাম বেড়েই চলেছে। গত কয়েক মাসের মধ্যেই সব রকম পাইপের দাম বেড়েছে ১১ পারসেন্ট। ক্রেতারা থমকে গেছেন; অসংখ্য ছোট বড় প্রতিষ্ঠানের বিক্রি কোথায় তলিয়ে গেছে। বিরাট ঐতিহ্য, রিজার্ভ ফান্ডের শক্ত ভিত আর পারিবারিক ঐক্যবদ্ধতার জোরে ঘাট বছরের জোয়ান সুর-নিয়োগী-কুমার সংকট-কাল পার হয়ে যাবেন, আগেও যেমন বহু বিপদ বাধা তাঁরা সসম্মানে অতিক্রম করে এসেছেন, কিন্তু ছোট ব্যবসায়ীদের কে পার করবে এই বৈতরণী?

এই মন্তব্যের সবটাই অক্ষয় সুর মশায়ের নয়, বেশ কিছুটা আমিও জুড়ে দিয়েছি। খুব রেগে গিয়েই সেটা করেছি, কারণ দিব্যচক্ষে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, বছর কয়েকের মধ্যেই শহরতলিতে এক-দেড় কাঠা জমি কেনার টাকা আমার জমেছে; জমিদার হবার কিয়ৎকাল পরে একতলা একটা 'ভিলা' তৈরির টাকাও জমিয়েছি, কিন্তু পাইপ? পাইপের দাম সরকারী পরিকল্পনার কল্যাণে যদি আরও চারগুণ বেড়ে যায় তখন?

অবশ্য সুর-নিয়োগী-কুমার তখনো থাকবেন; নিশ্চয়ই আমার জমি বাড়ি তৈরির আগেই তাঁদের 'প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী' উৎসবের শুভসংবাদ দশদিকে ঘোষিত হবে; সুর এনামেল, সুর ইন্ডাস্ট্রিজ, নিরুলিয়া ফার্ম, সুর এস্টেটস, সুরশ্রী সিনেমা (কত আর নাম করবো নন্দীগ্রামের তারিণীচরণ সুর মহাশয়ের উত্তরপুরুষের কীর্তিকলাপের?) সব ক'টি প্রতিষ্ঠানই দৃপ্ত পদক্ষেপে রজত, সুবর্ণ, হীরক জয়ন্তীর দিকে এগিয়ে চলবে।

আমার ঘাটতি বাজেটের জন্যে আমার নতুন বাড়ির পাইপ ফিটিংস কিনতে না পেরে আমি তখন সমদর্শনবাবুর কাছে যাবো, কারণ অক্ষয়বাবু ততদিনে নিশ্চয়ই রিটায়ার করেছেন। গিয়ে

বলবো, আপনাদের শুভ হীরক জয়ন্তী উৎসবে যে লোকটা ছাইপাঁশ কী সব লিখেছিল সে মোরারজীভাইয়ের (তিনি তখনো অর্থমন্ত্রকে মৌরসী করে অনর্থ ঘটাচ্ছেন) কল্যাণে কয়েক গাছা পাইপের টাকা যোগাড় করতে পারছে না। সমদর্শন দেবেন কি কয়েক গাছা পাইপ সস্তা দরে?

নিম্নবিত্ত ভারতবর্ষের প্রতীক বৃদ্ধ আমাকে তিনি চিনতে পারাতে পাইপ কয়েক গাছা পেয়ে যাবো দারুণ সস্তায়। আর আমি তাঁকে কল্যাণ কামনা করে আশীর্বাদ করতে করতে বাড়ি ফিরবো। সেই হবে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা, কারণ সুর-নিয়োগী-কুমারের শতবার্ষিকী উৎসব যখন তিনি মহা আড়ম্বরে পালন করবেন তখন আমি থাকবো না।

৭ ডিসেম্বর, ১৯৬৮





আটাশ

মানুষের জীবনে তেল জিনিসটি যে অপরিহার্য সেটা ছেলেবেলায় প্রথম রিয়্যালাইজ করেছিলাম আমাদের পাড়ার জগড়নাথ-র নোংরা ঘুপচি দোকানের পরম উপাদেয় তেলেভাজা খেয়ে এবং হেদো-গোলদীঘির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে সর্বাঙ্গে সর্ষপ তৈল লেপন করে। বড় হয়ে যখন জীবিকার অন্বেষণে বেরোলাম তখন আবার তেলের উপকারিতার আর একটি দিক ভিস্যুয়্যা-লাইজ করলাম। দেখা গেল যে, কাজ পেতে গেলে, কাজ আদায় করতে হলে পকেটে পকেটে নানারকম তেলের শিশি নিয়ে ঘোরা দরকার। কোথাও লাগে সুবাসিত রিফাইনড অয়েল, কোথাও সাদাসিধে সরষের তেল, আবার কোথাও খনিজ মোটা ক্রুড-অয়েল—একটি না-হয় আর একটি লাগাতেই হবে উপার্জন নামক রৌপ্যমুদ্রাপ্রসবিনী যন্ত্রটিকে চালু রাখতে হলে। রাজনৈতিক তৈল মর্দনের কথা এখন বলা বাহুল্য; কারণ বর্তমানে কয়েকমাস আপনার আমার মতো প্রত্যেকেই নির্বাচনপ্রার্থী রাজন্যবর্গের পরিবেশিত সুবাসিত তৈল দ্বারা মর্দিত অবস্থায় কাটাবো, যতদিন না তাঁদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ হয়ে যায় ভোটযুদ্ধে। তারপরেই আমরা আবার যে-কে সেই তৈলকল্কে (অভিধান দেখুন) পরিণত হবো।

শ্রীপ্রকৃতিনাথ ভট্টাচার্য এবং শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়রাও অবশ্য তাঁদের 'শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর কারখানায় প্রধানত তেল তৈরি করে বিতরণ করেন, কিন্তু তা নিতান্তই অভিসন্ধি-বহির্ভূত। তাঁরা নিছক 'কনজিউমার গুডস' অর্থাৎ ভোগ্যপণ্য হিসেবে ভারতবর্ষের বাজারে প্রায় দু'কোটি টাকার 'শালিমার' মার্কা নারকেল তেল এবং 'দেশী' ঘি উৎপাদন ও বিক্রয় করেন।

বাজারে এই তেল ও ঘিয়ের ছোট বড় টিন অনেকদিন থেকেই দেখে আসছি, কিন্তু এ যাবৎ আমার ধারণা ছিল যে, দ্রব্যগুলি কোনো অবাঙালী প্রতিষ্ঠানে তৈরী। প্রকৃতিনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রাত্রির স্বামী চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট শ্রীঅসীম ভট্টাচার্যের কাছে ঘটনাচক্রে শুনে আশ্চর্য হলাম—আপনারা অনেকেও নিশ্চয়ই তাই হবেন যে, প্রতিষ্ঠানটির সম্পূর্ণ মালিকানা দুই বাঙালী ভদ্রলোক এবং তাঁদের কর্মিবৃন্দ ও আত্মীয়স্বজনের। আরও অবাক হলাম এঁদের বিশাল কারখানা

শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাঃ লিমিটেড
১ চেতলা সেন্ট্রাল রোড,
কলিকাতা-২৭

দেখে, যে কারখানায় তেল-ঘি ছাড়াও অন্যান্য পণ্য-উপপণ্যের উৎপাদনের আয়োজন বেশ বড়। এ'রা 'রেমণ্ড মিল' প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে 'বেরাইটিজ' নামক খনিজ থেকে বোরিয়াম কম্পাউণ্ডস তৈরি করেন। উপরন্তু এ'দের একটি আধুনিক 'অ্যানোডাইজিং প্ল্যাণ্ট' আছে। আর আছে বহু যন্ত্র সংবলিত সম্পূর্ণ একটি আধুনিক মেশিন-শপ যার মালিকানা শালিমার কেমিক্যাল-এর নয়। এই মেশিন শপ-এর বারো আনা মালিক হলেন প্রকৃতিনাথ এবং চার আনা শরিক হচ্ছেন শালিমার-এর চীফ এঞ্জিনীয়ার শ্রীকালীমোহন চট্টোপাধ্যায়। মন্দা বাজার এবং শ্রমিক অস্থিরতার জন্যে মেশিন-শপটি এখন বন্ধ আছে। প্রকৃতিনাথরা শালিমার কেমিক্যালসের ভাড়াটে হিসেবে এই যন্ত্রশালাটিকে এখানে রেখেছেন। ঝকঝকে মেশিনগুলি নীরবে দাঁড়িয়ে আছে বন্ধ্যা নারীর মতো।

পণ্ডিত বংশের সন্তান প্রকৃতিনাথের পূর্বপুরুষরা প্রায় সকলেই টোল থেকে কলেজ পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সংস্কৃতের অধ্যাপনা করে এসেছেন। পিতা স্বর্গীয় জানকীনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক। উত্তরকালে তিনি কিছুদিন কলকাতার রিপন কলেজেও অধ্যাপনা করেছিলেন।

প্রথম ব্যতিক্রম ঘটালেন প্রকৃতিবাবুর দাদা শ্রীবিভূতিনাথ ভট্টাচার্য। তিনি পারিবারিক বৃত্তি ছেড়ে বি এন রেলওয়েতে চাকরি নিলেন। প্রকৃতিবাবু শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক পাসের পর রিপন কলেজ থেকে 'পিওর সায়ান্সে' বি. এস-সি. পাস করলেন। তারপরে তিনিও দাদার মতো চাকরির সন্ধানে বেরোলেন। চাকরি করা তাঁর পোষালো না বললে ভুল হবে, চাকরি তিনি পেলেন না। দু তিনটে দরখাস্তের পরই সে চেষ্টা তিনি ছেড়ে দিলেন, কারণ চাকরির উমেদারি করতে গিয়ে লোকের তাচ্ছিল্য ও অবহেলা তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ভাবলেন, এরকম দাস্যবৃত্তির চেয়ে মুটেগিরি করাও ভালো। যৎসামান্য উপার্জন তিনি অবশ্য প্রাইভেট টিউশনি থেকে করছিলেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শ্রমসাধ্য যে কোনো কাজকেই পরম মূল্য দিয়ে বাঙালীকে যতই উদ্বুদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করে থাকুন না কেন, প্রকৃতিনাথ যে কাজে নামা স্থির করলেন, 'কালচার্ড' বাঙালীর কাছে সেদিন সে কাজের কোনো 'প্রেসটিজ' ছিল না। ব্যবসাটি হলো গম পেষাইয়ের। গম-পেষাই মানে এখন কণ্ট্রোলের দিনে আপনার আমার পাড়ার অবাঙালী যে সমস্ত আটাকলে আমরা সপ্তাহের রেশনের গম চূর্ণ করাই সেইরকম কর্ন-গ্রাইণ্ডিং মেশিন নিয়ে ব্যবসা।

প্রকৃতিনাথের বাবা জানকীনাথ দেহত্যাগ করেন প্রকৃতিবাবুর যখন মাত্র দশ বছর বয়স। দাদা বিভূতিনাথ তখন রেলের কাজ করছেন শালিমারে। বাবার মৃত্যুর পরে তিনি বাড়ির সকলকে কৃষ্ণনগর থেকে নিজের কর্মস্থলে নিয়ে এসেছিলেন। তিনিই ছিলেন প্রকৃতিনাথের অভিভাবক। তিনি ছোট ভাইয়ের শিল্পপ্রচেষ্টার সমর্থন করলেন না; প্রস্তাব করলেন যে, প্রকৃতিনাথ বি এন রেলের খড়্গপুর ওয়ার্কশপে শিক্ষানবিসী করে, ভবিষ্যতে যাতে একটা ভালো কাজ পেতে পারেন তারই চেষ্টা করুন।

কিন্তু প্রকৃতিনাথ চাকরির পথ আর না-মাড়াবার সংকল্প করেছেন; তিনি দাদার ইচ্ছেয় সায় দিতে পারলেন না। অথচ একটা কর্ন-গ্রাইণ্ডার কেনার টাকা তো দূরের কথা তার দশমাংশও

প্রকৃতিনাথ যে এক সঙ্গে জোটাবেন সে সঙ্গতিও তাঁর তখন ছিল না। দাদা হয়তো পারতেন কিন্তু তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ভাই যে কাজ করতে চলেছেন তার জন্যে দাদার কাছে আর সাহায্য চাওয়া যায় না।

ধারে কিছু টাকা বা একটা মেশিন যোগাড়ের আশায় প্রকৃতিনাথ কলকাতা শহর চরে বেড়াতে লাগলেন। পথে হঠাৎ একদিন তাঁর স্কুলের এক শিক্ষক দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা। প্রকৃতিনাথের কাছে ইনি ছিলেন 'দীনুদা'। কুশল প্রশ্নে প্রকৃতিনাথের সমস্যার কথা শুনে 'দীনুদা' অযাচিতভাবে নিজের সামান্য সঞ্চয় থেকে প্রকৃতিনাথকে আড়াইশো টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সেই টাকাকে মূলধন করে প্রকৃতিনাথ অবিলম্বে শিবপুর বাজারে ছোট্ট একটি আটা-কল বসিয়ে ফেললেন। তার নাম দিলেন 'শঙ্খ আটা-কল'। কিন্তু একটা ঘর আর একটি মেশিনেই তো ব্যবসা চলে না, ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যালও দরকার। তা-ও জুটে গেল কয়েকজন সতীর্থের মাধ্যমে। এঁরাও গ্র্যাজুয়েট এবং সবাই অল্পবিস্তর বেকার। তাঁরা এক একজন আড়াইশো টাকা দিয়ে প্রকৃতিনাথের অংশীদার হলেন।

'শঙ্খ' মার্কা আটা অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। তখনো রেশনিং-এর প্রবর্তন হয়নি, কারণ সেটা ছিল প্রাক্-তেরশো পঞ্চাশ যুগ, মানে এ শতকে বাংলা দেশের প্রথম দুর্ভিক্ষের আগের কথা। (দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ মানে ১৯৬৭-র দুর্ভিক্ষ)। প্রকৃতিনাথরা ব্রাউন পেপারের পরিষ্কার ঠোঙায় ভালো প্যাকিং করে প্রচুর পরিমাণে সেই আটা বিক্রি করতে লাগলেন। ব্যবসা বেশ সুন্দর বেড়ে চলছিল, এমন সময়ে এলো পঞ্চাশের (১৯৪৩-এর) দুর্ভিক্ষ এবং তারপরে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ। 'শঙ্খ' আটা-কল বন্ধ করে দিতে হলো।

বন্ধুদের অংশের টাকা মিটিয়ে দিয়ে প্রকৃতিনাথ আবার বেকার হলেন। তবে এখন তাঁর কিছু সঞ্চয় হয়েছে। নতুন কিছু করার জন্য ব্যগ্র, অথচ কি করবেন তার কোনো আইডিয়াই তাঁর নেই। ঘুরতে ঘুরতে তিনি স্বর্গীয় জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মশায়ের কাছে গিয়ে পড়লেন।

এখনকার প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের কাছে জ্ঞানাঞ্জনবাবুর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তিনি ছিলেন আজ থেকে পনেরো বিশ বছর আগেকার বাংলা দেশের ক্ষুদ্রশিল্প-জগতের এক স্বনামধন্য উদ্বোদ্ধা। তাঁর উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় আয়োজিত কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলায় অবস্থিত স্থায়ী শিল্প-বাণিজ্য প্রদর্শনী, এবং ইডেন গার্ডেন প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত শিল্পপ্রদর্শনী বহু যুগ ধরেই আমরা নিয়মিত দেখে এসেছি। ১৯৫৬ সালে জ্ঞানাঞ্জনবাবু পরলোকগমন করেন।

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রকৃতিনাথকে বললেন ইনজেকশনের কাচের অ্যামপুল তৈরি শিখে তারই একটা ছোট কারখানা খুলতে। প্রকৃতিবাবুর শিক্ষানবিসী শুরু হলো আরেকটি অ্যামপুল কারখানায়। তিন মাস অবৈতনিক থাকার পরে তাঁর অ্যালাওয়েন্স হলো মাসিক পাঁচ টাকা। (শালিমার কেমিক্যালস্-এর বর্তমান ম্যানেজার শ্রীতুলসীদাস ঘোষ মশায় তখন সেই অ্যামপুল ফ্যাক্টরির ম্যানেজার ছিলেন এবং তাঁর হাতেই প্রকৃতিনাথের গ্লাস-ব্লোয়িং বিদ্যায় হাতেখড়ি হয়েছিল)।

শিক্ষার পরে প্রকৃতিনাথ স্বস্থানে শালিমারে সাত আটটি শ্রমিক নিয়ে নিজের অ্যামপুল ফ্যাক্টরি খুললেন। কিছুদিনের মধ্যে এই ছোট কারখানা থেকে প্রকৃতিনাথের মাসিক আড়াইশো তিনশো টাকার সাশ্রয় হতে লাগলো। এটা হলো ১৯৪৪ সালের কথা। পরে তিনি স্থান সংকুলানের জন্য কারখানা নারকেলডাঙ্গায় তুলে নিয়ে যান।

চুয়াল্লিশ সাল প্রকৃতিনাথের জীবনে নতুন অধ্যায়ের শুভসূচনার বৎসর। প্রথমে তিনি সেই বছরে গায়ত্রী দেবীর পাণিগ্রহণ করে গার্হস্থ্যে পদার্পণ করলেন; দ্বিতীয়ত, তিনি শ্রীপঞ্চানন মণ্ডলের বন্ধুতা ও সহায়তা পেলেন।

মণ্ডল পরিবার কালিঘাট-আদিগঙ্গার পশ্চিম পাড় চেতলা অঞ্চলের পুরনো বাসিন্দা।

পঞ্চাননবাবুর অর্থানুকূল্যেই ১৯৪৫ সালে প্রকৃতিনাথের পক্ষে 'শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড' সংস্থার পত্তন করা সম্ভব হয়েছিল। আজ থেকে ২৩ বছর আগে সেই যে দু'জনে ডিরেক্টর হয়ে প্রতিষ্ঠানের জন্মদান করেছিলেন এখনো তাঁরা পরস্পরের সৌহার্দ্য অটুট রেখে এগিয়ে চলেছেন, এবং সেইজন্যই নিশ্চয়ই, এত অল্প দিনের মধ্যে বাঙালী প্রতিষ্ঠান হয়েও তাঁরা এত বড় হতে পেরেছেন।

১নং চেতলা সেণ্ট্রাল রোডে পঞ্চাননবাবুর বাড়িরই এক অংশে 'শালিমার কেমিক্যাল'-এর যে হেড অফিস আরম্ভেই খোলা হয়েছিল তা এখনো সেখানেই আছে।

ছোট কারখানাটি স্থাপিত হলো নারকেলডাঙ্গায় প্রকৃতিনাথের অ্যামপুল কারখানার পাশে।

১নং চেতলা সেণ্ট্রাল রোড-এ কিন্তু কেবল ধনাগমের কাজই হয় না। শুনে খুব তৃপ্তিলাভ করলাম যে, পাস-করা না হলেও আমাদের স্বল্পবাক্ নম্রস্বভাব সুপুরুষ (অবশ্য প্রকৃতিনাথও দীর্ঘদেহ সুদর্শন ব্যক্তি), অথচ অকৃতদার শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল ওই অঞ্চলের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ। তাঁর দাতব্য চিকিৎসালয়ে তিনি প্রতিদিন সকালের দিকে শ' দুই আড়াই রোগীর চিকিৎসা এবং বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করেন। ছুটির দিনে চিকিৎসাপ্রার্থীর সংখ্যা শ' পাঁচেকেও ঠেকে।

ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর নারকেলডাঙ্গাতে নিয়মিত কাজ করায় প্রচুর বিঘ্ন হলো। তখন কর্তারা ফ্যাক্টরিটাকে সেখান থেকে তুলে আনলেন। ইতিমধ্যে কাজও অনেক বেড়ে গেছে, তাই কেবল একই জায়গায় স্থান অকুলান হওয়াতে বিভিন্ন বিভাগ পৃথক পৃথক অঞ্চলে স্থানান্তরিত হলো। নারকেল তেল, তিল তেল, পাউডার প্রভৃতি প্রসাধনীর বিভাগগুলি চেতলা, শাহাপুর এবং রামকেষ্টপুরে বসালেন। আর এই সময় থেকে অ্যামপুল ফ্যাক্টরিটা বন্ধ করে দেওয়া হলো।

প্রথম দিকে প্রকৃতিনাথরা বাজার থেকে বাল্ক প্যাকিং-এ অপরিস্রুত নারকেল তেল কিনে নিজেদের কারখানায় তার শোধন করে ছোট বড় টিনে ভরে শালিমার কেমিক্যালের লেবেলে বিক্রি করতেন।

পঞ্চাশ সালে এঁরা প্রথম অয়েল-ক্রাশিং শুরু করলেন। সেই কাজের জন্যে তাঁরা মাঝারি

সাইজের দুটো দেশী মেশিন বসালেন। এটা আমরা সকলেই জানি যে নারকেল তেল উৎপন্ন হয় নারকেলের শাঁস থেকে। সেই শাঁসের আখ্যা হলো 'কোপ্‌রা'।

'কোপ্‌রা' শব্দটা কানে এলেই আমার মনের তারে গীটার-ঝংকারের অনুরণন হয়—'আলোহা' আর 'লা-পালোমা' বাজতে থাকে যেন। স্বপ্ন দেখি নবযৌবনে ফিরে গেছি। যেন প্রবালদ্বীপের সুন্দরীরা হুলা-হুলা নাচের সঙ্গে দেহ হিল্লোলিত করছেন; ঘাসের ঘাগরার আন্দোলন আর ফ্র্যাঞ্জিপানির মধুগন্ধে সব কিছু যেন মাতাল হয়ে উঠেছে। ছেলেবেলায়, প্রথম যুগের সবাক ছবির আমলে 'দি পেগান' নামে একটা সঙ্গীত-মুখর ফিল্ম দেখেছিলাম, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পটভূমিকায়। (কয়েক সপ্তাহ আগে রেমন নোভারো নামক হলিউডের যে চিত্রতারকা রহস্যজনক-ভাবে মারা গেলেন, তিনি ছিলেন সেই ছবির নায়ক)। গল্পের সেই টাহিটি দ্বীপের অধিবাসীদের জীবিকা নির্বাহ হতো প্রধানত 'কোপ্‌রা' বিক্রি করে। সেই প্রথম কোপ্‌রা কথাটা শুনেছিলাম বলে আজও তার উল্লেখে এইসব কথা মনে পড়ে।

ভারত সরকারের পরিসংখ্যান অনুসারে পৃথিবীতে নারকেল চাষের মোট আয়তন ৮৫ লক্ষ একর এবং সেই জমিতে ফলে মোট ১৯০০ কোটি নারকেল। ফিলিপাইনসের নারকেল চাষ সর্ববৃহৎ—২৮ লক্ষ একরে ৬০৮ কোটি নারকেল ফলন হয়। তারপরেই স্থান হলো ভারতবর্ষের—১৭ লক্ষ একরে ৪৭০ কোটি। সিংহল, মালয়, ইন্দোনেশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরের (ফিলিপাইনস বাদে অন্যান্য) দ্বীপপুঞ্জের মোট চাষ ৪০ লক্ষ একর। আন্দামান, নিকোবার, লাক্কাদিভ, মিনিকয় প্রভৃতি দ্বীপেও নারকেলের যথেষ্ট ফলন হয়; আন্দামানের চেয়ে নিকোবারেই বেশী হয়। এগুলি ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত দ্বীপ এবং তার পরিসংখ্যান ভারতের হিসেবে থাকার কথা।

নারকেল গাছের এবং নারিকেল নামক কঠিন আবরণে কোমল অভ্যন্তরযুক্ত ফলটির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার একটি তালিকা প্রস্তুতের জন্য কাণ্ড থেকে শাখায় আরোহণ করা যাক।

নারকেল গাছের গুঁড়ি থেকে আসবাব না হলেও আরও অনেক কাজ হয়। নারকেল পাতা থেকে ঝুড়ি, বাস্কেট, পাটি, মসলন্দ, ঘরের চাল এবং গৃহলক্ষ্মীর পক্ষে আবশ্যিক সম্মার্জনী অর্থাৎ ঝাঁটা (মানে, মিনসের পোড়ারমুখ থেঁতলে দেবার খ্যাংরা) তৈরি হয়। নারকেলের ছোবড়া থেকে সুতলি, দড়ি, 'কয়ের', 'কয়ের ম্যাটিং' (ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর পক্ষে ইণ্ডিয়া টীমের আবশ্যকীয় সরঞ্জাম) নির্মিত হয়। নারকেলের মালা থেকে আমার মতো গরিব লোকের জন্যে থেলো হুঁকো, নুনের পাত্র, কলসির ঢাকনা ছাড়াও শখের জিনিস হয় নানারকমের এবং মালা পুড়িয়ে যে কাঠকয়লা করা যায় তার কোয়ালিটিও অতুলনীয়। ডাব-নারকেলের জল রোগীর পথ্য, আবার সেই জলকেই জারিয়ে নিয়ে শরীর-মনের উদ্দীপক ও উত্তেজক তাড়ি করা যায়; চিনি, মিছরি, ভিনিগার প্রভৃতিও হয়। সব শেষে নারকেলের শাঁস—ডাল, তরকারি আর মালাই কারি, নাড়ু, সন্দেশ, গঙ্গাজলি আর চন্দ্রপুলির বিচিত্র স্বাদের কথা ভাবলেই আমার পরম শ্রদ্ধেয়া শাশুড়ি ঠাকুরানীর রন্ধন সৌকর্যের কথা মনে হয়।

উপরন্তু নারকেলের শাঁস খোসাসুদ্ধ শুকিয়ে রাখা হয় ভবিষ্যতে নিঙড়ে তেল বের করার

জন্যে। তেল বের করে নেবার পর যে খইল (পুনাক) অবশিষ্ট থাকে তাও ফেলা যায় না। গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে তার প্রভূত উপকারিতা। (নারকেল, খেজুর আর তালগাছের মতো এমন সর্বার্থসাধক পাদপ আর একটিও আছে বলে তো আমার মনে পড়ছে না)।

ভারতবর্ষে নারকেলের সর্বাধিক ফলন হয় কেরালা রাজ্যে—৭০ পারসেণ্ট। মহীশূর, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, আন্দামান-নিকোবার প্রভৃতি দ্বীপে উৎপন্ন হয় সাকুল্যে ২৭ পারসেণ্ট। বাকি তিন পারসেণ্ট এদিক ওদিকে হয়।

নিজস্ব উৎপাদন বিরাট হওয়া সত্ত্বেও বিদেশ থেকে আমাদের ৯ কোটি টাকা দামের ৯০,০০০ টন আন্দাজ কোপরা আমদানি করতে হয়! ১৯৬৪-র আগে যে-কেউ ফরেন এক্সচেঞ্জ ও লাইসেন্স যোগাড় করে 'কোপরার' আমদানি ও 'পুনাক'-এর রপ্তানি করতে পারতেন, কিন্তু তারপর থেকে স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন ছাড়া কারও কোপরা আমদানির অধিকার নেই; পুনাক রপ্তানি করা যায়, কিন্তু সেটা করে আজকাল আর কোনো 'ইনসেণ্টিভ' (উৎসাহমূল্য) পাওয়া যায় না বলে এস-টি-সি ছাড়া আর কেউ তা প্রায় করেন না। দুঃখের বিষয় যে, এস-টি-সি-র কব্জায় আসার পর থেকে এইসব লেনদেনে নাকি খানিকটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকৃতিনাথ ও পঞ্চাননের শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কসকে সম্প্রসারণের সময় দিয়ে আমি মনের আনন্দে তথ্য পরিবেশন করে নিলাম।

১৯৫৯ সালে কলকাতা থেকে বারুইপুর যাবার মধ্যপথে, রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুর আবাসিক বিদ্যালয় থেকে একটু এগিয়ে দশ বিঘা জমি শালিমার-এর জন্যে কেনা হলো। তখন এঁরা যে জমি তিন হাজার টাকা বিঘা কিনেছিলেন, এখন তার দাম হয়েছে ত্রিশ হাজার টাকা করে। পরে তাঁরা আরও সতেরো বিঘা জমি বাড়িয়েছেন, কিন্তু আগের দরে আর পাননি।

উনষাটেই বাড়িঘর তৈরি হয়ে মেশিন বসানো শুরু হলো। এবারে আর সেই দেশী ছোট ক্রাশার নয়—প্রথমত বড় বড় তিনটে দেশী এবং সাতটা বিলিতী 'রোজডাউন' ক্রাশার বসানো হয়েছে।

নতুন কারখানা—না, কারখানা বললে কেমন যেন ছোট ছোট মনে হয়—শালিমার-এর প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরি চালু হলো ১৯৬০ সালের এক শুভ দিনে।

টোল-পাঠশালার গুরুমশায়দের উত্তরপুরুষ, কলেজ অধ্যাপকের সন্তান প্রকৃতিনাথের কর্ম-জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া উচিত ছিল শিক্ষক বা অধ্যাপক হওয়া, কিন্তু তা না হয়ে তিনি আজ তাঁর প্রিয়বন্ধু পঞ্চাননের সহযোগিতায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন বিশিষ্ট এক শিল্পপতি—শালিমার কেমিক্যালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তাঁদের ফ্যাক্টরির কতকগুলি বিভাগ এখন ২৪ ঘণ্টাই চলে। আর এই ফ্যাক্টরিতে শুধু নারকেল তেলই উৎপন্ন হয় মাসে ২০০ টন অর্থাৎ ৫৪০০ মণ, যার দাম হচ্ছে টন-করা ৬০০০ টাকার মতো।

উপরন্তু ঘি-বিভাগে দেশী ঘি হয় বছরে ৫।৬ লক্ষ টাকার মতো এবং প্রকাণ্ড কেমিক্যালস বিভাগেও পুরোদমে 'বেরিয়াম কম্পাউণ্ডস্' তৈরির ব্যবস্থা হয়েছে।

৩০ জুন, ১৯৬৭-র ব্যালেন্স শীটে এঁদের মোট বিক্রয়ের অঙ্ক পাচ্ছি ১,৯৫,৭৮,৬২০ টাকায়।

শালিমার কেমিক্যালের ২২ বছরে প্রবল অগ্রগতির মাত্রা বোঝা যাবে নিম্নলিখিত তুলনামূলক (টাকার) অঙ্কগুলি থেকে :

সাল	পেড-আপ ক্যাপিটাল	রিজার্ভ	সম্পত্তির দাম	বিক্রয়	নীট লাভ	ডিভিডেন্ড
১৯৪৫-৪৬	১,০০০	—	১,০০০	৬২,০০০	(-) ৩০০	—
১৯৫৮-৫৯	১,১৭,০০০	২,০০০	১,৩৬,০০০	২৩,৩০,০০০	৪২,০০০	২১,০০০
১৯৬৬-৬৭	৪,৬০,০০০	১০,০০,০০০	২০,৩৬,০০০	১,৯৬,০০,০০০	৭,৩৪,০০০	৬৯,০০০

(বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয় হলো ডিভিডেন্ডের ন্যূনতা এবং রিজার্ভ ফান্ডের প্রতুলতা, অর্থাৎ স্বর্ণাণ্ডপ্রসবিনী হংসটিকে জিইয়ে রাখার সৎপ্রচেষ্টা)।

কিন্তু কেবল প্রকৃতিনাথ ও পঞ্চাননের দ্বৈত প্রয়াসেই শালিমার-এর সফলতা নিশ্চয়ই সম্ভব হতো না। তাঁদের পাশে ও পিছনে আছেন শ্রীতুলসীদাস ঘোষের মতো প্রবীণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি (যিনি অতীতে প্রকৃতিনাথকে অ্যামপুল তৈরি শিখিয়েছিলেন), শ্রীঅবনীকুমার ব্রহ্ম, শ্রীঅমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায় (কেমিক্যাল বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক) এবং পঞ্চাননের অনুজ শ্রীসাধন মণ্ডল। এ'দের মধ্যে অনেকেই আবার কম্পানির শেয়ারহোল্ডার।

শ্রীমতী গায়ত্রী ভট্টাচার্য এবং ভট্টাচার্য দম্পতির বড় ছেলে শ্রীমান লোকনাথও শেয়ারহোল্ডার। লোকনাথ এবারে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেবেন। লোকনাথের দিদি রাত্রির ও তাঁর স্বামী শ্রীমান অসীমের নাম প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই করেছি। রাত্রি ও লোকনাথের পরে আছেন শ্রীমান সোমনাথ ও কুমারী অদিতি। নাবালকত্বের সীমা পার হতে তাঁদের এখনো অনেক দেরি।

প্রকৃতিনাথ-পঞ্চাননকে অশেষ সহায়তা করে চলেছেন এ'দের গুজরাটী বন্ধু শ্রীলালজী রতনসি ভাটিয়া, ওরফে আনন্দবাবু। প্রথমে ইনি ছিলেন শুধু এ'দের কোপরা-সাপ্লায়ার। বহু বছরের ব্যবসায়িক সান্নিধ্য এখন বন্ধুতায় পরিণত হয়েছে।

যে মেশিন-শপটির উল্লেখ আরম্ভেই করেছি সেই প্রতিষ্ঠানের নাম 'শালিমার টুলস অ্যাণ্ড অ্যালায়েড প্রোডাক্টস'। এটির তত্ত্বাবধান করেন শালিমার কেমিক্যালের চীফ এঞ্জিনীয়ার এবং প্রকৃতিনাথের অংশীদার শ্রীকালীমোহন চট্টোপাধ্যায়। ইনি ইওরোপ-আমেরিকায় অভিজ্ঞতা অর্জন করে এসে প্রকৃতিবাবুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন; শালিমার কেমিক্যালের দায়িত্বপূরণের পরেও এই মেশিন-শপের পরিচালনা শুরু করেছিলেন, কিন্তু পূর্ববর্ণিত শ্রমিক অস্থিরতার জন্যে এখন এই বিভাগটি বন্ধ রাখা হয়েছে।

শালিমার কেমিক্যাল-এর পরিবেশ শ্যামল, সুন্দর। নতুন ফ্যাক্টরির একাধিক বিল্ডিং, ল্যাবোরেটরি, ক্যান্টিন ও গ্যাবাজ প্রভৃতিকে ঘিরে রয়েছে বাগান, পুকুর আর পুষ্ট নারকেল গাছের শ্রেণী। এই পারিপার্শ্বিককে শ্রমিকদের উচিত সুস্থ দেহে মনে আনন্দে কাজ করা।

কিন্তু বালিগঞ্জের নতুন 'ফ্লাইওয়ে' (রেল লাইনের ওপরের ব্রীজ) পেরিয়ে বারুইপুর অবধি এই রাজপথেব এবং এই বিস্তীর্ণ দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের মনে এক অস্বাচ্ছন্দ্যাকর, অস্বাস্থ্যকর

অবস্থার সৃষ্টি করেছে ভ্রান্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব। কৃষ্ণা গ্লাস ওয়ার্কস, সুলেখা ওয়ার্কস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিষয়ে যে-দুটি প্রবন্ধ এই বইয়ে লিখেছি তাতেই এই নেতৃত্বের ভ্রমাত্মক কার্যকলাপের বিবরণ দিয়েছিলাম বলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

গত বছর এপ্রিল মাসে যুক্তফ্রণ্টের রাজত্বকালে শালিমার কেমিক্যালেও সেই মানসিক বিকার-গ্রস্ত নেতারা হানা দিয়ে শান্তিপ্রিয় কর্মীদের বিচলিত করে তুলেছিলেন। যে প্রকৃতিনাথ ভট্টাচার্য স্বয়ং কঠোর পরিশ্রমে সামান্য শ্রমিক ও দোকানদার হয়ে প্রথম যৌবনে দিনাতিপাত করেছিলেন, শূন্য থেকে এই বৃহৎ সংস্থাকে গড়ে তুলেছিলেন—রাজনৈতিক নেতারা শ্রমিকদের বিপথে টেনে নিয়ে সেই প্রকৃতিনাথকেই পর পর দু'বার একটানা ঘেরাও, লাঞ্ছনা ও অপমানের কষাঘাত করালেন। ক্ষোভে অভিমানে প্রকৃতিনাথ নবনির্মিত ফ্যাক্টরির তত্ত্বাবধান ছেড়ে দিলেন। প্রায় একটি বছর তিনি নরেন্দ্রপুরে আসা বন্ধ রেখেছিলেন। পরিণামে শালিমার-এর উৎপাদনের দ্রুত অবনতি হয়ে বিশ্রী এক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। তখন ত্রস্ত কর্মীরা নিজেদের ভুল বুঝলেন এবং আটষট্টির মে মাসে তাঁরা এক মিটিং ডেকে তাতে প্রকৃতিনাথের উপস্থিতি প্রার্থনা করলেন। সেই মিটিং-এ কর্মীরা তাঁকেই পাল ছেঁড়া নৌকোর হাল ধরতে নতুন করে আহ্বান করলেন—কোনো জবর-দখলদার রাজনৈতিক নেশাগ্রস্ত নেতাকে নয়।

এখন শালিমার কেমিক্যালের তেল ও ঘি-বিভাগ আবার পুরোদমেই চলছে, বেরিয়াম কম্পাউণ্ডস বিভাগ মন্থরগতিতে এগোচ্ছে, কিন্তু 'শালিমার টুলস্' এখনো বন্ধই আছে। শ্রমিক আন্দোলন বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু এঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে মন্দার উপশম বিশেষ হয়নি বলেই প্রকৃতিনাথ ও কালীমোহন সন্তর্পণে 'শালিমার টুলস্' নতুন করে খোলার বিষয়ে বিধিব্যবস্থা করছেন। আশা করি তাঁরা শীঘ্রই এটা চালু করে বেশ কয়েকজন বাঙালী কারিগরকে পুনর্নিয়োগ করবেন। বাঙালীর নতুন কর্মসংস্থানও হবে, আর দেশের সম্পদও বাড়বে। শালিমার কেমিক্যালের দু'শো কর্মীর মধ্যে অধিকাংশই বাঙালী।

প্রকৃতিনাথ-পঞ্চানন সরষের তেল তৈরি করেন না। আমি কিন্তু অনুরোধ করবো যে, আমার জন্যে তাঁরা যে করেই হোক কয়েক কিলো ঝাঁঝালো খাঁটি সর্ষপ তৈল প্রস্তুত করুন। তাই নিয়ে আমি লজ্জা ঘৃণা ভয় ভুলে ঘুরে ঘুরে নেতাদের হাতে পায়ে তেল মালিশ করতে রাজী আছি একটি শর্তে—নেতারা শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব-সৃষ্টি পরিহার করে অন্তত দশটা বছর বাঙালীর, তথা ভারতের শিল্পোদ্যোগকে 'ডিসটার্ব' করবেন না। বছর দশেক পরে তাঁরা সুগঠিত শিল্প-বাণিজ্যের সবটাই না-হয় দখল করে নেবেন, কিন্তু এখন রেহাই দিন! তাঁরা বাঙালীকে খেয়ে পরে বাঁচার চেষ্টাটা করতে দিন!

১৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৮



উনত্রিশ

পঞ্চত্বপ্রাপ্তি শব্দটা পশুদের বেলায় কোনো দিনও খাটেনি, আজও খাটে না। আমরা স্বার্থপর মানুষ গরু-মোষ ভেড়া-ছাগলের মতো নিরীহ পশুদের যে কেবল কেটে মাংসটি খেয়ে ফেলেই ক্ষান্ত হই তাই-ই নয়, তাদের অস্থিচর্ম-শৃঙ্গনখ-অন্তদন্তকেও অসংখ্য কাজে লাগাই। প্রকাণ্ড হাতি ছোট ব্যাঙ কিছুই রেহাই পায় না আমাদের লোভ থেকে। জামাজুতো থেকে ঘর সাজাবার জিনিস তৈরি করা ছাড়াও জীবজন্তুর অন্ত্রের তৈরি বেহালা-সারেঙ্গীর তারে ঘোড়ার লেজের ছড়ি ও ছড় ঘষে সুরের ঢেউ তুলি, আর চামড়ায় ছাওয়া তবলা-মৃদঙ্গ ঢাকঢোল খোল বাজিয়ে সুরের সঙ্গে তালের সমন্বয় ঘটাই।

এমনি করে মৃত্যুর পরেও দীর্ঘকাল পশুদেহের অনেক অংশই লয় পায় না—পঞ্চভূতে বিলীন হয় না।

এই ভূমিকার প্রয়োজন বোধ করলাম 'ক্যালকাটা ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড মিনার‍্যালস কম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড'-এর (বড্ড বড় নাম) কারখানায় গিয়ে। সি আই সি এম ফ্যাক্টরিটি কলকাতার পূর্বাঞ্চল ট্যাংরায় অবস্থিত।

কারখানায় ঢুকেই বাঁহাতি একটা চালার নীচে কালো আর পাঁশুটে রঙের কটুগন্ধ কি যেন কতকগুলি আবর্জনা দেখলাম। প্রশ্ন করে জানলাম যে, ওগুলো র-হাইড ফ্লেশিংস, অর্থাৎ জীবজন্তুর দেহাবশেষ। পায়ের খুর, মাথার শিঙ, চামড়ার টুকরো, পুচ্ছের গুচ্ছটুকুকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পচতে না দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে; যথাসময়ে কাজে লাগানো হবে।

এই সব হচ্ছে সিরিশ অর্থাৎ গ্লু-র র-মেটিরিয়্যাল। আসে ট্যানিং কারখানা থেকে। ন্যাশন্যাল ট্যানারি, বাটা কম্পানি সবাই জন্তুর চামড়াটা উদ্ধারের পর অবশেষ যা থাকে তাকে 'কিউবিক মেজার' অর্থাৎ ঘনফুট হিসেবে বিক্রি করে দেন। সেই থেকেই সি আই সি এম কিছুটা কিনে সিরিশের আঠার শক্ত শক্ত টুকরো আর কাপড়-কাচা 'লাক্স' সাবানের মতো ফ্লেকস্ তৈরি করেন তাঁদের এই ত্রিশ বছরের পুরনো কারখানাতে।

ক্যালকাটা ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড মিনার‍্যালস কোং প্রাঃ লিঃ

৪৩ ধর্মতলা স্ট্রীট

কলিকাতা—১৩

জল ও বাষ্পের মাধ্যমে এবং রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জারিত ও পিষ্ট হতে হতে সেই জান্তব দেহাবশেষ রূপ নেয় সিরিশ নামক পদার্থের।

কত কাজেই না লাগে এই সিরিশ বস্তুটি! আমাদের নিত্যপ্রয়োজনের দেশলাই তার অন্যতম। (ছেলেবেলায় ঘুড়ির সুতোর মাঞ্জাতেও আমরা সিরিশের ব্যবহার করতাম। বড়রা যদিও সেটাকে কাজের জিনিস বলবেন না। কিন্তু জ্যেষ্ঠরা যা-ই বলুন না কেন; কনিষ্ঠদের পক্ষে ভালো মাঞ্জা ঢের বেশি কাজের জিনিস)। দেশলাই বাদে আছে প্রিন্টিং মেশিনের রোলার কম্পোজিশন ও সিরিশ কাগজ। পেপার মিলে, আর্টিফিশিয়াল সিল্ক কারখানায়, রবার শিল্পে, রঙের কারখানায় এই সিরিশ ছাড়া চলবে না।

কিন্তু সিরিশ উৎপাদন বর্তমান কার্যক্রমের প্রধান একটি অঙ্গ হলেও সি আই সি এম-এর জন্মের সময়ে তার কোনো স্থান ছিল না।

সি আই সি এম-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীবসন্তলাল দাস এবং তাঁর অগ্রজ, 'দাস কোং অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীমাণিকলাল দাস মহাশয়রা ১৯৩১ সালে যখন ৫০০ টাকার মূলধন নিয়ে কাজে নামেন তখন তাঁদের একমাত্র ব্যবসা ছিল ছোট একটি দেশী গ্রাইণ্ডিং মেশিনে কাচ, ম্যাঙ্গানীজ ইত্যাদি পিষে তার পাউডার অর্থাৎ চূর্ণ কলকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা। নামী খরিদ্দারদের মধ্যে তখন ছিলেন প্রসিদ্ধ 'উইমকো' দেশলাইয়ের কারখানা, 'ক্যালকাটা ম্যাচ ফ্যাক্টরি' প্রভৃতি।

মাণিকবাবু ও বসন্তবাবুর বাবা স্বর্গত আশুতোষ দাস ব্যবহারজীবী ছিলেন। ধনী না হলেও তিনি ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ পিতা। ছেলেদের সুশিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলেছিলেন। ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হয়ে চাকরির চেষ্টাতেও বেরিয়েছিলেন। কিন্তু তার ঠিক আগে ১৯২৯-৩০ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রকোপে চাকরির বাজারেও সংকট দেখা দিয়েছিল।

বসন্তলাল আমাকে বললেন যে, সৌভাগ্যক্রমে চাকরি তিনি পেলেন না, দাদাও পাননি। অগত্যা ওই ৫০০ টাকার পুঁজি নিয়ে উত্তর কলকাতার ছোট্ট একটি জায়গায় তাঁদের মিনারাল্যাল ক্রাশিং শিল্প প্রচেষ্টায় নামলেন।

পাঠকদের একটা কথা বলছি (পাঠিকারা নিজগুণে ক্ষমা করবেন), স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্ বিষয়ে আপনারা নিশ্চয়ই ওয়াকিবহাল, আমার মতো কাঁচা নন; কিন্তু পুরুষস্য ভাগ্যমের বিচিত্র চক্র আমাকে সারাজীবন মুগ্ধ করেছে, আবার বিমূঢ়ও করেছে। মুগ্ধ হয়েছি, সামান্য দোকানদার বা বিল-ক্লার্ককে ৭৫ পারসেন্ট লাক এবং ২৫ পারসেন্ট প্লাক-এর দৌলতে ক্রোড়পতিত্বে উপনীত হতে দেখে, আর স্তম্ভিত হয়েছি ভাগ্যহত অর্বুদপতির হিরণ্ময় প্রাসাদ ধূলিসাৎ হতে দেখে।

এই রকম এক পড়ে যাওয়া মাল্টিমিলিঅনেয়ারের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি ছিলেন কলকাতার এক বিশিষ্ট মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী। তাঁর পতনের ঘটনাটা আন্দাজ বছর চল্লিশেক আগেকার। পাট, শেয়ার সব কিছুতেই অতুল ধনলাভের পর সে ভদ্রলোকের বাণিজ্য থেকে শিল্পোদ্যোগে ক্ষেত্র প্রসারের বাসনা হলো। কোনো ইংরেজ এজেন্সী হাউস একটি প্রকাণ্ড কটন মিল বিক্রি করবেন শুনে তিনি সেদিকেই এগোলেন। সে যুগের লোকের মুখে শুনেছিলাম যে

তিনি আশি লক্ষ টাকার একটি চেক লিখে সেই মিলটি কিনেছিলেন—সেকালের ৮০ লক্ষ ষোলো-আনার টাকা, তার তুলনায় আজকের টাকার ক্রয়শক্তি তিন আনারও কম। শেঠজীর নাম ছিল কেশোরাম পোদ্দার। নিজের নামে মিলটার নাম রেখেছিলেন কেশোরাম কটন মিলস্। বিড়লাদের পরিচালিত আজকের কেশোরাম ইণ্ডাস্ট্রিজ তারই বংশধর। শিল্পপতি হবার পরেও তিনি তাঁর নানা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তারপরে একদিন চঞ্চলা লক্ষ্মী তাঁকে ত্যাগ করলেন; তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য কর্পূরের মতো উবে গেল। তাঁর বৃদ্ধ বয়সে আমার সঙ্গে কেশোরামজী পোদ্দারের দু'একবার আলাপ হয়েছিল। তিনি বজ্রপাতেও ভেঙে পড়েননি। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছোট ছোট কারবারে জড়িত ছিলেন।

আমার প্রথম যৌবনেই এইরকম আরও একটি ইন্দ্রপাত ঘটেছিল। হুকুমচাঁদ জুট মিল, ইন্সিওরেন্স প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা স্যার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ কেশোরামবাবুর চেয়েও ধনী হয়েছিলেন। নিউইয়র্কের তুলোর বাজারে এককালে তিনি যেদিকে আঙুল হেলাতেন বাজার দর-ও সেই দিকেই চলতো। তাঁর একটা রেকর্ড বোধহয় বিশ্বের কোনো বণিকই আজও ভাঙতে পারেননি। সেটা হলো, একই দিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিউ ইয়র্কের তুলোর ফাটকায় হুকুমচাঁদজীর ১৫ কোটি টাকা লাভ করার ঐতিহাসিক কীর্তি।

সেই শেঠজীরও শুনেছি পরে প্রায় কেশোরামজীর মতোই দুঃসময়ের কবলে পড়তে হয়েছিল।

দু' সপ্তাহ আগে যে গ্রীক ধনকুবেরটি স্বর্গীয় প্রেসিডেন্ট কেনেডির বিধবা জ্যাকলিন কেনেডির পাণিগ্রহণ করলেন সেই অ্যারিস্টটল সোক্রাটিস ওনাসিস মশায়ের জীবনকাহিনীও অদ্ভুত। সামান্য অবস্থা থেকে শুরু করে কয়েক বছর আগে তাঁর নিজস্ব বাণিজ্যপোতের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছিল পাঁচশোটার মতো। শুনেছি যে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জুয়ার আড্ডা মণ্টিকার্লোর অধিকাংশেরই এখন মালিক হচ্ছেন এই ওনাসিস। তাঁর নিজের ভূসম্পত্তির মধ্যে আর একটি হলো গ্রীসের কাছে স্করপিঅস দ্বীপ। জ্যাকলিনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ সেই দ্বীপেই অনুষ্ঠিত হলো। ঐতিহাসিক গ্রীক রাজা ক্রেসাসের নামের অনুকরণে ওনাসিসের নাম ক্রেসাস হওয়া উচিত ছিল। গ্রীক দার্শনিক সোক্রাটিস এবং তাঁর প্রশিষ্য জ্ঞানী অ্যারিস্টটল ধনসম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। যা হোক, অ্যারিস্টটল সোক্রাটিস ওনাসিসের বিরাটত্বের মূলেও আছে ভাগ্যের বিচিত্র খেলা।

এগুলি কোনো উপমা নয়। এই সব দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে পুরুষের ভাগ্য বিষয়ে ওই শ্লোকটার ব্যাখ্যা করলাম মাত্র। গল্প দিয়ে যে কথাটা বলতে চাই তা হলো যে, মানুষের জীবনে নিয়তির লীলাই সার কথা। মাণিকলাল ও বসন্তলাল দাস মশায়দের অদৃষ্টে যদি কলেজ ছাড়ার পর চাকরি পাওয়ার যোগটা থাকতো তবে তাঁদের এই প্রশংসনীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রয়াসের সাফল্যের কাহিনীটি আজ পাঠকমহলে উপস্থিত করতে পারতাম না।

১৯৩১ সালে যাত্রা শুরু করে দাস মশায়দের বাণিজ্যরথ দ্রুত এগিয়ে চললো। ১৯৩৮ সালে পৌঁছে দুই ভাই একটু দম নিলেন। সেই সময়ে তাঁরা তাঁদের দায়িত্বের দুটো ভাগ করে

নিলেন। জ্যেষ্ঠ মাণিকলাল রইলেন কেবল ট্রেডিং নিয়ে। এই বিভাগের নাম হলো পূর্ববর্ণিত দাস কোং। বসন্তলাল নিলেন উৎপাদনের ভার। তাঁর পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের নাম হলো সি আই সি এম।

কাজ বেড়েই চললো, গ্রাহকদের তালিকা লম্বা হতে লাগলো। আদি গ্রাহকদের নাম আগেই বলেছি। এখন যাঁরা আছেন তাঁদের কারো কারো নাম এবং তাঁরা সি আই সি এম-এর কাছ থেকে যা কেনেন তার ছোট একটি তালিকা এখানে লিপিবন্ধ করলে অগ্রগতির রূপটা বেশ বোঝা যাবে।

(১) গ্লাস-পাউডার কেনেন উইমকো, আসাম ম্যাচ, এসাভি ইন্ডিয়া প্রভৃতি দেশলাই নির্মাতারা, (২) ম্যাঙ্গানীজ-পাউডার নেন সুর এনামেল, বেঙ্গল এনামেল, উত্তরপ্রদেশের হিন্দ ল্যাম্প, শ্রীদুর্গা গ্লাস প্রভৃতি, (৩) ফ্যাকটিস (রাবার তৈরিতে অপরিহার্য কাঁচামাল) কেনেন এন-আর-এম কলকাতা, স্বস্তিক রাবার পুনা প্রভৃতি, (৪) ধাতব স্টিয়ারেট্‌স ও ন্যাফথেট্‌স-এর গ্রাহক অনেক; নামীদের মধ্যে আছেন ব্রিটিশ পেইন্টস. জেনসন নিকলসন, ডানলপ, এসো, বম্বে রুফিং, জলন্ধরের কোটা রাবার, দিল্লীর বাজাজ রাবার ইত্যাদি, (৫) প্লু-ফ্লেকস বা সিরিশের খরিদ্দারদের মধ্যে বাটা শু কোং এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল উল্লেখযোগ্য।

অনেক লম্বা লিস্ট; সব নাম দেওয়া সম্ভব নয়। আমার লেখার ধারা বদলে এবারে এই ফর্দটি এই জন্যে দিলাম যে, এঁদের উৎপন্ন জিনিসগুলি হলো পণ্য গড়ার পণ্য, অর্থাৎ কাঁচামাল। এই সমস্ত জিনিস দিয়ে যাঁরা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করেন তাঁরা ছাড়া সাধারণ লোকের কাছে ব্যাপারটা নীরস ঠেকবে। তবে গ্রাহকদের নাম থেকে এই পণ্যগুলির প্রয়োজনীয়তা নিরূপিত হবে বলেই লিস্টটা তুলে দিলাম। আমাদের গৌরবের বিষয় এই যে, বাঙালী রসায়ন-পণ্ডিতরা জটিল প্রণালীতে এর উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছেন এক বাঙালী প্রতিষ্ঠানে।

ফলিত রসায়নে এম. এস-সি, স্বর্ণপদক বিভূষিত শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য রাজশাহী কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক। তিনি এখন এই প্রতিষ্ঠানের চীফ কেমিস্ট। তাঁরই তত্ত্বাবধানে এখানকার উচ্চমানের দ্রব্যগুলি তৈরি হচ্ছে। ম্যানেজার শ্রীজ্ঞান দত্ত সি আই সি এম-এর প্রাচীন কর্মচারী।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীবসন্তলাল দাস সকালের দিকটা ধর্মতলার হেড অফিসে কাটান আর বিকেলে কারখানাতে বসেন।

দুই শিফ্‌টে ভোর ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কারখানা পুরোদমে চলে। যত ফ্যাক্টরি এযাবৎ দেখেছি (সংখ্যায় নেহাত কম নয়) তার মধ্যে এই একটি দেখলাম যেটি নির্বিবাদে চলছে. যেটাতে শ্রমিক-মালিক বিরোধের কোনো খবর পেলাম না। যা উৎপাদন হচ্ছে তার চারগুণ বাড়ালেও বাজারে মাল পড়তে পাবে না, এমনি নাকি চাহিদা; কিন্তু বসন্তবাবু কাজ আর বাড়াতে চান না। জমিটা বসন্তবাবুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। শুধু জমি কেন, সমস্ত প্রতিষ্ঠানটিই তাই, কারণ মাণিকবাবু, বসন্তবাবু আর তাঁদের ভগ্নিপতি শ্রীগোপালকৃষ্ণ বসু মহাশয়রাই এর প্রায় সম্পূর্ণ শেয়ারেরই অধিকারী। গোপালবাবু ত্রিশ দশকের শেষ ভাগে প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তখন থেকেই তিনি সি আই সি এম এবং দাস কম্পানির সক্রিয় ডিরেক্টর।

আরও দু'একজন শেয়ারহোল্ডার আছেন যাঁদের আমরা সকলেই চিনি। যেমন, আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়। তিনি অবশ্য সামান্য কয়েকটা শেয়ারের মালিক;

নামেই আছেন, কোনো দিন ডিরেক্টর হননি। কিন্তু শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় পঞ্চাশ দশকে কয়েক বছর সি আই সি এম-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। প্রফুল্লবাবু, ভূপতিবাবু, স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এঁরা সকলে মাণিকবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মাণিকবাবু রাজনীতিতে কোনো দিন সক্রিয় অংশ নেননি, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা বেশবাসে সেকালের কংগ্রেসী বর্ণ ও গন্ধ এখনো বজায় আছে। মাণিকবাবু এককালে বন্ধু ধীরেন্দ্রনারায়ণের হুগলি ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ছিলেন, আর দাস ভ্রাতাদের এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধির মূলে ছিল ধীরেন্দ্রনারায়ণের সর্বাঙ্গীন সহায়তা। বস্তুত হুগলি ব্যাংকই দাস কম্পানি ও সি আই সি এম-কে আজকের এই উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়েছিল।

সি আই সি এম-এর বিক্রয়ের ক্রমিক উন্নতির পরিচায়ক কয়েকটি অঙ্ক এখানে পেশ করছি :

সাল				বিক্রয়
১৯৩৮	...	...	...	৮৩৫০০ টাকা
১৯৪৭	...	...	...	১৮০০০০ টাকা
১৯৫৭	...	...	...	৬০৮০০০ টাকা
১৯৬২	...	...	...	১০৩৭০০০ টাকা
১৯৬৭	...	...	...	১৫৭২০০০ টাকা

প্রতিষ্ঠানের ১১৪ জন কর্মীর বার্ষিক উপার্জন পৌনে তিন লক্ষ টাকা। কিন্তু এঁদের মধ্যে শতকরা মাত্র চল্লিশজন বাঙালী। তার কারণটি হলো এঁদের সিরিশের উৎপাদন। গোড়াতেই সিরিশ এবং তার উৎস র-হাইড ফ্লেশিংস-এর কথা বলেছি। সেই মরা চামড়া আর হাড়গোড় ঘাঁটার কাজে শ্রমিকরা আসেন প্রধানত বিহার থেকে। বাঙালী শ্রমিকরা এখনও এই কাজে হাত লাগাতে অনিচ্ছুক ও অপারগ।

মজঃফরপুর জেলার শ্রীহরিচরণ রাম আমাদের খাদ্যমন্ত্রী জগজীবনজীর স্বজাতি ও দেশের লোক। ত্রিশ দশক থেকে হরিচরণ সি আই সি এম-এ কাজ করছেন। পঞ্চাশোত্তর বয়সেও তাঁর শরীরের গাঁথুনি শক্ত আর মুখের ভাবে শিশুর সরলতা। তাঁকে দেখে আমার মনে পড়ে গেল গুরু রামানন্দের শিষ্য রবিদাসের কথা, যে-অন্ত্যজ রবিদাস চামারের শিষ্যা হয়েছিলেন চিতোরের রানী ঝালি। 'প্রেমের সোনার কাঙালিনী' রাজরানী ঝালি সামাজিক আচারের অর্থহারা বাঁধন ছিঁড়ে হরিপ্রেমের দীক্ষা নিয়েছিলেন রবিদাস চামারের কাছে। হয়তো আজকের হরিচরণ রাম সেই মহাত্মা রবিদাসেরই বংশধর! কে জানে?

বসন্তবাবুরা সিরিশ তৈরির যন্ত্রপাতি বসিয়েছিলেন চল্লিশ শতকের মাঝামাঝি। শ্রীইসরারুল হক নামে ত্রিপুরা জেলার এক বাঙালী মুসলমান দাস মহাশয়দের সিরিশ সাপ্লাই করতেন। সি আই সি এম মধ্যবর্তী হয়ে সেই সিবিশ বাজারে ছাড়তেন। ইসরারুলের তৈরী সিরিশের বাজারে খুব নাম হলো। বসন্তবাবু তাঁকে সি আই সি এম-এই ভর্তি করে নিলেন; আর তখন থেকে ইসরারুলের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানের প্রধান পণ্য গ্লু-ফ্লেকসের উৎপাদন সি আই সি এম-এর

নিজ কারখানাতেই শুরু হলো। ইসরারুল হক এখন পাকিস্তানে চলে গেছেন, কিন্তু যাবার আগে এই প্রতিষ্ঠানের তৈরী সিরিশের সুনাম ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন সারা ভারতবর্ষের বাজারে।

অভিধানে দেখছি যে 'সিরিশ' বা 'সিরেশ' ফার্সি শব্দ থেকেই বাংলা শব্দ 'সিরিশ'-এর উৎপত্তি। হাজার হাজার বছর আগে বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের প্রচারক আরব দেশের পণ্ডিতদের সঙ্গে যখন ভারতের বিজ্ঞানীদের জ্ঞানের আদান-প্রদান চলেছিল তখন পথিমধ্যে পারস্য দেশের সঙ্গেও ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক মিতালি হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আমার নিজের একটা ভুল ধারণা ছিল যে, শিরীষ গাছের বাকল থেকে যে আঠা হয় অথবা গাব গাছের ফল থেকে যে 'গাম অ্যারাবিক' হয় তার সঙ্গে 'সিরিশ'-এর আঠার কোনো সম্বন্ধ আছে; কিন্তু এখন দেখছি তা নয়—আগেরগুলি বনস্পতিজাত এবং শেষেরটি পুরোপুরি জান্তব আঠা।

সি আই সি এম-এর হেড অফিসের প্রাচীন কর্মীদের অন্যতম শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে জানলাম যে তাঁরা মাসে ১০ টন ক'রে সিরিশ তৈরি করেন। কলকাতায় কিন্তু সিরিশের প্রধান কারবারী হলেন শ-ওয়ালেস কম্পানি। শ-ওয়ালেসের মান্দ্রাজ ফ্যাক্টরিতে মাসে অনেক বেশি মাল তৈরি হয়।

১ টন সিরিশ তৈরি করতে ৮০,০০০ গ্যালন জল খরচ হয়—ন্যাফথেনিক অ্যাসিডের আমদানি হয় রুমানিয়া থেকে আর সেই অ্যাসিডকে ভিত্তি করেই ন্যাফথানেট তৈরি হয়, অথবা বাদাম তেল আর তামাকবীজের তেল থেকে ফ্যাকটিস নামক উপাদানটি গড়া হয়—এই সমস্ত রাসায়নিক আলোচনার চেয়ে যাঁরা এগুলির উৎপাদন ও বিপণন করেন তাঁদের বিষয়ে রসালাপটা আমার কাছে বেশি লোভনীয় মনে হয়।

সুদর্শন অমরনাথ চ্যাটার্জি যৌবনে ভালো খেলোয়াড় ছিলেন; ব্যাডমিনটনে বড় বড় ম্যাচ খেলতেন। আর খেলাধুলার সঙ্গে তাঁর আর একটি নেশা ছিল। সেটা হলো শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চা। ছেলেবেলাটা মোটের ওপর তাঁর ভালোই কেটেছিল। এখনো কনট্র্যাক্ট-ব্রীজ খেলা নিয়ে আনন্দেই আছেন; শিগগীরই নিজের টীম নিয়ে দিল্লী যাচ্ছেন জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। তবে মাঝের কয়েকটা বছর তাঁর পারিবারিক বিপর্যয়ে কেটেছিল। গান-বাজনা ছেড়ে সি আই সি এম-এ চাকরি নিয়েছিলেন '১৯৪০ নাগাদ। সেই থেকে এখানেই আছেন। দাস মশায়দের নিজের লোক হয়ে গেছেন।

অমরনাথ বললেন যে, বছরে ১৫।১৬ লক্ষ টাকার মাল তৈরি করতে তাঁদের যা কাঁচামাল লাগে তার মধ্যে মাত্র ৮০।৯০ হাজার টাকার উপাদান বিদেশ থেকে আমদানি করলেই বেশ চলে যায়। অন্যরা হলে অনেক বেশি ইমপোর্ট করতে বাধ্য হতেন; কিন্তু বসন্তলাল গোড়া থেকেই বিদেশী উপাদান বা বিলিতী মেশিন দিয়ে কাজ করার বিপক্ষে। তাঁর এই দৃঢ়তা এবং তাঁর এঞ্জিনীয়ারিং-এর মাথা এই ইমপোর্ট সাবস্টিটিউশন করে এসেছে প্রতিষ্ঠানের আদিকাল থেকে। তিনি নিজে এবং তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনায় সি আই সি এম-এর দক্ষ কর্মচারীরা প্রয়োজনীয় মেশিনের ডিজাইন করে এখানে সেসব তৈরি করিয়েছেন। অবশ্য সামান্য দু-একটা

বিদেশী মেশিন যে ব্যবহার করেন না তা নয়। স্বদেশের একটা বড় উপকার করছেন এ'রা বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় বন্ধ রেখে।

মোরারজীভাইয়ের নজর তো কেবল বড়দের দিকেই নিবদ্ধ—এইসব নীরব কর্মীদের কথা কি তাঁর কানে পেঁছয়? মোরারজীর মর‍্যাল ট্রেনিং আর ইকনমিকসের লেকচারগুলিতে যদি এইসব উদাহরণ সকলের চোখের সামনে তুলে ধরেন তবে এখন তাঁর বক্তৃতা শুনতে যত খারাপ লাগে ততোটা নিশ্চয়ই লাগবে না।

বাঙালী শিল্পোৎসাহীদের জ্ঞাতার্থে আর একটি কথা—বসন্তলালের একটি প্রস্তাব—বলে প্রবন্ধ শেষ করি। বসন্তলাল নিজের প্রতিষ্ঠানকে আর বাড়াতে চান না; অথচ তাঁদের উৎপন্ন জিনিসের এখনো প্রকাণ্ড চাহিদা আছে। তাই তিনি বলছেন—সি আই সি এম টেকনিক্যাল নো-হাউ, উৎপাদন পরিকল্পনা এবং মার্কেটিং-এর আঁতঘাত সব বিষয়ে সক্রিয় সহযোগিতা করে উদ্যোগী বাঙালীকে এই ব্যবসাতে যথাসাধ্য সাহায্য করতে প্রস্তুত।

এ পর্যন্ত বাঙালী অবাঙালী কোনো শিল্পপতির কাছ থেকে এমন একটি প্রস্তাব আমি অন্তত শুনিনি—এমন সহৃদয়তা, সংবেদনশীলতার ভাষা এই স্বার্থপরতার যুগে শুনতে এতো মধুর লাগে।

২ নভেম্বর, ১৯৬৮





ত্রিশ

"স্নেহের মঞ্জু ও মীনা,

বাণিজ্যের বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার মালমশলার সন্ধানে গিয়ে যে তোমাদের মতো সুন্দর, পরিচ্ছন্নরুচি পরিবারের সঙ্গে এমন করে আত্মীয়তাসূত্রে বাঁধা পড়ে যাবো বিশাখাপত্তন যাবার আগে তা একেবারেই ভাবিনি।...দুই নবীন কর্তা, তোমরা দু'জন তরুণী কর্ত্রী আর ভুলু বিটু মিঠু টুংকু আর মিলুর মতো মিষ্টি মিষ্টি ছেলেরা আর মেয়েটা—সকলের আদরে আমার মন এখনো ভরপুর হয়ে আছে।...ফেরার পথে ট্রেনটা ওয়ালটেয়ার স্টেশন ছাড়ার পরে যেন স্বজনবিচ্ছেদের বেদনা বোধ করলাম।..."

এটা আমার লেখা একটা চিঠির অংশ। লিখেছিলাম বিশাখাপত্তনের পুরনো বাঙালী 'স্টিভেডোর' প্রতিষ্ঠান রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জি প্রাইভেট লিমিটেড-এর ডিরেক্টর* ও অন্যতম কার্যাধ্যক্ষ শ্রীদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী মীনা দেবী আর দুলালবাবুর বড় ভাই 'হিন্দুস্থান শিপ-ইয়ার্ড'-এর উচ্চপদস্থ অফিসার চার্টার্ড এঞ্জিনীয়ার শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী মঞ্জু দেবীর কাছে।

এই দুই ভাই আর তাঁদের স্ত্রীরা এরকম কত চিঠি পেয়েছেন তা জানি না। তবে এ'রা যদি পেয়ে থাকেন বিশ পঞ্চাশটা, তো তাঁদের পিতৃদেব, অর্থাৎ পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয়ই এই ধরনের চিঠি পেতেন শত শত।

কারণ ভাইজাগ মানে অধুনা বিশাখাপত্তনমের** স্টিভেডোরগোষ্ঠীর অন্যতম নায়ক সুরেন

* প্রবন্ধ লেখার সময়ে আমি ভুল বুঝে লিখেছিলাম যে দুলালবাবু ডিরেক্টর পদাভিষিক্ত। তিনি সবেমাত্র সেদিন, উনসত্তরের মে-জুন মাসে ডিরেক্টর বোর্ডে মনোনীত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই পদোন্নতি দেখে যেতে পারেননি মীনা দেবী। বিধাতার নির্মম বিধানে তিনি আমার সঙ্গে পরিচয়ের মাস কয়েক পরেই পুত্রকন্যা ও প্রিয়জনের মায়া কাটিয়ে ইহলোক ছেড়ে গেছেন।

** ভাইজাগে রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জি ছাড়া অনেক বাঙালী স্টিভেডোর প্রতিষ্ঠান আছে। যথা :—

১। শরৎ চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং

রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জি প্রাঃ লিমিটেড

রয়চ্যাট বিল্ডিংস্

বিশাখাপত্তনম ১

ব্যানার্জি মশায়, ওরফে ভনুবাবুর পরিণত বয়সে এক অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল, প্রায় দুপুর বেলায় মেন রোডের অফিস বাড়ির দোতলায় নিজের বাসার বারান্দায় বসে পথের দিকে চেয়ে থাকা। কোনো অচেনা বাঙালী পথিককে দেখলেই ওপর থেকে ডাকাডাকি করে ভনুবাবু তাকে ঘরে তুলতেন। অবেলায় হলেও শহরে নবাগত সেই এক বা একাধিক বাঙালীকে সুরেনবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করে অন্তত সে বেলার খাওয়াটা সেখানে সেরে যেতে হতো; দরকার হলে অতিথি রাতের আশ্রয়ও পেতো। বিয়ের পরে কলকাতা থেকে এসে নববধূরা শ্বশুরের এই কাণ্ড দেখে অবাক। অনেকদিন এমন হতো যে, বাড়ির মেয়েরা, অল্পবয়সী সেই দুই বউ, না খেয়ে নিজেদের ভাগের মাছভাত তুলে দিতে বাধ্য হতেন। শেষে ছেলেরা অনুযোগ করাতে কর্তা নিয়ম বেঁধে দিলেন যে, অন্তত একজনের খাবার যেন প্রতিদিন বেশি রাঁধা থাকে। অতিথি পাওয়া গেল তো ভালো, 'না গেলে দিও ফেলে সে ভাত ডাল!'

কাজেই ভনুবাবুর ছেলে-বউ আর বাচ্চা বাচ্চা নাতি-নাতনীরা যে ব্যবসা বাণিজ্যের লোক দেখানো সৌজন্যের আবহাওয়াতে মানুষ হয়েও অন্তর দিয়ে অতিথিকে আপন করে নিতে পারেন সেটা হলো জ্যামিতিক 'করোলারি'-র মতন। আমি তাঁদের সম্বন্ধে লিখতেও পারি বা লিখবো, এই প্রত্যাশাতেই যে আমার প্রতি তাঁদের সৌজন্য, তা নয়; ভাইজাগের অনেক বাঙালীর মুখে একই কথা শুনলাম। দুলালবাবুদের কাছে অতিথি নারায়ণ—এই মাগ্গি গণ্ডার দিনেও।

অনেক প্রবাসী বাঙালীর সঙ্গেই আলাপ করার সুযোগ হলো বিশাখাপত্তন 'বাঙালী সঙ্ঘের' সান্ধ্য আড্ডায় গিয়ে। ১৯২৯ সালে তারকেশ্বর নিবাসী এক ভদ্রলোক, যাঁর নাম বর্তমান কর্মসচিবরা বহু চেষ্টা করেও জানতে পারেননি, এই সঙ্ঘ গঠন করেছিলেন। বোঝা যাচ্ছে যে গোড়ার দিকে সঙ্ঘের কাজ বেশি গুছিয়ে করা হয়নি। কিন্তু এখন এটা একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে বাংলা দেশ থেকে ছ-সাত শ' মাইল দূরে থেকেও ভাইজাগ ও ওয়ালটেয়ারের হাজার বারো শ' বাঙালী স্ত্রীপুরুষ বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ভালো করেই বাঁচিয়ে রেখেছেন।

তিন চারদিন ওখানে ছিলাম; তারই মধ্যে এক সন্ধ্যায় আমি গিয়ে দেখলাম দুর্গাপূজা-মণ্ডপে অভিনয়ের জন্যে তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' নাটকের জোর মহড়া চলেছে। পরিচালক হলেন আমাদের কমলবাবু—দুলালবাবুর দাদা। তিনি পার্ট করছেন 'নুটবিহারী'র আর তাঁর স্ত্রী মঞ্জু 'বিমলা'র। নাট্যপাগল শ্বশুরকুলের অন্যান্য গুণের সঙ্গে অভিনয় নৈপুণ্যটিও বধূ মঞ্জু রপ্ত করে নিয়েছেন। সহজ সুন্দর অভিনয়, মনে হয় খুব স্টেজ-ফ্রী। চমৎকার অভিনয় করেছেন ভাইজাগের আর এক পুরনো বাসিন্দা, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্সীর মালিক এবং বাঙালী সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীকৃষ্ণকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র অমূল্যকৃষ্ণ, ওরফে গোপালবাবু।

'কল্যাণী' মহড়ায় সেদিন অনুপস্থিত ছিলেন; তাঁর প্রক্সি দিচ্ছিলেন অপর্ণা দত্ত নামে একটি মেয়ে। মেয়েটিকে আমার বড় ভালো লাগলো; অনেকক্ষণ কথা বলে মনে হলো এ যেন সেই 'দু'দণ্ড শান্তি দেওয়া নাটোরের বনলতা সেন'। ইংরেজীতে এম. এ. অপর্ণাও এখানকার

২। বলাইলাল মুখার্জি অ্যান্ড কোং
৩। ই. সি. বোস অ্যান্ড কোং, এবং
৪। এইচ. কে. ব্যানার্জি অ্যান্ড কোং।

পুরনো এক বাসিন্দার কন্যা। বিশাখাপত্তনের বিরাট করমণ্ডল* সার-কারখানার বিদেশী কর্মচারিবৃন্দের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সে শিক্ষিকা। অপর্ণার দুঃখ যে শিশুকাল থেকে ভাইজাগের বাসিন্দা হয়ে সে বাংলায় লেখাপড়া করার সুযোগ পায়নি। কিন্তু বাংলায় অভিনয় করছে খাসা।

উল্লেখযোগ্য আরেকজন হলেন প্রম্পটার দ্বিজেন রায়। আমাদের ক্যালকাটা কেমিক্যালের ভাইজাগ সেলস অফিসের কর্মচারী। সেই অফিসের ম্যানেজার কিন্তু অন্ধ্রদেশীয় শ্রীসূর্যনারায়ণ রাও। বাঙালী প্রতিষ্ঠানের এই নীতিটা একদিক দিয়ে ভালোই। 'চিলড্রেন অব দি সয়েল'-কে উচ্চপদে নিয়োগ করা। রায়-চ্যাটার্জির নীতিও তাই। তাঁদের অধিকাংশ কর্মচারীই সে-দেশের লোক। দুলালবাবুরা বাঙালী যুবকদের রেখে দেখেছেন; তাঁরা নাকি বেশিদিন বাংলা দেশ, তথা কলকাতা ছেড়ে থাকতে পারেন না। অথচ কলকাতার অবাঙালী প্রতিষ্ঠানে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব দেশের লোকই তো দেখি বছরের পর বছর টিকে থাকেন। বাংলায় এই বেকারত্বের বাতাবরণে থাকতে, বাপখুড়োর গলগ্রহ হয়ে থাকতে খারাপ লাগে না, কিন্তু বাংলার বাইরে গিয়ে স্বাবলম্বী হতে খারাপ লাগে! কথাটা শুনে মোটেই উৎফুল্ল হলাম না।

নেপথ্যে আরও কয়েকজন বাঙালী-সঙ্ঘের জন্যে দারুণ একটি কাজ করে চলেছেন। অনেকের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন শ্রীশীতাংশু চক্রবর্তী (বন্দরে যেসব জাহাজ ভেড়ে তার চিপিং ও পেণ্টিং কণ্ট্রাক্টার), শ্রীতপন বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঙালী কার্গো-সার্ভেয়ার ও অ্যাসেসর মিত্র এস. কে. প্রাঃ লিমিটেডের স্থানীয় ম্যানেজার), শ্রীমৈত্র (সরকারি প্রতিষ্ঠান এন. এম. ডি. সি-র কর্মচারী), শ্রীঅরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বন্দরের ড্রেজার অফিসার), শ্রীদেব (নেভি স্টোর্সের ফোরম্যান), শ্রীসূর্যদেব বন্দ্যোপাধ্যায় (নেভির কর্মচারী), শ্রীমাখন চক্রবর্তী (নৌশিক্ষা জাহাজের কর্মচারী) এবং শ্রীনিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এঁদের উদ্যমে বাঙালী-সঙ্ঘের লাইব্রেরি সমৃদ্ধ হয়েছে। হেন বাঙালী লেখক নেই যাঁর বই নেই। কী করে বাছাই করেন—প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'দেশ' পত্রিকার পাতায় পাতায় বিজ্ঞাপন দেখে। 'ওটা তো আমাদের ক্যাটালগ।'

সপ্তমী পুজোর দিন থেকে নবমী পর্যন্ত ভাইজাগের কোনো বাঙালী বাড়ির হেঁসেলেই আগুন জ্বলে না। 'বাঙালী দুর্গাবাটী সমিতি'-র উদ্যোগে সবাই পুজামণ্ডপে খিচুড়ি বেগুন-ভাজা আর মিষ্টান্ন ভোগ খান। নাটকাভিনয় এবং ভ্যারাইটি পারফর্মেন্স হয়, আর এবারে পুজোর আগেই মহালয়ার দিন হবে কলকাতা থেকে বিখ্যাত প্রযোজক শ্রীঅসিত চৌধুরী মহাশয়ের পাঠানো বাংলা ছবির শো। ছবিটা অসিতবাবু প্রবাসী বাঙালীর বুভুক্ষু মনে উৎসাহ দেবার জন্যে কোনো ভাড়া চার্জ না করেই পাঠিয়েছেন।

* বিশাখাপত্তনের 'ডলফিন্স নোজ' পাহাড়ের নীচে সমুদ্রের খাঁড়ির গা ঘেঁষে ক্যালটেক্স তৈল শোধনাগার এবং করমণ্ডল সার-কারখানা। তৈল শোধনান্তে অবশিষ্ট উপপণ্য থেকে সার তৈরির উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভারতে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ই. আই. ডি.-প্যারি ক্যালটেক্সের রিফাইনারির পাশে বৃহৎ একটি ফার্টিলাইজার কারখানা বসিয়েছেন। তার নাম করমণ্ডল ফার্টিলাইজার্স।

ভাইজাগে বেশ কয়েকটা ভালো স্কুল আছে; আর আছে ওয়ালটেয়ার সমুদ্রতীরে অবস্থিত অন্ধ্র ইউনিভার্সিটি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন অতীতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।

এবারের লেখাটা—আমায় মাপ করবেন আপনারা—চায়নীজ চাও-চাও-এর মতো চেহারা নিচ্ছে। ডায়েরী, জীবনচরিত আর বাণিজ্যবৃত্তান্তের চচ্চড়ি হয়ে যাচ্ছে। রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জি'র বিষয়ে আবার একটু বলে নিই।

সালটা ১৯৩৫। চব্বিশ ঘণ্টার নোটিসে সুরেনবাবুকে এক জরুরী কাজের তাগিদে কলকাতা ছেড়ে ভাইজাগে চলে যেতে হলো। দিনটাও ছিল এক যাত্রা-নাস্তির তিথি। ভনুবাবু আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে বলে এলেন যে, এই তিথিতে যাত্রা মানে অগস্ত্য যাত্রা, দেশে ফেরার পথ আর থাকবে না। হলোও তাই; সেই যে বঙ্গভূমি ছেড়ে চোল-চালুক্যদের দেশে পেঁৗছলেন, তখন থেকে ভনুবাবু সেখানকারই বাসিন্দা হয়ে গেলেন। কালে ভদ্রে দেশে আসা ঘটতো।

ভনুবাবুর বাবা পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মশায়ের কথা আপনাদের নতুন করে বলার কী আর আছে। অন্যের কথা জানি না, আমি তো জঞ্জালনগরী কলকাতার রাস্তায় বেরিয়ে আলিবাবার দাসী মার্জনার সেই 'ওপনিং সং'টা আজও গাই গুন গুন করে, "ছিঃ ছিঃ, এত্তা জঞ্জাল!" আর আজকের বস্তাপচা বদরসিকতা পড়ে-শুনে বার বার ভাবি যে, মনের সেই 'হিউমার' নিয়ে আজ যদি ক্ষীরোদপ্রসাদের মতো রসিকশ্রেষ্ঠরা আমাদের নতুন কিছু দেবার জন্যে বেঁচে থাকতেন তো আমরা হয়তো দিনরাত 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' জিগির না তুলে মর্জিনার সেই গান গেয়ে গেয়ে ঘরঝাঁট দেবার মতো তাঁর নতুন কোনো নাচানো সুরের গানের তালে তালে হাতুড়ি আর কাস্তে চালিয়ে কাজ করতে পারতাম। আর গলা কাটিয়ে তিনবার 'চিচিং ফাঁক' বলে আমাদের ব্যর্থপ্রায় তিনটি ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানকে সার্থক করে তুলতে পারতাম। আমাদের মনে এখন 'হিউমার' নেই, খালি আছে রাগ।

ক্ষীরোদপ্রসাদের আর এক পৌত্র (দুলালবাবুদের খুড়তুতো ভাই) কলকাতা করপোরেশনের বর্তমান কাউন্সিলার শ্রীপরেশ ব্যানার্জি মশায়ের কাছ থেকে কয়েকটি তথ্য জানতে পারলাম।

নন্দনতত্ত্বের রাজা ক্ষীরোদপ্রসাদ একদিকে সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যের জন্যে নবদ্বীপ পণ্ডিত সভায় প্রদত্ত 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি পেয়েছিলেন; আবার কেমিস্ট্রিতে ছিলেন এম. এ. (তাঁর সময়ে কলকাতায় এম. এস-সি. ডিগ্রি চালু হয়নি)। জেনারেল অ্যাসেম্বলি (বর্তমান স্কটিশ চার্চ) কলেজে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু খাঁটি রস, কাব্যরস তাঁকে রসায়ন থেকে টেনে আনলো সাহিত্যে, বিশেষ করে নাট্য রচনায়। ছাত্রাবস্থায় ১৮৮৫ সালে দুই খণ্ডে 'রাজনৈতিক সন্ন্যাসী' থেকে শুরু করে মৃত্যুর বছরখানেক আগে ১৯২৬-এ জীবনের শেষ রচনা 'নরনারায়ণ' পর্যন্ত একচল্লিশ বছরে সাতান্নটি নাটক উপন্যাস ও প্রবন্ধমালা রচনা করে গিয়েছিলেন। সবই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'নন্দকুমার' এবং 'দাদা ও দিদি' পুলিস বাজেয়াপ্ত করেছিল। 'দাদা ও দিদি' প্রহসনটার যত কপি পুলিস হাতে পেয়েছিল, অত্যন্ত রাজদ্রোহী সাহিত্য বলে তার সব কপিই পুড়িয়ে ফেলেছিল। বইটা ১৯০৮-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু বিষয়বুদ্ধিতে ক্ষীরোদপ্রসাদ ছিলেন ইনফ্যাণ্ট ক্লাসের ছাত্র। বাগবাজারে পৈতৃক বাড়ি, খড়দায় কিছু জমিজমা, বাঁকুড়াতেও কিছু, এইসব নিয়ে বিষয়আশয় মন্দ ছিল না। থাকলে কি হবে, তিনি সে সবের দেখাশোনা করতে পারতেন না। থিয়েটারের নাটক আর বই

লিখেও যা রোজগার করতেন তাও ছিল অপ্রতুল। তাই তাঁর বড় ছেলে সুরেন্দ্রনাথ বা ভনুবাবুর খুব অল্পবয়সেই লেখাপড়া ছেড়ে জীবিকার অন্বেষণে বেরোতে হলো। ইতিমধ্যে ভনুবাবুর শুভবিবাহ কার্যটিও সম্পন্ন হয়ে গেছে, যেমন হতো সেকালের কম বয়সের ছেলেদের।

ভনুবাবু প্রথমে এক আত্মীয়ের সুপারিশে কেরানীর কাজ পেলেন স্ট্যান্ডার্ড লাইফ ইনসিওরেন্স কম্পানিতে। কিন্তু স্বাধীন ব্যবসা করার আগ্রহে সে চাকরি তিনি ছেড়ে দিলেন।

স্বাধীন ব্যবসাতে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এরকম বহু বাঙালী ও অবাঙালীর জীবনের ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে জানা যায় যে, হালে পানি পাওয়ার আগে অনেকেই উঞ্ছবৃত্তির ওপর নির্ভর করে নানা কাজে হাত লাগিয়ে কাল কাটিয়েছেন—কেউ বেশি আর কেউ কম। স্ট্যান্ডার্ড ইনসিওরেন্সের চাকরি ছাড়ার পর থেকে বিশাখাপত্তনে এসে স্টিভেডোরিং ব্যবসাতে ভনুবাবুর স্থিতি লাভ করার মধ্যে সময়ের ব্যবধানটি ছিল দীর্ঘ। তিনি জন্মেছিলেন ১৮৮৫ সালে আর ভাইজাগে গেলেন ১৯৩৫-এ, পঞ্চাশ বছর বয়সে।

ইংরেজী শব্দ 'স্টিভেডোর'-এর ব্যুৎপত্তি স্প্যানিশ 'এস্তিভাদর' শব্দ থেকে। ইতিহাস পড়ে যতটা জেনেছি, ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে নিয়মিতভাবে এই স্টিভেডোরিং ব্যবসাটির প্রবর্তন হয়েছিল ইংল্যান্ডে। স্টিভেডোরদের কাজ হলো মালবাহী জাহাজ থেকে আমদানি করা পণ্য খালাস করা আর জাহাজে চালানীর পণ্য বোঝাই করা। এ কাজে বিশেষজ্ঞ হওয়া চাই, কিছু ট্রাক-ট্রেলার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি থাকা চাই এবং লোকবল ও ধনবল আবশ্যিক। বন্দর অধিকর্তার অনুমতিপত্র অর্থাৎ লাইসেন্স না পেলে কাজ করা বারণ, কিন্তু তার চেয়েও বড় হলো বিভিন্ন স্টীমার কম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা চাই। প্রত্যেক স্টিভেডোর কোনো না কোনো 'স্টীমশিপ লাইন'-এর নিযুক্ত প্রতিষ্ঠান। এই 'লাইন'-রা ভালো করে যাচাই না করে স্টিভেডোর নিয়োগ করেন না। বহু যুগের প্রথা অনুসারে কোনো দেশেরই চালানি বা আমদানির কাজ একেবারেই চলে না স্টিভেডোর ছাড়া। অবশ্য কমিউনিস্ট দেশরা এ বিষয়ে কোন পদ্ধতিতে কাজ করেন তা ঠিক জানি না।

স্টিভেডোরের দারুণ ঝুঁকির কাজ। দশ বিশ হাজার টন মাল নিয়ে বন্দরে জাহাজ ঢুকছে সঙ্গে সঙ্গে স্টিভেডোরকে কোমর বেঁধে তৈরী হতে হবে। দশ হাজার টন মানে প্রায় তিন লক্ষ মণ মাল সেই জাহাজ থেকে দু-এক দিনের মধ্যে নামিয়ে গন্তব্য স্থানে পাঠাতে হবে, বিশেষ করে বন্দরের লাগোয়া রেললাইনে মালগাড়িতে বোঝাই করে। লরিতেও কিছু কিছু পাঠানো হয়। সেই সময়টুকুর মধ্যে আবার আছে কার্গো-সার্ভেয়িং বা পণ্যসমীক্ষা—যে মাল এলো বা যাচ্ছে তার মান ও ওজন ঠিক আছে কিনা সেটা ঠিক করার জন্যে। সে দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে গ্রাহক খরিদ্দারের নিযুক্ত 'কার্গো-সার্ভেয়ারের' ওপরে। তাঁদের সঙ্গে স্টিভেডোর-এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা একান্ত প্রয়োজন। আর দরকার বন্দর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা। ধীরে সুস্থে মাল খালাস করলে চলবে না, কারণ বন্দরে 'বার্থিং' অর্থাৎ জাহাজ ভিড়িয়ে রাখার সময় সীমাবদ্ধ। নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ বার্থিং-এর জন্যে মোটা ভাড়া তো লাগেই, কোনো কারণে দেরী হয়ে গেলে আরও মোটা জরিমানা দিতে হয়। আর সেই জরিমানার চোট এসে পড়ে

স্টিভেডোরের ওপর। মাল বোঝাইয়ের ব্যাপারেও একই কথা। অবশ্য এই উৎকণ্ঠা, পরিশ্রম আর ঝুঁকির পারিশ্রমিকও প্রচুর।

এই ব্যবসার আনুষঙ্গিক আরও একটি কারবার সাধারণত স্টিভেডোররাই করে থাকেন। সেটা হলো শিপ-শ্যান্ডলার-এর কাজ। শিপ-শ্যান্ডলাররা নাবিকদের রসদ, মালমশলা, দড়িদড়া, শিকলি প্রভৃতি ছোট বড় যা কিছু জিনিস সাগরপাড়ি দিতে গেলে জাহাজের লাগে, সবই সরবরাহ করেন। তাতে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ কিছুই বাদ পড়ে না। এতেও মোটা লাভ।

রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জির বাণিজ্য সূচীতে স্টিভেডোরিং ও শিপ-শ্যান্ডলিং ছাড়া আরও যা যা আছে তার কথা পরে বলছি।

স্টিভেডোরিং-এর ব্যাকরণে কিছুটা জ্ঞান দিলাম, এবারে কাহিনীতে ফিরে যাবার আগে ভারতবর্ষের বন্দর, নৌবাণিজ্য এবং জাহাজ তৈরীর শোচনীয় ইতিহাসটাও আপনাদের ছোট করে বলে নিই।

বিশাল ভারতে এখন মাত্র আটটা প্রধান বন্দর আছে। পূর্ব উপকূলে চারটে—কলকাতা, পারাদীপ, বিশাখাপত্তন ও মান্দ্রাজ, এবং পশ্চিমে চারটে—কান্দলা, বোম্বাই, মর্মুগাঁও এবং কোচিন। এই আটটির মধ্যে বোম্বাই বৃহত্তম, কলকাতা দ্বিতীয় হয়েও তার প্রায় অর্ধেক, এবং পারাদীপ কনিষ্ঠতম। এই কনিষ্ঠতমটির কোথায় তাজা তারুণ্যের উজ্জ্বলতা হবে, না উল্টে সেটি হয়েছে এক রুগ্ন শিশু। সম্প্রতি দৈনিক কাগজে এর দুর্দশার কথা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। আটটি বন্দরে ১৯৬৬-৬৭ সালে আমদানি ও রপ্তানির মালের মোট ওজন ছিল ৫ কোটি ৩৬ লক্ষ টন, যার মধ্যে বিশাখাপত্তন আমদানিতে ২৩ লক্ষ আর চালানিতে ৩৮ লক্ষ টন মাল দেয়ানেয়া করে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিল। ওই এক বছরে মোট ৮৯০৪টি জাহাজ এই ৮টা বন্দরে যাতায়াত করেছিল।

ভারতে এ ছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে কোকোনদা (বর্তমান কাকিনাদা), পন্ডিচেরী, কানানোর প্রভৃতি কতকগুলি ছোট ছোট বন্দর আছে যেখানে জাহাজ তীরে না ভিড়ে কিছুদূরে নোঙর ফেলে বোট-লোডিং অর্থাৎ গাদাবোট, ল্যান্ডিং-ক্রাফট ইত্যাদির সাহায্যে মাল ওঠানো নামানো করে।

বিশাখাপত্তনের বিশেষত্ব হলো বন্দরের সংলগ্ন সরকারি প্রকল্প হিন্দুস্থান শিপ-ইয়ার্ড লিমিটেড—আদার ব্যাপারী ভারত সরকারের জাহাজ তৈরীর প্রয়াস। শুনেছি সেখানকার কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীরা কাজের লোক, কিন্তু তাঁদের কর্মক্ষমতা স্তম্ভিতপ্রায় হয়ে রয়েছে ফরেন এক্সচেঞ্জের অভাবে।

স্বাধীনতার ঊষাকাল ১৯৪৭ সালে আমাদের মাননীয় সরকার বাহাদুর এক কমিটি বসিয়েছিলেন। চেয়ারম্যান স্যার রামস্বামী মুদালিয়ারের নামে তার নাম রাখা হয়েছিল 'মুদালিয়ার কমিটি'। তাঁদের সুপারিশে সরকারী নীতি নির্ধারিত হয়েছিল যে, পাঁচ বছর অর্থাৎ ১৯৫২ সালের মধ্যে দেশের নৌবাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ পণ্য বহন করবে ভারতের বাণিজ্যিক নৌবহর। তখন প্রয়োজনীয় স্পেশাল স্টীল ও সাজসরঞ্জাম বিদেশ থেকে আমদানি করার মতো

যথেষ্ট বৈদেশিক ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সও ছিল। সুতরাং উদ্যম ও সাধুতা থাকলে সেই নীতির রূপায়ণ মোটেই অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রেও পর্বত মূষিক প্রসব করলেন। আমাদের বিশাল বিশাল ইস্পাত প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও আজ স্বাধীনতার একুশ বছর পরে হিন্দুস্থান শিপ-ইয়ার্ডে স্টীল শীটের প্রায় সবটাই এবং সাজসরঞ্জামের অনেকটা আমদানি করতে হচ্ছে; একটা জাহাজ তৈরী করতে যা লাগে তার শতকরা ৬০/৬২ ভাগই ইমপোর্ট করতে হচ্ছে। একুশ বছরে ভারতীয় জাহাজের মাল বহন ক্ষমতা এসে দাঁড়িয়েছে ১৫ পারসেণ্টে, অর্থাৎ উল্লিখিত ৫½ কোটি টন মালের মধ্যে ১৯৬৬-৬৭ সালে ভারতীয় জাহাজ বহন করেছে আন্দাজ ৮০ লক্ষ টন। কী পারফরম্যান্স!

কিন্তু বিশেষ করে আকরিক ধাতু রপ্তানির ব্যাপারে মালগাড়ি চলাচলের দিকটায় ওয়ালটেয়ারের রেলপথের উল্লেখ্য উন্নতির মাধ্যমে ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ড এবং দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে অভাবনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বছর আট দশ আগে যেখানে ওয়ালটেয়ার স্টেশন দিনে ২০০/২৫০ ওয়াগন সামাল দিতে পারতো, আজ সেখানে পারে ৭০০ আন্দাজ। এইসব ওয়াগন টানাটানির জন্যে আবার স্টীমের বদলে ডীজেল এঞ্জিনেরই বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই বিশাল ক্রমবর্ধমান ট্র্যাফিকের চাপ সইবার জন্যে নানা কায়দায় নতুন নতুন লাইন পাতা, সরঞ্জাম বাড়ানো, পুরনো স্টেশন ভেঙে সুন্দর করে গড়া—স্বীকার করতেই হয়, রেল-বোর্ডের এটা ভালো পারফরম্যান্স।

ইস্টার্ন রেলের ব্যাপারিক (কমার্শিয়াল) বিভাগের এক উচ্চপদস্থ বাঙালী অফিসার শ্রীকল্যাণকুমার দাস (ইনি আবার সরকারি কর্মচারী হয়েও অপূর্ব কর্মকুশলতায় দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ সদৃশ) মহাশয়ের সঙ্গে কিছুদিন আগে আলোচনা করেছিলাম। গতবারের রেল-বাজেটে বিরাট ঘাটতির প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী রেলওয়ের আয়োজন ও সম্প্রসারণ শত শত কোটি টাকা খরচ করে সূচী মাফিকই করা হয়েছিল কিন্তু মন্দার চোটে বছর দুই যথেষ্ট মাল রেলপথে চলাচল করলো না—যত লোহা, যত কয়লা আর সিমেণ্ট ইত্যাদি যতটা রেলে আনাগোনার কথা ছিল তার ভগ্নাংশ মাত্র বহন করার ফলে মাশুলের খাতে প্রচণ্ড মার খেলো ভারতীয় রেলপথ। মানে, দু' হাজার যাত্রীবাহী লাক্সারি-লাইনার 'কুইন এলিজাবেথ' জাহাজ যেন দু'শ যাত্রী নিয়ে সাগর পাড়ি দিল।

কিন্তু এ বছরে পরিস্থিতি অন্যরকম। চালানির কাজ অনেক বেড়েছে; আর বোধ হয় ঘাটতি হবে না।

এভাবে কাজ না করলে, মুদালিয়ার কমিটি দর্শিত পথে চললে আজ বিশাখাপত্তনে বছরে আড়াইটে ১২,৫০০ টনি জাহাজের জায়গায় ৮/১০টা করে জাহাজ তৈরী করা দুঃসাধ্য হতো না; অন্যান্য শিপ-ইয়ার্ড এবং আমাদের কলকাতার 'গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপ'-এও (এখন এটাও সরকারী সম্পত্তি) সমুদ্রগামী অনেক ছোট ও বড় জাহাজ তৈরী হতে পারতো। আর তাহলে এখন যেটা বিদেশী জাহাজ কম্পানিকে আমরা ভাড়া দিই সেই বাৎসরিক ২০০ কোটি টাকার ফরেন এক্সচেঞ্জের অনেকটাই বাঁচানো যেতো।

শুধু বিশাখাপত্তনের কথাই ধরি। কী না হতে পারতো পাহাড় ঘেরা নৈসর্গিক শোভায় সমৃদ্ধ এই বন্দরের শিপ-ইয়ার্ডে আর তার অনতিদূরে অবস্থিত পরিত্যক্তপ্রায় বিমলিপত্তনম্ বন্দরে!

স্থানমাহাত্ম্য বলে যদি কিছু থাকে তো বিশাখাপত্তনের পবিত্র বেলাভূমিতে আরব্ধ কোনো শুভ কাজে সফল হওয়া উচিত ছিল বই কি! পুরাকালে অন্ধ্রদেশের এক ধর্মপ্রবণ রাজা বারাণসীতে তীর্থযাত্রার সময়ে এই স্থানের সৌন্দর্য ও পবিত্রতায় মুগ্ধ হয়ে* বিশাখদেবের এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। বহুকাল আগে সমুদ্র এগিয়ে এসে মন্দিরকে গ্রাস করে নেওয়া সত্ত্বেও নাকি বিশাখাপত্তনের পবিত্রতা আগের মতোই আছে।

কেবল প্রাকৃতিক শোভাই বিশাখাপত্তন তথা অন্ধ্রের বৈশিষ্ট্য নয়—অন্ধ্রের নরনারীর অঙ্গ-সৌষ্ঠবও মনোহর। বিশেষ করে কামিনীকুল—কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশার মতো কৃষ্ণ-কুন্তলা মেয়েরা—না থাক তাঁদের মুখে শ্রাবস্তির কারুকার্য, তুঙ্গভদ্রা-গোদাবরীতটের পীনবক্ষ ক্ষীণকটি ঘননিতম্ববতী সুদেহী কন্যাদের বিশাখাপত্তনের উচ্চাবচ সরণিতে স্বভাবসুন্দর চরণক্ষেপ এ স্থানকে করে তুলেছে পরমরমণীয়।

জার্মান হানসা লাইনের এজেণ্ট, পরবর্তীকালে ইণ্ডিয়া স্টীমশিপ কম্পানির প্রতিষ্ঠাতা, খোদ লায়োনেল এডওয়ার্ডস সাহেব বললেন, "ভনু. আই ওয়াণ্ট ইউ টু প্রোসীড টু ভাইজাগ বাই দি নেক্সট অ্যাভেলেবল ট্রেন। ওখানে আমাদের লাইনের একটা মাল-জাহাজ ভিড়বে পরশু-তরশুর মধ্যেই। সেটা আন্‌লোড করার দায়িত্ব 'রয় অ্যাণ্ড চ্যাটার্জির' অ্যাকাউণ্টে তোমাকেই দিলাম।"

স্ট্যাণ্ডার্ড লাইফের চাকরি ছাড়ার পর ভনুবাবু নানা কাজের মধ্যে 'ইউনিভার্সাল লাইব্রেরী' নামে একটা বইয়ের দোকানও দিয়েছিলেন কলেজ স্ট্রীটের বই পাড়ায়। কিন্তু তাতে সুবিধে হলো না। তখন তাঁকে অন্য জীবিকার সন্ধানে বেরোতে হলো।

লায়োনেল এডওয়ার্ডস কম্পানির আংশিক কাজ দুটি স্টিভেডোর প্রতিষ্ঠান নির্বাহ করতেন—হুগলি-ভাণ্ডারহাটির ধনী (রায়)চৌধুরী পরিবারের স্বর্গীয় অতুল্যচন্দ্র (রোয়)চৌধুরীর এ সি রায় অ্যাণ্ড কোং এবং শরৎ চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড কোং। লায়োনেল সাহেবের নির্দেশে এঁদের একটি যুক্ত প্রতিষ্ঠান গঠিত হলো রায় অ্যাণ্ড চ্যাটার্জি নাম দিয়ে। এ সি রায় অ্যাণ্ড কোং এবং শরৎ চ্যাটার্জি কম্পানি অবশ্য তা সত্ত্বেও তাঁদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে এসেছেন এবং তাঁরা এখনও ভারতের নানা বন্দরে বড় ব্যবসা করছেন। কিন্তু লায়োনেল এডওয়ার্ডস-এর ক্ষেত্রে 'রায় অ্যাণ্ড চ্যাটার্জি'ই একমাত্র স্টিভেডোর হলেন।

ত্রিশ দশকের গোড়ায় ভনুবাবু রায় অ্যাণ্ড চ্যাটার্জির কর্মচারী হিসেবে যোগ দিলেন এবং কর্মপটুতার জন্য কিছুদিনের মধ্যেই ব্যক্তিগতভাবে লায়োনেল সাহেবের নজরে পড়লেন।

* একদা ইন্দ্র ও স্কন্দের মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ হয়। তখন ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে স্কন্দের দক্ষিণ অঙ্গ থেকে এক সুন্দর যুবকের আবির্ভাব হয়। কার্তিক ঠাকুরের বাইপ্রোডাক্ট এই দেবতাটির নাম রাখা হয় বিশাখ। তাহলে এই স্থানের নাম হওয়া উচিত ছিল 'আকার'-বর্জিত বিশাখপত্তন। বোধ হয় 'আকার'-প্রিয় অন্ধ্রবাসীরা বিশাখ-কে 'বিশাখা' রূপ দিয়েছেন, উত্তর ভারতে যেমন দিল্লীওয়ালারা অশোক হোটেলকে অশোকা হোটেল বলেন।

লায়োনেল সাহেব প্রায় একবস্ত্রে ভনুবাবুকে ভাইজাগ রওনা করিয়ে দিলেন। ভালোই হলো। ভনুবাবুর কাছে তখন জনাকীর্ণ কলকাতা শহর মরুভূমির মতো হয়ে গিয়েছিল। দুই ছেলে আর চার মেয়ে রেখে ভনুবাবুর স্ত্রী ক'দিন আগেই চোখ বুজেছিলেন। বুড়ি মা আর ছোট দুই ভাই যতিনাথ ও ডাক্তার সতীনাথের (পরেশবাবুর বাবা) কাছে পাঁচ বছর বয়সী দুলাল আর তার ভাইবোনদের রেখে ভনুবাবু যেন দৌড়ে ভাইজাগ পালিয়ে গেলেন।

তাঁর সংগে এক সহকর্মীও গিয়েছিলেন। তাঁরা পেঁাছে দেখেন জাহাজটা বন্দরে ঢুকছে। আজকের ছিমছাম বিশাখাপত্তনমের মতো তখন ভাইজাগ বন্দরে কোনো সুবন্দোবস্ত ছিল না--না ছিল যথেষ্ট 'ক্রেন, না-এটা না-সেটা, আর দক্ষ মজুরের অভাব তো ছিলই। ভনুবাবুরা এক বুদ্ধির কাজ করেছিলেন ওস্তাদ কুলিসর্দার সাতিয়া নামে এক যুবককে কাজে বহাল করে। সাতিয়া চটপট লোকজনের ব্যবস্থা করে ফেললো।

কিন্তু তখন ভাইজাগে পুরনো এক স্টিভেডোর স্টিভেডোরগোষ্ঠীর প্রায় একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। ভনুবাবুদের ভাইজাগে এসে কাজ শুরু করার খবর পেয়ে তিনি মহা খাপ্পা। তাঁর মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে এসেছে এরা! তিনি জবর জবর চাল চালতে লাগলেন। একটা পুরো দিন সাতিয়ার লোকদের মদ খাইয়ে বুঁদ করে ফেলে রাখলেন নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে। এমন কি, ভনুবাবুদের প্রাণের ভয় দেখালেন। কিন্তু কিছুতেই ভনুবাবুকে টলাতে পারলেন না। জাহাজের মাল খালাস হলো। সে দিনগুলি ভনুবাবুদের কাছে ছিল বিভীষিকার মতো—স্নান নেই, খাওয়া নেই, উপরন্তু কেবল মারের ভয় নয়, একেবারে মৃত্যুভয়।

সেই হলো ভনুবাবু অর্থাৎ সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের সার্থক জীবনের সূচনা।

১৯৪৮ পর্যন্ত অতুল্য রায় ও চ্যাটার্জিরা এক সংগে কাজ করার পর তাঁদের পার্টনারশিপে ছেদ পড়লো। চট্টোপাধ্যায়রা আলাদা হয়ে যেতে চাইলেন। তখন অতুল্য রায় মশায়ের বড় ছেলে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ (রায) চৌধুরী চ্যাটার্জিদের অংশটি তো কিনে নিলেনই, সংগে সংগে প্রতিষ্ঠানকে প্রাইভেট লিমিটেড কম্পানিতে পরিণত করলেন। অধিকন্তু তাঁরা ভাইজাগের ম্যানেজার ভনুবাবুর বিশ্বস্ততার পুরস্কার দিলেন কম্পানির কিছু শেয়ার দিয়ে।

অমরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর দুই ভাই শ্রী বি এন এবং শ্রী এফ এন চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন এখন রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জির বড় শরিক। দুলালবাবুরা ছোট তরফ।

আটচল্লিশ সালে রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জির কাজে ভাটা পড়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে চ্যাটার্জিরা আলাদা হয়ে যাবার পরে। ভনুবাবু অক্লান্ত পরিশ্রমে তাতে নতুন করে যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। এই কাজে ভনুবাবুকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর বন্ধুপুত্র শ্রীদয়ানন্দ (বাদল) বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন তিনি রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জি, ভাইজাগ শাখার অন্যতম কার্যাধ্যক্ষ। বাণিজ্যের পরিবেশও বেশ অনুকূল হয়ে উঠছিল। বিশাখাপত্তন বন্দরের উন্নতি হচ্ছিল আর ফরেন এক্সচেঞ্জের শ্রাদ্ধ করে সরকার তখন রকমারি প্রকল্পের জন্যে লাখ লাখ টন মাল আনাচ্ছিলেন। সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কম্পানির প্রাণপুরুষ স্বর্গীয় বালচাঁদ হীরাচাঁদ প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিমিটেড'-ও ভারত সরকার কিনে নিলেন, আর ভারতীয় নৌবহরের বড় ঘাঁটিও

বিশাখাপত্তনেই স্থাপিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে ভনুবাবুর দক্ষ পরিচালনায় রায় অ্যাণ্ড চ্যাটার্জি'রও শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগলো।

বড় ছেলে কমলবাবু কলকাতার স্কুল কলেজ পড়ে বি. এস-সি পাস করার পর যাদবপুর থেকে মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং পাস করলেন। বাবাকে তিনি আগেই বলে রেখেছিলেন যে, তিনি এঞ্জিনীয়ারের পেশাই নেবেন, ব্যবসাতে ঢুকবেন না। তিনি বিলেতের শেফিল্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে মাস্টার অব এঞ্জিনীয়ারিং পাস করে দেশে ফিরে হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ডে জাহাজ তৈরীর কাজে লাগলেন। তা ছাড়া তিনি লণ্ডন 'ইনস্টিটিউট অব মেরিন এঞ্জিনীয়ারিং'-এর মেম্বার এবং এখন সেই সংস্থার ভাইজাগ শাখার সেক্রেটারি।

ওদিকে দুলালবাবু কলকাতা থেকে বি-কম পাস করে ভাইজাগে এসে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পাস করলেন। কমলবাবু তখন বিলেতে পড়তে যাবার তোড়জোড় করছেন। ভনুবাবু ঠিক করলেন কমলকে তো নিশ্চয়ই, দুলালকেও বিয়ে দিয়ে দেবেন। বিয়ের পরে কমল বিলেত চলে গেলেন।

দুলালজায়া মীনা আমাকে বললেন, "বিয়ের পরে দেখি আমার কর্তা বাবার সঙ্গে অফিসে বেরোন না। জিগ্যেস করলে বলেন, কলকাতা ছেড়ে এই নিজঝুম টাউনে কে থাকবে!" আঠারো বছর বয়স হলে কী হবে, দারুণ বুদ্ধি ছোট বউয়ের। বড়-জা মঞ্জু কলকাতায় বাপের বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ছেন। তাঁকে দিয়ে বলালে ভালো হতো, তা তিনি যখন নেই তখন লজ্জার মাথা খেয়ে মীনা নিজেই শ্বশুরকে গিয়ে বললেন, "বাবা, আপনার ছেলে কেবল বলেন আপনার ব্যবসায় ঢুকবেন না, কলকাতায় গিয়ে প্র্যাকটিস করবেন, কী হবে বলুন তো?"

শ্বশুর পুত্রবধুতে কী যেন একটা চক্রান্ত হলো। ফলে দুলালবাবুর বাণিজ্যবিমুখ মন হঠাৎ যেন বদলে গেল। বুদ্ধিমান ছেলে কিছুদিনের মধ্যেই স্টিভেডোরিং শিপ-হ্যাণ্ডলিং সব ব্যবসাই শিখে ফেললেন। ভনুবাবু ইহলোক ত্যাগ করলেন ১৯৫৮ সালে। রায় অ্যাণ্ড চ্যাটার্জি'র বড় শরিক রায়চৌধুরীরা থাকেন কলকাতায়। তাই ভাইজাগের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়লো সাতাশ বছরের ছেলে দুলাল আর বাদলবাবুর ওপরে। রায়চৌধুরীদের আস্থার মর্যাদা পূর্ণমাত্রায় বজায় রইল।

সাধে কি আমি আমার প্রবন্ধে শিল্প ও বাণিজ্যের রথী মহারথীদের উদ্যম ও মনো-বলের উৎস খুঁজতে গিয়ে তাঁদের অন্দর মহলের সমাচারও যোগাড় করি! নেপথ্যে মীনার হস্তক্ষেপ আর প্রেরণা না থাকলে কি দুলাল এই দশ বছরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানকে এতটা এগিয়ে দিতে পারতেন?

রায় অ্যাণ্ড চ্যাটার্জি'র বর্তমান কার্যক্রমের যে বিবরণ পেলাম ও কিছুটা নিজের চোখে দেখলাম তার সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করছি।

সরকারী সংস্থা এম. এম. টি. সি, (মিনারেলস অ্যাণ্ড মেটালস ট্রেডিং করপোরেশন) এবং গম, চাল ইত্যাদি আমদানির ব্যাপারে খাদ্যমন্ত্রকের কাজ ধরে 'রায় অ্যাণ্ড চ্যাটার্জি' এখন (ইণ্ডিয়া স্টীমশিপ কম্পানি সহ) ১৫টি বড় বড় এক্সপোর্টার, ইম্পোর্টার ও জাহাজ কম্পানির

স্টিভেডোর। রকমারি ধাতু, বিশেষ করে আকরিক লোহা ও ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানিতে 'হ্যান্ডলিং এজেন্ট' হয়েছেন এম. এম. টি. সি, এবং আরও ৪টি প্রতিষ্ঠানের। ধাতু ছাড়া অন্যান্য পণ্যের হ্যান্ডলিং এজেন্ট হয়েছেন ৭টি কম্পানির।

কিন্তু রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জি'র সবচেয়ে বেশি মর্যাদা বেড়েছে বিদেশী ও দেশী স্টীমশিপ কম্পানির 'এজেন্ট' পদাভিষিক্ত হয়ে। এ'রা 'ইস্ট এশিয়াটিক', 'সুইডিশ ইস্ট এশিয়া' এবং 'উইলহেলমসন' লাইনের বুকিং এজেন্ট। সাব-এজেন্টও হয়েছেন 'ইউনাইটেড লাইনার এজেন্সিজ অব ইণ্ডিয়া', 'ডি এস আর' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের।

কোকোনদার (অধুনা কাকিনাদার) অপেক্ষাকৃত ছোট বন্দরেও রায় অ্যান্ড চ্যাটার্জি অফিস খুলেছেন, আর বিমলিপত্তনমেও কাজ করেন। বছরে ৭০/৭৫টা জাহাজে মাল দেয়া-নেয়া করেন প্রায় ৫ লক্ষ টন।

দুলালবাবু আমাকে তাঁর পার্টি'র চালানি ম্যাঙ্গানীজ বোঝাই পর্ব দেখাতে একটি জাহাজে নিয়ে গেলেন। 'গ্রীক লাইন'-এর 'অ্যারিস্‌টাইঅস্‌' জাহাজের ক্যাপ্টেন কারাৎসকাকে বিদেশীয় তুলনায় এদেশের এবং এই বন্দরের স্টিভেডোরদের কর্মতৎপরতার কথা জিগ্যেস করলাম। তিনি তাঁর ভাঙা ইংরেজীতে বললেন, "মিঃ ব্যানার্জি ভেরী স্মার্ট; শিপ অলওয়েজ লোডেড ইন টাইম।" কারাৎসকা উলটে আমাকে একটা প্রশ্ন করলেন। বেয়াড়া প্রশ্ন—"হোয়াই ইজ সো মাচ ডিফারেন্স ইন ইওর কাণ্ট্রি বিট্‌ইন রিচ অ্যান্ড পুওর?' বিদেশীর কাছে নিজের দেশের কুৎসা গাইতে পারলাম না। মোরারজীভাইয়ের মতো আমিও বললাম, উন্নতিশীল দেশে এমনটি হয়েই থাকে; বছর দশেক পরে এলে দেখতে পাবেন আমরা সবাই রাজা। (মোরারজীভাই বেঁচে থাকলে তদ্দিনে আমরা একেবারে 'বাদশা-বেগম ঝম্‌ঝমাঝম্‌ বাজিয়ে চলেছি')।

ভনুবাবুর একটি অতৃপ্ত বাসনা দুলালবাবু এতদিনে পূর্ণ করেছেন। সেটা হলো বিশাখাপত্তনে রায় অ্যান্ড চ্যাট্যার্জি'র একটি বাড়ি তৈরি করানো। শহরের কেন্দ্রে স্টেট ব্যাংকের অফিসের মুখোমুখি সুদৃশ্য তেতলা বাড়িটা দুলালবাবুর কীর্তিসৌধ। ভাইজাগের জনকল্যাণেও কমলবাবু ও দুলালবাবুর অবদানের কিছু কিছু নিদর্শন চোখে পড়লো। কিন্তু তার লিস্ট দিতে গেলে লেখাটা আরও লম্বা হয়ে যাবে।

মোট কথা, এ'রা হলেন বাঙালীর খেইহারা জীবনতরীর পক্ষে তিমির রাতে বাতিঘরের দীপ—'ডলফিনস্‌ নোজ' লাইটহাউসের চল্লিশ মাইল রেঞ্জের আলোর ঝলকের মতো।

১২ অক্টোবর, ১৯৬৮



একত্রিশ

দিলীপ চন্দ্র ঠিক কথাই বলেছিলেন। বাড়ি ফিরে এসে বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত খুলে পেলাম : মহাপ্রভু ঘোষণা করলেন এবার তিনি যাবেন শ্রীক্ষেত্রে। কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে তিনি হাঁটতে হাঁটতে ছত্রভোগে এসে পেঁছিলেন। চব্বিশ পরগনার জয়নগর-মজিলপুরের তেইশ ক্রোশ দক্ষিণের এই গ্রামটির অন্য নাম 'খাড়ি'। মহাপ্রভুর পুরী যাত্রার সময়ে ছত্রভোগ গ্রাম গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। (এখন গঙ্গা নদী সেখান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে)। শতমুখী গঙ্গা দেখে শ্রীগৌরাঙ্গ আনন্দে আত্মহারা হলেন। ...ছত্রভোগের রামচন্দ্র খাঁয়ের বাড়িতে চৈতন্যদেব সশিষ্য আতিথ্য গ্রহণ করার পর নৌকাযোগে পুরীর পথে ওড়িশার যাজপুর অভিমুখে যাত্রা করলেন।

লোকে বলে যে, ছত্রভোগ থেকে শতমুখী গঙ্গা পার হবার সময়ে মহাপ্রভু আজকের গেঁওখালি এবং তার অপর পারে হলদিয়ায় পদধূলি দিয়ে গিয়েছিলেন। তার পরে পাঁশকুড়া কোলাঘাট হয়ে তিনি জলপথেই ওড়িশার যাজপুরে পেঁছেছিলেন।

ধাতব দ্রব্য বিষয়ে স্টেট ট্রেডিং করপোরেশনের উত্তরসাধক ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত আধা-সরকারি মিনারাল্যালস অ্যান্ড মেটালস ট্রেডিং করপোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর (এক কথায় এম এম টি সি-র) অধ্যক্ষ মেজর দিলীপকুমার চন্দ্র বললেন যে, যাজপুর থেকে কটক ভুবনেশ্বর হয়ে যে হাঁটা-পথে চৈতন্যদেব পুরী গিয়েছিলেন ইতিপূর্বে তার নাম ছিল রাণী অহল্যাবাঈ রোড। ইন্দোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যাবাঈ তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্যে গত শতকে সেই পথটি তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। এখন সে নাম মুছে ফেলে নয়া সড়কের নাম রাখা হয়েছে পাঁচ নম্বর ন্যাশন্যাল হাইওয়ে। সে পথ গেছে মাদ্রাজ পর্যন্ত।

হলদিয়া বন্দরের প্রসঙ্গ থেকেই এই সব কথা উঠেছিল, আর হলদিয়ার বিষয় উত্থাপিত হয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে লোহা ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি বিভিন্ন আকরিক ধাতুর এবং কয়লার রপ্তানির কথায়।

এম এম টি সি-র ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেসের অফিসে এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলাম আমরা

চারজন। রিজিওন্যাল ম্যানেজার মেজর চন্দ্র, তাঁর সহকারী শ্রীভুজঙ্গভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি এবং আজ আমি যে প্রতিষ্ঠানের কথা লিখতে বসেছি সেই মিত্র এস-কে প্রাইভেট লিমিটেডের অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীঅভয়কৃষ্ণ মিত্র।

আলোচনা মানে আমার প্রশ্ন এবং অন্য তিনজনের উত্তর :

বাংলার বর্ধমান, মানভূম ও রাঢ় অঞ্চলের অংশ, বিহারের ছোটনাগপুর, সিংভূম, ধলভূম এবং ওড়িশার কেওনঝড় সুন্দরগড় প্রভৃতি হলো পৃথিবীর আরম্ভযুগের স্থলভাগের অংশ। ভূতাত্ত্বিকরা বলেন যে, এর জন্ম হিমালয়েরও আগে। সে সময়ে আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের স্থলাংশের যোগ ছিল। কোন্ সুদূর অতীতের বিরাট আলোড়নে পৃথিবীর চেহারা বদলালো, আর্যাবর্তের অনেকটা জলের তলা থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো হিমালয়ের সঙ্গে সঙ্গে, আর দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে আফ্রিকার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মহাসাগরের প্লাবনে।

মোট কথা, স্থলভাগ হিসেবে বাংলা বিহার ওড়িশার উল্লিখিত অঞ্চলের কাছে আমাদের হিমগিরি শিশুর শামিল। আর পুরনো প্রাচীন ধরণীর এই ক্ষুদ্র ভাগ তার গর্ভে বহন করছে মহামূল্য সব খনিজ পদার্থ।

উপর্যুক্ত অঞ্চল এবং আসাম, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত দেশকে ইংরেজীতে এক কথায় বলা চলে কলকাতার হিন্টারল্যান্ড। তার মানে, ওই সমস্ত অঞ্চলের শিল্প ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি এবং আমদানি কলকাতা বন্দরের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। নেপালকেও কলকাতার ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়।

অথচ এই কলকাতা বন্দরের অবস্থাই আজ সঙ্গীন। খবরের কাগজে এ বিষয়ে নিয়মিত লেখালিখি হচ্ছে; নতুন কিছু নয়। তবুও আমি আবার এক বাণ্ডিল কথা বলবো। কারণ, বিষয়টার গুরুত্ব এত বেশী যে সকলের সর্বদা সজাগ থাকার জন্যে বার বার তার আলোচনা দরকার।

এম এম টি সি-র কলকাতার কর্তা শ্রীদিলীপকুমার চন্দ্রকে আমার একটু অসাধারণই মনে হলো। তিরিশ থেকে পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি অবধি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মি ও খাঁটি ইণ্ডিয়ান আর্মিতে একটানা কাজ করে এবং বহুবার দেশের বাইরে কাটিয়েও বাংলা দেশের ইতিহাস ও ভূগোলে এতটা ব্যুৎপত্তি কোনো সাধারণ মেজর-সাহেবের পক্ষে বিরল।

আর একটা ব্যাপারে আমার বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক হলো। আধা-সরকারি এই বিরাট সংস্থা, বছরে যার বেচাকেনা ৯০/৯৫ কোটি টাকার, তার আঞ্চলিক প্রধান দুজনই হলেন বাঙালী। মেজর চন্দ্রের সহকারী রিজিওন্যাল ম্যানেজার হলেন শ্রীভুজঙ্গভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা দুজনেই খাস কলকাতার লোক—চন্দ্র মশায় গড়পারের আর বাঁড়ুজ্যে মশায় ভবানীপুরের লোক। আরও আনন্দিত হলাম যখন দেখলাম যে এঁরা নিজেদের মধ্যে বাঙলায় বাক্যালাপ করেন এবং অতিথি আপ্যায়ন করেন চা সিগারেটের সঙ্গে এলাচ সুপারি এগিয়ে দিয়ে।

মিত্র এস-কে প্রাইভেট লিমিটেড আকরিক ও সাধারণ ধাতুর সার্ভেয়ার হিসেবে ভারত-বিখ্যাত। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত ছাড়াও পশ্চিম ভারতের বন্দরে বন্দরেও তাঁরা কাজ করেন। তার চেয়েও বড় কথা হলো যে ১৯৬৫ সালে তাঁরা জাপানেও অফিস খুলেছেন।

অভয়বাবুর মতে মিত্র এস-কে প্রতিষ্ঠানই হলো প্রথম বাঙালী গোষ্ঠী যাঁরা সাগরপারে

শাখা অফিস খুলেছেন। 'সুপারিণ্টেণ্ডেন্স কম্পানি অব ইণ্ডিয়া প্রাঃ লিমিটেড' নামে আর একটি বাঙালী কার্গো সার্ভেয়ার সংস্থাও তারপরে সাতষট্টি সালে ব্যাঙ্কক-এ ব্রাঞ্চ খুলেছেন বলে শুনলাম। মিত্র এস-কেই প্রথম বিদেশে ব্রাঞ্চ খুলেছেন কি না সে বিষয়ে আমি জোর করে কিছু বলতে চাই না; কারণ ইতিমধ্যে কোন্ প্রচারবিমুখ বাঙালী কবে কোথায় সে কার্যটি করে বসে আছেন তা বলা শক্ত। গত বছরের আরম্ভে আমি যখন লেখা শুরু করি তখন ভেবেছিলাম, ক'টা প্রবন্ধই বা লিখবো! মাস ছয়েক টেনে নিয়ে যেতে পারলেই বাঙালীর শিল্পবাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু আজ উনসত্তরের আরম্ভে সানন্দে ঘোষণা করতে পারছি যে, তা নয়—ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙালীর কৃতিত্ব বিষয়ে এখনও অন্তত বছর তিনেক ধরে লেখা চলবে। কোথায় কে বা কাহারা প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন কে জানে! তাঁরা নিজেদের জাহির করতে চান না বা জানেন না, আর বাঙালীর এমন কোনো সঙ্ঘ বা সমিতিও নেই যে সেই সব আত্মগোপনকারীদের খুঁজে বের করেন।

গত বছরে আমার মনে যে নিরাশা ছিল আজ সেটা কেটে যাচ্ছে। আজ সাহস করে এ কথাও ভাবতে পারছি যে নিকট ভবিষ্যতে এমনও দেখে যেতে পারবো যে, 'মেড ইন বেঙ্গল বাই বেঙ্গলী টেকনিশিয়ানস্' পণ্যের তেমনি আদর হয়েছে সর্বত্র, যেমন এখন আছে সারাভাইয়ের ক্যালিকো কাপড়ের, বিড়লার গোয়ালিয়র রেয়নের অথবা বাটার জুতোর।

এই তো দেখা যাচ্ছে যে, মিত্র এস-কে'র মতো বাঙালী সংস্থার ক্লায়েণ্টেলে এক-আধ জন ছাড়া বাঙালী বলতে প্রায় কোনো খনি মালিকই নেই। সরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জাপানী-জার্মানদের কাছেও তাঁদের প্রচুর সম্মান। বাঙালীর পক্ষে এটা কত বড় গৌরবের কথা।

জাপানের কথা বলছিলাম। মিত্র এস-কে'র টোকিও, ওসাকা এবং অন্যান্য অফিসের ভার নিয়ে আছেন বিকাশ বিশ্বাস, অশোক সেনগুপ্ত, প্রশান্ত সরকার ও কুণাল চক্রবর্তী। (জাপানে মিত্র এস-কে'র ক্রমবর্ধমান কাজের চাপ সামলাতে ১৯৬৯-এর জুন মাসে রমারঞ্জন চৌধুরী নামে আরও একজন এখান থেকে গেছেন)।

বিকাশবাবুর সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় থাকার কথা সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকাতে তাঁর লেখা সুন্দর সুন্দর 'টোকিওর চিঠির' মাধ্যমে।

এম এম টি সি-র অফিসে বসে কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের বিষয়ে আলোচনার প্রসঙ্গটা এদিকে চাপা পড়ে যাচ্ছে। সেটা বলে নিই।

আয়রণ-ওর, মানে আকরিক লোহার কথাটাই ধরা যাক। ৫৭-৫৮ সাল থেকে দশ বছরে আয়রণ ওরের রপ্তানি ৪৪ লক্ষ টন থেকে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে এম এম টি সি ১৯৬৭-৬৮তে রপ্তানি করেছেন ৮৫ লক্ষ টন। বাকীটা হয়েছে গোয়া থেকে: সেখানকার রপ্তানি বাণিজ্য এখনও ব্যবসায়ীদের হাতেই আছে, কারণ গোয়া ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবার সময়ে শর্ত ছিল যে ভারত সরকার গোয়ার স্বাধীন ব্যবসায়ীদের অথবা খনি মালিকদের বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করবেন না। নিম্নমানের হলেও গোয়ার খনিজ সম্পদ অগাধ।

কিন্তু বাকী ভারতবর্ষের ৮৫ লক্ষ টনের মধ্যে কলকাতা বন্দর থেকে রপ্তানি হয়েছে বছরে মাত্র ৪ থেকে ৮ লক্ষ টন। তার কারণ একাধিক।

আট দশ হাজার টনের ছোট ছোট মালবাহী জাহাজে করে এই সব ভারী ভারী ধাতু নেওয়া আজকের দিনে কোনো বিদেশী ক্রেতাই (বিশেষ করে আমাদের প্রধান গ্রাহক জাপান) একেবারেই পছন্দ করেন না। অনেক অসুবিধার মধ্যে প্রথম হলো ছোট চালানের ব্যয়বহুলতা। জাপান এখন স্বদেশে প্রস্তুত লক্ষ টনের ওর-ক্যারিয়ার-ও সমুদ্রে ভাসিয়েছেন, যেমন ছেড়েছেন লাখ দুই টন তৈলবাহী ট্যাঙ্কার। কলকাতার কথা বাদই দিলাম, ভারতবর্ষের কোনো বন্দরই এখনও ৪০,০০০ টনের চেয়ে বড় জাহাজে মাল বোঝাই করতে অসমর্থ। তার দুটো কারণ। প্রথমটি হলো, তীরের কাছে সমুদ্রের জলের গভীরতা (ড্রাফ্‌ট) কম—মাত্র ৩৪।৩৫ ফুট, যার জন্যে বড় ভারী জাহাজ সেখানে লাগানো যায় না। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে জাহাজ ভেড়ানোর বার্থগুলির অপ্রশস্ততা। কলকাতার বন্দর তার ধার কাছ দিয়েও যায় না। এখানকার ড্রাফট বর্ষাকালেও ২৬।২৭ ফুটের বেশী থাকে না, আর গঙ্গানদীর এখানে-ওখানে বালির চড়া এবং ঘন ঘন বান ডাকার প্রকোপে এখানে ১৫।২০ হাজার টনের মাঝারি জাহাজও পৌঁছতে পারে না। যে ছোটখাটো জাহাজ এই সব বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে কলকাতায় পৌঁছয় তারাও পোতাশ্রয়ে আশ্রয় খুঁজে বেড়ায় বেশ কয়েক দিন। মন্থরগতিতে বোঝাই এবং বন্দরের নানা অব্যবস্থার জন্যেই সেটা হয়। বজবজ খিদিরপুরের গঙ্গায় জাহাজগুলি বেকার দাঁড়িয়ে থেকে দৈনিক হাজার হাজার টাকার লোকসান গোণে আর পোতাধিকর্তারা ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে হিমসিম খান।

এখানে যন্ত্রের সাহায্যে মাল বোঝাই প্রায় হয়ই না—সেটা হয় শ্রমিকের মাথায় চাপানো ঝুড়ি বা ঠেলাগাড়ি দিয়ে। সারা দিনে মাল বোঝাই হয় গড়ে ১০০০ টন। কেবল ৫নং কিং জর্জ ডক্‌সে একটু বেশী হয়—গড়ে হাজার তিনেক টন সারা দিনে। কলকাতা বন্দরের পোর্ট-চার্জ আবার ভারতের সব বন্দরের চেয়ে বেশী।

উন্নত দেশের কথা বেশী না-ই বললাম, আমাদের বিশাখাপত্তন, গোয়া প্রভৃতি বন্দরেও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বোঝাই হয়। বিশাখাপত্তনে বর্তমানে ঘণ্টায় ২৩।২৪০০ টন ধাতু বোঝাইয়ের ব্যবস্থা আছে। তা হয় কিনা জানি না।

আর ব্যবস্থা আছে পারাদীপে। পারাদীপ বন্দরে সাধারণ পণ্য অর্থাৎ জেনারাল কার্গো বোঝাই হয় না, কেবল এম এম টি সি-র ধাতব দ্রব্যের রপ্তানির জন্যেই এই নতুন বন্দরটি ব্যবহৃত হয় বলে শুনলাম। এটা বললেন অভয়বাবু। তিনি আরও বললেন যে, প্রাথমিক পর্যায়ে পারাদীপের উন্নতির জন্যে আমাদের দিলীপ চন্দ্র মশায়ের প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসার্হ। তিনিই নতুন বন্দরটিকে চালু করে দিয়েছিলেন। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও পারাদীপ এগিয়ে চলেছে। যান্ত্রিক বোঝাইয়ের ব্যাপারে এই বন্দর প্রায় প্রথম সারিতে পৌঁছেছে এবং সে বিষয়ে এম এম টি সি-র বর্তমান স্থানীয় অধিকর্তা শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কৃতিত্বও অনেকখানি।

ওদিকে অস্ট্রেলিয়ার বন্দরে মাল বোঝাই হয় ঘণ্টায় ৪০০০ টন, আর আমাদের মতোই উন্নতিশীল দেশ ব্রেজিলের টুবারো বন্দরে হয় ঘণ্টায় ৬০০০ টন।

নাবিকরা সাগর পাড়ি দিয়ে পোতাশ্রয়ে এসে ঘুমোয় আর আরাম করে—কিন্তু দুষ্ট লোকেরা বলে যে আমাদের অধিকর্তারা পোতাশ্রয়ে বসে বসেই ঘুমোন; মাঝে মাঝে চটকা ভেঙে

কাজ করতে উঠে হিমসিম খান। কিন্তু কেবল তাঁরা জেগে উঠলেই হবে না, সমস্ত অসঙ্গতির প্রতিকার করা সম্ভব আমাদের হলদিয়া বন্দরকে তাড়াতাড়ি গড়ে তুলে।

ডিভ্যালুয়েশনের হিসেব ধরেও হলদিয়া বন্দর গ'ড়ে তোলার জন্যে ভারত সরকার ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। কাজ কিছু দূর এগোবার পর এখন দেখা যাচ্ছে যে আরও ২০ কোটি অর্থাৎ মোট ৫০ কোটি টাকার দরকার। কী হিসেব করে ৩০ কোটি ধরা হয়েছিল প্রথমে? আর গৌরী সেনের কত টাকা আছে, যে দিয়েই চলবে চাওয়া মাত্রই? আমাদের পোর্ট কমিশনের প্ল্যানারদের মুনশিয়ানা আছে বলতে হয়।

কিন্তু যা-ই হয়ে থাকুক এতদিন, হলদিয়া আমাদের চাই-ই। বন্দরটিকে পুরোপুরি সাজিয়ে তোলার টারগেট ছিল ১৯৭১-৭২। কিন্তু চেনাশোনা সাংবাদিক ও ব্যবসায়ীরা যাঁরা হলদিয়া দেখে এসেছেন, তাঁরা বলেন কাজ হতে হতে এখন যেমন থমকে গেছে তাতে আগামী পাঁচ বছরেও সেটা সম্ভব হবে না।

হলদিয়াতে এখন তীরে জাহাজ ভেড়ানোর ব্যবস্থা নেই; মাঝ নদীতে দাঁড় করিয়ে বার্জে করে জাহাজে মাল বোঝাই হয়। অধিকাংশ জাহাজই কলকাতা বন্দর থেকে খানিকটা মাল তুলে হলদিয়ায় এসে দাঁড়ায়। সেখানে হয় আপটপিং, অর্থাৎ আধাবোঝাই মালের ওপর জাহাজের সাধ্যানুযায়ী পুরো মাল চাপানো হয়। একে তো কলকাতায় এত খরচ আর সময় নষ্ট, তার ওপরে এই ঝামেলা—বিদেশী ক্রেতারা খুশী থাকবেন কেন? তাই তাঁরা ঝুঁকেছেন পারাদীপ, ভাইজাগ, মাদ্রাজ আর গোয়ার দিকে। তাতেও অসুবিধে হলে তাঁরা চলে যাবেন দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা আর অস্ট্রেলিয়াতে, যেসব দেশ খনিজ সম্পদ রপ্তানিতে তৎপর হয়ে উঠেছে।

হলদিয়ার গঙ্গা প্রায় পাঁচ মাইল চওড়া। এপার থেকে ওপার দেখা যায় না প্রায়। এখানকার 'ড্রাফ্‌ট' ৪২ ফুট; তাহলে 'বার্থ' তৈরি হলে তাতে ৪৫,০০০ টন জাহাজও ভিড়তে পারবে। বাহাত্তর সালে যদি বন্দর তৈরি হয়ে ওঠে তবে গোড়ায় সেখানে বছরে ১৪ লক্ষ টন থেকে শুরু করে চুয়াত্তর সাল পর্যন্ত ৩০ লক্ষ টন মাল রপ্তানির ব্যবস্থা হবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করছেন। তাহলে অসংখ্য বাঙালী ছেলের কর্মসংস্থানের পথ উন্মুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু—এটা একটা বড় 'কিন্তু'—হবে কি তাই? অঘটনটি কি ঘটবে? দেখা যাক! সব যে নির্ভর করছে আমাদের বিমাতা কেন্দ্রীয় সরকারের দাক্ষিণ্য আর কলকাতা পোর্ট কমিশনারদের তৎপরতার ওপর।

বন্দরটি গড়ে তোলার কনট্রাক্ট যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের নিজেদের এবং তাঁদের কর্মী ও শ্রমিকদের কষ্টের সীমা নেই। একে তো কলকাতা থেকে হলদিয়ায় স্থলপথে ৬০।৭০ মাইল। যাতায়াতের ভীষণ অসুবিধা; সময়সাপেক্ষ ব্যাপারও সেটা। হলদিয়াতে রাত কাটানোর কথা কিছু দিন আগে পর্যন্তও ভাবা যেত না। অব্যবস্থার নাকি চূড়ান্ত ছিল। তাই সকালের স্টীমারে করে হলদিয়া পেঁছেই কনট্রাক্টার ফার্মের ম্যানেজার এঞ্জিনীয়ারদের এবং সরকারি অফিসারদের বিকেলের ফিরতি স্টীমারের কথা ভাবতে হতো। আর রাত কাটানোর দরকার হলে ওই যে রেস্ট না গেস্ট-হাউস আছে, তাতে আশ্রয় নিতে হতো। সেখানে সব আছে—একজন ঠাট্টা করে আমায় বললেন—বিছানাপত্রও পাওয়া যায়; ভয়ানক মশার জন্যে মশারিও আছে, কিন্তু টাঙাবার দড়ি

নেই। মশারি খাটাতে গেলে দু'জন লোকও দরকার হয় সঙ্গে, যারা সারারাত দু' দিকের খুঁট ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। মশকদংশন থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আবার সেই দণ্ডায়মান ব্যক্তিদ্বয়কে গ্যামাক্সিন বা কেরোসিন লেপন করতে হবে সর্বাঙ্গে। সেখানে রান্নাবান্নাও হয়, কিন্তু একটু বেশী খাবার জলের দরকার হলে চলে যেতে হবে নদীর তীরে পবিত্র গঙ্গোদক পানের নিমিত্ত।

যাক গে ওসব ফালতু রসিকতা, কাজের কথা বাকী থেকে যাচ্ছে।

মেজর চন্দ্র বললেন আকরিক ধাতুর কথা আর ভুজঙ্গভূষণ তারপরে তুললেন কয়লার প্রসঙ্গ। ১৯৬৫ সালের দোসরা সেপ্টেম্বর থেকে ভারত সরকার কানুন জারি করলেন যে, কয়লা-রপ্তানি কারবারটি ব্যবসায়ীরা আর করতে পারবেন না, এম এম টি সি-ই সেটা করবেন। কানুন জারির অব্যবহিত পরেই বড় খদ্দের পাকিস্তানের সঙ্গে হামলা-হামলি লেগে গিয়ে সে কারবারটা মাটি হয়ে গেল। এখন ব্যবসাটা আবার একটু ইমপ্রুভ করেছে। বর্মা রেল, সিংহল রেল এখন এম এম টি সি-র সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী ক্বরন করেছেন কয়লা সাপ্লাইয়ের জন্য। কিন্তু সে কাজটা ভালো করে চালাতে হলে যে কোলিয়ারী থেকে সময় মতো কয়লা এনে জমা করা, বন্দরে ঠিক মতো জাহাজ ভিড়িয়ে তাড়াতাড়ি মাল বোঝাই করা (বর্তমানে কখনো কখনো বোঝাই এত আস্তে হয় যে দিনে ৪।৫০০ টনের বেশী কয়লা জাহাজে ওঠে না), আর বন্দর অঞ্চলের চোরাই কয়লা ব্যবসায়ীদের কারবারটা সমূলে উচ্ছেদ করা, প্রভৃতি আবশ্যিক কর্তব্যগুলি পালন করা উচিত সেটা কি ভুজঙ্গভূষণ ভেবে দেখেছেন ভালো করে?

বিদেশী ক্রেতারা এখনও আমাদের আয়রন-ওর*, কয়লা, ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমাইট, কায়ানাইট, বক্সাইট, লাইমস্টোন, ডলোমাইট, ফায়ার ক্লে, চায়না ক্লে প্রভৃতি অনেক রকম খনিজ প্রচুর পরিমাণে কেনেন।

কিন্তু এটা আমাদের কর্তাদের মনে রাখতে হবে যে, খনিজসমৃদ্ধ অন্যান্য অনুন্নত ও উন্নতিশীল দেশও আধুনিক বন্দর গড়ে তুলছে। খনির সঙ্গে বন্দরের যথাযথ যোগাযোগের ব্যবস্থা আগে থেকে করেই তাঁরা এগোচ্ছেন! তাঁরা তৈরি হয়ে বিশ্ববাণিজ্যে প্রবেশ করার আগেই আমাদের কর্মকুশলতা না বাড়লে পরে আমাদের জন্যে ক্রেতারা অর্থাৎ জাপান, জার্মেনী, ইংল্যান্ড, অ্যামেরিকা কেউ বসে থাকবেন না। সুয়েজ খাল বন্ধ হয়ে জাহাজ ভাড়া অনেক বেড়ে যাবার পরে তো এমনিতেই অনেক খদ্দের ভারত ছেড়ে আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকা থেকে মাল কিনতে শুরু করেছেন।

পুনরুজ্জীবিত কলকাতা বন্দর এবং নতুন হলদিয়া বন্দরই পশ্চিম বাংলা ও বাঙালীর রপ্তানি বাণিজ্যের মেরুদণ্ড হবে এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পদধূলিলাঞ্ছিত ভূমিতে বাঙালীর নতুন কর্মকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে—এই কথাটা আমরা যেন প্রতি মুহূর্তে মনে রাখি, সেই জন্যই অনেকখানি চর্বিতচর্বন করা গেল।

* ম্যাঙ্গানীজের সওদা এম এম টি সি এবং খনি মালিক উভয়পক্ষই পৃথকভাবে করেন, কিন্তু খনি মালিকরা সরাসরি টাকাপয়সার লেনদেন করতে পারেন না। অতীতে 'আন্ডার ইনভয়েসিং' হয়ে বহু ফরেন এক্সচেঞ্জ পাচার হবার পর থেকে সরকার এই মূল্য বিনিময়ের ভারটি নিজের হাতে নিয়ে এম এম টি সি-র ওপর ন্যস্ত করেন। আয়রন-ওরের সবটাই কিন্তু এম এম টি সি নিজেরাই রপ্তানি করেন। অন্য কেউ পারেন না। এম এম টি সি-র এক্সপোর্টের অঙ্ক হলো বছরে ৬০।৬৫ কোটি টাকা। ইমপোর্টের অঙ্ক বছরে ২৫।২৬ কোটি টাকা।

মিত্র এস-কে প্রাইভেট লিমিটেডের লক্ষ্মীলাভের কাহিনীর ভূমিকাটা মস্ত বড় হয়ে গেল। তার দরকার ছিল, কারণ ভারতবর্ষের খনিজ ও ধাতব পদার্থের রপ্তানি ও আমদানির সঙ্গেই তাঁদের অস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

স্বর্গীয় সন্তোষকুমার মিত্র মশায় ১৯২৮ সালে ছাব্বিশ বছর বয়সে বার্ড কম্পানির বড়জামদা অফিসে কেমিস্ট হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। বিহার ওড়িশার সীমান্তে অবস্থিত বড়জামদার প্রধান অধিবাসী হলেন 'হো' (কোল) উপজাতির আদিবাসীরা।

হো-দের প্রসঙ্গে তাঁদের নেতা আমাদের বিখ্যাত অলিম্পিক হকি খেলোয়াড় বর্তমানে লোকসভার সদস্য শ্রীজয়পাল সিং এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী জাহানারা জয়পাল সিংয়ের (তিনিও এম পি) নাম উল্লেখ্য।

সন্তোষ মিত্র মশায় বার্ড কম্পানিতে বছর আষ্টেক কাজ করার পর এক পরিচিত ভদ্রলোকের প্রেরণায় চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে ধাতু সমীক্ষার ব্যবসায় নামলেন। কিন্তু সেই পার্টনারশিপ ফার্ম বেশী দিন চললো না। তখন ১৯৩৮ সালে ওড়িশার কেওনঝড় স্টেটের বড়বিল নামক স্থানে সন্তোষবাবু একক একটি ব্যবসা আরম্ভ করলেন। সন্তোষবাবুর মান নির্ণয়ের ওপর সব খনি মালিকদেরই শ্রদ্ধা ছিল। তাই তাঁরা অনেকেই সন্তোষবাবুর ল্যাবোরেটারিতে মালের নমুনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দিতে লাগলেন। তিনি টাটা, বার্ড, মার্টিন কম্পানি, ডি কে পাণ্ডে, এ সি ফিগ্রেড, এম এ টালক প্রভৃতি প্রাচীন খনিমালিকদের পৃষ্ঠপোষকতা পেলেন। পরে এলেন চাইবাসার বিখ্যাত রুংটা পরিবার, মিশ্রীলাল ধরমচাঁদ, সিরাজুদ্দিন কম্পানি।

ওই অঞ্চলে বাঙালীদের মধ্যে ম্যাঙ্গানীজের খনি ছিল স্বর্গীয় বিভূতি মিত্র ও শ্রীশৈলেন সেন মহাশয়দের। আর উল্লেখ্য হলেন স্বর্গীয় নৃপেন রায় মহাশয়, যাঁর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা সবিতা রায় ও তাঁর ছেলেরা এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন 'ইণ্ডিয়া ট্রেডস করপোরেশন' নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও বাঙালী মালিকানায় দু'চারটে ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি আকরিক ধাতুর খনি ছিল এবং সম্ভবত এখনো আছে। এ বিষয়ে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি তা হলো, অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলম জেলাতে স্বর্গত সতীশচন্দ্র ভদ্র মহাশয়ের ছোট ম্যাঙ্গানীজ খনিটি এখন তাঁর দুই ছেলে শ্রীক্ষিতীশ ভদ্র ও শ্রীঅজিত ভদ্র চালাচ্ছেন। অভয়কৃষ্ণ বললেন যে, ওই অঞ্চলেই কলকাতার মিঃ জে. ব্যানার্জি মহাশয়েরও আরেকটি খনি ছিল।

বর্তমানে আরও একজন বিশিষ্ট বাঙালী ভদ্রলোকেরও লোহা ও ম্যাঙ্গানীজের খনি আছে। তাঁর নাম ডক্টর শৌনকচন্দ্র বসু। খনিজ অর্থনীতিতে ডক্টরেট উপাধিধারী শৌনকবাবুর সঙ্গেও সেদিন এম এম টি সি-র অফিসে আমার পরিচয় হয়েছিল।

সন্তোষবাবুর কাজের শুরু বেশ সুন্দর ভাবেই হয়েছিল কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে সব তছনছ হবার উপক্রম হলো। রপ্তানি বন্ধ থাকাতে সন্তোষবাবু নমো নমো করে টাটা আর ইণ্ডিয়ান আয়রনের স্থানীয় কাজ করতে লাগলেন। তাতে কোনো রকমে ব্যবসাটি চালু রইলো। উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ছিল না।

অবশেষে দীর্ঘ ছ' বছর পরে ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হলো এবং সরকার তার কিছু দিন পর থেকেই সাধারণ ব্যবসায়ীদের মাইনিং লীজ দিতে আরম্ভ করলেন। নতুন খনি মালিকরা সন্তোষবাবুর সাহায্য নেওয়াতে এতকাল পরে তিনি হালে পানি পেলেন।

ব্যবসাটি তখনও 'এস কে মিত্র' নামে ছিল। এই জাতীয় বিশেষজ্ঞের ব্যবসা পণ্য তৈরি বা বেচাকেনার মতো রাতারাতি বাড়ে না। কিন্তু তখন থেকেই সন্তোষবাবুর ব্যবসার ক্রমিক উন্নতি হতে লাগলো।

বিভূতি মিত্র নামে চাইবাসার এক ছোট সাইজের খনির মালিকের কথা একটু আগে বলেছি। তিনি সন্তোষবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কাজ বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট কেমিস্টের দরকার পড়াতে বিভূতিভূষণের ছেলে মণীন্দ্রনাথ ১৯৪৭ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে সদ্য বি. এস-সি. (কেমিস্ট্রিতে) পাস করে বড়বিলে সন্তোষবাবুর ল্যাবোরেটারিতে যোগ দিলেন।

সন্তোষ মিত্র ও বিভূতি মিত্রের বন্ধু চাইবাসার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী ব্রজগোপাল মিত্র মহাশয়ের পুত্র এবং মণিবাবুর সতীর্থ অভয়কৃষ্ণ তখন এম. এস-সি. পড়তে পাটনা সায়ান্স কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ফাইন্যাল পরীক্ষায় কেমিস্ট্রির একটি পেপারে শক্ত প্রশ্নের অজুহাতে ছাত্রদের সঙ্গে অভয়কৃষ্ণকেও পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। তারপরে কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে তাঁর আর পরীক্ষায় বসা হয়ে ওঠেনি।

১৯৫২ সালে সন্তোষবাবু যখন কলকাতায় অফিস খোলা ঠিক করলেন তখন মণিবাবুর পরামর্শে তিনি অভয়কৃষ্ণকে কলকাতা অফিসের ভার দিতে চাইলেন। অনভিজ্ঞতার জন্যে মনের অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে অভয়বাবু সেই ভার নিলেন।

মজার ব্যাপারই হলো সেটা। প্রৌঢ় সন্তোষ মিত্র মশায় আর দুই যুবক মণীন্দ্র মিত্র ও অভয় মিত্র, যাকে বলে মিত্রে মিত্রে ঢুল পরিমাণ, অথচ কারুর সঙ্গে কারুর রক্তের সম্পর্ক নেই।

কলকাতার অফিস হলো ১৪নং হেয়ার স্ট্রীটে এবং ল্যাবোরেটারি বসলো গ্রে-স্ট্রীট অঞ্চলে।

এই সময়ে করুণাকুমার দত্ত নামে এক ভদ্রলোক বার্ড কম্পানি ছেড়ে কলকাতায় মিত্র এস-কে'র কেমিস্ট হিসেবে যোগ দিলেন। এখন তিনি এই প্রতিষ্ঠানের চিফ কেমিস্ট। এস. কে. মিত্রের কাজ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো। (এখন মিত্র এস-কে প্রাঃ লিমিটেডের অফিস মৌলালীর কাছে পি-১১ সি. আই. টি. রোডে)।

সফলতা জিনিসটা মানুষকে উচ্চাশার পথে ঠেলে দেয়। দ্রুত উন্নতিশীল বিশাখাপত্তন বন্দরে কাজ করার ইচ্ছে সন্তোষবাবুর মনে অনেক দিন থেকেই হয়েছিল, কিন্তু সেখানে তখন সাতটি পুরনো ওর-সার্ভেয়ার ফার্ম অফিস খুলে বসে আছেন। তা সত্ত্বেও নির্ভীক সন্তোষকুমার অভয়কৃষ্ণকে পাঠিয়ে ১৯৫৫ সালে বিশাখাপত্তনে ব্রাঞ্চ অফিস ও ল্যাবোরেটারি খোলালেন।

১৯৫৬ সাল। প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা ও মর্যাদা অনেক বেড়ে গিয়েছে। সন্তোষ মিত্র এবার দুই বিশ্বস্ত তরুণকে অংশীদার করে সেটিকে এক প্রাইভেট লিমিটেড কম্পানিতে পরিণত করলেন। 'এস. কে মিত্র প্রাইভেট লিমিটেড' নামে ইতিপূর্বেই একটি প্রতিষ্ঠান থাকাতে ঘুরিয়ে এই নতুন সংস্থার নাম হলো 'মিত্র এস-কে প্রাঃ লিঃ'।

এখন থেকে মিত্র এস-কে'র ক্রমোন্নতির লয় দ্রুততর হয়ে উঠলো। দুই শিষ্যকে নানা শহর এবং বন্দরে পাঠিয়ে সন্তোষবাবু শাখা অফিস খুলতে লাগলেন। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত মণিবাবু খুলেছেন নোয়ামুণ্ডি, পারাদীপ, দুর্গাপুর প্রভৃতি শাখা, আর অভয়কৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে খোলা হয়েছে বিশাখাপত্তনের পর ১৯৫৭ সালে মান্দ্রাজ, ১৯৬০-এ ব্যাঙ্গালোর এবং আরও দু' একটার পর পশ্চিমঘাট্টিতে সাগরপারের চৌকিও অফিস। মিত্র এস-কে'র শাখা অফিসের সংখ্যা বর্তমানে ১৪।

বড়বিল ও বিশাখাপত্তনম আঞ্চলিক অফিসের ওপর এই সব শাখাগুলির পরিচালনার ভার। আঞ্চলিক অফিস দুটির পরিচালক হলেন যথাক্রমে রমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণ ওড়িশার খনি অঞ্চলের শাখাসমূহের তত্ত্বাবধানের জন্য সম্প্রতি কটকেও একটি অফিস খোলা হয়েছে। তার চার্জ নিয়ে আছেন মলয়কুমার দে। দেশের অন্যান্য বন্দরেও তাঁরা শীঘ্রই নিজেদের অফিস খুলবেন বলে আয়োজন উদ্যোগ করছেন। বিদেশে জাপান ছাড়া অন্য দেশেও ব্রাঞ্চ খোলার তোড়জোড়ের কথা অভয়বাবু বললেন। বিদেশে অফিস রাখার মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় বিক্রেতাদের স্বার্থ বজায় রাখা। এখন এদেশ থেকে রপ্তানির অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ফাইন্যাল সেটেলমেণ্ট' হয় গন্তব্যস্থলে স্থিরীকৃত মানের উপর। অনেক বিদেশী ক্রেতা অকারণে অথবা সামান্য খুঁত পেলেই প্রেরিত মালের বাবদ অযৌক্তিক খেসারত আদায়ের ফন্দিফিকির খোঁজেন। তার ফলে আমাদের বহুমূল্য বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হয়ে যায়; সেই জন্যেই এই সতর্কতা। জাপানে মিত্র এস-কে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করাতে তাঁদের কাছে অনুরোধ এসেছে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় অফিস খোলার জন্য। এ বিষয়ে তত্ত্বতল্লাস করার উদ্দেশ্যে অভয়কৃষ্ণ শীঘ্রই আবার ইয়োরোপ আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন।

১৯৬০ সালে সন্তোষকুমার দেহত্যাগ করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৫৮ বছর। এক নীরব কর্মীর মৃত্যু হলো।

সন্তোষকুমারের কাজের ভার নিলেন তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা ইলা মিত্র। এখনও তিনি মিত্র এস-কে'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর। একঘাট্টিতে তাঁর ছেলে তপনকুমারও বি. এস-সি. কেমিস্ট্রি অনার্সে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবার পর প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন। মণীন্দ্রনাথ, অভয়কৃষ্ণ ও তপনকুমার তিন জনই কম্পানির ডিরেক্টর।

অভয়বাবুর স্ত্রী সদাহাস্যময়ী সাবিত্রী কথায় কথায় রসিকতা করেন। কথা না বলে চোখের চাউনিতেও তাঁর রসিকতা প্রকাশ পায়। প্রথম আলাপে আমার বিরলকেশ মস্তকের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মুখে একটু হাসি ফোটালেন। অভয়কৃষ্ণের বেয়াল্লিশ বছরের টাক আমার ইন্দ্রলুপ্তের চেয়েও বড়ো। কিন্তু মাথার শেপ-টা সুন্দর বলে দীর্ঘদেহ সৌম্যদর্শন অভয়কৃষ্ণকে দেখে হঠাৎ মনে হয় যেন তিনি হলিউডের ইউল ব্রিনারের মতো মাথা কামিয়েছেন। সমবয়সী মণিবাবুর কিন্তু মাথা ভরা কালো চুল। অভয়বাবুর পাশে তাঁকে অনেক জুনিয়ার মনে হয়। তবে, অভয়কৃষ্ণকে যেসব আউটডোর মুভমেণ্টে সারা বছর কাটাতে হয় তাতে তাঁর ওই কেশমুক্ত মাথা সহায়তাই করে—ডিগনিটিটা বাড়িয়ে দেয়।

দুর্ভাগ্যবশত মণি-গৃহিণী দীপালি বা তপনকুমারের স্ত্রী চন্দ্রলেখার সঙ্গে আমার আলাপ হলো না।

১৯৬৮-তে আন্তর্জাতিক মানক সঙ্ঘের এক সম্মিলন লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে ভারতীয় মানক সংস্থার পক্ষ থেকে যে দু'জন প্রতিনিধি গিয়েছিলেন অভয় মিত্র তাঁদের অন্যতম। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে এম এম টি সি-র অনুরোধে তাঁকে অধিকতর প্রয়োজনীয় কাজে ইয়োরোপের নানা দেশ পরিক্রমায় লিপ্ত থাকতে হয়েছিল বলে সেই সম্মেলনে তিনি যোগ দিতে পারেননি।

এ ছাড়াও তিনি ভারত চেম্বার অব কমার্সের বিশেষ কমিটিতে গত দু' বছর ধরে মনোনীত সভ্য হিসেবে আছেন।*

১৯৩৮ সালে সন্তোষ মিত্র ৫০,০০০ টন আয়রন-ওর এবং ২০ হাজার টন ম্যাঙ্গানীজ নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। সেই জায়গায় সাতষট্টিতে মিত্র এস-কে ৩৮ লক্ষ টন আয়রন-ওর, ৬½ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানীজ এবং ১½ লক্ষ টন ক্রোমাইটের মান-নির্ণয়ের কাজ করেছেন। এ ছাড়া অন্য ধাতু নিয়ে ছোটখাটো কাজের কথা না হয় নাই-ই ধরলাম। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই ছিল রপ্তানির মাল। দেশী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত জাপানী এবং ইয়োরোপীয় ক্রেতাদের হয়েই তাঁরা এ কাজ করেছেন।

আড়াই শো কর্মীর (যাঁদের অধিকাংশই বাঙালী) কর্তব্যপরায়ণতার জন্যেই মিত্র এস-কে প্রাইভেট লিমিটেড দিনে দিনে উন্নতির শিখরের দিকে এগিয়ে চলেছেন।

অভয়বাবুরা নতুন হাওড়া ব্রীজ তৈরির উদ্যোগপর্বে প্রিনসেপ ঘাটের কাছে নদীর মাটি ও জল নিয়ে গবেষণা করছেন। কতরকমের কাজই না এঁরা করেন! কোন্ দিন শুনবো যে অভয়বাবু ইণ্টারন্যাশান্যাল স্ট্যাণ্ডার্ডস কনভেনশনে ভারতীয় প্রতিনিধি হয়ে চাঁদের জল মাটি ধাতুটাতুর বিষয়ে সমীক্ষার জন্যে চন্দ্রযানে আরোহণ করেছেন।

৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯

* উনসত্তরের জুন মাসে অভয় মিত্র পণ্যসমীক্ষকদের সর্বভারতীয় পরিষদ 'অল ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন অব ইনস্পেকশন এজেন্সিজ্'-এর উপ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। মিত্র এস-কে'র মর্যাদাবৃদ্ধির এটি আরেকটি সোপান।



বত্রিশ

সদু ঠাকরুণ তাঁর লোলচর্ম বাহু দুটি দিয়ে শ্রীপতিচরণকে বুকের কাছে টেনে আনলেন। ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, "মরার আগে আমায় তীর্থ করালি বাবা—আশীর্বাদ করি ধনেপুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক তোর!" বৃদ্ধার দুই ফোঁটা আনন্দাশ্রু শ্রীপতিচরণের জামার ওপরে পড়লো। তাঁর নিজের চোখ দুটিও একটু ভিজে উঠেছিল। আস্তিনে চোখ মুছে নিয়ে চারিদিকে একবার তাকালেন কৃতার্থ শ্রীপতি কুণ্ডু। তাঁদের দু'জনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সহযাত্রীরা দৃশ্যটা দেখছেন। সকলেরই মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। একজন প্রৌঢ় এবার এগিয়ে এসে শ্রীপতিবাবুর গলায় একটি সোনার মেডেল ঝুলিয়ে দিলেন। যাত্রীরা নাকি নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে মাঝপথের কোনো শহর থেকে এটি কিনে রেখেছিলেন, ফিরতি পথে বাঁকুড়ায় গাড়ি পেঁছিলে শ্রীপতি কুণ্ডুকে পরিয়ে দেবেন বলে।

শ্রীপতিচরণের খড়্গপুরের প্রকাণ্ড বাড়ির দোতলার দালানে বসে চৌত্রিশ বছর আগেকার সেই দৃশ্যটা কল্পনা করছিলাম মস্ত একটি ছবির ওপর চোখ রেখে। কুণ্ডু মশায়কে নিয়ে চারশো ন'জনের একটি গ্রুপ ফটো—প্রথম কুণ্ডু স্পেশালের তীর্থ ফেরত যাত্রীদের সমাবেশ। ছবিটির নীচে লেখা আছে : যাত্রা, সন ১৩৪১, ১০ মাঘ। প্রত্যাবর্তন, ৩০ ফাল্গুন।

সৌদামিনীর আশীর্বাদ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। ১৯৩৪ সালের সেই প্রথম তীর্থযাত্রী স্পেশালের পর থেকে আজ পর্যন্ত কুণ্ডুদের স্পেশাল ট্রেন এবং রিজার্ভড কোচ যাত্রী নিয়ে বেরিয়েছে সাতশ'বারের কাছাকাছি; জাহাজে করে আন্দামান-নিকোবার প্রমোদ ভ্রমণের ট্রিপও বছরে বছরে যায়; আর সম্প্রতি এঁদের প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েছে, যাতে নিজেদের লাকসারি বাসে করেও যাত্রীদের নানা জায়গায় ঘুরিয়ে আনতে পারেন। মোটামুটি 'হোম কমফর্টস' যুগিয়ে কুণ্ডুরা সস্তায় যে-সব রেলওয়ে ট্রিপের ব্যবস্থা করেন, তার চেয়েও নাকি সস্তা এবং আরামের হবে এই লাকসারি বাস-বিহার। উপরন্তু তাঁরা মধ্যবিত্ত বাঙালীর জন্যে দারজিলিংয়ে একটা হোটেলও খুলেছেন। তার নাম 'হোটেল কুনডুজ্'। এইসব ছাড়াও শ্রীপতিচরণ আর তাঁর সাত-জন কর্মঠ পুত্র রেলওয়ে, পি ডবলিউ ডি এবং অন্যান্য কনট্রাকটারি করে যথার্থ লক্ষ্মীলাভ

করেছেন। সারা জীবন পরিশ্রমের পর আজ আশী বছর বয়সে শ্রীপতি কুণ্ডু বৃদ্ধা পত্নী ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী নিয়ে খড়্গপুরের কুণ্ডু-ভবনে বিশ্রাম করছেন। তীর্থসলিল আর তীর্থযাত্রীর মঙ্গলকামনাই তাঁকে এই পুরস্কার দিয়েছে।

বিধাতা যে কখন কাকে দিয়ে কী করান তা বোঝা ভার। বাঁকুড়া শহরের চালের আড়তদার স্বর্গীয় দিগম্বর কুণ্ডু মশায়ের ছেলে শ্রীপতিচরণ ১৯০৭।৮ সালে তাঁর উনিশ বছর বয়সে বেঙ্গল নাগপুর রেলের কেটারিং বিভাগে এক কনিষ্ঠ কেরানির পদে বহাল হয়েছিলেন। কর্তব্য-নিষ্ঠার জন্য তিনি প্রমোশন পেয়ে বছর দশ পনেরোর মধ্যে কেটারিং ইনসপেক্টারের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। সেকালে রেলের চাকরিতে স্বস্তি ছিল, শান্তি ছিল এবং মর্যাদাও ছিল। কিন্তু নিয়তি এক একটি যুবককে সুখে থাকতে ভূতে কিলিয়ে সাধারণ থেকে অসাধারণের পর্যায়ে এনে ফেলে। সাধারণ মানুষ হলে অমন সুখের চাকরিটি করে কর্মজীবনের পুরোটাই কাটাতেন; রিটায়ার করে পেনসন নিতেন। শ্রীপতি কুণ্ডু সেই 'সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো' জাতের মানুষ ন'ন। তাই তিনি নিজের ব্যবসা গড়ার সুযোগ পেয়ে রিটায়ার করার কিছু আগেই চাকরি ছেড়ে নতুন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ওপরওয়ালাদের সহায়তায় তিনি বি এন আর-এর রামরাজাতলা থেকে পুরী স্টেশন পর্যন্ত কেটারিংয়ের কনট্রাক্ট পেলেন।

সেটা হল ১৯৩২ সালের কথা। আটত্রিশ সাল পর্যন্ত সেই কাজটি করার পরে এক ধনবান অবাঙালী প্রতিযোগীর চক্রান্তে রেল কম্পানির সঙ্গে তাঁর ভাল সম্বন্ধটি ক্ষুণ্ণ হল। অন্য সব স্টেশন হাতছাড়া হয়ে গিয়ে কেবল খড়্গপুর স্টেশনের কেটারিং নিয়েই শ্রীপতিচরণ আরও বছর খানেক রইলেন, আর পেলেন বেঙ্গল নাগপুর রেল কম্পানির নিজস্ব কারখানায় তৈরী সোডা লেমোনেডের ডিসট্রিবিউশন কনট্রাক্ট। ১৯৩৯-এ কেটারিং কনট্রাক্টের কাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। তবে পুরনো খাতিরের জোরে শ্রীপতিচরণের বড় ছেলে বিজয় কুণ্ডু খড়্গপুর কেটারিং ম্যানেজার হলেন। বিজয়বাবু ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ওই বিভাগেই ছিলেন; ব্যবসায় যোগ দেবার জন্যে চাকরিতে ইস্তফা দেবার আগে পর্যন্ত তিনি অ্যাসিসট্যান্ট কেটারিং সুপারিনটেনডেন্ট হয়েছিলেন।

কম খরচে লোককে তীর্থ করানো আর সুন্দর সুন্দর জায়গায় ঘুরিয়ে আনার আইডিয়াটা শ্রীপতিবাবুর মাথায় এসেছিল কেটারিং ব্যবসাতে নামার আগে থেকেই। ১৯৩০ সালে তিনি কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে একবার দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। অনেক তীর্থস্থানেও তাঁরা গিয়েছিলেন। পুণ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে গিয়ে তীর্থযাত্রীরা যে কত কষ্ট করেন, সেবারে শ্রীপতিচরণ সেটা ভাল করে দেখে এসেছিলেন। তখন থেকেই তাঁর মাথায় এল তীর্থযাত্রীদের নিয়ে স্পেশাল ট্রেন বের করার ব্যবসার কথা। কিন্তু তাঁর হাতে এমন মূলধন ছিল না যে, তাই নিয়ে তিনি অজানা নতুন একটি কাজে নামবেন নিরাপদ চাকরিটিতে জলাঞ্জলি দিয়ে।

বছর দুই পরে যদিও তিনি তাঁর জানা লাইন কেটারিংয়ে ঢুকলেন, কিন্তু মনে মনে সেই

ইচ্ছাটা পুষতে লাগলেন। তাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আরও দু' বছর পরে, ১৯৩৪ সালে। কেটারিং ব্যবসাটা তখন বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন।

আজ না হয় কুণ্ডু স্পেশাল ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও গঠিত হয়েছে, আর হয়েছে সরকারি ট্যুরিজম্—শ্রীপতি কুণ্ডু যখন শুরু করলেন, তখন সে রকম কেউই ছিলেন না। ছুটিছাটা আর পুজোপার্বণে রেল কম্পানিরা আদ্দেক ভাড়ায় রেল ভ্রমণের সুযোগ দিতেন বটে, কিন্তু গন্তব্য স্থানে উপনীত হয়ে সেখানকার দর্শনীয় মন্দির, মসজিদ, স্থাপত্য আর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার পরে দিনের শেষে নিরাপদ আশ্রয়ে যাত্রীকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব তখন 'কুণ্ডু স্পেশাল' ছাড়া সরকারি বে-সরকারি কোন প্রতিষ্ঠানই নিতেন না। সরকারি ট্যুরিস্ট ব্যুরো এখনও তীর্থযাত্রী-স্পেশাল বলতে যা বোঝায়, তেমন কিছুর ব্যবস্থা করেছেন বলে শুনিনি।

শ্রীপতিচরণই এ বিষয়ে পথিকৃৎ হয়ে এবং পথিকৃতের মস্ত ঝুঁকি নিয়েই এই কাজ আরম্ভ করেছিলেন। সেই প্রথম যাত্রায় পুরো একটি স্পেশাল ট্রেনের ভাড়া রেল কম্পানিকে কবুল করে তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। মাত্র ১৪৬ টাকায় কুণ্ডু স্পেশালে করে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানে ঘুরিয়ে আনা হবে ৫০।৬০ দিনের মধ্যে। খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা ওই খরচেই কুলিয়ে যাবে। (এখন অবশ্য ক্রমবর্ধমান রেলভাড়া আর মূল্যস্ফীতির জন্যে কুণ্ডু স্পেশালের চার্জও বহু গুণ বেড়ে গেছে)। কুণ্ডু স্পেশালের অফিস খোলা হল বর্তমান অফিস ৪০/১, স্ট্র্যান্ড রোডের কাছেই আরেকটা বাড়িতে।

পৃথিবীতে ট্র্যাভেল-এজেন্সি ব্যবসার পথপ্রদর্শক ছিলেন ইংল্যাণ্ডের এক ব্যাপটিস্ট পাদ্রী টমাস কুক (১৮০৮-৯২)। মদ্যপান বর্জন ও নিবারণ বিষয়ে প্রচার করার জন্য পাদ্রী-সাহেবকে স্থানে স্থানে যাতায়াত করতে হতো। ১৮৪১ সালে তিনি একটি স্পেশাল ট্রেন ভাড়া করে আন্দাজ সাড়ে পাঁচ শ' জন যাত্রীকে মস্ত এক 'টেম্পারেন্স' (মাদক নিবারণী) সভায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তার পর থেকেই তিনি এই কাজটিকে ব্যবসায়িক রূপ দিলেন। ১৮৫১ সালে লণ্ডনে যে 'গ্রেট একজিবিশন' হয়েছিল সেই প্রদর্শনী তিনি পালা করে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার জন দর্শককে দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৮৫৬ সালে কুক-ই প্রথম সারা ইয়োরোপে এবং সুইজারল্যাণ্ডে যথাক্রমে 'সারকুলার' ও 'কনডাক্টেড্' ট্যুরের আয়োজন করেন। এইভাবে ধীরে ধীরে পরিধি বাড়িয়ে ১৮৭২ সালে টমাস কুক সাহেব এক 'রাউন্ড দা ওয়ার্লড' অর্থাৎ পৃথিবী ভ্রমণের ব্যবস্থাও করেছিলেন। কুক সাহেবের পৌত্রের সময় পর্যন্ত পারিবারিক ব্যবসা হিসেবে চলার পর ১৯২৮ সালে টমাস কুক অ্যাণ্ড সনের কর্তৃত্ব চলে গেল এক বেলজিয়ান কম্পানি'র কবলে। হাত ঘোরাফেরা হয়ে ১৯৪২ সালে পার্লামেন্টের এক বিশেষ আইন পাস হয়ে টমাস কুক অ্যাণ্ড সন-এর কর্তৃত্ব পৌঁছেছিল ব্রিটিশ মেইন-লাইন রেলওয়েজ-এর হাতে। বিশ্বব্যাপী এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্তৃত্ব এবং অবস্থার বিবরণ সংগ্রহ করার সময় পাইনি। ক্রমোন্নতির পথে টমাস কুক অ্যাণ্ড সন ব্যাঙ্কিং ব্যবসাও হাতে নিয়েছিলেন। (কুণ্ডুরা এখনও ব্যাঙ্ক করেননি: করলেই আমিও একটা বিনাবন্ধকী ধারের দরখাস্ত করবো)।

আমার কিন্তু মনে হয় যে, কুণ্ডু স্পেশাল আর টমাস কুকের ঢের ঢের আগে আমাদের এই বাংলা দেশেই ট্র্যাভেল-এজেন্সি এবং তীর্থযাত্রা-স্পেশাল ব্যবসার প্রচলন ছিল। ওই যে আমাদের মৈত্র মহাশয়—তিনি যখন 'তীর্থস্নান লাগি' সাগর সঙ্গমে গেলেন তখন তিনি যাদের সঙ্গে নিয়েছিলেন তাদের কি তিনি ছেড়ে কথা বলেছিলেন, কেবল ভক্তিশ্রদ্ধাটুকু নিয়েই? অসম্ভব-- একে ব্রাহ্মণ, তায় বারেন্দ্র! মোদ্দা কথা, সেকালে যাঁরা সদলবলে পদব্রজে, গরুর গাড়িতে আর নৌকো করে তীর্থযাত্রার আয়োজন করতেন, তাঁরা যে সহযাত্রীদের কাছে ক্যাশে না হোক বিকল্পে, কলাটা, মুলোটা কিংবা দু'এক কাঠা জমি কমিশন হিসেবে আদায় করতেন না, এটা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

শ্রীপতিবাবুর আশা ছিল, কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোনো মাত্রই এত দরখাস্ত এসে পড়বে যে, একটা ট্রেনে সব প্যাসেঞ্জারকে জায়গা দেওয়া যাবে না। কিন্তু কোথায়? সামান্য দু চারটে চিঠির পরই সব চুপ। প্রমাদ গুণে শ্রীপতিচরণ খদ্দের জোটাবার জন্যে কলকাতা ছাড়াও মেদিনীপুর, বাঁকুড়া আর ওড়িশায় ছোটাছুটি করতে লাগলেন। অনেক ধরা করার পর ২৫৬ জন যাত্রী টিকিট কিনলেন। কিন্তু নিজের দেশ বাঁকুড়ার লোক, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ঘরের পাশে পুরীধামেও সাহস করে যেতে পারেননি কখনো, তাঁরাই পিছিয়ে রইলেন। 'পারবে কি শ্রীপতি স্পেশাল ট্রেন চালু করতে, নাকি আমাদের টাকা জলে যাবে?' ইচ্ছা আছে অথচ সাহস নেই, এই হলো তাঁদের মতিগতি। কেবল সামান্য কয়েকজন দুঃসাহস করে টিকিট কিনে ফেললেন।

কিন্তু যাত্রী সংখ্যা কম হলেও নির্দিষ্ট দিনে কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেন ছাড়লো। হাওড়া থেকে উঠলেন মাত্র একজন যাত্রী; বাকী ২৫৫ জন উঠবেন বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর আর গড়বেতা থেকে। বাঁকুড়া স্টেশনে যখন ট্রেন ইন করলো, তখন শ্রীপতি দেখেন প্ল্যাটফরম লোকে লোকারণ্য। যাবেন তো মাত্র ক'জন, তা এত লোক কেন? ট্রেন থামতেই হই-হই পড়ে গেল। "হ্যাঁ, মরদ-কা-বাত বটে শ্রীপতি কুণ্ডুর", নতুন অনেকে তাঁকে ধরে বসলেন সঙ্গে নেবার জন্যে। শ্রীপতি রাজী হতে সবাই ছুটলেন বাড়ি থেকে টাকাকড়ি লটবহর আনতে। ট্রেন ডিটেন্ড হয়ে গেল চার পাঁচ ঘণ্টা! যাত্রার তারিখটা তো আগেই বলেছি—১০ মাঘ ১৩৪১—আজ থেকে চৌত্রিশ বছর আগে। বাঙালীর গৌরব করার মতো একটি উদ্যোগ এক নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীর চেষ্টায় গড়ে উঠলো।

১৯৩৪ সালে শ্রীপতিচরণ যখন তীর্থযাত্রা-স্পেশাল ব্যবসাতে নামেন সে সময়ে ধরাবাঁধা সূচী অনুসারে অল-ইণ্ডিয়া অথবা কেবল উত্তর ভারত কিংবা দক্ষিণ ভারত ট্যুরের সঙ্গে তাল রেখেই চলতে হতো। নতুন রুটে ট্যুর চালু করায় তখন ঝুঁকি অনেক। কিন্তু গতানুগতিকতা ভেঙে শ্রীপতিচরণ প্রথম কয়েকবার লোকসানের বোঝা ঘাড়ে করেও নতুন পথের পরিক্রমা শুরু করলেন। তাঁর দূরদর্শিতার ফলেই কুণ্ডুরা আজ ভারতের দিকবিদিক্, এমন কি নেপাল এবং সিংহল ভ্রমণের ব্যবস্থাও করেছেন। যাঁদের কাছে তীর্থদর্শনই প্রধান সেই সমস্ত যাত্রীদের জন্যে আছে অমরনাথ, কেদারবদ্রী, পশুপতিনাথ, কামাখ্যা, সোমনাথ এবং দক্ষিণ ভারতের অগুণতি তীর্থস্থান, আর যাঁরা শুধুমাত্র রমণীয় স্থান দর্শনে যেতে চান তাঁদের জন্যে কুণ্ডুরা শিলং দার্জিলিং থেকে আরম্ভ করে কাশ্মীর, রাজস্থান, অজন্তা-ইলোরা, আন্দামান-নিকোবার এবং সিংহল যাত্রার ব্যবস্থা রেখেছেন।

এইভাবে তাঁরা তীর্থযাত্রা অথবা নিছক ট্যুরিজমের জন্যেও বছরে ৫০/৫৫টি ট্যুরের আয়োজন করেন। তার মধ্যে গড়ে ১৪/১৫টিতে তাঁরা লোকসান দেন। সেটা তাঁরা না করেও পারতেন, কারণ যথেষ্ট যাত্রী না হলে এইসব ট্যুর ক্যানসেল করার অধিকার তাঁদের আছে। কিন্তু শ্রীপতি কুণ্ডুর সেই মরদ-কা-বাত নীতির কোনো বিচ্যুতি এ'রা ঘটতে দেন না। যাত্রীসংখ্যা যথেষ্ট না হলেও কুণ্ডু স্পেশালের ট্যুর বাতিল হয় না। যদি কখনো তার প্রয়োজন হয় তো সেটা হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যেও মাঝে মাঝে কুণ্ডুদের মোটা লোকসান হয়ে যায়। সেই জন্যে একবার তাঁদের অমরনাথ ট্যুরে এক ধাক্কায় দশ হাজার টাকার ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল।

সেটা ১৯৫৭ সালের কথা। একশ'পঁচিশ জন যাত্রী নিয়ে সেবারে অমরনাথ যাত্রার পথে পহেলগাঁও পেঁাছে জানা গেল যে অত্যধিক তুষারপাতের ফলে আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। সে পথ খুলতে লাগলো পুরো একমাস। দেবাদিদেবের দর্শনপ্রাথীরা যেখানে অমরনাথে পেঁাছবেন আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সেখানে তাঁরা পেঁাছলেন শ্রাবণ পূর্ণিমায়। কিন্তু এই বিলম্বের প্রায় সমস্ত আর্থিক বোঝাটাই কুণ্ডু স্পেশাল নীরবে বহন করলেন।

এইভাবে সাড়ে তিন দশক ধরে কুণ্ডুরা ট্যুরিজমের উন্নতিসাধন করে চলেছেন, বাঙালীর মনে ভ্রমণের নেশা বাড়িয়ে তুলেছেন। প্রতি বৎসর তাঁরা রেলওয়ের তহবিলে তিন চার লক্ষ টাকার যোগান দিচ্ছেন। তা সত্ত্বেও, কেন বুঝি না, কী রেলমন্ত্রক, কী সরকারি ট্যুরিজম্ বিভাগ, কেউই এমন একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠানকে ইজ্জত দিচ্ছেন না। শত অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও কুণ্ডু স্পেশাল আজ পর্যন্ত রেলের ট্র্যাভেল এজেন্সি পাননি। এইসব প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ দিলে ভারতবর্ষে ট্যুরিজমের যে দ্রুততর উন্নতি হতে পারে সেটা বোধহয় আমাদের শ্লথ লালফিতেবাজ রেলমন্ত্রক বা ভ্রমণমন্ত্রকের মন্ত্রী-উপমন্ত্রী ও আমলাবর্গের ধাতে সয় না। অবশ্য সরকারি ট্যুরিজম মন্ত্রকের গাফিলতি নিজেদের বেলাতেও কম প্রযোজ্য নয়। কেন্দ্রীয় অথবা অন্য রাজ্যের কথা বাদ দিয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ট্যুরিস্ট ব্যুরো-র কথাটাই ধরা যাক। সেখানে যেসব ছেলেমেয়েরা আছেন সকলকেই কাজের মানুষ বলে মনে হয়, ব্যবহারেও তাঁরা ভদ্র। কিন্তু এই বুদ্ধিতে উজ্জ্বল চেহারার সুন্দর তরুণ তরুণীরা—যতদূর মনে হলো, ইচ্ছে থাকলেও কাজ করার, মানুষের ভ্রমণের নেশা বাড়িয়ে দেবার যথেষ্ট সুযোগ পান না।

বহুকাল ধরে কুণ্ডু স্পেশালের নাম শুনে এসেছি, কিন্তু ইতিপূর্বে এ'দের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরিচয়ের অবকাশ ঘটে ওঠেনি। দিন কুড়ি আগে গোরা মিত্র নামে এক ভদ্রলোকের উৎসাহে বৃদ্ধ শ্রীপতিচরণ কুণ্ডু মশায়ের দর্শনাভিলাষে খড়্গপুর গিয়েছিলাম। হঠাৎ গোরা মিত্তিরের নাম করতে সকলে হয়ত ব্যক্তিটিকে জানতে চাইবেন। মিত্তির একবার কুণ্ডু স্পেশালে করে অমরনাথ মহাতীর্থে গিয়েছিলেন। সেই থেকে ইনি কুণ্ডুদের বন্ধু। আমি নিজে কুণ্ডু স্পেশালে করে কোথাও না গিয়েও গোরার মুখে কুণ্ডুদের, বিশেষ করে শ্রীপতিবাবুর চতুর্থ পুত্র ফকিরচন্দ্রের প্রশংসা শুনে, আর এ'দের আরেক বন্ধু সত্যেন ঘোষ মশায়ের তোলা কুণ্ডু

স্পেশালের অমরনাথ অভিযান এবং দক্ষিণাপথ পরিক্রমার রঙীন চলচ্চিত্র দুটি দেখেই এ'দের সম্বন্ধে এমন করে লিখতে সাহস পাচ্ছি।

খড়্গপুরে কিন্তু শ্রীপতিবাবু আর তাঁর তিন ছেলে ছাড়া বাকী চারজনের সঙ্গে দেখা হল না। সাত ভাই—বিজয়, দুর্গাপদ, সত্যনারায়ণ, ফকিরচাঁদ, সুকুমার, শঙ্করীপ্রসাদ আর দেবদাস, দিনরাত তুফানের মতো খেটে বেড়ান। কেউ হলদিয়ার নতুন রেলপথের কাজ করছেন। কেউ যাচ্ছেন উত্তর ভারত স্পেশালে, আবার যাত্রীদের নিয়ে কেউ গেছেন দাক্ষিণাত্যে—সবাই ভীষণ ব্যস্ত। শুনলেও আনন্দ হয় যে, একটি খাঁটি বাঙালী পরিবারের প্রত্যেকেই লক্ষ্মীলাভ করার পরেও এমন মেহনত করে ব্যবসার প্রসার করে চলেছেন। শতাধিক বাঙালী কর্মচারীর কর্মসংস্থান হয়েছে কুণ্ডুদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে।

কুণ্ডু-কুললক্ষ্মী এবং কন্যাদের মধ্যে বড়বৌমা প্রভাময়ী, ফকিরজায়া কানন, শঙ্করীপ্রসাদের স্ত্রী লতিকা এবং শ্রীপতিবাবুর এক কন্যা গীতা'র আতিথেয়তার সুখ্যাতি না করলে আমার পক্ষে অকৃতজ্ঞতা হবে। এ'রা সেই 'বুকভরা মধু, বাঙলার বধু' ও কন্যা। দিনরাত্রির যে কোনো প্রহরে অভ্যাগত ঘরে এলে এ'রা হাসিমুখে অতিথিসৎকারের জন্য প্রস্তুত থাকেন। এ'দের তুলনা হয় না।

খড়্গপুর থেকে ফেরার পথে সন্ধ্যের অন্ধকারে গাড়ি ড্রাইভ করে আসছিলেন ফকিরবাবু। সঙ্গে ছিলাম আমরা তিনজন—মিত্তির, আমি আর কুণ্ডুদের কলকাতার প্রতিবেশিনী ইভা সাহা। ফকিরবাবু আর আমি তাঁদের ব্যবসার বর্তমান সমস্যা, কুণ্ডু স্পেশালকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে রেল কর্তৃপক্ষের অসহযোগ—এবম্প্রকার গূঢ় আলোচনায় মগ্ন ছিলাম। কিন্তু মিত্তির বাদ সাধলেন। নাম্বার সিকস্ ন্যাশনাল হাইওয়েতে পড়া মাত্রই তিনি 'আগুনের পরশমণি' জুড়ে দিলেন। সকালবেলায় ইভাকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলেছিল গান গাইতে পারে না—এখন দেখি সে-ও গলা মিলিয়ে গুন-গুন করছে। ফকিরবাবুরও ছোঁয়াচ লাগলো; তিনিও বেশ সুরেলা গলায় ইভার সঙ্গে যোগ দিলেন। আমিই বা কেন গান গাওয়ার এই সুবর্ণ সুযোগটি ছাড়ি; সোজা হয়ে বসে হেঁড়ে গলা ছেড়ে দিলাম।

ঘটনাটা দাঁড়ালো কুণ্ডু স্পেশালের যাত্রীদের মতো। একটু আগে ফকির বলছিলেন যে, যাত্রারম্ভে যাত্রীরা পরস্পরের একটু দূরে দূরে থাকেন, কিন্তু যত দিন যায় সখ্য বাড়তে বাড়তে ঘরে ফেরার আগে আর ভেদাভেদ থাকে না। সমাজের মানী ধনী লোক থেকে শুরু করে সাধারণ গৃহস্থ পর্যন্ত সবাই হয়ে যান সকলের আপনজন—গান করুন বা নাই করুন, সকলেরই মনে তখন বাজে একই মধুর ঐকতান।

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯



তেত্রিশ

দৃশ্যটা বড় মধুর, বড় মর্মস্পর্শী—প্রৌঢ় স্বামী তাঁর বিগতযৌবনা স্ত্রীর গলায় সোনার মটরমালাটা দুলিয়ে দিলেন। তারপরে স্ত্রীর পেছনে দাঁড়িয়ে স্বামী যখন মালার হুকটা লাগিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁর মনে পড়ছিল অনেক দিন আগের সেই বালিকাবধূর কথা—যে-চেলিপরা অগুরু-চন্দন-চর্চিতা মেয়েটিকে পিছন থেকে দু' হাতে ঘিরে প্রায় আলিঙ্গন করেই নবযুবক তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বলেছিলেন : যদিদং হৃদয়ং মম, তদিদং হৃদয়ং তব।

দিন কয়েক আগে এক সন্ধ্যেবেলায় ১৭১।১-এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের এ-সরকার অ্যান্ড সন্সের গয়নার দোকানে এই দৃশ্যটি দেখেছিলাম। মালিক শ্রীরাজেশ্বর সরকারকে আমি ইশারা করাতে তিনি রসিকতা করে আমাকে বললেন যে, মেয়েরা কিন্তু স্বামীর চেয়েও গয়না বেশী ভালোবাসে।

আমার তা মনে হয় না। মেয়েরা অলঙ্কার নিশ্চয়ই খুব ভালোবাসেন। আদিম যুগের বনফুল আর কচি বাঁশের-ডগার তৈরী দুল, গজদন্ত, পশুশৃঙ্গ, শঙ্খপ্রবালের আভরণ, তারপরে হীরে পান্নার অলঙ্কার আর মোতির মালা এবং আরও পরে তামা পেতল সোনা রুপোর মূল্যবান অঙ্গভূষণ ছাড়াও সস্তা পল্কা রেশমী চুড়ি--চিরন্তনী নারী মন প্রাণ দিয়ে সবই ভালোবেসেছেন। কিন্তু দয়িতের নিজ হাতে পরানো কণ্ঠহার, প্রেমের স্পর্শে রোমাঞ্চিত কোমল বাহুতে বেঁধে দেওয়া বাজুবন্ধ—আমার মতে সেই পাওয়ার মধ্যে আয়তীর মনে প্রণয়মাধুর্যই ফুটে ওঠে বেশী করে, লোভ নয়। রাজার ঘরের কথা জানি না, মধ্যবিত্ত স্বামী কত কষ্ট, কত পরিশ্রমে উপার্জন করে, সঞ্চয় করে স্ত্রীকে যে সুন্দর জিনিসটি গড়িয়ে দেন তাতে থাকে ভালোবাসার ছোঁয়া, আর থাকে অজানা দুর্দিনের পাথেয়। যে স্ত্রী একদিন স্বামীর কাছ থেকে রত্নাভরণের উপহার পরম আনন্দের সঙ্গে নেন, অবসর সময়ে নিজে একা একাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন আর সখীদের দেখান, সেই স্ত্রীই স্বামী-পুত্র-কন্যার মঙ্গলের জন্যে সেই অলঙ্কারই খুলে দিতে একটুও দ্বিধা করেন না। যদি সেই গহনার বিনিময়ে অসুস্থ বা বিপদগ্রস্ত স্বামী সুস্থ নিরাপদ হতে পারেন,

মেয়ের বিয়ে আর ছেলের উচ্চশিক্ষার পথ যদি প্রশস্ত হয় তাহলে মহীয়সী মহিলাদের সেই সাধের জিনিসও নিমেষে বর্জন করতে যে চোখের পলকও পড়ে না তা আমি নিজে দেখেছি।

এটাই আমাদের বাঙালী ঘরের নিয়ম। তবে অনিয়মও যে ঘটে না তা নয়, কিন্তু সেটা বিরল ঘটনা।

এ সব কথা ভালো করে জেনেশুনেও ওটা হয়ে গেছে আমাদের স্বামীদের স্টক-রসিকতা। এ-সরকার অ্যান্ড সন্সের সোল প্রোপ্রাইটার রাজেশ্বর সরকার রসিকতাটা করলেন বটে, কিন্তু তিনিও তাঁর নিজের জীবন দিয়েই জানেন যে, কথাটা সত্যি নয়। রাজেশ্বরের স্ত্রী অঞ্জলি তাঁর যৌতুকের গয়নাগুলো স্বামীর হাতে তুলে না দিলে এ-সরকার অ্যান্ড সন্সের জন্মই হতো না আর আমার এই গল্পটাও বলা হতো না।

রাজেশ্বর সরকার গিনি-হাউসের এম. বি. সরকারের ছেলে—এ কথা শুনলেই মনে হবে তাহলে আর তেমন হলো কোথায়! বড়লোকের ছেলে বাপের টাকায় দোকান খুলেছিল, এখন নাম ভাঙিয়ে ফলাও ব্যবসা করছে—এতে রোমান্টিক গল্পের মশলা কোত্থেকে আসবে? কিন্তু তা নয়, এ যে-সে মশলার ব্যঞ্জন নয়, জায়ত্রি জায়ফল এলাচ লবঙ্গের সঙ্গে এতে 'কিশোরী' রঙেরও কয়েক চিমটে ছোঁয়ানো আছে; সেটা ভালো করে আসবে গল্পের শেষের দিকে। আগেরটা আগে বলে নিই।

সরকারদের জমিজিরেত কিছু ছিল বটে, কিন্তু নগদ বলতে কিছু ছিল না। বিশ্বেশ্বর সরকারের বড় ছেলে হাজারীলাল চাকরি করতেন। কোনো কারণে তাঁর ক্যাশ টাকার ভীষণ দরকার পড়লো। যে করে হোক সেটা যোগাড় করতে না পারলে মান ইজ্জত যায়। হাজারীলাল তাই বাবা আর ভাইয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করে মায়ের আর স্ত্রীর গয়না বিক্রি করেই টাকাটার সংস্থান করা ঠিক করলেন। কিন্তু বেচতে গিয়ে দেখেন গয়নার ন্যায্য দাম পাওয়া যায় না। ব্যাপার দেখে সেই শিয়রে-সংক্রান্তি অবস্থাতেও অন্য একটা চিন্তা তাঁর মাথায় শিকড় গেড়ে বসলো। দায়ে পড়ে মানুষ যখন আপনজনের গায়ের গয়না বাজারে বিক্রি করতে যায় তখন যে এমনি করে মোটা লোকসানে তা হাতছাড়া করতে হয়, এর কি কোনো প্রতিকার নেই? অথচ হাতে টাকা থাকলে পরিবার পরিজনের জন্যে গয়না গড়াতে মানুষ দু দশ টাকা বেশী খরচ করতেও কুণ্ঠিত হয় না, যদি বোঝে যে খাঁটি জিনিসটি সে পাচ্ছে. আর বিপদের সময়ে সেটা বন্ধক রেখে বা বিক্রি করে ন্যায্য অঙ্কের টাকা সে পাবে।

প্রতিকারের জন্যে হাজারীলাল নিজেই অলঙ্কারের ব্যবসায় নামা ঠিক করে ফেললেন। কিন্তু তাঁর একার পক্ষে উল্লেখযোগ্য কিছু করার মতো ক্ষমতা ছিল না। যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহের জন্য তিনি পথ খুঁজছিলেন, এমন সময়ে এক পুজোর ছুটিতে আসাম থেকে কলকাতায় এলেন তাঁর চতুর্থ ভ্রাতা মন্মথভূষণ। তিনি আসামের এক ইংরেজ চা-করের বাগিচায় কাজ করতেন। সে কালের ইংরেজ প্লান্টাররা এ-দেশী কর্মচারীদের সঙ্গে সাধারণত কেমন ব্যবহার করতেন সেটা আমরা সকলেই মোটামুটি জানি। সেখানে চাকরি করার স্পৃহা মন্মথভূষণের অনেক আগেই

ঘ্‌চে গিয়েছিল। মাইনে অবশ্য তিনি মন্দ পেতেন না; মিতব্যয়িতা বজায় রেখে তিনি সেই পারিশ্রমিক থেকে গোপনে সঞ্চয় করতেন।

ছ্‌টিতে বাড়ি এসে যখন তিনি শ্‌নলেন যে বড়দা হাজারীলাল চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় নামছেন তখন তিনিও পরম আগ্রহে দাদার সঙ্গে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন এবং দাদার সম্মতি পেয়ে অবিলম্বে চাকরি ছেড়ে দিলেন।

১৯০৪ সাল থেকে তোড়জোড় করে ১৯০৫-এ হাজারীলাল ও মন্মথভূষণের ব্যবসার পত্তন হলো। এঁদের পিতৃদেব বিশ্বেশ্বর সরকার মহাশয় তখন জীবিত; তাঁর নামেই দোকানের নাম রাখা হলো বি-সরকার অ্যান্ড সন্স। শেয়ালদার খ্‌ব কাছে ১৬০ নম্বর বউবাজার স্ট্রীটে বি-সরকারের শো-র্‌ম ও অফিস স্থাপিত হলো।

যে সমস্ত কারণে সেদিন প্‌রনো সোনার গয়না বিক্রি করে লোকে ন্যায্য দাম পেত না তার ব্যাখ্যা করে এ সরকারের মালিক রাজেশ্বর এবং তাঁর বন্ধ্‌ ও সহকর্মী স্‌ধীন নিয়োগী বললেন যে, অতীতে স্বর্ণকাররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খরিদ্দারের কাছ থেকে প্‌রনো গয়না পেতেন, যে-সব ভেঙে তাঁদের নতুন গয়না গড়ে দিতে হতো। নতুন বাট থেকে তৈরী গয়না খ্‌ব বেশী হতো না। প্‌রনো গয়না গলালে তার সোনার সঙ্গে আগের যে 'পান' (জোড়াতাড়া দেবার জন্যে সোনার সঙ্গে র্‌পো এবং তামার খাদ) থাকতো সেটা মিশে যেত এবং তারপরে যখন তা থেকে নতুন গয়না গড়ানো হতো তখন আর এক প্রস্ত খাদ মিশে সোনার মান আরও নেমে যেত। এই-ভাবে একই গয়না বারবার ভেঙে গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত সেটা মরা সোনায় পরিণত হতো। অতএব প্‌রনো গয়না বিক্রি করতে গেলে ন্যায্য দাম পাওয়া লোকের পক্ষে অসম্ভব হতো।

আরও একটা কারণ ছিল; সেকালের বাঙালী স্বর্ণকারদের শো-র্‌ম বা তৎসংলগ্ন কারখানা বলতে তেমন কিছ্‌ থাকতো না। তাঁরা বাড়ি বাড়ি ঘ্‌রে অর্ডার আনতেন এবং কিছ্‌টা নিজেরা তৈরি করতেন ও বেশীর ভাগটা ফ্‌রনে তৈরি করতে দিতেন কর্মকারদের কাছে। এক্ষেত্রে কর্মকার কিন্তু লৌহশিল্পী কামাররা নন; এঁরা হচ্ছেন যাঁদের আমরা স্যাঁকরা বলে থাকি চলতি কথায়। রাজেশ্বর সরকার একটা উদাহরণ দিলেন। স্বর্ণকার কর্মকারকে একটা ৮ ভরি ওজনের কঙ্কণ সাত দিনের মধ্যে তৈরি করার ফ্‌রন দিলেন; তার মজ্‌রী ঠিক হলো তখনকার দিনের ৫ টাকা। কর্মকার সেই পাঁচ টাকা তো পেলেনই, উপরন্তু কঙ্কণটি তৈরি করতে যে 'পান'-ট্‌কু কর্মকার ব্যবহার করলেন, ঠিক সেই ওজনের সোনাও তিনি প্রাপ্য হিসেবে নিলেন। এই রেওয়াজকে কেউ অসাধ্‌তার পর্যায়ে না ফেললেও উৎপাদনের এটা একটা প্রকান্ড গলদ ছিল।

হাজারীলাল ও মন্মথভূষণ দোকান খোলার সঙ্গে সঙ্গেই এই সমস্ত দোষ ত্র্‌টি শোধরাতে আরম্ভ করলেন।

কর্মকারকে ফ্‌রনে কাজ দেওয়ার পথ একেবারেই না মাড়িয়ে মাস মাইনের মিস্ত্রী রেখে শো-র্‌মের সংলগ্ন নিজ কারখানাতে চোখের সামনে গয়না গড়ানো আরম্ভ করলেন।

এর ফলে বি-সরকারের গয়নার সোনার মান বাজারের চাইতে অনেক উন্নত হলো; খরিদ্দার ঠিক যত ক্যারাটের যে জিনিসটি চাইতেন তাই পেতে লাগলেন।

হাজারীলালই প্রথম বাঙালী যিনি বি-সরকারে নির্মিত গহনায় '২২ সি. টি.' এবং 'বি. এস.' মার্কা দিয়ে গ্যারান্টি-করা সোনার জিনিস কলকাতায় চালু করলেন।

সঙ্গে আছেন সদালাপী মন্মথভূষণ। ক্রেতারা তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ; অধিকন্তু প্রতিটি গয়নার সঙ্গে তাঁরা পাচ্ছেন প্রয়োজন মতো টাকা ফেরতের গ্যারান্টিপত্র। মুখে মুখে কথাটা সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়লো, আর সামান্য দু এক বছরের মধ্যেই বি-সরকার অ্যান্ড সন্সের ব্যবসা বিরাট রূপ নিল। সেই সময়ে এ'দের মেজো ভাই বিভূতিভূষণ, সেজো প্রমথভূষণ এবং কনিষ্ঠ চারুচন্দ্রও ব্যবসাতে যোগ দিলেন।

কৌতূহলোদ্দীপক একটা খবর দেওয়া হয়নি—বি-সরকারের প্রথম বড় অর্ডার এসেছিল কলকাতার বিখ্যাত নস্কর পরিবার থেকে—৮০ ভরি ওজনের কোমরের বিছেহার। ওজন শুনে এখনকার স্লিম বাঙালী মহিলারা বোধ হয় মূর্ছা যাবেন। আজকের ট্র্যাভেল-লাইট আধুনিকারা সেকালের 'চলন্ত গিনি-হাউস' গরীয়সীদের কাহিনী শুনেই থাকেন; দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার মত প্রবীণদের। সেকালের ধনী ঘরের মহিলারা পুজো পার্বণ আর বিয়ে বউভাতে যখন একসঙ্গে দু চারশো ভরি সোনা আর জড়োয়া গয়না পরে উপস্থিত হতেন তখন পঁচিশ ওয়াটের বাতির আলোতেই তাঁদের ঝাড়লণ্ঠনের মত দেখাতো। সেদিন এক বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে কিন্তু দেখলাম যে এখন লুপ্তোদ্ধার পর্ব চলছে। উনিশ কুড়ি বছরের একটি মেয়ে, খুব সুন্দর দেখতে মেয়েটি আর তার নামটাও বেশ মানানসই, স্নিগ্ধা—নাক থেকে কান পর্যন্ত টানা একটা ফাঁদি নথ পরে টেবিলে টেবিলে ঘুরে অতিথি আপ্যায়ন করছে। মেয়েটি আমার চেনা; তাকে ডেকে তার রুচির প্রশংসা করাতে সে বললো, "আপনিই একমাত্র অ্যাপ্রিশিয়েট করলেন, বাড়ির সবাই আমাকে খুব বকাবকি করেছেন।"

'অ্যাপ্রিশিয়েট' তো করলাম কিন্তু ওই সাত আট ভরির গয়না মেয়ে বউকে গড়িয়ে দেবার সামর্থ্য আজ ক'জন বাপের আছে?

২২ সি. টি.—বি. এস-এর কথায় আমার হল-মার্ক-এর ইতিহাসটি মনে পড়ে গেল। 'হল-মার্ক', শব্দটার উৎপত্তি ইংল্যান্ডে, ১৭২১ সালে। সেই আড়াই শো বছর আগেই ইংরেজ স্বর্ণকাররা ক্রেতার আস্থাভাজন হবার জন্যে তাঁদের 'গোল্ডস্মিথ' কম্পানি-র মাধ্যমে ধাতুর বিশুদ্ধতাজ্ঞাপক যে ছাপ গয়নাগাঁটি আর সোনারূপোর তৈরি জিনিসে মারতে শুরু করেছিলেন তাকেই বলে হল-মার্ক। উত্তরকালে ইংরেজ সরকারও হল-মার্ক ব্যবহার করতেন সরকারী সোনা-রূপো বিক্রির সময়ে। আপনারা বিলেত সফরে গিয়ে যখন রূপো বা সোনার সিগারেট কেস কিনে আনেন তখন লক্ষ্য করবেন তার ভেতরে হল-মার্ক আছে কি না; না থাকলে বুঝবেন জিনিসটা খাঁটি নয়।

১৬০ নম্বরের ভাড়া বাড়ি থেকে সরকার মহাশয়রা ১৯১৫ সালে ১৩০ বউবাজার স্ট্রীটে নিজেদের বাড়ি 'গিনি হাউস'-এ উঠে এলেন। বিশ্বেশ্বর সরকার এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হাজারী-লালের মৃত্যু হলো। কিন্তু হাজারীলালের অনুজবৃন্দ সসম্মানেই কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। বউবাজারের শো-রুম সব সময়েই লোকে লোকারণ্য তো থাকতোই, দরকার হলে সরকাররা খরিদ্দারের বাড়ি গিয়েও অর্ডার আনতেন।

মন্মথভূষণের বড় তিন ছেলে—গোষ্ঠবিহারী, কৃষ্ণগোপাল এবং পুলিনবিহারী—ইতিমধ্যে ব্যবসাতে যোগ দিয়েছেন। গোষ্ঠবিহারী বিশ্বেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পৌত্র। স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তে পড়তেই ১৯৩০ সালে তিনি অ্যাকাউন্ট্যান্সি ও বিজনেস অর্গানাইজেশন শিখতে বিলেত যাত্রা করলেন। কিন্তু বছর দুই সেখানে কাটিয়ে ডিগ্রি-ডিপ্লোমা পাওয়ার আগেই মন্মথভূষণের কঠিন অসুখের জন্যে তাঁকে কলকাতায় ফিরে আসতে হল।

বিলেত থেকে ফিরে ব্যবসাতে আবার ঢোকার পর গোষ্ঠবিহারী কিন্তু বিপদে পড়ে গেলেন। তাঁর অর্জিত বিদ্যা ব্যবসাতে প্রয়োগ করতে গিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে তাঁর পদে পদে মতের অমিল হতে লাগল। মন্মথভূষণ তখন সেরে উঠেছেন। তিনি দেখলেন যে, এভাবে পরস্পরের মধ্যে প্রীতিসম্পর্কের অবনতি ঘটতে দেওয়া উচিত নয়। তাই যে-দোকানের সঙ্গে তাঁর নাড়ির সম্পর্ক, সেই বি-সরকার অ্যান্ড সন্স থেকে বেরিয়ে এসে তিনি নিজের আলাদা দোকান খোলা স্থির করলেন। তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে এলেন কিছুদিন পরেই। সেটা ১৯৩২।৩৩ সালের কথা। বৌবাজার স্ট্রীট ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে প্রাতঃস্মরণীয় নির্মলচন্দ্র চন্দ্র মশায়ের অনুজ, আই. সি. এস. এবং উত্তরকালে কলকাতা হাইকোর্টের জজ, স্বর্গীয় কমল চন্দ্রের বাড়ির একতলার পুরোটা ভাড়া নিয়ে 'এম. বি. সরকার অ্যান্ড সন্স (সন অ্যান্ড গ্র্যান্ডসন্স অব লেট বি-সরকার)' প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হল ১৯৩৪ সালে। কয়েক বছরের মধ্যেই এম. বি. সরকার অ্যান্ড সন্সের যে সুনাম ও সমৃদ্ধি হয়েছিল, তার বিবরণ দিয়ে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি করতে চাই না। সারা বাংলা দেশ এবং বাংলার বাইরেও সেই প্রতিষ্ঠানের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এখন তার অস্তিত্ব না থাকলেও আজও বহু লোক বি-সরকার এবং এম. বি. সরকার জুয়েলার্সকে এক কথায় চেনে। সেই পরিবারের বংশধরদের মালিকানায় কলকাতা শহরে এখনও দশ-এগারোটা বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে। রাজেশ্বরবাবুর এ সরকার অ্যান্ড সন্স তার অন্যতম।

মন্মথভূষণের মৃত্যু হল ১৯৩৪ সালেই। তাঁর ছয় ছেলের মধ্যে গোষ্ঠবিহারী, কৃষ্ণগোপাল ও পুলিনবিহারী তখন সাবালক, লক্ষ্মীকান্ত ও ব্রজেশ্বর নাবালক, এবং কনিষ্ঠ রাজেশ্বর মাত্র এক বছরের শিশু।

১৯৩৪ থেকে ১৯৫৫—এই একুশ বছরে এম. বি. সরকার অ্যান্ড সন্স ভারতজোড়া নাম কিনলো। কলকাতার শো-রুম ও কারখানার প্রভূত উন্নতি সাধন ছাড়াও বছর বছর পুজোর সময়ে স্পেশাল এক্জিবিশন ট্রেন-এ এম. বি সরকারের অলঙ্কার প্রদর্শনী বাংলা দেশের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতো, বাংলার বাইরেও গিয়েছিল দু' একবার। একবার যে এম. বি. সরকারের গয়না কিনতো, সে নিজেই শুধু বারবার ফিরে আসতো না, সঙ্গে আনতো আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব। অলঙ্কার শব্দটি উচ্চারণ করলেই লোকের মনে এম. বি. সরকারের শো-রুম আর ক্যাটালগের ছবি ভেসে উঠতো। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রপূর্ব যুগের অনেক লেখকের গল্প-উপন্যাসে হ্যামিলটনের বাড়ির গয়না আর রুপোর বাসনকোসনের উল্লেখ পেয়েছি (ডালহাউসি স্কোয়ারের কাছে আজও হ্যামিলটনের মস্ত শো-রুম দাঁড়িয়ে আছে)। এম. বি. সরকার অ্যান্ড সন্সের গহনার খ্যাতিও সেই পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। দক্ষিণ কলকাতার হিন্দুস্থান মার্ট এবং জামসেদপুরেও প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলা হল।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, লক্ষ্মীর অপার কৃপালাভ সত্ত্বেও বি-সরকারের মতো এম. বি. সরকারের মূল প্রতিষ্ঠানটিও আজ অবলুপ্ত। আজ তাঁদের বংশধররা একটির জায়গায় আলাদা আলাদা দশ-এগারোটি প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। রূপক করে বলা চলে যে, খাঁটি সোনার মানের অবনয়ন ঘটেছে।

মন্মথভূষণের কনিষ্ঠ পুত্র রাজেশ্বরের অলঙ্কার ব্যবসায় হাতেখড়ি এম বি. সরকারের বালিগঞ্জের দোকানে। তাঁর তখন বয়স আঠারো উনিশ। স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে পড়ার তাঁর খুব সাধ ছিল, কিন্তু দাদারা তাঁর ওপর এত কাজের ভার দিলেন যে, তা আর হয়ে উঠলো না। কিন্তু তাঁর খুব একটা লাভ হল এই যে, দু-চার বছর বালিগঞ্জের দোকানে শিক্ষানবিসী করে কেবল ব্যবসা শেখাই হল না, ও-পাড়ার মহিলা মহলে তিনি সুপরিচিত হয়ে গেলেন। কিশোর ছেলেটির কাছে মেয়েরা কেউ হলেন দিদি, কেউ বউদি, কেউ মাসিমা আর কেউ পিসিমা। এত বছর পরে আজও তিনি মহিলাদের সঙ্গে সেই সম্পর্ক রেখেই একান্ত আপন জনের মতো ব্যবহার করেন। তাঁর দোকানের সুন্দর ডিজাইনের গয়না ছাড়াও খরিদ্দারের সঙ্গে তাঁর এই সুন্দর ব্যবহারই তাঁকে আজ লক্ষ্মীলাভ করিয়েছে।

নাকি আমি ভুল বললাম! রাজেশ্বরকে লক্ষ্মীলাভ করিয়েছেন তো তাঁর গৃহলক্ষ্মী অঞ্জলি। না, সে পরিচ্ছেদটা এখনও মুলতুবী থাক একটুক্ষণের জন্যে।

তাঁকে কলেজে পড়তে দেওয়া হচ্ছে না বলে রাজেশ্বর একদিন অভিমান করে দাদাদের আশ্রয় ছেড়ে একাই বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। সামান্য কিছু টাকা যোগাড় করে বালিগঞ্জের দোকানটা ছোট্ট করে খুললেন ১৯৫৭ সালে। কিন্তু দোকান আর চলতে চায় না। কখনো নগদ টাকার অভাবে সময়মতো সোনা কেনা হয় না, আবার কখনো কারিগরকে মাইনে দিতে দেরি হয়ে যায় বলে তাঁরা কাজ করতে চান না, এইভাবে দিন গুজরান হচ্ছিল।

এমন সময়ে ঘটনাচক্রে ছোট একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। কোন্ এক আত্মীয় না বন্ধুর পাত্রী দেখতে গিয়ে পাত্রপক্ষের পিছনের সারি থেকে একুশ বছর বয়সের রাজেশ্বর কিশোরী অঞ্জলিকে দেখলেন। দেশপ্রিয় পার্কের পাশে রায়সাহেব স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র বসুর বাড়ি। অঞ্জলি দেবী অনুকূলচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা। বার বার রাজেশ্বরের তাঁর দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টিপাত কিশোরী মেয়েটির মনেও আনলো চাঞ্চল্য।

এসব গোপন কথা আমি শুনেছি রাজেশ্বরের আবাল্য সুহৃদ ও সহচর সুধীন নিয়োগীর কাছ থেকে। কাহিনীটা পড়ে আপনারা বয়োজ্যেষ্ঠরা বলবেন, "বাব্বাঃ, আজকালকার ছেলেমেয়ে-গুলি কী পাকা!" কিন্তু তাহলে তো চোদ্দ বছরের শকুন্তলা (পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে) ও জুলিয়েটরাও পরমপাকার দলে পড়েন।

যাই হোক, এর পরে কী করে যেন পথেঘাটে রাজেশ্বর আর অঞ্জলির দেখাশোনা হতে লাগলো এবং প্রজাপতির নির্বন্ধে অনতিবিলম্বে তাঁদের পরিণয় মঙ্গলোৎসব অনুষ্ঠিত হল।

একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি—রাজেশ্বরের মা শেষ বয়সে এই কনিষ্ঠ সন্তানের কাছেই থাকতেন এবং রাজেশ্বরের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

বিয়ের পরেই অঞ্জলি স্বামীর টাকার টানাটানি, প্রতিদিন বিব্রত থাকাটা লক্ষ্য করলেন। কয়েকদিন পরে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। অবস্থাপন্ন পিতার দেওয়া যৌতুকের গয়নার—তা প্রায় দশ-বারো হাজার টাকার গয়না হবে—প্রায় সবটাই তরুণ স্বামীর হাতে তুলে দিলেন ষোলো-সতেরো বছরের সেই নববধূ। এ সরকার অ্যান্ড সন্স-এ নতুন প্রাণের সঞ্চার হল সেই কিশোরীর অকৃপণ দাক্ষিণ্যে। তাঁর কল্যাণহস্তের স্পর্শটুকুর জন্যেই রাজেশ্বরের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যেন এতদিন অপেক্ষা করে ছিল।

অঞ্জলির বড়দা শ্রীঅসীম বসুও তরুণ ভগ্নীপতিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। ন্যাশনাল গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের চীফ ম্যানেজারের সচিব হিসেবে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দিয়ে রাজেশ্বরকে তিনি নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন।

সাতান্ন থেকে বাষট্টি সাল পর্যন্ত এ-সরকারের ব্যবসা প্রচুর উন্নতি করলো।

তারপরেই এলো চীনের আক্রমণ, যার ফলে এলো ভারতরক্ষা আইনের কড়াক্কড়ি এবং আমাদের মোরারজীভাইয়ের গোল্ড কণ্ট্রোল রুল। স্বর্ণকারদের অনেকের ব্যবসা চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল আর অনেকে করলেন আত্মহত্যা। (সোনার বিশুদ্ধতার পরিমাপ হলো ২৪ ক্যারাট, সোজা কথায়, খাঁটি সোনার মাপ হলো ২৪ ক্যারাট। গিনি সোনার হলো ২২ ক্যারাট। গিনি সোনার সঙ্গে ১ ক্যারাট আন্দাজ রুপো আর তামার 'পান' মেশানো মিশ্র ধাতুতেই সবচেয়ে ভালো গয়না গড়া যায়। গোল্ড কণ্ট্রোলে বেঁধে দেওয়া হল যে, ১৪ ক্যারাটের বেশী সোনা অলঙ্কার নির্মাণে ব্যবহার করা চলবে না। তাহলে কী করে ব্যবসা চলবে, এই ভেবেই স্বর্ণকারদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়ে মিছিমিছি কতকগুলি নিরপরাধ মানুষ আত্মবিসর্জন দিল। এখন অবশ্য সেই আইনের বাঁধাবাঁধি অনেকটা কমেছে। ধীরে ধীরে সেটা আরও কমবে বলেই আশা হয়, কারণ, মোরারজীকে আমরা যা-ই বলি না কেন, রাশিয়া প্রমুখ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সহায়তা তো আছেই, অধিকন্তু তিনি পাকেপ্রকারে অ-কমিউনিস্ট ধনী দেশগুলো থেকেও আরও অনেক অর্থসাহায্য আনার রাস্তা প্রায় করে ফেলেছেন। অবশ্য ঠিক তাঁর নিজের হাতযশে এটা ঘটবে বলে বলা চলে না, ভিয়েতনামে মার্কিন রাজনীতির বর্তমান দৈন্যই তার প্রধান কারণ হবে বলে মনে হচ্ছে)।

গোল্ড কণ্ট্রোলের আগে বাংলা দেশে জড়োয়া গয়নাতে ছাড়া ১৪ ক্যারাট-এর প্রচলন ছিল না। জড়োয়াতে আরও কম ক্যারাটের সোনাও চলতো। সাধারণ গয়না, মানে যে-সব গয়নায় নক্সা, মণিপুরী বা কট্‌কী কাজ হয়, তা যে ১৪ ক্যারাট সোনায় হতে পারে, সে কথা বাংলা দেশের কর্মকাররা ভাবেননি। সেই জন্যেই বৃথা আত্মবিসর্জনের কথাটা আগে বললাম। আসল ব্যাপারটা ছিল শত্রুর আক্রমণ। সেই অবস্থায় মানুষ ২২ ক্যারাট কেন, ৯ ক্যারাটের গয়না গড়াবার কথাও ভাবতে পারছিল না।

১৯৬৩-৬৪ সাল। বেচাকেনা প্রায় বন্ধ। কিছুটা ন্যায্য কারণবশত এবং কিছুটা অহেতুক ত্রাসে সোনার ব্যবসার কাঠামোটাই ভেঙে পড়োপড়ো। মোরারজীভাইও স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের বিকল্প প্রচেষ্টার দিকে ঝুঁকতে উপদেশ দিয়ে ফেলেছেন। এক ভদ্রলোকের উৎসাহে রাজেশ্বর সোদপুরে জমি কিনে এক লোহেতর ধাতুর ফাউন্ড্রী খুলে বসলেন, অর্থাৎ অব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন। এই উদ্যোগে বেশ কিছু টাকা খরচ করলেন, অর্ডার-টর্ডারও বেশ পাচ্ছিলেন, কিন্তু যে ভদ্রলোক তাঁকে এই কাজে নামিয়েছিলেন, তিনি অন্যত্র বেশী মাইনের কাজ পেয়ে মধ্যপথে বিদায় নিলেন। মাঝের থেকে রাজেশ্বরবাবুর কতকগুলো লোকসান হয়ে গেল। তিনি আবার ঘরে ফিরে এলেন। আবার সেই গয়নার ব্যবসা। তিনি এবার ১৪ ক্যারাট সোনার গয়না গড়ে তার প্রচার ও প্রচলনের চেষ্টায় গ্রাহকের বাড়ি বাড়ি যেতে লাগলেন। সেই উদ্যোগের ফলে নীচু মানের সোনাও খানিকটা জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। বিক্রি বেশ কিছুটা বেড়ে গেল।

ছেষট্টি সালে ভারত সরকার কন্ট্রোল অর্ডার শিথিল করে আবার ২২ ক্যারাটের গয়না গড়ার অনুমতি দিলেন। এ-সরকার অ্যান্ড সন্স আবার পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ করলেন। তারপরে এই দু' বছরে এ সরকার অ্যান্ড সন্সের বিক্রি প্রকাণ্ড আকার ধারণ করেছে। দোকানের ওপরের অপ্রশস্ত জায়গার কারখানায় অনেকদিন ধরেই কুলোতো না, তাই ১০৭ নং মতিলাল নেহরু রোডে এ সরকারের বড় কারখানা বসানো হয়েছিল। সেখানে এখন উনিশ-কুড়িজন কর্মকার ও কারিগর কাজ করেন। রাজেশ্বর ও সুধীন নিয়োগীর সহকর্মী হিসেবে আছেন প্রবীণ শ্রীপ্রফুল্লকুমার নাগ—সরকার পরিবারের সঙ্গে যাঁর দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের সম্পর্ক। ক্যাশিয়ারের দায়িত্বপূর্ণ পদে যিনি আছেন তিনিও প্রবীণ ব্যক্তি; নাম শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার। হিসাবরক্ষক শ্রীজ্যোৎস্নাবরণ রায়ের নামও উল্লেখযোগ্য। অগণী সাউ, আনন্দ মন্ডল প্রমুখ পাঁচ-ছ'জন সেলস্‌ম্যানদের সকলের নাম করা সম্ভব নয়। তাঁরা সকলেই তরুণ হওয়া সত্ত্বেও এরই মধ্যে প্রচুর দক্ষতা অর্জন করেছেন।

কারখানায় যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শেখ মোসলেম আলি এবং শ্রীনিবারণ পাল। এঁরা সুপারভাইজার। এ সরকার অ্যান্ড সন্সের দুটি নেপালী দারোয়ান এবং একটি বিহারী ড্রাইভার ছাড়া সবাই বাঙালী।

রাজেশ্বর আর সুধীনকে আমি সেদিন সন্ধ্যেবেলার প্রচণ্ড ভিড়ে কোনঠাসা হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম যে, যেদিন ভিড়টা একটু কম থাকে সেদিন এলে পারতাম। শুনে রাজেশ্বর সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, "সন্ধ্যেবেলায় এলে প্রায় রোজই এখন এমনি ভিড় পাবেন। তবে আপনার চেনা অনেকের দেখা এখানে পাবেন।" যেমন, শিল্পী যামিনী রায় মশায়ের বাড়ীর লোক (দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাঁদের আমি চিনি না), রাধারাণী দেবী (হ্যাঁ, বাল্যকাল থেকে তাঁর কবিতা পড়া ছাড়াও তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি আমাদের নবনীতা সেনের মা বলে), আশাপূর্ণা দেবী ও প্রতিভা বসু (সাহিত্যজগতের এই উজ্জ্বল তারকাদের আমি সসম্ভ্রমে দূর থেকে দেখি), অন্নদাশঙ্কর (ছেলে-বেলায় এঁর সঙ্গে যথেষ্ট জানাশোনা ছিল) প্রমুখ কলকাতার 'এলিট' সমাজের অনেকের নাম করলেন রাজেশ্বর সরকার।

তিনটি মহিলা ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। একজন আমার বেশ চেনা, শিল্পী রণেন

আয়নের স্ত্রী, হিল্লোলা আয়ন দত্ত। তাঁরা নিজেদের জন্যে প্রথমসারিতে জায়গা করে নিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে একটি সদ্যনির্মিত কঙ্কণের কারুকার্য পরীক্ষা করতে লাগলেন।

আর আমি আরও একটু কোনঠাসা হয়ে এ সরকারের ক্যালেন্ডারের ঐরাবতরূঢ়া লক্ষ্মী-দেবীর (কোন্ পুরাণে মালক্ষ্মীর এই রূপ আছে সেটা আমার জানা নেই) ছবির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

২১ ডিসেম্বর, ১৯৬৮





চৌত্রিশ

'অলরাইট ভেরী গুড
পাঁউরুটি বিস্কুট'

ছেলেবেলায় ডাংগুলি, লাট্টু, আর মার্বেল খেলার সময়ে আমাদের যেসব রানিং কমেন্টারি চলতো তার মধ্যে 'নাথিং নট কিচ্ছু' আর 'অলরাইট ভেরী গুড'-টা আমরা খুব বলতাম। আরও কী কী যেন বলতাম মনে নেই।

সব বাড়িতে তখনো সকাল বিকেল পাঁউরুটি টোস্ট খাবার রেওয়াজ হয়নি। কেউ খেতো বাড়ির তৈরী লুচি তরকারি, কেউ মুড়ি চিঁড়ে, আবার কারও চলতো দোকানের জিলিপি কচুরি। আমাদের বাড়িতে কিন্তু আমরা সবাই সকাল বেলায় জলখাবার খেতাম রুটি মাখন দিয়ে। আগের দিন বিকেলে রাজাবাজারের মুসলমান রুটিওয়ালা তার বাজরাতে (চ্যাপ্টা গোল ঝুড়িতে) থাকে থাকে সাজানো গরম গরম পাঁউরুটি থেকে আমাদের দুটো একটা দিয়ে যেতো। তার গন্ধ ছিল অপূর্ব। এখনকার মতো ওয়াক্স-পেপারে মোড়া দুগ্ধহীন মিল্ক-ব্রেড আর মাখনের নামগন্ধ ছাড়া 'বান' তখন ছিল না।

কিন্তু সেই হাতে গরম তাজা রুটি মা আমাদের খেতে দিতেন না; বলতেন, পাঁউরুটি বাসী না হলে খেতে নেই। কেন খেতে নেই তার বৈজ্ঞানিক কারণটা আমাদের মা-ও বোধ হয় ঠিক জানতেন না।

এতকাল পরে সেদিন 'আর্য বেকারী অ্যান্ড কনফেকশানারী'-র মালিক শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ মশায় ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন।

ময়ান দিয়ে ঠাসা ময়দার খামির-এ (ডো-তে) নুন, চিনি ও দু একটা কেমিক্যালের সঙ্গে মদ অর্থাৎ বীয়ার-এর গাদ—এক কথায় যার নাম 'ইস্ট'—মিশিয়ে নিতে হয়। 'ইস্ট'-এর বিকল্প আরও একটা বস্তু আছে 'হপস্'; তারও প্রয়োজন হয়। তারপরে আবার কিছুটা দলাই-মলাই করে রুটির ছাঁচে সেই খামির ভরে দিতে হয়। এক দেড় ঘণ্টা ফেলে রাখলেই দেখা যাবে

আর্য বেকারী অ্যান্ড কনফেকশানারী
৪/১ পন্ডিতিয়া রোড,
কলিকাতা ২৯

কাঁচা রুটিটা ফুলে ফেঁপে উঠছে—কচি কাঁচা মেয়েটা যেন বাল্য আর কৈশোর পেরিয়ে এক লাফেই মদালসা যুবতী হয়ে উঠেছে।

আসলে সেটা তখন গাঁজিয়ে, মানে তার মধ্যে 'ফারমেণ্টেশান' হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস হচ্ছে আর নানা ব্যাক্টিরিয়া জন্মাচ্ছে। এর পরে সেই ফোলা ফোলা খামির সুদ্ধ ছাঁচগুলোকে 'অভেন' বা তন্দুরে ঢুকিয়ে আধ ঘণ্টা সেঁকে বের করবার পর তৈরী রুটি নিরাপদে খাবার যোগ্য হতে ৫।৬ ঘণ্টা লাগে। ততক্ষণ ওই তাজা বর্ণচোরা পাঁউরুটি দুষ্পাচ্য থাকে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে সেই রুটিই খেয়ে হজম করা এত সহজ হয় যে, ডাক্তাররা রোগীদেরও তাই দিয়ে পথ্য করান।

সুধাংশুবাবুর বাবা স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের লেখা 'পাশ্চাত্ত্য পাক প্রণালী ও বেকারী দর্পণ' বইটিতেও দেখলাম একই কথা আছে। আরও জানলাম যে, বিলেতে যে-সব কড়া কড়া ব্রেড ল'জ আছে তাতে আছে যে, তৈরির ছয় না আট ঘণ্টা পেরোবার আগে কোনো পাঁউরুটি গ্রাহককে বিক্রি করলে 'বেকার'-এর কঠিন দণ্ড হবে এবং তাঁর রুটি তৈরির লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

শরৎবাবুর বইটিতে আরও অনেক টীকা ও ভাষ্য আছে। পড়তে জিবে জল আসে। তাতে এ-ও আছে যে, 'ইস্ট' বা 'হপস্' পাওয়া না গেলে খাঁটি স্বদেশী তাড়ির গাদ দিয়েও পাঁউরুটি বানানো যায়। বইটা এখন আর পাওয়া যায় না।

গ্রন্থটির মুখবন্ধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র লিখছেন: "প্রিয় শরৎচন্দ্র, তুমি যে উন্নত এবং আধুনিক ধরনের 'বেকারী' স্থাপন করিয়া একটি নূতন অর্থোপার্জনের পন্থা সাধারণকে দেখাইয়া দিয়াছ, ইহাতে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি।...বিভিন্ন কারবার বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তোমার ন্যায় যদি স্বীয় অভিজ্ঞতার দ্বারা বেকার সমস্যা সমাধানের ভিন্ন ভিন্ন পথ দেখাইয়া দেন তবে দেশের ও জাতির অশেষ কল্যাণ হয়।"

আর গ্রন্থপ্রণেতার পরিচয় দেওয়া আছে Late Officer-in-charge Bengal Criminal Intelligence Bureau অর্থাৎ বাংলা পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার। সেকালের রায়-সাহেবের পুত্র, স্বয়ং পুলিস অফিসার ভদ্রলোকের চরিত্রের এই দিকটা আমায় চমৎকৃত করলো।

শরৎচন্দ্রের বাবা রায়সাহেব তারাপদ ঘোষ মহাশয় ছিলেন ২৪ পরগনা—আলিপুরের রেজিস্ট্রার। অর্থাৎ বাপ-ছেলে দু'জনেই সরকারি চাকুরে ছিলেন।

সুধাংশুবাবু বললেন যে, শরৎচন্দ্রের চাকরিতে স্পৃহা কোনোদিনই ছিল না। মনে-প্রাণে তিনি প্রফুল্লচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন। তাই শরৎচন্দ্র তাঁর বড় দুই ছেলে সুধাংশুকুমার ও হিমাংশুকুমারকে কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়িয়েই পড়া ছাড়িয়ে ব্যবসাতে ঢুকিয়ে দিলেন।

ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়াতে শরৎবাবুর নিজ বাড়ি। ১৯২৭ সালের ১১ নভেম্বর চার আনা, মানে আজকের পঁচিশ পয়সার ময়দা এনে রুটি তৈরির ট্রায়াল হলো। ট্রায়াল সাকসেসফুল—এবারে শুরু হলো ছোট সাইজের পুরো একটি 'বেকারী' বসানোর তোড়জোড়।

বাড়ির সংলগ্ন জমিতে একটি জার্মান 'হাবাম্ফা' মিক্সিং মেশিন (ময়দা মাখা ও ঠাসার জন্যে) ও দু'টি ছোট ছোট ফায়ারব্রিক-এর তৈরী তন্দুর বসিয়ে কিছু দিনের মধ্যেই 'আর্য বেকারী অ্যাণ্ড

কনফেকশ্যনারী'-র জন্ম হলো। শরৎবাবু এই প্রতিষ্ঠানের দেখাশোনার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শেখার ভার দিলেন বড় ছেলে সুধাংশুকুমারের ওপর।

এখন যেমন আমাদের মফস্বল শহরে সাইকেল-রিকশাতে গ্রামোফোনের বাজনা বাজিয়ে, গান বাজিয়ে আর লাউডস্পীকারে ঘোষণা করে সিনেমা-থিয়েটার আর সার্কাসের বিজ্ঞাপন করা হয়, সেদিন তেমনি আর্য বেকারী কাজ শুরু করার পর 'ব্যান্ডপার্টি' নিয়ে ঘটা করে সুধাংশুবাবুদের উৎপন্ন কেক-পাঁউরুটির হ্যান্ডবিল বিলি করা হলো। রাস্তায় রাস্তায় রঙবেরঙের পোস্টারও মারা হলো সারা শহরময়—বাঙালীর প্রথম মেশিন-মেড মিল্করেড। আর্য বেকারীর তৈরী কেক-পাঁউরুটির কথা লোকের মুখে মুখে প্রচার হতে লাগলো। বাঙালীর তখন দেশাত্মবোধ ছিল, স্বদেশী জিনিস কেনার আগ্রহ ছিল। তাই আর্য বেকারীর রুটি-কেক প্যাটি-পেস্ট্রি হু হু করে বিক্রি হতে থাকলো।

আর্য বেকারীর আগে কলকাতা শহরে বাজার-চালু মেশিন-মেড রেড বলতে আমরা যে যে বেকারীর বা হোটেলের নাম শুনেছি তা হলো, 'উইলসন হোটেল' অর্থাৎ অধুনা 'গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল'-এর রুটি এবং নিউ মার্কেটের পাশে লিন্ডসে স্ট্রীটে এখন যেখানে 'ফেরাজিনি' আছে সেইখানে পুরনো একটা বাড়িতে 'ওয়ালেস' নামে যে রেস্তোরাঁটি ছিল তার তৈরী রুটি। যতটা মনে পড়ে, ফারপো (অতীতে কস্টেলো ব্রাদার্স-এর হোটেল) অথবা গ্র্যান্ড হোটেল কেবল হোটেলে অভ্যাগতদের জন্যেই রুটি তৈরি করতেন, বাজারে বেচতেন না। এ'রা সব ছিলেন কুলীন।

মীর্জাপুর-রাজাবাজার অঞ্চলের মুসলমান রুটিওয়ালাদের কথা তো আগেই বলেছি।

তিন নম্বর ছিল বউবাজারের 'বামুনের রুটি'। বয়স্ক বাঙালীর মনে থাকারই কথা যে, বর্ধমান, হুগলি, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের নিম্নমধ্যবিত্ত হিন্দু ব্রাহ্মণ রুটিওয়ালারা বিশেষ করে বউবাজারেই (শহরের ও শহরতলির অন্যত্রও কিছু কিছু ছিল) কতকগুলি ছোট ছোট 'বেকারী' খুলেছিলেন। দোকানে বিক্রি ছাড়াও তাঁরা ধামায় করে সেই 'বামুনের রুটি' ফেরি করে বেড়াতেন। বিশুদ্ধ ময়দা, নুন-চিনি এবং স্নেহপদার্থজাত পাঁউরুটি বলেই তাঁরা চালাতেন। কিন্তু একটু তাড়ির গাদের অনুপান ছাড়া কি সে রুটি ফুলতো? তা হলোই বা—কারণবারি তো পবিত্র জিনিস, মুনিঋষিরা পান করতেন! বিদগ্ধ ব্যক্তিরা এখনো করেন।

আর্য বেকারী যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন স্বাধীনতা-আন্দোলনের মধ্যযুগ। সারা দেশে উত্তেজনা ও উন্মাদনা। ১৯৩০ সালে গান্ধিজীর লবণ-আইন ভঙ্গ ও বিদেশী বয়কট আন্দোলন শুরু হলো। সশস্ত্র বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করলেন।

কিন্তু তার আগেই ১৯২৮ সালের শীতকালে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে সদ্যোজাত আর্য বেকারী-র ডাক পড়লো অধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের বিরাট চতুরঙ্গ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এর ঘোড়সওয়ার, মোটর-সাইক্লিস্ট, সাইক্লিস্ট এবং পদাতিক ছেলেমেয়েদের পাঁউরুটি যোগানোর জন্যে। পুরো দায়িত্বটাই সুধাংশুবাবুদের ওপর পড়লো।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সেবারে সভাপতিত্ব করেছিলেন, আর গান্ধিজী থেকে শুরু করে

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রায় সকল নেতা ও নেত্রীই অধিবেশনে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯২৫-এ দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে বাংলাদেশে কংগ্রেসের নেতৃত্বে তখন ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসু, স্বর্গীয় বিধানচন্দ্র রায়, স্বর্গীয় কিরণশঙ্কর রায়, স্বর্গত নির্মল-চন্দ্র চন্দ্র এবং অপেক্ষাকৃত তরুণ দলে নেতাজীর মতো ব্যক্তিবর্গ। বাঙালী নেত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, স্বর্গতা মোহিনী দেবী, স্বর্গীয়া হেমপ্রভা মজুমদার প্রমুখ মহিলারা। স্বর্গতা সরোজিনী নাইডুও নিশ্চয়ই ছিলেন, কিন্তু তিনি যেন ঠিক বাঙালী নেত্রীর দলে পড়তেন না।

অধিবেশনে এক প্রকাণ্ড গানের দল ঐকতানে সবাইকে দেশাত্মবোধক অসংখ্য গান শুনিয়েছিলেন। সেই বৈতালিকের নেত্রী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী স্বর্গীয়া সরলা দেবী চৌধুরানী।

সমস্ত মণ্ডপটির চারিদিক ঘিরে স্বদেশী পণ্যের বড় প্রদর্শনী হয়েছিল। সেখানে আর্য বেকারীর স্টলও ছিল।

আমরা তখন পরাধীন ছিলাম বটে, কিন্তু তবুও যেন আজকের চেয়ে তখনকার দিনগুলি অনেক দিক দিয়ে ভালো ছিল। শিকল ছিঁড়ে ফেলার প্রতিজ্ঞা ছিল, আবার সংহতি ও সংগঠনের দৃঢ়তাও ছিল সেদিনের মানুষের মনে।

যা বলছিলাম, সকলকে খাওয়াবার যে ব্যবস্থাটি হয়েছিল তাতে পাঁউরুটি সরবরাহের ভার পড়েছিল আর্য বেকারীর ওপর। সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে সুধাংশুবাবুরা একজন দক্ষ বিদেশী 'বেকার'কেও নিয়োগ করেছিলেন।

সমস্ত কাজটি তাঁরা ভালো করেই করতে পেরেছিলেন বলে সুভাষচন্দ্র "I am glad to certify" ইত্যাদি বয়ান দিয়ে 'S. C. Bose, G. O. C., Bengal Volunteers' সই করে চমৎকার একটি শংসাপত্র আর্য বেকারীকে দিলেন। সুধাংশুবাবুরা সেটা এখনও সযত্নে রেখে দিয়েছেন ভালো ফ্রেমে বাঁধিয়ে।

সুধাংশুবাবু বললেন যে, নেতাজী আর সেদিনের বাঙালী এইভাবে আমাদের তুলে না ধরলে আমরা কি আর সেই ব্রিটিশ রাজত্বে বেশী দিন টিকতে পারতাম? তাঁর কণ্ঠে কৃতজ্ঞতার আবেগ ফুটে উঠলো।

এর পরেই একে একে এলো ত্রিশ ও বত্রিশ সালের লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন। সঙ্গে রইলো বিলিতী বয়কট। ইংরেজের তৈরী কোনো জিনিস ছোঁয়া হবে না বলে সকলে পণ করলেন।

নেশাখোরেরাও এই ব্রতে যোগ দিয়েছিলেন। বিলিতী সিগারেটের বদলে দেশী বিড়ি জোরসে চালু হলো। যাঁদের বিড়ি চলতো না তাঁরা জাপানী আর চীনে সিগারেট খেতে লাগলেন। ধূমপানরতা চৈনিক সুন্দরীর (নাকটা কিন্তু চ্যাপটা ছিল না) ছবিওয়ালা 'চিমাই' মার্কা সিগারেটের কথা এখনও আমার মনে আছে। আমার দাদারা খুব খেতেন। রসপিপাসুদের মধ্যে অনেকে সেই যে স্কচ হুইস্কি থেকে ধান্যেশ্বরীতে সরে এসেছিলেন, তাঁরা শুনেছি সেই অপূর্ব নতুন স্বাদটি পেয়ে আর স্কচ-এ ফিরে যাননি।

আন্দোলনে যোগ দেওয়া হাজার হাজার বন্দী কলকাতা ও দমদমের স্পেশাল জেলগুলি ছেয়ে ফেললেন। বন্দী নেতারা বললেন যে, তাঁরা স্বদেশী বেকারীর পাঁউরুটি ছাড়া খাবেন না, আর 'কে সি বোস'-এর বার্লি ছাড়া পথ্য করবেন না। সরকার তখন বাধ্য হয়ে 'আর্য বেকারী'কে ডাকলেন। সুধাংশুবাবুরা আটাশ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে বড় এক ধাপ উঠেছিলেন, এবারে আরও বড় এক ধাপ উঠলেন, কারণ এটা তো আর কয়েকদিনের অধিবেশন নয়, এই সাপ্লাই চলবে যতদিন না লড়াই থামে।

এর পরে আসতে হয় ১৯৩৪ সালে। সুধাংশুবাবু তাঁর 'আর্য বেকারী'কে পৈতৃক চক্রবেড়ের বাড়ি থেকে রানী শংকরী লেনের (ভবানীপুর থানার কাছে) একটা বাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে এলেন। পুরনো মেশিনের সঙ্গে যোগ করে সম্প্রসারণ নয়, দুটো নতুন মিক্সিং মেশিন এবং গোটা পাঁচেক 'ফায়ারব্রিক্স'-এর তৈরী তন্দুর বসিয়ে আর্য বেকারীর বড় কারখানা স্থাপিত হলো।

সঙ্গে সঙ্গে বাবা শরৎবাবু মস্ত বড় একটা কাজ হাতে নিলেন। চক্রবেড়িয়ার একটা 'মিক্সার' ও দুটো তন্দুর নিয়ে শরৎচন্দ্র ১৯৩৪ সালেই 'বেকারী ট্রেনিং কলেজ' নাম দিয়ে এক শিক্ষায়তন খুললেন। রবার্ট প্যাটন নামে এক সাহেব বেকারী এক্সপার্টকে শিক্ষক-পদে আনলেন মোটা মাইনে দিয়ে। উত্তরকালে সুধাংশুবাবুর পরের ভাই হিমাংশুবাবু কাজ শিখে এই কলেজে শিক্ষকতার ভার নিয়েছিলেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য শরৎচন্দ্র ঘোষ মশায় ব্যবসাতে নিজের লাভের দিকটাই কেবল ভাবতেন না। যে বিদ্যা আয়ত্ত করে তিনি লাভবান হয়েছিলেন, আরও দশজন বাঙালী যাতে সেটা শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেইটাই ছিল শরৎচন্দ্রের মহৎ উদ্দেশ্য।

কলেজের প্রেসিডেন্ট হলেন শিল্পায়নের আর একজন খ্যাতনামা গুরু, স্বর্গীয় জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয়।

এইরকম একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জানতে পেরে বাঙালী ছাড়াও সুদূর মালয়, নেপাল প্রভৃতি দেশ থেকেও ছাত্ররা এসে ভর্তি হয়েছিলেন। বাঙালী ছাত্ররা কেউ কেউ কলেজ থেকে বেরিয়ে নিজেদের বেকারী খুলছিলেন। সেইসব বেকারীর মধ্যে কোনো কোনোটা এখন মস্ত বড় হয়ে নাম করেছে। শুনলাম তার মধ্যে দু'একটি বেকারী এখন আয়তনে আর্য বেকারীর চাইতেও বড় হয়েছে।

প্রাচীন রোমের ইতিহাসে এইরকম একটি কলেজের কথা আছে। তার নাম ছিল 'কলেজিয়াম পিস্টোরাম্'। 'পিস্টর' মানে 'বেকার'। খুব কড়া আইনকানুন ছিল সেই কলেজের ছাত্রদের জন্যে। একবার যে সেখানে ঢুকতো, তাকে এবং তার অধস্তন চোদ্দ পুরুষকে বাধ্যতামূলকভাবে 'বেকার'-এর কাজই করতে হতো। আর রাজনৈতিক কারণে 'বেকার'রা কোনো সভাসমিতি বা জনসমাগমে যোগ দিতে পারতেন না। বেকাররা তো বড় বড় লোকদের, নেতাদের বাড়িতে চাকরি নিতেন, স্বাধীন ব্যবসা করতেন না—তাই পাছে তাঁরা সেকালের সুপ্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ঘুষ খেয়ে তাঁদের ক্ষমতাশালী প্রভুদের বিষ খাইয়ে মেরে না ফেলেন সেইজন্যেই এত কড়াক্কড়ি ছিল বোধ হয়।

'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' অর্থাৎ বাইবেলের আদিকাণ্ডের শুরুতে 'জেনেসিস' অধ্যায় থেকেই পাতায় পাতায় 'ব্রেড' ও 'বেকার' শব্দ দুটির উল্লেখ আছে।

উত্তরকালে ইহুদী জাতির মহান নেতা, সুদর্শন ইহুদী যুবক ক্রীতদাস জোসেফের প্রেমোন্মত্তা ও প্রত্যাখ্যাতা প্রভুপত্নী পটিফার-জায়ার কুচক্রে জোসেফ যখন ফারাওর (মিশর সম্রাটের) বন্দীশালায় নিক্ষিপ্ত হলেন তখন সেখানে আর একজন বন্দীর সঙ্গে জোসেফের আলাপ হয়েছিল। তিনি ছিলেন ফারাওর 'চীফ বেকার'। জেনেসিস-এর চত্বারিংশৎ শ্লোকের এই উল্লেখই সম্ভবত (পরোক্ষভাবে) পাঁউরুটির প্রথমতম ইতিহাস। তারপরে অবশ্য বাইবেলের পাতায় পাতায় পাঁউরুটির উল্লেখ আছে।

(ভাষাতে গুরুচণ্ডালী হয়ে গেল। রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল—এইসব ধর্মগ্রন্থের আদি-রসের কথা লিখতে গেলেই আমার কাঁচা রচনাশৈলীতে আরও তালগোল পাকিয়ে যায়। নব্য বাংলা ভাষার ডি এইচ লরেন্স আর জেমস জয়েসদের কাছে নাড়া বাঁধানো দরকার, যাতে সোজা কথায় সহজ ব্যাপারটি খুলে বলতে পারি। যেমন, সোজাসুজি লিখলেই হতো, পটিফারের কামুক বউটা কর্তার পেয়ারের নফরটার সঙ্গে শুতে চেয়েছিল...ইত্যাদি ইত্যাদি)।

ফিনিশিয়া, গ্রীস, পম্পিয়াই, ক্রীট, রোম, স্পেন, গল (ফ্রান্স) হয়ে পাঁউরুটি ক্রমে ক্রমে সারা ইওরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। রোমে বারোয়ারী তন্দুরও ছিল। সরকার সেটা চালাতেন, আর জনসাধারণ নিজের নিজের তৈরী খামির নিয়ে সেই তন্দুরখানায় রুটি সেঁকে আনতেন।

পাঠান-মুঘলরা তন্দুরী রুটি অনেক আগেই এনেছিলেন, কিন্তু 'পাঁউরুটি' শব্দটা থেকে পরিষ্কারই বোঝা যায় পোর্তুগীজরাই এ-দেশে খাদ্যটির প্রচলন করেছিলেন। পোর্তুগীজ 'পাও' শব্দের মানে হলো পাঁউরুটি। আধুনিক পাঁউরুটি না হলেও তা ছিল একই কুল ও মেলের।

তাল তাল ময়দা ঠেসবার জন্য রুটিওয়ালারা হাতের বদলে পা ব্যবহার করতেন, তাই এর নাম হয়েছে 'পাঁউরুটি' (পাওরুটি) বলে যে প্রবাদ আছে, তা ভুল।

ছাঁচে ঢালা খামির তন্দুরে সেঁকার পর ফুলে উঠে অনেক বড় দেখায় বলে উত্তর ভারতে এর নাম 'ডবল রোটি'।

১৯৪১ সালে শরৎচন্দ্রের কর্মময় জীবনের অবসান হলো। আর একচল্লিশেই দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের রণাঙ্গন পূর্বে এশিয়ায় প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'কণ্ট্রোল'-এর যুগও আরম্ভ হলো। খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে দেশে নানারকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো আর সেই সময়েই বাংলা দেশে পঙ্গপালের মতো এলো কালোবাজারী আর মজুতদারের দল।

রুটি তৈরিতে সেই যে বিশৃঙ্খলার শুরু হয়েছিল আজ ২৭ বছর পরেও তার কোনো প্রতিকার তো হয়ই নি, বরং দিন দিন অবনতিই হয়ে চলেছে। গত বছরের এপ্রিল থেকে কয়েক মাস আগে পর্যন্ত রুটির দুর্ভিক্ষের কথাটা আমাদের মনে তাজাই আছে। ঠিক গম বা ময়দার অভাবেই যে এসব ঘটে তা যে নয়, সে কথাটাও আমরা এখন ভালো করেই বুঝতে পেরেছি সংবাদ-পত্রের গম পচতে দেওয়া বা খোলা ওয়াগনে ভিজতে দেওয়ার সচিত্র খবর থেকে। সরকারি অকর্মণ্যতা এবং অপবণ্টনই এর মূল কারণ। এই অনাচারের বিষয়ে এত আলোচনা আর এত চিঠিচাপাটি হয়ে গেছে যে, নতুন করে বলার মতো আমার আর কিছু নেই।

কিছু দিন আগে পর্যন্ত বেকারীর মালিকরা কখনো সারা মাসে ময়দা পেতেন ২০০।২৫০ মণ, আবার কোনো মাসে পেতেন ৩।৪,০০০ মণ। ওদিকে এস্টাব্লিশমেণ্ট বহাল রাখতে হতো

উৎপাদনের ক্ষমতা বরাবর। ছিরিছাঁদ কিছুই থাকতো না কাজ করার।

সেদিন অবশ্য সুধাংশুবাবুর বড় ছেলে 'আর্য বেকারী'র বর্তমান কার্যাধ্যক্ষ সুশান্তবাবু বললেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেকারীদের চার শো মণ করে ময়দা 'বাফার স্টক' রাখার আদেশ দিয়েছেন। সরকার যদি ময়দার কলগুলিকে যথেষ্ট গম সরবরাহ করে সেই অবস্থাটা বজায় রাখতে পারেন তো অতি আনন্দের ও প্রশংসার কাজ হবে সেটা। দেখা যাক—ব্যাপারটা সরকারি তো!

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, যে-সমস্ত বেকারী ও কনফেকশানারীতে মেশিন-মেড বিস্কুট তৈরী হয় না তাঁরা ময়দার 'কোটা' পান রাজ্য সরকারের কাছ থেকে, আর যাঁদের বিস্কুট মেশিনে তৈরী হয়, যেমন 'ব্রিটানিয়া' বা 'কোলে', তাঁরা পান ভারত সরকারের কাছ থেকে।

ময়দা ছাড়া রুটি তৈরির অন্য যে-সমস্ত প্রধান উপাদান আছে তার মধ্যে 'ইস্ট' এখন এখানে (শ' ওয়ালেস কম্পানির উদ্যোগে) তৈরী হলেও তার অপ্রতুলতা ঘটে এবং 'হপস্' আমদানি হয় 'স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন'-এর মারফত। 'হপস্'-এর আবার চমৎকার একটি কালোবাজার আছে। পাঁচ টাকার এক প্যাকেট 'হপস্' নাকি চল্লিশ টাকাতেও বিক্রি হয়।

'কণ্ট্রোল'-এর কথায় আবার সুধাংশুবাবুর ব্যক্তিগত জীবনের কথা এসে পড়ে।

১৯৩৩ সালে সুধাংশুবাবু সেদিনের বর্ধিষ্ণু চাল ও তেলকল মালিক মাকড়দার স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ দত্তের কন্যা শ্রীমতী সতীরানী'র পাণিগ্রহণ করেন। বর্ধমান থেকে কোলাঘাট পর্যন্ত বেশ কয়েকটা মিল ছিল অন্নদাবাবুর; তা ছাড়া তিনি শ' ওয়ালেস কম্পানির ডিরেক্টরও ছিলেন।

শিল্পপতির মেয়ে সতীরানী বাণিজ্যের ওঠাপড়াটা বুঝতেন। তাই বিয়ের দু'-তিন বছরের মধ্যেই যখন কণ্ট্রোলের ঠেলায় স্বামী বিপন্ন হয়ে পড়লেন, তাঁর নগদ টাকার অভাব পড়লো, তখন গায়ের দামী দামী গয়না স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "এখন এই দিয়ে সামলাও, সময় ফিরলে আবার চুনিপান্না দিয়ে মুড়ে দিও।"

এমন মেয়ে যাঁর সহধর্মিণী, জীবনযুদ্ধে তাঁর কিসের ভয়? সুধাংশুবাবু লড়ে চললেন।

বাজারে বিক্রি ছাড়াও হাসপাতাল, ছাত্রাবাস আর মেস-বোর্ডিং-এও আর্য বেকারীর রুটির চল হলো। ততদিনে কলকাতায় বাঙালীর মালিকানায় আরও কয়েকটা বেকারী হয়েছে। তাদের মধ্যে কারও কারও এবং উত্তরকালে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি বেকারী-র নাম নীচে লিখছি :

প্রতিষ্ঠানের নাম	কর্তা বা মালিক
এরিয়ান বেকারী	চট্টোপাধ্যায় পরিবার
লর্ডস বেকারী কনফেকশানারী অ্যান্ড বিস্কুট কোং ...	শ্রীঅনিল ঘোষ
সুধাংশু বেকারী	শ্রীপ্রভাত দত্ত
বড়ুয়া বেকারী প্রাঃ লিঃ	শ্রীমনোরঞ্জন বড়ুয়া
রয়নস্ বেকারী	শ্রীদীপক রায়চৌধুরী
ইস্ট ইণ্ডিয়ান বেকারী	শ্রীচিত্তরঞ্জন ও শ্রীগোষ্ঠেশ্বর সাহা
সন্তোষ বিস্কুট কোং প্রাঃ লিঃ	শ্রীমণীন্দ্রনাথ সাহা
জলযোগ ফুড প্রোডাক্টস	শ্রীগোপালচন্দ্র সিংহ রায়

মেশিন-মেড পাউরুটি আরও কোনো বাঙালী প্রতিষ্ঠান করছেন কিনা জানি না। খুঁটে খুঁটে এইসব তথ্য বের করা শক্ত কাজ। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার যদি এ বিষয়ে তৎপর হন তো আমরা ইতরজনেরা উপকৃত হই। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশন' নামে এঁদের একটা সঙ্ঘ আছে। সেই সঙ্ঘ 'ভারত চেম্বার অব কমার্স'-এর অন্তর্ভুক্ত। সেই চেম্বার অবাঙালীপ্রধান। বেঙ্গল ন্যাশন্যালের সংবিধানেও অবশ্য বাঙালী অবাঙালী বলে কোনো ভেদাভেদ নেই, কিন্তু বাস্তবে তা বাঙালীপ্রধান। তাই বলছিলাম যে, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বারের পরিসংখ্যান বিভাগ যদি এইসমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে রাখেন তো খুব ভালো হয়। বাঙালীর সমস্যা যে বড় কঠিন।

১৯৫০ সাল থেকে আর্য বেকারী নতুন রূপ নিল। পণ্ডিতিয়া রোডে ক্যালকাটা কেমিক্যালের কারখানার অদূরে এক বিঘা জমির ওপর সুধাংশুবাবু বর্তমান দোতলা কারখানাটির স্থাপনা করলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল যে, রুটি কেক ইত্যাদির সঙ্গে মেশিন-মেড বিস্কুটও তৈরি করবেন। পাঁউরুটির জন্যে ইওরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আনিয়ে আধুনিক মেশিনারী বসালেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, 'ডবল-ডেকার স্টীম অভেন' এবং পাঁউরুটি স্লাইস করার মেশিন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাংলা দেশে স্লাইস করা রুটির প্রবর্তক হলেন আমাদের সুধাংশুবাবু।

এই মেশিন ও তন্দুর বসিয়ে আর্য বেকারীর উৎপাদন-ক্ষমতা দাঁড়ালো দিনে ১৫০ মণ ময়দার পাঁউরুটি, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি তৈরি করার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কখনো ময়দার অভাবে, কখনো শ্রমিক সমস্যার জন্যে উৎপাদনে এতদিন নানা ব্যাঘাত ঘটে এসেছে।

সুধাংশুবাবু বছর তিন চার মেশিনে তৈরী বিস্কুটও করেছিলেন, কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন হওয়ার জন্য বহুদিন আগেই সে কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

তখন থেকে আর্য বেকারী-র উৎপাদন নানারকমের রুটি, কেক, প্যাটি এবং হাতেগড়া নিমকি বিস্কুট ও মিষ্টি নানখাটাইয়ে সীমাবদ্ধ আছে।

আর্য বেকারীর বিক্রি এখন বছরে ১২।১৩ লক্ষ টাকা। শ্রমিক সংখ্যা এক শো-র কিছু বেশী।

ম্যানেজার শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য ও সেলস্ ম্যানেজার শ্রীতারাশংকর দে-কে সঙ্গে নিয়ে সুধাংশুবাবুর মেজো ছেলে সুশান্ত আমাকে বেকারীর কাজ দেখালেন। অনিলবাবু এখানে আছেন ৩০ বছর, আর তারাশংকরবাবু আছেন ৩৪ বছর। তারাশংকর চোদ্দ বছর বয়সে আর্য বেকারী-র জগুবাবুর বাজারের স্টল-এ দোকানদারের যোগানদার হয়ে ঢুকেছিলেন; এখন তিনি কলকাতা ছাড়াও বাইরে বিহার, উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত আর্য বেকারী-র মাল বিক্রির কাজে সুধাংশুকুমার ও সুশান্ত-র সহায়তা করেন।

সুধাংশুবাবুর যে পাঁচ ছেলে আজ প্রতিষ্ঠানের শরিক, সেই সুশান্ত, শ্যামল, কমল, গৌতম ও কল্যাণের অন্নপ্রাশনে কম্পানির এই প্রাচীন কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন না শুধু সুধাংশুবাবুর বড় ছেলে রবির মুখেভাত-এ। রবি আজ নেই। একচল্লিশ সালে, মাত্র সাত বছর বয়সে সে তার পিসীমা, ময়মনসিংহের আঠারো-বাড়ির জমিদারগৃহিণী শ্রীমতী বীণাপাণি রায়চৌধুরানীর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। ইনি এঁর ছোট ভাই সুধাংশু আর তাঁর পরিবারের

সকলকে খুব ভালোবাসতেন। সুধাংশুকুমারের আর্থিক অনটনের সময়ে আর্য বেকারী-কে রক্ষা করার ব্যাপারে ইনি অনেকখানি সহায়তা করেছিলেন।

সেই পিসীমার বাড়িতে আর কোন্ কোন্ ছেলের সঙ্গে খেলা করতে গিয়ে একটা টোটাভরা বন্দুকের গুলি ছুটে গিয়ে রবি মারা যায়।

কোনো প্রতিষ্ঠান দেখতে গিয়ে সেখানকার মেশিনের চাইতেও আমি মানুষগুলিকে বেশী করে দেখি। তাঁদের জীবনের ওঠাপড়া আর হাসিকান্নার সঙ্গেই তো এইসব মেশিনের চলা বা অচল হওয়া জড়িয়ে থাকে। কখনো কখনো তাঁদের অন্দরমহলের পর্দা সরিয়েও তাঁদের মা, বোন, স্ত্রী আর মেয়েকেও পাদপ্রদীপের আলোর সামনে উপস্থিত করি এইটা প্রমাণ করবার জন্যে যে, সেই শক্তিরূপিণীদের সহায়তা ছাড়া কর্তারা কর্মে পটুত্ব দেখাতে পারতেন না; আর তা হলে কারখানাও বসতো না, মেশিনও চলতো না। সুধাংশুবাবুর বেলায় যেমন তাঁর দিদিকে আর সতীরানী দেবীকে একেবারে স্পটলাইটের আলোয় টেনে আনলাম।

কথায় কথায় অপ্রাসঙ্গিক আরও কত কিছু এসে পড়ে—সুধাংশুবাবুর ধর্মজীবনের কথা, তাঁর গুরু শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী আর গুরুভাই শ্রীমদ্ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের প্রভাবে তিনি কত প্রভাবান্বিত তার কথা—কিন্তু ভালো কথা হলেও সে-সমস্ত এই প্রবন্ধে অবান্তর হবে। অথবা বঙ্গভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের সময়ে সুধাংশুবাবুর মামার বাড়ি, বাগবাজারের স্বনামধন্য স্বর্গত পশুপতিনাথ বসু মহাশয়ের বাড়িতে বাঙালীর রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানের বর্ণনার অবকাশও এখানে নেই।

কলকাতার কনভেণ্ট রোডে একটি সরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থা আছে। তার নাম 'কেটারিং অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড নিউট্রিশন কোর্স'। সেখানে 'বেকারী ও কনফেকশানারী'র প্রয়োগগত দিকটা শেখানো হয় বলে শুনলাম। অনেক বাঙালী ছেলে তার ছাত্র। আর্য বেকারীতেও তাঁদের একজন আছেন। তাঁর নাম শ্রীসমীর সেনগুপ্ত। সমীরবাবুর কাছে জানলাম যে, দিল্লীতে ভারত সরকারের উদ্‌যোগে 'মডার্ন বেকারীজ প্রাইভেট লিমিটেড' নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে এক উচ্চপদস্থ বাঙালী অফিসার আছেন—নাম শ্রীপ্রেমাংশু দত্ত। তিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে বেকারী এক্সপার্ট হয়ে এসেছেন।

অন্য বিদেশী ভাষা জানি না, কিন্তু ইংরেজী "The Modern Baker Confectioner And Caterer" (Author—John Kirkland) নামক মোটা মোটা চার খণ্ডের একটি বইয়ের পাতা উল্টে উল্টে দেখলাম যে, কী নিষ্ঠার সঙ্গে বিদেশীরা সব কাজ করেন এবং কোন্ সুদূর অতীত-কাল থেকে। অতীতে আমাদের মুনিঋষিরাও এই ধরনের সংহিতা ও শাস্ত্র রচনা করে গেছেন অবশ্য।

ইংরেজী বইটিতে পাঁউরুটি বিষয়ে বেশ কয়েকটা কবিতাও আছে, যেমন একটা হল :

Though Flesh, Fish, Whitemeat All in fitting season
Nourish the body being used with reason.
Yet no man can deny (to end the strife)
Bread is worth all being the stuff of life.

—তার মানে, মাছ মাংস সবার চাইতে—ভালো পাঁউরুটি (আর ঝোলাগুড়!)

পদ্যটদ্য না লাগালে সাহিত্য রচনা হয় না। আমি পাকা সাহিত্যিক হবার আশায় লেখাটা শুরু করেছি একটা ছড়া দিয়ে, মাঝে আর একটু পদবৃদ্ধির জন্যে দিলাম ইংরেজী পদ্য; এখন পরমপাকা হবার চেষ্টায় আর একটা ছড়া দিয়ে শেষ করি। সবই পাঁউরুটি সাহিত্য।

নিনি বাবা নিনি
মাখন রুটি চিনি,
খা যা বাবা খা—যা--
লাল পালংক্ পর সো-যা--॥

৫ অক্টোবর, ১৯৬৮





পঁয়ত্রিশ

গৌরীকিশোর ঘোষ ৪ নভেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকায় 'যন্ত্র-গণক' বিষয়ে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধের সমাপ্তিতে তিনি বলেছেন : বিজ্ঞানের দানকে অগ্রাহ্য করার অর্থ আলো থেকে অন্ধকারের দিকে উল্টোরথের যাত্রা।

গৌরীকিশোরের এই উপসংহারে নিহিত আছে এক চিন্তাশীল মানুষের ক্ষোভ। বলতে গেলে রাজনৈতিক কারণেই, ভারতীয় জনসাধারণের একাংশ আজ ইলেকট্রনিক যন্ত্র-গণকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। আমাদের কর্মব্যস্ত নেতারা কিন্তু সময় বাঁচাবার জন্যে জেট-প্লেনে করে দেশেবিদেশে যাতায়াত করেন এবং ইলেকট্রনিকসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান অটোম্যাটিক টেলিফোন ব্যবহার করেন দিনে বিশ পঞ্চাশ একশো বার। অথচ তাঁদেরই বক্তব্য হলো যে, ভারত যদি এখন কম্পিউটার ইত্যাদির মাধ্যমে আরও অগ্রসর হয় তা হলে বেকার সমস্যাও বেড়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু বেকার সমস্যা কি এই যন্ত্র-গণক এবং অন্যান্য আধুনিক যন্ত্র ব্যবহারের জন্যেই বাড়ছে? না হলে কি বাড়তো না? আমার তো তা মনে হয় না। বরঞ্চ, নতুন নতুন যন্ত্রের নির্মাণ ও তত্ত্বাবধানের জন্যে নতুন কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত হয়েই চলেছে।

নেতৃবৃন্দের কথা বাদ দিয়ে আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষের কথাতেই আসি। আমরা আজকাল ইলেকট্রিক ট্রেনে যাতায়াত করতে পারলে স্টীম-এঞ্জিন টানা সেকেলে ট্রেনে চড়তে চাই কী? ইলেকট্রিক ও ডীজেল এঞ্জিনের প্রবর্তনে ফায়ারম্যানের পদটি বিলুপ্ত হতে চলেছে। কিন্তু মোট কর্মসংস্থানে কি কোনো বাধা হয়েছে তাতে? আর আমরা কি ইলেকট্রিক ও ডীজেল ট্রেন বন্ধ করে স্টীম এঞ্জিনের যুগে ফিরে যেতে চাই, তারপর স্টীম-এঞ্জিনকেও বাদ দিয়ে 'গরুর গাড়ি আর কিস্তির নৌকো' সভ্যতায় ফিরে যেতে চাই—অনেক গাড়োয়ান, অনেক মাঝি আর অসংখ্য দাঁড়ির কর্মসংস্থান হবে বলে? নিশ্চয়ই নয়।

কাজেই বিশ্বের অষ্টপ্রহরব্যাপী সংকীর্তনে পশ্চিমী মূলগায়েনদের দোহারকি ভারতকে করতেই হবে; অনেক দেরিতে হলেও আধুনিকতম যন্ত্রের ব্যবহার আমাদের দেশেও চালু করতে হবেই।

দাস রিপ্রোগ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ
দাস জিমারম্যান প্রাঃ লিঃ
১০, তারাতলা রোড
কলিকাতা-৫৩

আজ কয়েকটি যন্ত্র ও সরঞ্জামের কথা বলবো। এইসব যন্ত্রের সাহায্যেই আজকের যান্ত্রিকরা ও বিজ্ঞানীরা সামান্য সাইকেল থেকে আরম্ভ করে মহাকাশযান পর্যন্ত সমস্ত কিছুরই পরিকল্পনা করছেন নকশার পর নকশা এ'কে।

দেরির কথা বলেছিলাম—তা অনেক দেরি করেই 'ময়েস্ট ডায়াজো' মেশিন এবং সেনসিটাইজড্ কাগজের সুপরিকল্পিত উৎপাদন ভারতে আরম্ভ হলো। এর সূচনা হয়েছিল সাঁইত্রিশ বছর আগে হল্যান্ডের ভেনলো শহরে। ১৯২৬ সালে সেই শহরের ডক্টর কার্ল ও ডক্টর লুইস ভ্যান্ডার-গ্রিনটেন নতুন পদ্ধতিতে নকশার প্রতিলিপি (চলতি ভাষায় যাকে বলে ব্লু-প্রিন্ট) তোলার মেশিন এবং সেই মেশিনে ব্যবহার্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত কাগজ তৈরির উদ্ভাবন করেছিলেন। মাত্র সেদিন ১৯৬৩ সালে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দাস নামে এক বাঙালী ব্যবসায়ী ভারতবর্ষে সেই দুটিরই উৎপাদন আরম্ভ করলেন।

ডঃ কার্ল ও ডঃ লুইসের গবেষণার ফলে এখন তাঁদের সেই আবিষ্কার আধুনিকতম রূপ পেয়েছে। অবশ্য 'ময়েস্ট ডায়াজো'র পরেও আবিষ্কৃত হয়েছে 'ইলেকট্রোস্ট্যাটিক' প্রণালী এবং তা-ও এখন দেশে দেশে প্রচলিত হয়েছে। 'ডায়াজোথার্ম' নামে সর্বাধুনিক আরও একটি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু ইয়োরোপেও তার প্রচলন এখনো ভালো করে হয়নি। আমেরিকান আবিষ্কার 'জেরক্স' প্রণালীও বেশ কয়েক বছর ধরেই চালু হয়েছে, কিন্তু সেই কাজের জন্য মেশিন কিনতে পাওয়া যায় না; টেলিপ্রিন্টার বা টেলেক্স মেশিনের মতো ভাড়া নিতে হয়।

এইসব আবিষ্কারের আগে ছিল সূর্যের আলোর তেজে ছাপানো ফেরো-প্রিন্ট এবং হস্ত-চালিত যন্ত্রে অ্যামোনিয়া-প্রিন্টিং প্রণালী। ভারতবর্ষে তারও অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন নাট্যাচার্য স্বর্গীয় শিশিরকুমার ভাদুড়ির আত্মীয় ভাদুড়ি মহাশয়দের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল মিসেলিনি'।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দাস অবশ্য ভ্যান্ডারগ্রিনটেনের লাইসেন্সী হওয়ার আগে জার্মেনির ডুসেলডর্ফ শহরের এ-এম্ জিমারম্যান কম্পানির সহযোগিতায় অ্যামোনিয়া-প্রিন্টার এবং আরও কয়েকটি যন্ত্র ভারতে নির্মাণ শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল অনেক ক্ষুদ্রতর প্রচেষ্টা। কেমন করে গৌরাঙ্গসুন্দর এইসব কাজে নামলেন এবারে সেই কাহিনীটা বলা যাক।

বর্তমান পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলার গৌরাঙ্গসুন্দর দাস কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি. এস-সি. পাস করার পর গত মহাযুদ্ধের সময়ে (১৯৪১ সালে) ডি জি এম পি দপ্তরে একটি সাধারণ চাকরি পেলেন। নিষ্ঠা ও একাগ্রতার ফলে লড়াই থামার আগেই তিনি গেজেটেড অফিসার পদে উন্নীত হলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে ১৯৪৬ সালে গৌরাঙ্গবাবু সরকারি ভালো চাকরিটি ছেড়ে দিলেন।

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, এমন কিছু সংগতি নেই যে, নিজে একটা কিছু গড়ে তুলবেন—তাই এক বন্ধুর সঙ্গে তিনি ফার্নিচারের ব্যবসাতে নামলেন। শরিকে শরিকে বনিবনা না হওয়াতে কিছু দিনের মধ্যেই সে ব্যবসা গুটোতে হলো।

তারপরে গৌরাঙ্গবাবু নিলেন কমিশন এজেন্সীর কাজ। সাবানের এজেন্সী বটে, কিন্তু তাতে বেশ ভালো রোজগার হচ্ছিল। মন এদিকে পড়ে আছে নিজের একটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায়; তাই কিছু টাকা জমিয়ে গৌরাঙ্গসুন্দর এবারে একাই বৌবাজার অঞ্চলে একটি

ফার্নিচারের দোকান খুললেন। কাঠ জিনিসটা বোধ হয় তাঁর ধাতে সয় না, তাই এই একক ব্যবসাতেও লোকসান হয়ে গেল। এইভাবে স্বাধীন ব্যবসার পথে তাঁর প্রতি পদক্ষেপেই বাধা পড়তে লাগলো।

তখন তিনি পরিচিত এক ধনী মুসলমান ব্যবসায়ীর ব্রাঞ্চ অফিসের চার্জ নিয়ে চট্টগ্রাম চলে গেলেন। এটা হলো ১৯৪৮ সালের কথা। সে সময়ে ভারতীয় নাগরিকের পক্ষে পাকিস্তান যাতায়াতে কোনো অসুবিধে ছিল না, কারণ তখনও পাসপোর্ট ভিসার প্রবর্তন হয়নি। আট বছর যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করার পর ১৯৫৬ সালে তিনি সেই প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায় নিলেন।

এই আট বছরে বেতন ও কমিশনের টাকা থেকে গৌরাঙ্গসুন্দর বেশ কিছুটা সঞ্চয় করেছিলেন। চাকরি ছেড়ে ছাপ্পান্ন সালেই তিনি ইয়োরোপ সফরে বেরোলেন। মনে মনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, কোনো উন্নত দেশ থেকে খোঁজখবর নিয়ে নতুন কোনো শিল্পপ্রচেষ্টাতে তিনি নামবেন। এমন কোনো কাজে নামবেন যাতে প্রতিযোগিতা কম।

জার্মেনির হানোভার শহরে তখন বিরাট শিল্পমেলা বসেছিল। ঘুরতে ঘুরতে গৌরাঙ্গসুন্দর সেই প্রদর্শনীতে পেঁাছলেন। তখনো তিনি কেবল দেখেই বেড়াচ্ছেন আর ভাবছেন। পাকাপাকি কিছুই ঠিক করতে পারছেন না যথার্থ যোগাযোগের অভাবে।

যোগাযোগ ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত। শিল্প ও বাণিজ্য প্রচেষ্টাতে কত যে বিচিত্র যোগাযোগ হয়ে মানুষকে কেমন করে সফলতার শিখরে টেনে উঠিয়েছে তার কিছু উদাহরণ আমার পূর্ব-রচিত প্রবন্ধমালায় আমি লিপিবদ্ধ করেছি।

একটা ব্যক্তিগত যোগাযোগের কাহিনী মনে পড়ে গেল। একটি ডাঁসা পেয়ারা কেমন করে এক ব্যক্তির জীবনে চিরস্থায়ী যোগাযোগ ঘটিয়েছিল এটা তারই উপাখ্যান।

কলকাতার কিছু দূরে এক শহরের একটি সহশিক্ষা বিদ্যালয়ে ঘটনাটি ঘটেছিল। এক অপরাহ্নে সেখানকার কলেজের দুই সহপাঠী কিশোর সেই বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণের বড় রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। পথের ধারে একটা পেয়ারা গাছ। ছেলে দুটি সেই গাছের কাছাকাছি এসে পেঁাছতেই কোথা থেকে যেন একটা ডাঁসা পেয়ারা বুলেটের মতো একটি ছেলের বুকের পাঁজরে সজোরে আঘাত করলো। অতর্কিতে লাগাতে ব্যথাটা যেন খুব বেশীই মনে হলো ছেলেটির। দুই বন্ধুতে আততায়ীর সন্ধানে গাছের কাছে গেল। পেয়ারাগাছের শাখাপ্রশাখা এমন নয় যে, তার আচ্ছাদনে একটি মনুষ্যদেহ পুরোপুরি লুকনো যায়। আততায়ীর মুখ দেখা গেল না বটে, কিন্তু পুষ্ট দুটি পায়ের গোছ স্পষ্ট দেখা গেল। তা দেখেই অন্য ছেলেটি হাসতে হাসতে আহত কিশোরকে বললো, "আমার ছোট বোন, এখানকার নীচের ক্লাসে পড়ে, ছুটির পরে সারা দিন গাছে গাছেই থাকে; আমার গায়ে ছুঁড়ে মারতে গিয়ে তোমাকেই জখম করে বসেছে। এই, নেমে আয়!" অপরাধিনী এবারে পাতার আড়াল থেকে মুখ বের করলো। দুষ্টুমিতে ভরা ডাগর দুটি চোখ আহত ছেলেটির ওপর পড়ে একটু যেন অপ্রস্তুত হলো। পেয়ারার আঘাতের বেদনাটা মধুর হয়ে উঠলো ছেলেটির পক্ষে, আর সে বেদনা তার অন্তরের অন্তস্তলে বাসা বাঁধলো। যোগাযোগটা দিনে দিনে দানা বেঁধে এমন হলো যে, কয়েক বছরের মধ্যেই সেই গেছো মেয়ে চেলি আর কনেচন্দন

পরে ছেলেটির গলায় বরমাল্য পরালো। ওই ডাঁসা পেয়ারার চোটটি না খেলে ছেলেটির পক্ষে সেই যোগাযোগ হয়তো হতোই না।

গৌরাঙ্গসুন্দরের যোগাযোগটাও অতর্কিতেই ঘটে গেল। তিনি আজীবন নিরামিষাশী। একদিন শুয়োরখোর জার্মানদের দেশের শিল্পমেলার রেস্তোরাঁ-তে নিরামিষ খাবারের অর্ডার দিতে তাঁর খুব অসুবিধা হচ্ছিল। 'বয়'-টি জার্মান ছাড়া অন্য ভাষা বোঝে না। এমন সময়ে পাশের টেবিল থেকে এক শ্বেতকায় ব্যক্তি উঠে এসে সবিনয়ে গৌরাঙ্গবাবুকে বললেন, "ক্যান আই হেলপ্ ইউ?"

এই ভদ্রলোক এ. এম. জিমারম্যান কম্প্যানির মালিকের জামাতা। এঁর সঙ্গে সেদিন থেকে যে বন্ধুতা গড়ে উঠলো সেই সূত্রেই গৌরাঙ্গসুন্দর জিমারম্যান-এর অ্যামোনিয়া-প্রিণ্টার এবং সাজসরঞ্জামের লাইসেন্সী হয়ে দেশে ফিরলেন।

ভারত সরকারের অনুমতি নিয়ে কাজ শুরু করতে প্রচুর সময় লাগবে। সেই সময়টা চুপ করে বসে না থেকে গৌরাঙ্গসুন্দর হাওড়াতে একটা ফোর্জিং (যন্ত্রচালিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতুড়ি দিয়ে লোহা আর ইস্পাত পিটিয়ে আরও শক্ত করা মানে ফোর্জিং) ওয়ার্কশপ খুলে ফেললেন। সেই প্রতিষ্ঠানের নাম হলো 'এ এস. দাস অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড'। সেটা এখনো পুরোদমেই চলছে, কিন্তু আজকের কাহিনীতে তার অংশ গৌণ।

'দাস জিমারম্যান লিমিটেড'-এর লাইসেন্স ভারত সরকারের অনুমোদন পেলো ১ নভেম্বর, ১৯৫৮ থেকে। জিমারম্যানের সঙ্গে এগ্রিমেণ্টের স্থায়িত্ব হলো ১০ বছরের। (কয়েকদিন আগে ১ নভেম্বর ১৯৬৮ থেকে দাস-জিমারম্যান পুরোপুরি বাঙালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে)। ঢাকুরিয়া—যোধপুর পার্কে একটি ১২৫ টাকা ভাড়ার ফ্ল্যাট নিয়ে গৌরাঙ্গবাবু এবং তাঁর ছোট ভাই শ্রীসুনীলকুমার দাস হস্তচালিত 'জিমকো' অ্যামোনিয়া-প্রিণ্টার প্রভৃতি কয়েকটি যন্ত্রপাতির উৎপাদন আরম্ভ করলেন ১৯৬০ সালে।

'লাইসেন্সী' শব্দটির মানে যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্যে টীকা করে দিচ্ছি। সব দেশের ছোট বড় প্রায় সব মেশিনের এবং যন্ত্রে-উৎপন্ন কোনো কোনো পণ্যেরও 'পেটেণ্ট' নেওয়া থাকে, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতি অনুসারে মূলে উৎপাদকের বিনা অনুমতিতে সেগুলির হুবহু নকল করে অন্য দেশের লোকেও সে জিনিস তৈরি করতে পারে না। এই অনুমতির সংজ্ঞা হলো লাইসেন্স এবং যে সেটা নেয় তাকে বলা হয় লাইসেন্সী। স্বভাবতই লাইসেন্সী হতে গেলে 'রয়্যালটি' অর্থাৎ নাম ও নকশা ব্যবহারের কমবেশী ভাড়া লাইসেন্সী লাইসেন্সরকে দিয়ে থাকে। চুক্তি যেটা হয় তারও মেয়াদ থাকে। সেই মেয়াদের সময় পার হয়ে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাইসেন্সী কোনো রয়্যালটি না দিয়েও বিদেশী উৎপাদকের প্রণালী তো ব্যবহার করতে থাকেই, নামটাও ব্যবহার করে যায়।

ডঃ কার্ল ভ্যাণ্ডারগ্রিনটেনের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দাস মহাশয়ের পরিচয়ের ইতিহাসটাও অসাধারণ। ভ্যাণ্ডারগ্রিনটেনের মতো বিরাট প্রতিষ্ঠানের ইংল্যাণ্ডের লাইসেন্সী হলেন বিশ্ববিখ্যাত 'ইলফোর্ড' সংস্থা। সেই ভ্যাণ্ডারগ্রিনটেন-এর ভারতীয় লাইসেন্সটি গৌরাঙ্গবাবুর মতো সামান্য লোক পেয়ে গেলেন ডক্টর কার্ল-এর স্নেহের নিদর্শন হিসেবে।

দু'জনের আলাপ হয়েছিল ১৯৬১-র হানোভার শিল্পমেলাতে। গৌরাঙ্গ দাস কার্লকে বললেন যে, পরিচয়টুকুই যথেষ্ট; আর কিছু তো সম্ভব নয়, কারণ তাঁর ছোট্ট ইন্ডিয়ান কনসার্ন কার্ল-এর প্রকাণ্ড সংস্থার লাইসেন্সী হবার দুরাশা পোষণ করতে পারে না। বৃদ্ধ ডক্টর কার্ল সস্নেহে যুবককে বললেন, "ব'সো, এক পেয়ালা কফি খাও। তুমি ও-কথা বলছো কেন? ছোটরা কি বড় হতে পারে না, মিঃ দাস? আমরা দুই ভাই-ও তো ভেনলো-র এক ছোট্ট ফার্মেসি-র এক কোণে বসে কাজ শুরু করেছিলাম।"

এই যোগাযোগের ফলে ভ্যান্ডারগ্রিনটেনের প্রতিনিধি কলকাতায় এলেন। তখন যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাট ছেড়ে দাস ভ্রাতারা প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের এক অল্প ভাড়ার দোতলা বাড়িতে উঠে এসেছেন। দোতলায় দু'জনে থাকেন আর একতলায় দাস-জিমারম্যানের ছোট কারখানা। যে ওলন্দাজ যান্ত্রিককে কার্ল সাহেব পাঠিয়েছিলেন তিনি সেই কুটিরশিল্প দেখবার পরেও যে সেই মহামূল্য লাইসেন্স দেওয়াটা অনুমোদন করবেন, গৌরাঙ্গবাবু ঘুণাক্ষরেও তা ভাবেননি। কিন্তু ভাগ্য ভালো যে, সেই পরিদর্শকও গৌরাঙ্গসুন্দরের প্রচ্ছন্ন প্রতিভা বুঝতে পারলেন। ১৯৬২ সালে নতুন কম্পানি গঠিত হলো। নামকরণ হলো 'দাস রিপ্রোগ্রাফিকস্ প্রাইভেট লিমিটেড'।

ভারতবর্ষের শিল্পযোজনা তখন পুরোদমে চলেছে—তাই উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই দাস-রিপ্রোগ্রাফিকসের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির দারুণ চাহিদা হলো। এঁদের তৈরী ও-সি-ই ডায়াজো মেশিন মিনিটে ৩০ ফুট কাগজের ওপর প্রতিলিপি ছেপে বের করতে পারে। চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজের কপি রাখার ছোট যন্ত্রটিও দেখতে হলো ভারী সুন্দর। বিক্রি বেড়েই চললো।

আর একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানও গৌরাঙ্গসুন্দরের বাণিজ্য ও শিল্প প্রচেষ্টার প্রধান সহায়ক হয়ে দাঁড়ালেন—ন্যাশানাল অ্যান্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক। গৌরাঙ্গসুন্দরের প্রথম যখন টাকার খুব টান তখন সেই ব্যাঙ্ক তাঁকে অপ্রত্যাশিতভাবে সাহায্য করাতেই তিনি কাজ চালাতে পেরেছিলেন। সেই সাহায্য না পেলে তিনি যে কতখানি এগোতে পারতেন তা বলা যায় না।

তা ছাড়াও উত্তরকালে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করেছেন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনানশিয়্যাল করপোরেশন'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীমানস রায়।

গৌরাঙ্গসুন্দর তেষট্টি সালে বেহালার ১০নং তারাতলা রোডে সাড়ে চার বিঘা জমির দীর্ঘমেয়াদী লীজ নিলেন পোর্ট কমিশনের কাছে। সেখানে তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে নতুন ফ্যাক্টরি ও অফিস-বাড়ি তৈরি করালেন।

এইরকম ছবির মতো সুন্দর পরিবেশে অফিস ও কারখানা আমি খুব কমই দেখেছি। ভিতরটা হয়তো সুন্দর কিন্তু বাইরেটা অপরিচ্ছন্ন—এমন কারখানা অবশ্য এর আগে দেখেছি, কিন্তু দাস-জিমারম্যান এবং দাস-রিপ্রোগ্রাফিকসের ভিতর বাহির দুই-ই সমান। সুপরিকল্পিত তারাতলা পল্লীতে গেলে মনে হয় পাশ্চাত্ত্য কোনো দেশে ঢুকলাম।

নতুন লোকের মনে ছাপ রাখার পক্ষে ফ্যাক্টরির 'পেপার সেনসিটাইজিং' বিভাগটি সবচেয়ে ভালো। লম্বা একটা মেশিন, কিন্তু কী ছিমছাম! সমস্ত ফ্যাক্টরির মধ্যে অবশ্য এই একটি মেশিনই হল্যান্ড থেকে ইমপোর্টেড; আর সবই প্রায় দেশী। সেইসব মেশিনও দেখতে খুব সুন্দর, আর সবচেয়ে সুদৃশ্য হলো এঁদের নিজেদের তৈরী ও-সি-ই মেশিনগুলি—যাকে বলে স্ট্রীমলাইনড্।

হল্যাণ্ডের মেশিনটায় দু তিন মিনিটের মধ্যে সেনজিটাইজড্ কাগজ তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসছে, এত দ্রুত তার গতি। আসা মাত্রই সেই কাগজকে এয়ার-কণ্ডিশন করা গুদাম ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যতটা মনে পড়ছে এই বিভাগের সবটাই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। কারণ, সেনজিটাইজড্ কাগজকে অসূর্যম্পশ্যা, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া বড় ঘরের তন্বীর মতো আদর করে, খাতির করে রাখতে হয়।

এই রাজকন্যার পরিচর্যায় আছেন প্রিয়দর্শন এক যুবক শ্রীঅমিতাভ ঘোষাল। তিনি এই সেনজিটাইজিং বিভাগের কর্তা। ফ্যাক্টরি চালু করার সময়ে সাহায্য করতে যে দু-একজন ওলন্দাজ বিশেষজ্ঞ হল্যাণ্ড থেকে এসেছিলেন অমিতাভ তাঁদের কাছে শিক্ষালাভ করেই এখন অনায়াসে এটার তত্ত্বাবধান করছেন।

গৌরাঙ্গসুন্দর বললেন যে, এই অমিতাভ এবং ডেভেলপমেণ্ট ও প্রোডাকশন বিভাগের ইন-চার্জ শ্রীঅচ্যুতানন্দ হালদার ও শ্রীসমীর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তরুণ কর্মঠ যুবকদের ওপরেই তিনি ফ্যাক্টরি চালাবার ভার দিয়ে রেখেছেন। তাঁদের মমত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতাই দাস-জিমারম্যান এবং রিপ্রোগ্র্যাফিকসের সফলতার ভিত্তি।

গৌরাঙ্গবাবুর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ভাই সুনীলবাবু বহু দিনের শিক্ষানবিসিতে পাকা হয়ে মাত্র কয়েক মাস আগে ডিরেক্টর পদে উন্নীত হয়েছেন। (গৌরাঙ্গসুন্দররা পাঁচ ভাই। বড় এক ভাই ডক্টর সুধীররঞ্জন দাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক)। গৌরাঙ্গবাবু চান যে, সুনীলকুমারের মতো অমিতাভ, অচ্যুতানন্দ এবং সমীরকেও তিনি যেন কর্তৃপক্ষের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। পারিবারিক উত্তরাধিকারে তিনি বিশ্বাস করেন না।

এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মোট কর্মিসংখ্যা আন্দাজ ২০০। তার মধ্যে কয়েকটি দারোয়ান ছাড়া আর সবাই বাঙালী এবং তাঁদের মধ্যে বাঙালী মুসলমানও আছেন ১৫।১৬ জন।

আর একটি ৭৩ বছর বয়স্ক তরুণকে দেখে মুগ্ধ হলুম। তিনি হলেন এঁদের চীফ-অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু। দূর থেকে দেখলে এই পক্ককেশ সুদর্শন ভদ্রলোককে শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ইনি সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা আটটা পর্যন্ত কাজ করেন। আমাকে দুই কম্পানির মোট বিক্রয়ের অঙ্ক বিষয়ে অবহিত করার সময়ে বীরেনবাবু বললেন, "সেই গোড়া থেকেই ওঁয়াদের সঙ্গে আছি।" (খুইল্নে জেলার লোক আর কি!)

বিক্রয়ের অঙ্ক

সাল				মোট বিক্রি
১৯৬২	...	...	...	১২,২৮,০০০ টাকা
১৯৬৪	...	...	...	১৯,১৬,০০০ টাকা
১৯৬৭	...	...	...	২৭,৭৯,০০০ টাকা

আর একটি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন বাঙালী প্রতিষ্ঠান 'সি সি কম্পানি' এ'দের পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলের ডিস্ট্রিবিউটর। (কন্টিনেন্টাল কমার্শিয়্যাল কম্পানি এবং তার কর্তা শ্রীতারকদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথাও সকল বাঙালীরই জানা উচিত)।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দাস শিল্পায়নে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর গতিবেগও প্রবল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর একটি উদ্যোগ করছেন; সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি 'ইনস্টিটিউট অব রিপ্রোগ্রাফি' গঠনের চেষ্টায় আছেন। তার প্রয়োজনীয়তা অসীম, কারণ যোজনা ও শিল্পায়নের মূলে হলো পরিকল্পনা, আর পরিকল্পনা অসম্ভব হতো ব্লু-প্রিন্ট না থাকলে। দাস-জিমারম্যান এবং দাস-রিপ্রোগ্র্যাফিকস্-এর প্রয়াসে তারই পথ প্রশস্ত হচ্ছে। দেশী মেশিনে, দেশী কাগজে মিনিটে ত্রিশ ফুট করে ছাপার ব্যবস্থা করেছেন গৌরাঙ্গসুন্দর—ব্লু, ব্ল্যাক এবং ব্রাউন, তিন রঙেরই প্রিন্ট।

২৩ নভেম্বর, ১৯৬৮





ছত্রিশ

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বললেন, "কিছু ভেবো না খগেন, দেশ স্বাধীন হলে তোমার হাত সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দেবো।"

স্বদেশী যুগের একেবারে গোড়ার দিকের কথা; সালটা উনিশ শ' চার কি পাঁচ। চৌরঙ্গীর 'হোয়াইট ওয়ে-লেড-ল' কম্পানি, মানে অধুনা ইউ এস আই এস অফিসের সামনে, রাজপথে একক পিকেটিং করার সময়ে পুলিসের লাঠির ঘায়ে খগেন্দ্রচন্দ্র দাশ নামে এক যুবকের হাত ভেঙে যায়। তাঁকে উদ্দেশ করেই সুরেন্দ্রনাথ এই কথাগুলি বলেছিলেন।

মহাপুরুষের আশীর্বাদ বিফল হয়নি।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কম্পানি লিমিটেড অথবা তার উৎপাদিত পণ্যের নাম জানেন না, এমন কোনো শিক্ষিত বাঙালী আজ আছেন বলে আমার মনে হয় না। সেই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্মী-লাভও সর্বজনবিদিত। খগেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন তারই তিনজন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠাতার অন্যতম। কিন্তু দেবীর অঢেল কৃপালাভও এই দেশপ্রেমিক কর্মযোগীর নিবেদিত সত্তাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পথভ্রষ্ট করতে পারেনি। চিরকালের মোটা খদ্দরের ধুতী পাঞ্জাবী পরে আর চটের একটি থলিকে অফিসের ব্যাগ হিসেবে ব্যবহার করেই খগেন্দ্রচন্দ্র কর্মময় জীবনটি কাটিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁর বিষয়ে আরও বলার আছে, কিন্তু তার আগে তাঁর অন্য দুই সহকর্মীর কথা বলে নিই।

যথার্থ উপমার ব্যবহার সাহিত্যিকের কর্ম। আমি তা নই। আমার ভাষায় এঁদের তিন-জনকে আমি বলবো ত্রিধারা, যার জলসেচনে ক্ষেত্র আজ উর্বর, সমৃদ্ধ।

অধ্যক্ষ রাজেন্দ্রনাথ সেন বহুকাল আগে, ১৯৩৬ সালে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। খগেন্দ্রচন্দ্র সম্প্রতি (১৯৬৫-তে) পরলোকগত। আছেন কেবল ৮০ বৎসর বয়স্ক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মৈত্র, যাঁরই জন্যে শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে তিন অধ্যাপক বন্ধুর যোগাযোগ ঘটেছিল।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন-এর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে দীক্ষিত ব্রাহ্ম মধুসূদন সেন মহাশয়ের তৃতীয় সন্তান রাজেন্দ্রনাথ ১৮৯৮ সালে ২০ বছর বয়সে

প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি-তে এম-এ পরীক্ষায় (তখনও এখানে এম.এস-সির প্রবর্তন হয়নি) প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর খ্যাতনামা জ্যেষ্ঠভ্রাতা অধ্যাপক স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের মতো রাজেন্দ্রনাথও অধ্যাপনা ব্রত গ্রহণ করে প্রথম দিকে কিছুকাল উত্তরপাড়া কলেজ ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজে শিক্ষকতা করেন। জগন্নাথ কলেজে থাকতে থাকতেই আনুমানিক ১৯০৭ সালে 'ঘোষ স্কলারশিপ' নিয়ে রাজেন্দ্রনাথ বিলেতে যান এবং লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এস-সি. পাস করেন। ১৯১০ সালে আই-ই-এস অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান এডুকেশন্যাল সার্ভিসে মনোনীত হবার পর দেশে ফিরে শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের 'টিংক্টোরিয়াল কেমিস্ট্রি' (রঞ্জক রসায়ন) বিভাগের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

নাটোরের এবং পরবর্তীকালে কলকাতা হাইকোর্টের বর্ষীয়ান ব্যবহারজীবী স্বর্গীয় কাশীনাথ মৈত্রের পুত্র শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় ক্যালকাটা কেমিক্যালের তিন প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে কনিষ্ঠ। সেণ্ট জেভিয়ার্সে এফ-এ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এস সি. পাসের পর ওই কলেজ থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রবর্তিত এম. এস-সি. কোর্সের প্রথম ছাত্রদলের অন্যতমরূপে ১৯১০ সালে কেমিস্ট্রিতে এম. এস-সি. ডিগ্রী পান। তখন তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র। পাস করার কিছুকাল পরেই বীরেন্দ্রনাথও কেমিস্ট্রির লেকচারার পদে শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে যোগদান করেন।

বীরেন্দ্রনাথের পারিবারিক ইতিহাসে দেখা যায় যে, তাঁর পিতা ও ভ্রাতৃবৃন্দের ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে বিশেষ আগ্রহ ছিল। কাশীনাথবাবু একটি ব্যাঙ্কের স্থাপনা করেছিলেন। তিনি এবং তাঁর অন্য ছেলেরা বর্তমান পূর্ণ থিয়েটারের বাড়িটা লীজে ভাড়া নিয়ে বাঙালীর প্রথম সিনেমা হাউস 'রসা থিয়েটার'-এর সৃষ্টি করেন। অন্যতম প্রথম বাংলা ফিল্ম 'বিলাত ফেরত'-ও তাঁদেরই প্রযোজিত।

খগেন্দ্রচন্দ্রের পারিবারিক ঐতিহ্য বিস্ময়কর। তাঁর পিতা তারকচন্দ্র দাশ ছিলেন ঢাকা আদালতের জজ। পিতামহ আনন্দমোহন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদাভিষিক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি একদিনের জন্যও এজলাসে বসেননি। ওদিকে মা ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয়া মোহিনী দেবী, যিনি রাজপুরুষের পত্নী হয়েও মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ১৯২১-এর নন-কোঅপারেশনের যুগ থেকেই অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি একাধিকবার কারাবরণ করেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩০-এর বিলিতী বয়কট ও লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন-কালীন কারাবাসে মোহিনী দেবীর সঙ্গে স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের পত্নী ('আনন্দ-বাজার' ও 'দেশ' সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকারের মাতৃদেবী) স্বর্গতা নির্ঝরিণী দেবী, ঢাকায় প্রকাশিত অধুনালুপ্ত 'ভারত মহিলা' পত্রিকার সম্পাদিকা স্বর্গীয়া সরযূবালা দত্ত ভারতী প্রমুখ দু'-তিনজন বর্ষীয়সী মহিলাও কারাবরণ করেছিলেন। ১৯৩২-এর 'আইন অমান্য' এবং বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনেও মোহিনী দেবী কংগ্রেসের নেত্রীস্থানীয়া ছিলেন।

মোহিনী দেবীই বোধ হয় প্রথম সম্ভ্রান্ত বাঙালী মহিলা যিনি একা একা সেকালের ট্রামে চলাফেরা করে সারা কলকাতা শহরের রক্ষণশীল সমাজকে চকিত করেছিলেন। আর তাঁর চতুর্থা

কন্যা ডক্টর প্রভাবতী দাশগুপ্ত, নারীপ্রগতি-উৎসাহক পিতা তারকচন্দ্র দাশ মহাশয়ের প্রেরণাতে, উচ্চতম শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ডক্টরেট বিভূষিতা ভারতীয়াদের মধ্যে প্রথমতম মহিলা (বর্তমানে ৭৫ বৎসর বয়স্কা) প্রভাবতী দেবীর শতায়ু কামনা করি।

বঙ্গবাসী কলেজে এফ-এ (ফার্স্ট আর্টস অর্থাৎ আজকের আই-এ) এবং প্রেসিডেন্সীতে বি-এ পড়ার পর স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়ে খগেন্দ্রচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ছাড়াও সখারাম গণেশ দেউস্কর ও বালগঙ্গাধর তিলকের মতো বিরাট পুরুষদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও এসেছিলেন।

১৯০৫ সালে জাস্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের অগ্রজ স্বর্গীয় সুবোধচন্দ্র রায় এবং স্বর্গীয় বনোয়ারীলাল চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রেমিক বাঙালী এ দেশের তরুণদের বিদেশে পাঠিয়ে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পশিক্ষায় ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য "Society for the Advancement of Scientific and Industrial Education for Indians" সংস্থা গঠন করেন। সেই সংস্থার ধনভাণ্ডারের সহায়তায় ১৬ জন (মতান্তরে ১৯ জন) বাঙালী যুবক বিদেশে, বিশেষ করে জাপানে গিয়ে নানা শিল্পে পারদর্শিতা লাভ করে আসেন। এঁরা অবশ্য সকলে একই সঙ্গে যাননি; পর পর কয়েক বছরে এঁদের বৃত্তি দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। সংস্থার উদ্দেশ্যই ছিল যে, এই যুবকরা নানা রকম কাজ শিখে এসে স্বদেশের শিল্পোন্নয়ন করবেন। সেই বৃত্তি যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে পর্সিলেন-এর শ্রীসত্যসুন্দর দেব ও গোয়ালিয়র পটারিজের স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়দের অবদানের বিষয়ে আগের এক প্রবন্ধে লিখেছি। আরও যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, 'বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের' স্বর্গীয় সুরেন্দ্রমোহন বসু, 'মনোরমা' মোমবাতির উদ্ভাবক নগেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়, 'যশোর কোম্ব (চিরুনী) বাটন অ্যান্ড ম্যাট (মাদুর)'-এর স্বর্গীয় মন্মথনাথ ঘোষ, 'রংপুর টোব্যাকো' কম্পানির অম্বিকাচরণ রায় মহাশয় এবং চুলের কাঁটা তৈরীতে স্বর্গীয় অবনীনাথ মিত্র প্রমুখ পথিকৃৎবর্গ। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের শিষ্য। বাঙালীকে শিল্পায়নে পরিচালিত করার জন্য আচার্যদেব তখন উদাত্তস্বরে তাঁর আহ্বান, তাঁর ভর্ৎসনা এবং তাঁর সাবধানবাণী প্রচার করে চলেছেন।

খগেন্দ্রচন্দ্র এই ষোলো জনের অন্যতম। তিনি ১৯০৬ সালে জাপান যান। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই দলের বাইরের একজন, কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথও একই জাহাজে খগেন্দ্রচন্দ্রের সহযাত্রী হন।

রথীন্দ্রনাথ যাচ্ছিলেন কৃষিবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের জন্য আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। এঁরা দু'জনেই ইলিনয়-এর স্নাতক হয়ে দেশে ফিরেছিলেন।

খগেন্দ্রচন্দ্র দাশ জাপান থেকে আমেরিকা যান উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে এবং ১৯১০ সালে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিস্ট্রিতে বি. এস-সি. হন। কিছু দিন আমেরিকারই

এক বড় কারখানাতে রাসায়নিকের কাজ করার পর দেশে ফিরে খগেনবাবু শিবপুর বি-ই কলেজে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

কিন্তু সে কাজ তাঁর বেশী দিন করা হল না। ১৯১৪ সালে 'কোমাগাটামারু'-র* ব্যাপারে খগেন্দ্রচন্দ্র ও তাঁর সুহৃৎ 'বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ' কম্পানির প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সুরেন্দ্রমোহন বসু গ্রেপ্তার হলেন। কিছু দিন পরে তাঁরা ছাড়া পেলেন বটে, কিন্তু সরকারের চাপে খগেনবাবু সরকারী চাকরি ছাড়তে বাধ্য হলেন।

অধ্যাপক বীরেন মৈত্র বি-ই কলেজের কাজ ছেড়েছিলেন খগেন্দ্রচন্দ্রের প্রায় বছরখানেক পরে। ১৯১৫ সালে শিবপুর বি-ই কলেজের টিংক্টোরিয়াল কেমিস্ট্রি বিভাগটি বন্ধ হয়ে যায়। রাজেন্দ্রনাথ তখন আলিপুরে গভর্ণমেণ্ট টেস্ট হাউসে অস্থায়ী কেমিস্ট্রি-বিশেষজ্ঞ হিসেবে যোগ দেন। এটা হলো তাঁর ১৯১৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক পদে নিয়োগের আগের কথা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯১৮ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার পর রাজেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। দু' বছর পরে ১৯৩৪ সালে রিটায়ার করে ক্যালকাটা কেমিক্যালের পরিচালনায় সক্রিয় অংশ নেন। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৩৬-এ তাঁর মৃত্যু হয়।

তখন ইওরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। বীরেনবাবু কিছু একটা করবেন বলে নানা জায়গায় যাতায়াত করছিলেন। তাঁর মনে তখন কাজ করছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শ ও প্রেরণা। কোনো কাজে একদিন শেয়ালদায় ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কম্পানির ডিপোতে গিয়ে দেখলেন যে, সেখানকার প্রশস্ত প্রাংগণে গ্যাস তৈরির উপাদান 'স্পেণ্ট অক্সাইডের' পর্বতপ্রমাণ স্তূপ অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকে। রাসায়নিক বীরেন্দ্রনাথের খেয়াল হলো যে, এই দগ্ধাবশেষ থেকে 'ইয়েলো প্রুশিয়েট অব পোটাশ' নামে যে পদার্থটি উপপণ্যরূপে নির্গত হয়, ইস্পাত টেম্পারিং এর পক্ষে সেটি আবশ্যিক। অথচ গ্যাস কম্পানি তার সদ্ব্যবহার করে না।

* গত শতাব্দী থেকেই বেশ কয়েক হাজার কষ্টসহিষ্ণু উদ্‌যোগী শিখের কর্মক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার কৃষিপ্রধান পশ্চিমাঞ্চল। স্থানীয় লোকের চাইতে এঁরা কম মাইনেতে শ্রমিকের কাজ করতেন বলে শ্বেতকায় শ্রমিকরা পদে পদে এঁদের ওপর অত্যাচার করতেন। এমন কি একটি আইনও পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন যে, বিদেশী শ্রমিকরা স্বদেশ থেকে জাহাজে করে পথে কোনো বন্দরে না নেমে সরাসরি আমেরিকা বা কানাডাতে জাহাজ ভেড়ালে তাঁদের প্রবেশ করতে দেওয়া হবে; অন্যথায় নয়। ভারতীয়দের নিজস্ব কোনো জাহাজ ছিল না বলেই বোধ হয় এই আইন হলো। সেই সময়ে লালা হরদয়াল নামে দিল্লীর এক বিপ্লবী সে দেশে গিয়ে উপস্থিত হন এবং তাঁর সম্পাদনায় 'গদর' (বিদ্রোহ) নামে এক পত্রিকার হিন্দী ও উর্দু দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হতে থাকে। প্রায় একই সময়ে শিখনেতা বাবা গুরদিৎ সিং 'কোমাগাটামারু' নামক পুরো একটি জাপানী জাহাজ ভাড়া করে বিরাট একদল শিখ শ্রমিক নিয়ে হংকং থেকে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলাভিমুখে যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য, স্থানীয় আইন বাঁচিয়ে সে দেশে প্রবেশ করা এবং কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করা। কিন্তু এত করা সত্ত্বেও কানাডা বা আমেরিকার কোনো বন্দরে তাঁদের নামতে দেওয়া হলো না। জাহাজ সকলকে নিয়ে ভারতে ফিরে এলো এবং ১৯১৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর কলকাতার বজবজে উপনীত হলো। বাবা গুরদিৎ সিংয়ের এই দলের নাম হয়েছিল 'গদর পার্টি'। পাঞ্জাবের শিখ বিপ্লবীরা বাঙলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যাতে যোগাযোগ না করতে পারেন সেই জন্যে ইংরেজ সরকার এই দলের কলকাতায় এসে পৌঁছবার আগেই পুরো একটি ট্রেন মজুত রাখলেন, আর 'কোমাগাটামারু' কলকাতায় পৌঁছতেই দলনেতাদের বলা হলো যে সেই ট্রেনে করে দলবল নিয়ে তাঁরা সোজা পাঞ্জাব ফিরে যান। এই সব নিয়ে পুলিসের সঙ্গে 'গদর পার্টি'-র মহা হাঙ্গামা হয়ে শিখ পক্ষে একজন বাঙালী ও একজন ওড়িশাবাসীসহ আঠারোজনের এবং কিছু পুলিসের প্রাণহানি হলো। সুরেন্দ্রমোহন, খগেন্দ্রচন্দ্র এবং কলকাতার অন্যান্য বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিকরা 'কোমাগাটামারু'র যাত্রীদের সাহায্য করতে এগিয়ে যাওয়াতেই তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

খবরটি নিয়ে বীরেন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু ও ভ্রাতৃপ্রতিম খগেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। দু'জনে মিলে গ্যাস কম্পানির সঙ্গে এক চুক্তি করে সেই পাঁশের গাদা কিনে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 'ইয়েলো প্রুশিয়েট'-এ পরিণত করে ইওরোপে চালান দেওয়া শুরু করলেন। বছর দুয়েকের মধ্যে সেই রপ্তানি দাঁড়ালো কয়েক লক্ষ টাকায়।

১৯১৬ সালে রাজেন্দ্রনাথও এ'দের দুজনের সঙ্গে যোগ দিলেন, কিন্তু আগেই বলেছি যে, সরকারী চাকুরে বলে সক্রিয় অংশীদার হতে পারলেন না।

প্রতিষ্ঠানের নাম হলো ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং প্রাইভেট লিমিটেড। প্রত্যেকে ৩000 টাকা করে জমা দিয়ে মোট ৯000 টাকা মূলধনে তিন বন্ধুর সমস্বামিত্বে প্রতিষ্ঠানের জন্ম হলো। কারখানা স্থাপনার আয়োজন হলো পণ্ডিতিয়া রোডে।

ঝোপঝাড় আর খানাডোবায় ভরা বালিগঞ্জের পণ্ডিতিয়া অঞ্চলে তখন সূর্যাস্তের পরেই শেয়াল ডাকতো। মোটা মোটা বিষধর সাপেরও বাস ছিল। মাঝে মাঝে সুন্দরবনের দক্ষিণরায়ের চেলা-চামুণ্ডারা দু' চার মাইলের মধ্যে এসে ঘোরাফেরা করে তাঁদের চতুষ্পদের ধুলো দিয়ে যেতেন। হাজরা রোডই বলতে গেলে কলকাতার দক্ষিণ প্রান্ত ছিল, যদিও কালিঘাটের দিকটা আরও একটু ঠেলে এগিয়ে গিয়েছিল।

বীরেন্দ্রনাথের কাকার এক বন্ধুর পণ্ডিতিয়াতে পাঁচ বিঘা জমির ওপর এক বাগানবাড়ি ছিল। মাসিক ৫0 টাকা ভাড়ায় পাঁচ বছরের লীজে ৩৫ নং পণ্ডিতিয়া রোডের সেই বাড়িটাই ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর জন্য নেওয়া হলো। শেষ পর্যন্ত কতদূর কি হয়ে ওঠে সেই ভয়ে প্রতিষ্ঠাতারা বেশী দিনের লীজ নিতে সাহস পেলেন না।

বিক্রির দিকটা ধরলে আজকের ক্যালকাটা কেমিক্যাল মুখ্যত সাবান ও প্রসাধন পণ্যের উৎপাদক। ১৯৬৭ সালের ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার মধ্যে ২ কোটি ৮ লক্ষই হলো সাবান ও প্রসাধনীর বিক্রি। কিন্তু সেই ১৯১৬ সালে সেটা একেবারেই কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী ছিল। তার প্রথম যুগের কার্যক্রম পোটাশিয়াম ও সোডিয়াম সাইট্রেট এবং ল্যাক্টিক, স্টিয়ারিক, ওলিক প্রভৃতি অ্যাসিডের উৎপাদনেই সীমিত ছিল। ক্যালকাটা কেমিক্যালই ভারতবর্ষে প্রথম স্টিয়ারিক্, ওলিক্ ও ল্যাক্টিক অ্যাসিড, পোটাশিয়াম কার্বনেট, ফার্মেণ্টেশন পদ্ধতিতে ক্যালসিয়াম ল্যাক্টেট প্রভৃতির উৎপাদন শুরু করেন। পোটাশিয়াম কার্বনেট বিদেশে রপ্তানি হতো। অ্যাসিডগুলির মানের উৎকর্ষের জন্য সরকার ট্যারিফ প্রোটেকশন দিয়েছিলেন। এখনো বি-পি কোয়ালিটির ওলিক্ অ্যাসিড একমাত্র এ'রাই তৈরি করেন।

বাজারে এইসব কেমিক্যালের প্রচুর চাহিদা ছিল এবং তিন কেমিস্ট্রি অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে উৎপন্ন ক্যালকাটা কেমিক্যালের উৎকৃষ্ট অ্যাসিড ও কেমিক্যাল বাজারে পেঁছতে না পেঁছতেই বিক্রি হয়ে যেতো। চাহিদার ক্ষুদ্রতম অংশও সরবরাহ করা কঠিন হয়ে উঠলো।

চার বছরে তিন মালিকের যতটা লাভ হলো তার সামান্য ভাগ নিজেরা রেখে বাকীটা কম্পানিতে পুনর্নিয়োগ করে ৯000 টাকার মূলধন ৫0,000 টাকায় দাঁড়ালো। কিন্তু যথেষ্ট

সম্প্রসারণের পক্ষে সে টাকাও অপ্রতুল হলো। তাই কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন যে, মূলধন বৃদ্ধির জন্যে কম্পানিকে পাবলিক লিমিটেড করে বাজারে আরও শেয়ার বেচবেন।

১৯২০ সালে ক্যালকাটা কেমিক্যাল লিমিটেড কম্পানিতে পরিণত হলো। ম্যানেজিং এজেন্টস্ হলেন 'সেন দাশ মৈত্র' কম্পানি। রাজেন্দ্রনাথের স্থানে তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা সুজাতা সেন এই ম্যানেজিং এজেন্সির পার্টনার হলেন।

কর্তারা প্রথমেই যে কাজটি করে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন তা হলো, যথার্থ রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা উচ্চমানের কেমিক্যাল উৎপাদনের জন্য প্রতিষ্ঠানের সেই ক্ষুদ্রাবস্থাতেই প্রচুর সাজসরঞ্জাম সংবলিত একটি ল্যাবোরেটরির স্থাপনা করা। সেই গবেষণাগারে একের পর এক রিসার্চ চললো। চরকসংহিতায় উল্লেখিত আয়ুর্বেদীয় সর্পগন্ধা লতা অর্থাৎ রাজসিক রোগ ব্লাড-প্রেসার বা হাইপারটেনশনের অমোঘ ঔষধ রাওলফিয়া সার্পেন্টিনা নিয়ে এঁদের গবেষণার ফল আপনারা অনেকেই আজ পাচ্ছেন।

কিন্তু ক্যালকাটা কেমিক্যালকে যে বস্তুটি বিশ্ববিখ্যাত করেছে তা হলো নিমের তেল থেকে প্রস্তুত 'মার্গো' সোপ ও 'নিম' টুথপেস্ট। খাঁটি নিমের তেলের দুর্গন্ধ প্রায় ন্যাশান্যাল ট্যানারির ভেজিটেবল্ ট্যানিং বা ছালপাকাইয়ের গন্ধের সমান। সে গন্ধে আপনার আমার বমি আসবে। সে গন্ধের উৎস হলো নিমের ফল ছেঁচা তেলের গন্ধ।

অথচ নিমফুলের গন্ধ কী মধুর।

'শাপমোচনে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'কমলিকার অন্ধকার ঘরে একদিন নিমফুলের গন্ধ অনির্বচনীয়ের আমন্ত্রণ' নিয়ে এসেছিল।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল উগ্রগন্ধী নিমতেলকে সুঘ্রেয় করে তুললেন। এখনকার কথা জানি না, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো দেশের রাসায়নিকরাই এই কাজে সফল হতে পারেননি। ক্যালকাটা কেমিক্যালের গবেষণাগারেই তা সম্ভব হয়েছিল। নিম-তেল নিয়ে রাজেন্দ্রনাথ এবং তাঁর শ্যালক কর্নেল করুণাকুমার চ্যাটার্জি এই গবেষণা করেছিলেন। তার ফলে নানারকম ওষুধপত্রও তৈরী হয়েছিল।

উপাধি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, করুণাকুমার রাজেন্দ্রনাথের মতোই সরকারী কর্মচারী ছিলেন। আত্মীয়তা ও বন্ধুতাসূত্রে তিনি ক্যালকাটা কেমিক্যালের কর্তৃপক্ষকে এইভাবে সাহায্য করতেন। খগেন্দ্রচন্দ্র ও বীরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন বলেই সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর বছর কয়েক আগে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত করুণাকুমার ক্যালকাটা কেমিক্যালের ওষুধ তৈরির ব্যাপারে উপদেষ্টারূপে কাজ করে গেছেন।

ক্যালকাটা কেমিক্যালের পরিচ্ছন্ন এয়ার-কন্ডিশনড ল্যাবোরেটরিটি দেখবার মতো। দামী দামী ইম্পোর্টেড যন্ত্রে ওষুধপত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রস্তুতি চলেছে। কেমিক্যাল ল্যাবোরেটরির কার্যক্রম কিছুটা বুঝতে পারলাম; কিন্তু অদ্ভুত লাগলো এঁদের ইলেকট্রনিক যন্ত্রসংবলিত 'ফিজিক্যাল ল্যাবোরেটরি'টি দেখে।

ওষুধ তৈরীতে কেমিক্যাল পরীক্ষা ছাড়াও যে সপ্তাশ্ববাহন সূর্যের সহায়তা প্রয়োজন তা আমার একেবারেই জানা ছিল না। অনেকের মধ্যে একটি যন্ত্র—দাম নাকি তার ৫০,০০০ টাকা—সেই যন্ত্রে বেগুনিপার (আলট্রা ভায়লেট) ও লাল-উজানি (ইনফ্রারেড) আলোয় ওষুধের উপাদান পরীক্ষা করে তার গুণাগুণ সম্বন্ধে সর্বশেষ রায় দেবার পর সেই ওষুধ বাজারে ছাড়া হয়। 'কোয়ালিটি কন্ট্রোল'-এর এই উচ্চমার্গের পদ্ধতিটি আমি বুঝলাম না, তবে এটুকু আমার মাথায় ঢুকলো যে, উৎপাদনের আধুনিকতার জন্যেই ক্যালকাটা কেমিক্যাল দিনে দিনে এত এগিয়ে যাচ্ছে।

রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে ভেষজ শিল্পের দিকেও প্রতিষ্ঠানের বিশেষ লক্ষ্য। ক্যালকাটা কেমিক্যালের সি-বি-টিনা, ডলোরিন, কে-সল্ট, কোলিবিল, সাইক্লোস্যাক, উইনোমনোস্, নোপিন বাম প্রভৃতি ঔষধ বাজারে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে। কয়েকজন প্রখ্যাত রাসায়নিক ও চিকিৎসক রিসার্চের তত্ত্বাবধান করেন।

সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স পেয়ে এঁরা মেন্‌থল ও ফেনাসেটিন—এই দুটি অতি প্রয়োজনীয় রসায়নও সর্বপ্রথম তৈরি করেন। স্যাকারিনের উৎপাদনও যথেষ্ট।

তিলজলার ২ নম্বর কারখানা। এর স্থাপনা হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। ততদিনে লীজ নেওয়া বাড়িটির সংলগ্ন কেনা-জমির ওপর কম্পানির নিজস্ব বাড়ির অনেকটা তৈরি হয়ে গেছে। দু' নম্বর ফ্যাক্টরি বসাবার সময়ে জমি কম ছিল; এখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 'শেড' এবং তিন চারটে নতুন বৃহৎ অট্টালিকা সহ জমির আয়তন হয়েছে ১০ বিঘা। পন্ডিতিয়া রোডের ফ্যাক্টরীটি বালিগঞ্জের সবাই চেনে। আকাশচুম্বী বিরাট সৌধটি গৃহস্থ পাড়ার মধ্যেই অবস্থিত এবং বহুদূর থেকে তার চিমনির ধোঁয়া দেখা যায়।

সেদিন তিলজলার কারখানাতে মার্গো-সোপ, রেণুকা পাউডার, আর মাথার তেলের মধ্যে ব্রাহ্মী আমলা, কোকোনল, ভৃঙ্গল প্রভৃতির প্রস্তুতি পর্ব আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন এই প্রতিষ্ঠানের খ্যাতনামা প্রচার সচিব শ্রীশ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় এবং কম্পানির প্রাচীনতম কর্মীদের অন্যতম, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ ভট্টাচার্য। প্রকাণ্ড ব্যাপার। দোতলার সমান উঁচু এক একটি দানবীয় কেট্‌লিতে এঁদের সুবিখ্যাত নিম সাবানের শত শত মণ উপাদান একসঙ্গে তৈরি হচ্ছে। বেশ দুর্গন্ধ। পাশেই মহাভৃঙ্গরাজ লতার স্তূপ। তাতেও দুর্গন্ধ। এইসব কড়া গন্ধকে সুরভিত করা কৃতিত্বের কাজ বইকি।

কিছু দূরে নতুন চারতলা বাড়িগুলিতে তৈরী হচ্ছে রমণী মনোরঞ্জন সব প্রসাধন সামগ্রী। পুরুষের ব্যবহার্য জিনিসও অনেক আছে বটে, কিন্তু আবহমান কাল থেকে অঙ্গরাগ হলো নারীরই জন্মগত অধিকার; পুরুষ সেখানে গৌণ (অবশ্য রাজারাজড়াদের বাদ দিয়ে)।

প্রসাধনের ইতিহাস কে না-জানে! আদিমানব, আমাদের দেশের হরাপ্পা-মহেঞ্জোদারোর অধিবাসী, মিশরের রানী নেফারতিতি ও ক্লিওপ্যাট্রা, চীনের প্রাচীনতম সিয়া রাজবংশ (অবশ্য চীনের নারীদের প্রসাধনে কাঁচা ডিমের স্থান খুব আদরের), রোমক নারীকুল, মুঘল হারেম প্রভৃতির অঙ্গসজ্জার উপাখ্যান থেকে শুরু করে ফরাসী পুষ্পসার ও প্রসাধনী-প্রিয় নর-নারীর রূপচর্চার বিষয় নিয়ে আপনার আমার কিশোরী কন্যাও কয়েক পাতার প্রবন্ধ লিখে ফেলতে

পারে। (আমার এক কন্যার প্রবন্ধ অলরেডি ছেপে প্রকাশিত হয়ে গেছে বহু দিন আগে; ক্যালকাটা কেমিক্যালের লিটারেচার নাড়াচাড়া করে নিলে আপনার কন্যা পুরো একটা বই লিখে ফেলতে পারবে)।

তবুও কালিদাসের কালের মন্দালিকা চিত্রলেখা মঞ্জুলিকা মঞ্জরিণীদের অঙ্গরাগের বর্ণনার সেই অপরূপ ছন্দোবন্ধ লিটারেচার-এর লাইন ক'টি দিয়ে ইতিহাসের পালা শেষ করি—

অলক সাজত কুন্দফুলে শিরীষ পরত কর্ণমূলে
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নবনীপের মালা।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে
লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু মাখত মুখে বালা।
কালাগুরুর গুরু গন্ধ লেগে থাকত সাজে,
কুরুবকের পরত মালা কালো কেশের মাঝে॥

এর পরে 'কুঙ্কুমেরি পত্রলেখায় বক্ষ রইত ঢাকা' দিয়ে যে স্তবকটি আছে সেটাও এখানে টেনে আনলে লেখাটা ঝুলে পড়বে। থাক গিয়ে সেটা।

'ঋতুসংহার' আর 'কুমারসম্ভব' থেকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেকালের সুন্দরীদের অঙ্গরাগের এই ছবিটি এ'কেছেন বলেই শুনেছিলাম। কাব্যে অজ্ঞতার জন্যে আমি ঋতুসংহার ও কুমার-সম্ভবের উল্লেখের পারম্পর্যে যদি ভুল ক'রে থাকি তো অনবধানতার জন্যে আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন। ঋতুসংহার লেখা না হলে কুমারসম্ভব লেখা অসম্ভব ভেবেই এটা আমি আন্দাজে লিখলাম।

আজ আমি আফসোস করে মরছি যে, বিশ্বকর্মার কাজটা যদি আমি যৌবনকালে পেতাম তাহলে শ্রীহরিবাবুর সৌজন্যে আমার কত লাভ হতো! নবোঢ়া কিশোরী বধূকে আনন্দিত করার—তাঁর দন্তরুচির কৌমুদীর ছটায় আমার দৃষ্টি সার্থক করার; আর স্নো-ক্রীম, পাউডার, শ্যাম্পু-ল্যাভেণ্ডার, ও-ডি-কলোন ও পুষ্পসার দিয়ে তাঁর দেহবল্লরী সুরভিত করার সবকিছুই এক জায়গায় হাত বাড়িয়ে পেয়ে যেতাম। তিনি খুশি মনে থাকলে ক্যান্থারল বা ক্যাস্টরল, আর রুষ্ট হলে ভৃঙ্গল তেল মাখতেন মাথায়। সারা বাড়িটা গন্ধবিধুর হয়ে থাকতো।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল এয়োতীর সিঁথির ও ঠোঁটের সিঁদুর ছাড়া আর সবই তৈরি করেন কিনা!

১৯৫৯ সালে মাদ্রাজের কোডাম্বকম্ অঞ্চলে এই প্রতিষ্ঠানের তিন নম্বর কারখানা স্থাপিত হলো। দক্ষিণ দেশে, চুলের তেল, ট্যালকম্ পাউডার, প্রভৃতি জিনিসের প্রচুর চাহিদার জন্যেই এই সম্প্রসারণ জরুরী হয়ে পড়েছিল।

ভারতবর্ষে এখন ক্যালকাটা কেমিক্যালের নিজস্ব শাখা অফিসের সংখ্যা সতেরো। সিঙ্গাপুরেও একজন বাঙালী প্রতিনিধি আছেন। এছাড়াও এজেন্সি দেওয়া আছে নানা জায়গায়।

জলজঙ্গলে ভরা পণ্ডিতিয়া রোডের সেই ছোট্ট প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিক্রি এখন প্রায় তিন কোটি টাকার। ক্রমোন্নতির একটি পরিসংখ্যান নীচে লিপিবন্ধ করছি।

সাল	বিক্রি	ডিভিডেন্ড
১৯২২	১,৪৭,০০০ টাকা	৬ পারসেণ্ট
১৯৩২	২,৮৪,০০০ "	ঐ
১৯৪১	১২,৯২,০০০ "	৯ "
১৯৬৪	২,৩৫,২৩,০০০ "	১৮ "
*১৯৬৭	২,৭৯,৩৩,০০০ "	১৮ "

কম্পানির বর্তমান পেড-আপ ক্যাপিট্যাল ২০,২১,০০০ টাকা এবং রিজার্ভ ফাণ্ড ৪৬,২৩,০০০ টাকা।

একটি কৌতূহলোদ্দীপক কথা শুনলাম। এত যে মন্দা আর সংকট গেল তা সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠানের প্রসাধন দ্রব্যের বিক্রি বছরে বছরে বেশ বেড়ে গেছে। দেশময় অভাব আর অভাব, অথচ মানুষের অঙ্গরাগে স্পৃহার অভাব নেই। এখন আবার শৌখিন লোকের জন্যে সেরা জাতের দামী দামী প্রসাধনীও এখানে তৈরি হচ্ছে। 'ল্যাভেণ্ডার ডিউ' সাবান, ট্যালকম এবং ও-ডি-টয়লেটের মধুর গন্ধে ভারতবর্ষের ধনী ব্যক্তিদের গৃহ ভরপুর।

সহ-প্রচারসচিব শ্রীরণজিৎ সিংহের টেবিলে বসে তথ্যসংগ্রহ-কালে টিফিনের সময় হলো। জলখাবারের প্লেট আমার জন্যেও এলো--একটি বড় সাইজের মর্তমান কলা, বিস্কুট বেশ কয়েকটি, দু'টি প্রমাণ সাইজের মিষ্টি ইত্যাদি। ভাবলাম, এসব হচ্ছে আতিথেয়তার নিদর্শন। 'এত কেন' বলাতে রণজিৎবাবু বললেন যে, এই খাবার ক্যালকাটা কেমিক্যালের ছোট বড় প্রত্যেক কর্মীর দৈনিক বরাদ্দ; বিকল্পে ডালভাত, মাছতরকারি এবং দুধের ব্যবস্থাও আছে ওপরের খাবার ঘরে। আগে জানতাম যে, ফার্স্টক্লাস মার্চেণ্ট অফিসের ভাগ্যবান অফিসাররাই কেবল ফ্রী লাঞ্চ আর ফ্রী হুইস্কি, এইসব পেয়ে থাকেন। আহার্যের বিষয়ে ক্যালকাটা কেমিক্যালে মানুষ এবং তার শ্রমেরই মূল্য দেওয়া হয়, পদের নয়। কম্পানি বাৎসরিক নীট লাভের ৫০/৫৫ পারসেণ্ট এইভাবে কর্মীদের হিতের জন্য ব্যয় করে আসছেন বহুকাল ধরে।

ছিদ্রান্বেষীরা সম্ভবত বলবেন, এ হচ্ছে সরকারকে ট্যাক্স কম দিয়ে খরচ করে ফেলার ব্যবস্থা। তা যদি হয়-ও, সেটা করেন ক'জন শিল্পপতি? পাকেপ্রকারে অনেকেই তা অন্য খাতে ঢুকিয়ে ফেলেন বলেই তো শুনি।

ক্যালকাটা কেমিক্যালের কর্মীদের 'স্টেট ইনসিওরেন্স'-এ চিকিৎসা এবং ওষুধপত্রের বাধ্যতামূলক সুবিধা দেওয়া ছাড়াও পৃথকভাবে 'মেডিক্যাল বেনিফিট'-এর ব্যবস্থা আছে।

* ১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি খবর পেলাম যে বিক্রির অংক সাড়ে তিন কোটি টাকার কাছাকাছি।

কর্মীদের সন্তানসন্ততির বিদ্যাশিক্ষার জন্যেও সাহায্যক ভাণ্ডার আছে। আর এক অভিনব ব্যবস্থা আছে। তা হলো, বছরে একবার, পুজোর আগে লটারি করে যাঁরা জেতেন তাঁদের দেশভ্রমণ ও পাথেয় খরচের জন্যে সাহায্যক।

ক্যালকাটা কেমিক্যালে এয়ার-কণ্ডিশনিং আছে, কিন্তু সেটা লাগে ওষুধ তৈরির ঘরে আর গবেষণাগারে—কর্তাদের আরামের জন্য নয়।

এখানে চেম্বার আছে, দরজাও আছে; কিন্তু সেই দরজা হাট করে খোলাই থাকে অধিকাংশ সময়ে—কারও পক্ষে কর্তাব্যক্তিদের সেসব ঘর দুষ্প্রবেশ্য নয়। সকলেই কাজে ব্যস্ত, তাই কাজ ছাড়া কোনো কর্মী কর্তাদের খোলা দরজার সুযোগ নিয়ে উৎপাত করেন বলে মনে হলো না।

কেবল দেখলাম পিতামহ স্থানীয় বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র মশায়ের আদিকালের পুরনো বার্নিশ ওঠা কাঠের দরজার হাফপাল্লা কখনোসখনো বন্ধ থাকে। বৃদ্ধের প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রমের নিদর্শন বলে মনে হলো। সেই ঘরে খোলা জানলার সামনে গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দু'জোড়া টেবিল চেয়ার পাতা। একটিতে বীরেন্দ্রনাথ বসেছিলেন, আর একটি খালি—খগেন্দ্রচন্দ্র এই সেদিনও সেই শূন্য আসন পূর্ণ করে বসতেন। পঞ্চাশ বছর দু'জনে একসঙ্গে পাশাপাশি বসে কাজ করার পর বীরেনবাবু, এত লোকের মধ্যে থেকেও, আজ একলা।

'খুল্লা দরওয়াজা' হলো এই প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য। এখানকার সহস্র কর্মীর প্রাণ কর্তাদের সঙ্গে যেন একই সূত্রে বাঁধা হয়ে রয়েছে এই খোলামেলার জন্যেই। কর্তারা সহজ মানুষ—বৈষ্ণবী বিনয়ও নেই আর দম্ভও নেই।

এখানে কখনো স্ট্রাইক বা লক-আউট হয় না।

অনেক জায়গায় ঘুরে আমার এই প্রত্যয় হয়েছে যে, বাঙালী প্রতিষ্ঠানে ঠাট-এর আধিক্য কমিয়ে দেওয়া উচিত, যদি-না আমাদের কর্তারা তাঁদের কর্মীদের সকলকেও মোটামুটি একই পর্যায়ে সেই সুযোগ সুবিধা দিতে পারেন। অবশ্য নিজেদের মধ্যে গোপন বাণিজ্যিক আলাপ আলোচনা এবং মান্য বিদেশী অতিথিকে আদর আপ্যায়নের জন্য, ক্রেতাকে খাতির করার জন্যেও, এয়ারকণ্ডিশনিং বা প্লাশ কার্পেটে মোড়া ঘর রাখা এযুগে আবশ্যক; আর আবশ্যক ব্যাঙ্কের মতো প্রতিষ্ঠানে, যেখানে মস্তিষ্কের ব্যবহারই বেশী, গোপনীয়তা রক্ষা করা তো আছেই।

এ কথায় অনেকে হয়তো আমাকে আধুনিকতা-বিরোধী মান্ধাতার আমলের লোক বলে মনে করবেন, কিন্তু ক্যালকাটা কেমিক্যাল এবং অন্য দু' চারটে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধের মাধুর্য দেখে আমার খুবই মনে হচ্ছে, শ্রমিকসমস্যাসঙ্কুল বাংলাদেশের বাঙালী শিল্পপতি ও বণিকশ্রেষ্ঠদের উচিত অন্তর থেকে কর্মীদের সান্নিধ্যে এগিয়ে আসা। বাহ্যিক আচারের দ্বারাও সেই আন্তরিকতা ফুটিয়ে তোলা বোধহয় খুবই দরকার। অনেক জায়গায় গিয়ে মনে হয়েছে ঠাটের আতিশয্য চরম; তার একটি মাঝারি জাতের অফিসে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে গিয়েও ঘণ্টাখানেক বাইরে বসে থাকার পরে কর্তার কার্পেট মোড়া এয়ারকণ্ডিশনড্ ঘরে ঢুকে তাজ্জব হয়েছি। কর্তার খাবার প্লেটটা, জলের গেলাসটা এগিয়ে দিচ্ছেন এক শিক্ষিত ভদ্র

হুঁকোবরদার। একটু ভুল করতেই প্রৌঢ় ভৃত্যকে কর্তা বার তিনেক রূঢ় ভাষায় তিরস্কার করলেন আমার সামনেই।

বাস্তবের দিকে লক্ষ্য রেখেই কথাগুলি বললাম, কেউ যেন একে অযাচিত উপদেশ বলে মনে না করেন, এটাই আমার অনুরোধ। আমাদের রোদে-পোড়া আর জলে-ভেজা প্রতিষ্ঠাতা পথিকৃৎ-দের উদাহরণ সব সময়ে আমাদের মনে উজ্জ্বল থাকা উচিত বলেই মনে হয়।

আলুথালু চুল আর আধময়লা খদ্দরের ধুতীপাঞ্জাবী পরা খগেন্দ্রচন্দ্রের অনুজ শ্রীজগদীশ-চন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ডিরেক্টর এবং 'কমিটি অব ম্যানেজমেণ্ট'-এর চেয়ারম্যান। ১৯২৬-এ সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি. এস-সি. পাস করে সায়ান্স কলেজে ফলিত রসায়নে পঞ্চবার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময়ে সাধারণ কর্মচারী হিসেবে ১৯২৭ সালে ক্যালকাটা কেমিক্যালে ঢোকেন। ক্রমিক পদোন্নতির পর এখন বাষট্টি বছর বয়সে তাঁর স্থান বীরেন্দ্রনাথের পরেই। ত্রয়ী প্রতিষ্ঠাতার পরেই জগদীশচন্দ্রের নাম উল্লেখ্য।

বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় এখন ডিরেক্টর বোর্ড থেকে অবসর নিয়ে উপদেষ্টারূপে সকালের দিকে অফিসে বসেন। তিনি বিশ-পঁচিশটি সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং সঙ্ঘের সঙ্গে জড়িত এবং বর্তমানে 'ইনস্টিটিউশন অব কেমিস্টস'-এর সভাপতি। তিনি আগে ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং ইণ্ডিয়ান সোপ এণ্ড টয়লেট্রিজ মেকার্স অ্যাসো-সিয়েশনেরও সভাপতি ছিলেন।

আর জগদীশচন্দ্রও দেশী ও বিদেশী ১৪/১৫টি সংস্থা ও সঙ্ঘে আছেন। ইনি এখন 'ইণ্ডিয়ান সোপ অ্যাণ্ড টয়লেট্রিজ মেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের'-ও সভাপতি।

তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা আমার প্রথমেই বলা উচিত ছিল। বাঙালীর শিল্প ও বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান সহায়ক, ভূতপূর্ব কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর, ডক্টর শান্তিভূষণ দত্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি, ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল' মহাশয়ের বিশদ পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তিনি গত কয়েক বছর থেকে ক্যালকাটা কেমিক্যালের বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের চেয়ারম্যান। বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রাক্তন প্রধানপুরুষ শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন এবং প্রখ্যাত এঞ্জিনীয়ার শ্রীসুরেন্দ্রকুমার গুহ মহাশয়-ও এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর।

খগেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুর পর এবং বীরেন্দ্রনাথের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর ডিরেক্টর বোর্ডই কম্পানির কার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। এখন আর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদ নেই। বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরস তাঁদের পক্ষে দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য ছ' জন একজিকিউটিভ ডিরেক্টরকে নিয়ে 'কমিটি অব্ ম্যানেজমেণ্ট' গঠন করে দিয়েছেন। এই কমিটির চেয়ারম্যান জগদীশচন্দ্র ছাড়াও জনে জনে বাকি পাঁচজনের সঙ্গে দেখা হলো।

সবাই কর্মব্যস্ত; সকলেরই টেবিলে স্তূপীকৃত কাগজপত্র আর সামনের চেয়ারে অভ্যাগতের ভীড়। এঁরা কেউ ক্রয়, কেউ উৎপাদন আর কেউ বিক্রয়ের দায়িত্ব নিয়ে আছেন। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মৈত্র এখানে বহুকাল ধরে আছেন; তিনি উৎপাদন প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের তত্ত্বাবধান করেন। শ্রীসমরেন্দ্র দাশগুপ্ত খগেন্দ্রচন্দ্রের একমাত্র পুত্র। তিনি সেলস-এর বিষয়েই প্রধান তত্ত্বাবধায়ক।

রাজেন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ সেন 'পারচেজ'-এর প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। বীরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ-পুত্র শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মৈত্রের দায়িত্ব হলো উৎপাদনের উৎকর্ষ সাধন। আর আছেন কম্পানির সেক্রেটারি অন্যতম প্রাচীন কর্মী শ্রীসুধীরকুমার বসু। ইনি ক্যালকাটা কেমিক্যালে সাতাশ বছর ধরে কাজ করছেন।

রাজেনবাবু এবং সুধীরবাবুও খদ্দরের ধুতীপাঞ্জাবী পরিহিত, তবে জগদীশবাবুর মতো দিন দশেক আগের পাটখোলা ময়লা মোটা খদ্দর নয়, একটু মিহি আর ধোপদুরস্ত।

আর এই জাতীয় পণ্য, উপপণ্যের বিক্রয়ের যে প্রচারকার্য আবশ্যিক তার তত্ত্বাবধানে আছেন শ্রীহরিবাবু। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, বিজ্ঞাপন ও ফটোগ্রাফি জগতে সুপরিচিত এই মার্জিতরুচি মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ১৯৪৭ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানের প্রচার বিভাগে আছেন।

ত্রিধারার মিলিত জলস্রোত আয়তনে বর্ধমান, গতিতে দ্রুত, জলোচ্ছ্বাসে প্রবল, সাগরের মোহনা যেন অদূরে—ব্যক্তির বিষয়ে যেমন যায়, তেমনি কোনো প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিও যদি কল্পনায় আঁকা যেত তবে এইটাই যেন ক্যালকাটা কেমিক্যালের ইমেজ হতো।

২০ জুলাই, ১৯৬৮





সাঁইত্রিশ

১৯৪৩ সালে স্যার অ্যালেকজাণ্ডার ফ্লেমিং যখন পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেন আর ১৯৪৪ সালে প্রফেসর ওয়াকস্‌ম্যান দুনিয়াকে স্ট্রেপটোমাইসিন দিলেন, দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্সের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীভূপেন দে তখন তাঁর ৬।২-বি লিণ্ডসে স্ট্রীটের ছোট্ট এক-দরজার দোকানের কাউণ্টারে ধুতি শার্ট পরে দাঁড়িয়ে আমাদের ওষুধ বিক্রি করতেন।

দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্সের দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, যুদ্ধের বাজারে দুষ্প্রাপ্য অনেক বিদেশী ওষুধ কলকাতার আর কোনো দাওয়াইখানায় পাওয়া না গেলেও দে'জ-এর দোকানে পাওয়া যেত; দ্বিতীয়ত, ধনী দরিদ্র সব শ্রেণীর ক্রেতারাই সেখানে সমান আদর, সমান খাতির পেতেন। কারণ, ভূপেন দে এবং তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ, যাকে বলে লাইভওয়্যার সেলস্‌ম্যান, তাই ছিলেন। আমি তখন দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্স থেকে একটা জরুরী ওষুধ আনতে গিয়ে ভামিনীমনোরঞ্জক দু' একটি প্রসাধনসামগ্রী কিনে আনতে বাধ্য হতাম। সুপুরুষ ভূপেনবাবু হাসিমুখে কথা বলতে বলতে এমন মোহিত করে ফেলতেন যে, ডাক্তারের ওষুধের প্রেসক্রিপশনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী শখের জিনিসও কিনতে বাধ্য করতেন—সে জিনিসের দরকার থাক বা না থাক। ওষুধের বেলাতেও যদি প্রেসক্রাইব করা ওষুধটি তাঁর স্টকে না থাকতো তো তার বিকল্প ওষুধ সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে দিতেন। ব্যবস্থাপত্রের বাইরে অন্য কিছু নিয়ে গেলে আমাদের ডাক্তার আপত্তি করতে পারেন শুনে নাছোড়বান্দা ভূপেন দে তৎক্ষণাৎ সেই ডাক্তারবাবুকে নিজেই ফোন করে অনুমতি আদায় করে ছাড়তেন।

অসাধারণ সেলস্‌ম্যান ভূপেন দে তাঁর প্রত্যেকটি পেটেণ্ট ওষুধের কুলমেল এবং প্রসাধনীর গোত্র-প্রবরের খবর নখদর্পণে রাখতেন। স্যার অ্যালেকজাণ্ডার ফ্লেমিং মৃত্যুর কয়েক বছর আগে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছিলেন। সেই সময়ে এই মেধাবী ঔষধ বিক্রেতার সঙ্গে পরিচয় হতে তিনি ভূপেন দে মশায়কে বিক্রয়-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ তৈরির কাজে নামবার উৎসাহ দিয়ে গিয়েছিলেন; এবং পরবর্তীকালে ভূপেনবাবুরা যখন বড় কর্মসূচী নিয়ে বণ্ডেল রোডে

ফ্যাক্টরি চালু করলেন তখন স্ট্রেপটোমাইসিনের আবিষ্কর্তা প্রফেসর ওয়াকস্‌ম্যান সেই ফ্যাক্টরিতে পদধূলি দিয়েছিলেন। ভূপেন দে সেদিন ক্রমবর্ধমান বিরাট এক প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

অনেকে বলবেন যে, ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে বাঙালীর কথা লিখতে গেলে সর্বাগ্রে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালের ইতিহাস দিয়েই আরম্ভ করা উচিত। নানা কারণে অগ্রজকে নিয়ে লেখা শুরু করা গেল না বলে উল্লেখযোগ্য মুষ্টিমেয়র মধ্যে সর্বকনিষ্ঠকে নিয়েই এই পর্ব আরম্ভ করলাম। অগ্রজদের কথা একে একে পরে বলা যাবে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্ম হয়েছিল আজ থেকে প'চাত্তর বছর আগে ১৮৯৩ সালে, এবং কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে পথিকৃতের সম্মান ভারতবর্ষে বাঙালীরই। কিন্তু আজ সেই ঐতিহ্য নিয়ে ঢেঁড়া পেটানোর মতো পদমর্যাদা আর আমাদের নেই। আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি।

তুলনামূলক একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই আমাদের দুরবস্থাটা সহজে বোঝা যাবে। ভারতবর্ষে এখন প্রায় ১৭৫ কোটি টাকার অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ বিক্রি হয়। তার মধ্যে ভিটামিন, টনিক ইত্যাদি বাদ দিয়ে মুমূর্ষুর জীবনরক্ষায় অতি প্রয়োজনীয় 'সালফা' এবং 'অ্যান্টি-বায়োটিক' শ্রেণীর ওষুধের শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশী তৈরি হয় মহারাষ্ট্রে। গুজরাটেও বেশ খানিকটা হয়। সেই জায়গায় বাংলা দেশে আমরা বাঙালীরা তৈরি করি শতকরা ৪ ভাগের মতো। আমরা আচার্য রায়ের উত্তরসাধকরা কি এর বেশী কিছু করার যোগ্য নই?

ইচ্ছা আর যথার্থ চেষ্টা থাকলে আমরা পারতাম, কিন্তু সেই উদ্যমেরই একান্ত অভাব আমাদের।

ভূপেন দে মশায়ের নেতৃত্বে দে-ভ্রাতৃবৃন্দের বিষয়ে কিন্তু ওপরের মন্তব্য খাটে না। মাত্র দশ বছর আগে ১৯৫৮ সালে বড় স্কেলে উৎপাদন শুরু করে ১৯৬৮ সালের মধ্যে দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্স (ম্যানুফ্যাকচারিং) প্রাইভেট লিমিটেড এবং দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্স প্রাঃ লিমিটেড দেড় কোটি টাকার মূলধনে বছরে ছ' কোটি টাকার ওষুধপত্র তৈরি আর বিক্রি করছেন। উপরন্তু, তাঁরা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোল্যাবোরেশনে দে-সি-কেম লিমিটেড নামে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা মূলধনের একটি সংস্থা গঠন করে সর্বাধুনিক যন্ত্রসংবলিত নতুন একটি ফ্যাক্টরি স্থাপন করেছেন। এই কারখানাতে অ্যান্টি-বায়োটিক ওষুধ তৈরির অন্যতম মৌলিক উপাদান 'ক্লোরাম্‌ফিনিকল' তৈরী হবে। সাজ-সরঞ্জাম ফিট করা প্রায় শেষ; উৎপাদন আরম্ভ হতে বেশী দেরী নেই।

এই কৃতিত্বের—বাঙালীর পক্ষে এ এক অভাবনীয় কৃতিত্ব—এই কর্মনিষ্ঠতার জন্যে দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্স আজ সমস্ত বাঙালীর ধন্যবাদার্হ। কেবল দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিই নয়, দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্স ১৩০০ বাঙালীর (এ'দের মোট কর্মিসংখ্যা ১৬০০) কর্মসংস্থান করেছেন। কর্মচারীরা ছাড়াও আর প্রায় ২০০০ বাঙালী সাপ্লায়ার আছেন যাঁদের একমাত্র উপজীব্য দে'জ-এর তিনটি প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা।

ভূপেন দে নিজেও বলতে পারলেন না যে, ঠিক করে তাঁর পূর্বপুরুষরা বর্ধমান জেলার

চকদীঘি থেকে উত্তর কলকাতার জোড়াবাগানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। দেশের বাড়িতে বড়রকমের একটা ডাকাতি হবার পরেই তাঁরা সপরিবার চকদীঘি থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন, এইটুকুই তিনি বাবা-কাকার কাছে শুনেছিলেন। পিতামহ স্বগীয় কালীকুমার দে কোন্ এক মার্চেন্ট অফিসে কাজ করতেন তা-ও ভূপেনবাবু জানেন না। পিতা স্বগীয় ফণীন্দ্রনাথ দে মহাশয়ই এই পরিবারের প্রথম ব্যক্তি যিনি ব্যবসাতে নেমেছিলেন। ফণীন্দ্রনাথের ছোট দু'একটা ব্যবসার মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেকার 'শিবাজী স্টীল ট্রাঙ্ক ফ্যাক্টরি'-র নামই উল্লেখযোগ্য।

ভূপেনবাবু মেট্রোপলিটান স্কুলের বড়বাজার ব্রাঞ্চের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু পড়াশোনার চেয়ে তিনি 'বায়োস্কোপ' দেখতে বেশী ভালবাসতেন। ছোটবেলায় আমরা সিনেমাকে 'বায়োস্কোপ' বলতাম। নেশাটা তাঁর এমন ধরেছিল যে, স্কুল পালিয়ে তিনি সকালের শো-তে শক্তিমান এডি পোলো আর এলমো দি মাইটি-র সিরিয়্যালে (পাঁচ ছ ঘণ্টার একটানা ২৫।৩০ রীলের তেমন ছবি আজকাল আর দেখানো হয় না) তুলকালাম ধামগুজারি কাণ্ড, বেলা ৩টের ম্যাটিনিতে বনরাজ টার্জনের চমকপ্রদ কাহিনী এবং সন্ধ্যায় সেই নির্বাক যুগের জুলপিওয়ালা নায়ক রুডলফ ভ্যালেন্টিনো এবং তাঁর জুটি পোলা নেগ্রি কিংবা থেডা বারার রোমান্টিক ছবি দেখে বেড়াতেন। বড় ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস, চার্লি চ্যাপলিন, হ্যারল্ড লয়েড—কারও ছবিই ভূপেন দে-র বাদ পড়তো না। সে যুগের বাংলা ছবির কথায় ভূপেনবাবু বললেন, হ্যাঁ, কৃষ্ণকান্তের উইল, কপালকুণ্ডলা, 'দি প্যামপার্ড ইয়ুথ—আদুরে ছেলে' এমনি অনেক ছবিও তিনি দেখতেন। পরদার ওপর ছায়ার নড়াচড়া লাফালাফি হলেই হলো—তাই মহা আনন্দে দেখতেন তেরো চোদ্দ বছর বয়সের ভূপেন দে।

এই ছবি দেখার মরসুম বেশ কিছু দিন চলেছিল বাবাকে লুকিয়ে। শেষে একদিন ধরা পড়ে ভূপেন বাবার কাছে প্রচণ্ড বকুনি খেলেন। দারুণ অভিমানে তিনি শুধু গৃহত্যাগ নয়, কলকাতা ছেড়েই পালালেন।

এই পালানোটা তেমন কিছু নয়; অনেক কিশোর বয়স্ক ছেলেই বাপ-দাদার ভর্ৎসনায় এমনি করে পালায়; কেউ কেউ আবার পালায় অ্যাডভেঞ্চারের জন্য। আর তারপরেই কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোয়, 'বাবা হারাধন, তোমার মা অন্নজল ত্যাগ করিয়াছেন, তোমার পোষা কুকুর টমি দিনরাত কেঁউ কেঁউ করিতেছে, তুমি শীঘ্র ফিরিয়া আইস' ইত্যাদি। কিছুদিন নাকানিচোবানি খেয়ে খেয়ালী দুরন্ত টীন-এজার ছেলেগুলি বাড়ি ফিরে আসে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। শান্ত হয়ে আবার লেখাপড়ায় মন দেয়।

মাস দুই বাংলা দেশের এ-শহর সে-শহর ঘুরে ভূপেনও বাড়ি ফিরে এলেন, কিন্তু লেখাপড়ায় একেবারে ইস্তফা দিলেন তিনি। স্বাধীন হবার জন্যে সেই চোদ্দ বছরের ছেলে চীনেবাজারের এক স্টীল ট্রাঙ্ক আর বালতির দোকানে সেলস্‌বয়ের কাজ নিলেন। গ্রাহক খরিদ্দারকে বশে আনার যে অদ্ভুত ক্ষমতার উদাহরণ আগে দিয়েছি তাতে ভূপেন দে-র হাতেখড়ি হয়েছিল চীনেবাজারের সেই ক্ষুদ্র পরিবেশে। সেটা ১৯২১ সাল।

ছাব্বিশ সালে ভূপেনবাবু মুর্গিহাটা পাড়া থেকে বনেদী নিউ মার্কেটের এক দোকানের কর্মচারী হয়ে এলেন। সেটা ছিল ট্র্যাভেলিং রেকুইজিট, মানে বাক্সপেঁটরা-হোল্ড-অলের দোকান।

এখানে তিনি প্রায় চার বছর ধরে আর এক শ্রেণীর খদ্দেরের মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ হলেন।

তারপরে ১৯৩০ সালে তিনি প্রথম পদক্ষেপ করলেন ওষুধ আর প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবসায়। যে কোনো পণ্য নিয়েই ভূপেনবাবু নাড়াচাড়া করতেন, তার আগাগোড়া বুঝে নেওয়াটাই ছিল তাঁর স্বভাব। কলেজের চৌকাঠ না মাড়িয়েও তিনি নিজের অনুসন্ধিৎসু মন ও বুদ্ধি দিয়ে যে জ্ঞান লাভ করতে লাগলেন সেটাই হয়ে দাঁড়ালো তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয়।

আমি অনেক তরুণকে দেখেছি, তাঁরা বড় বড় প্রতিষ্ঠানে 'সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভ' হওয়ার চেয়ে 'ম্যানেজমেণ্ট ট্রেইনী' হওয়াটাকেই বেশী পছন্দ করেন। তাতে নাকি সম্মান বেশী। কিন্তু যে ছেলে বিক্রয়বাণিজ্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে, সে একটু সুযোগ পেলেই নিজের ব্যবসা ফেঁদে অনেক ম্যানেজমেণ্ট ট্রেইনীর কর্মসংস্থানও করে দিতে পারে। ম্যানেজমেণ্ট ট্রেইনী যদি সেলস্-এ যথাযথ ট্রেনিং না পান তবে তিনি হয়তো কষ্টেসৃষ্টে স্বাধীন বাণিজ্য গড়ে কোনোরকমে সেটা চালাতে পারেন। কিন্তু সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভ একাধারে বণিক ও মনস্তাত্ত্বিক। স্বাধীন ব্যবসাতে তাঁর মতো সাফল্য অর্জন করা আর কারও পক্ষে সহজ নয়।

১৯৩০ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত দশ বছরে ভূপেনবাবু এই ছোট ব্যবসাতে বড় অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। সুদীর্ঘ শিক্ষানবিসির পর তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার সুযোগ পেলেন একচল্লিশ সালে।

১৯৪১ সালে ৬।২-বি লিণ্ডসে স্ট্রীটে সরু একফালি জায়গা পেয়ে ভূপেনবাবু নিজস্ব দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্সের স্থাপনা করলেন। দোকানের পণ্য হলো ওষুধ আর প্রসাধনী।

ভূপেনবাবুরা পাঁচ ভাই। জ্যেষ্ঠ স্বর্গীয় শৈলেন দে দে'জ মেডিক্যালের পত্তনের সময়ে অন্য কাজ করতেন। তিনি দে'জ মেডিক্যালে যোগ দিয়েছিলেন অনেক পরে। তাই গোড়ার দিকে মেজদা ভূপেনকে সাহায্য করতেন সেজো ভাই ধীরেন দে। চতুর্থ রবীন ও কনিষ্ঠ অমর তখন ছোট। বাবা ফণীন্দ্রনাথ তখন জীবিত। (তিনি দেহ রেখেছিলেন বাহান্ন সালে আর শৈলেনবাবু গেছেন চৌষট্টি সালে)।

ভূপেনবাবুর যেমন ব্যবসার নেশা, ধীরেনবাবুর তেমনি খেলার নেশা। ভারতবর্ষের খেলার জগতে ধীরেন দে আজ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

রবীনবাবু ও অমরবাবু এঁদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তাঁরা ব্যবসাতে আরও অনেক পরে যোগ দিয়েছেন।

ভূপেনবাবুর প্রতিভা ও পরিশ্রমের ফলে বছর দুয়েকের মধ্যেই দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্সের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। ডাক্তার বিধান রায়, ললিত ব্যানার্জি, নলিনী সেনগুপ্ত, অমল রায়চৌধুরী, কর্নেল ডেনহ্যাম হোয়াইটের মতো কলকাতার প্রথিতযশা চিকিৎসকরা কঠিন কঠিন রোগের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে দুষ্প্রাপ্য ওষুধের বিষয়ে রোগীর আত্মীয়স্বজনকে বলে দিতেন যে, ওষুধটা আর কোথাও না পাওয়া গেলে দে'জ-এ খোঁজ করতে। ওষুধ বিক্রেতার কাছে এর চেয়ে বড় প্রশংসা, বড় বিজ্ঞাপন আর কী হতে পারে! দে'জ মেডিক্যালের খ্যাতি দ্রুতবেগেই সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো এবং দূর দূরান্তর থেকে বড় বড় চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন ভূপেনবাবু-ধীরেনবাবুর কাছে আসতে লাগলো।

দোকানে বড়বাবু, মেজোবাবু আর সেজোবাবু, আর বাড়িতে মাথার ওপরে ছিলেন কর্তা ফণীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহধর্মিণী ননীবালা দেবী। কর্তা চলে যাবার পর থেকে একান্নবর্তী দে-পরিবারের কর্ত্রী হয়ে রয়েছেন ভূপেনবাবুদের মা শ্রীযুক্তা ননীবালা দেবী। তাঁর এখন ৮৬ বছর বয়স। কর্তা চলে গেছেন ষোলো বছর আগে, বড় ছেলেকেও হারিয়েছেন আজ চার বছর—তবুও তিনি ঈশ্বরে মন রেখে শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরে আছেন আজও। দে-পরিবারের বর্তমান আবাস দেওদার স্ট্রীটের বিরাট বাড়িতে ভরা সংসার নিয়ে আছেন ননীবালা। এই বয়সেও রোজ সকালে গঙ্গাস্নানে যান, আর ফিরতি পথে জোড়াবাগানে শ্বশুরের ভিটে ঘুরে আসেন। সে বাড়ির একমাত্র বাসিন্দা সমবয়সী অকৃতদার দেবর পঞ্চাননকে দেখে তাঁর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা ননীবালার নিত্যকর্তব্য। গ্রীষ্ম বর্ষা শীত শরৎ কোনো ঋতুতেই তার খেলাপ হয় না।*

ভূপেন বললেন যে, মা-ই হলেন তাঁদের ফ্রেন্ড, ফিলজফার আর গাইড। কিন্তু ননীবালা তাঁর সেজো ছেলে ধীরেনকে ঠিক গাইড করতে পারেননি। সে ছেলে ব্যবসা করে, খেলার মাঠে নেতৃত্ব করে, কিন্তু বিয়ে করে ঘরসংসার করেনি। ধীরেন দে এখনো অবস্থাটা শোধরাতে পারেন—পুরুষকে কেউ দোষারোপ করবে না। এই দেখুন না, বাষট্টি বছরের ওনাসিস সেদিন কেমন করলেন! আর চার্লি চ্যাপলিন, মনীষী বার্টরাণ্ড রাসেলকেও বাদ দেওয়া চলে না। ধীরেনবাবু তেমন করলে মাতৃদেবী বোধ হয় খুশীই হবেন।

১৯৫০ সালে ভূপেনবাবু বিখ্যাত এক বিদেশী কম্পানির অ্যাণ্টি-বায়োটিক ওষুধের সোল এজেন্সী নিলেন। দে'জ মেডিক্যালের উন্নতির সোপানে এটি একটি বড় ধাপ। আরও এক ধাপ তাঁরা আরোহণ করলেন যখন লিণ্ডসে স্ট্রীটের দোকানের পেছনেই কয়েকটা ঘর নিয়ে দে'জ-এর ওষুধ তৈরি আরম্ভ হলো। সামনের দিকে দোকানের আয়তনও আস্তে আস্তে বেড়ে প্রায় চারগুণ হলো।

ওষুধ তৈরির কাজ বেড়ে গিয়ে জায়গার অকুলান হতে ১৯৫৮ সালে এ'রা বালিগঞ্জ বণ্ডেল গেটের কাছে দু বিঘা জমি কিনলেন। আর উৎপাদন বিভাগটিকে সমিতিভুক্ত করে নাম রাখলেন দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্স (ম্যানুফ্যাকচারিং) প্রাইভেট লিমিটেড। দোকানটিও তখন প্রাইভেট লিমিটেড কম্পানিতে পরিণত হয়ে গেছে।

আজ দু বিঘার জায়গায় সেখানে ন' বিঘা জমি হয়েছে ভূপেনবাবুদের, আর প্রকাণ্ড তেতলা ফ্যাক্টরি-বাড়িটির আয়তন হয়েছে প্রায় পৌনে দু লক্ষ বর্গ ফুট। এখন সেখানে আমদানি করা মৌলিক উপাদানের মাধ্যমে টাইফয়েড, নিউমোনিয়া প্রভৃতি মারাত্মক রোগের অমোঘ ওষুধ এনটেরো-মাইসেটিন ছাড়া সাল্ফা ড্রাগ, ভিটামিন, হরমোন প্রভৃতি তৈরি হচ্ছে। (কোন্ এক ডাক্তার সাহেবের কাছে যেন শুনেছিলাম যে, হরমোন সেবনে রাজা যযাতির মতো যৌবন ফিরে পাওয়া যায়—ছেলের যৌবন 'লোন' না নিয়েও)।

বিশাল ফ্যাক্টরিটি সম্পূর্ণভাবে এয়ারকণ্ডিশণ্ড অর্থাৎ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত, ডি-হিউমিডি-

* এই গ্রন্থ যন্ত্রস্থ থাকাকালে ননীবালা দেবী ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে চিরশান্তি লাভ করেছেন।

ফাইড মানে আর্দ্রতামুক্ত, এবং স্টেরাইল অর্থাৎ অবাঞ্ছিত জীবাণুর সংস্পর্শমুক্ত। এই পরিবেশে যতজন বিজ্ঞানী একনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উল্লিখিত কঠিন কঠিন ওষুধ তৈরি করেন তাঁদের সকলের পরিচয় দিতে গেলে এক মহাভারত হয়ে দাঁড়াবে। এ'রা কেউ উপাধ্যায়, কেউ মহো-পাধ্যায় আবার কেউ মহামহোপাধ্যায়।

সুন্দর করে সাজানো-গোছানো বিক্রয় বিভাগের যে কৃতী তরুণ অধিকর্তাটি সারা ভারতের প্রধান প্রধান রাজ্যে অবস্থিত ১৩টি শাখার মাধ্যমে দে'জ-এর ৬ কোটি টাকার ওষুধ বর্তমানে বিক্রি করাচ্ছেন তাঁর নামও উল্লেখ করা খুবই উচিত ছিল, কিন্তু কর্মীদের কারও নামই যখন করলাম না, তখন এ যাত্রা তাঁরটাও উহ্য থাক।

এই সব বনেদী পাশ্চাত্ত্য মতের ওষুধের সঙ্গে এখানে আমাদের একান্ত স্বদেশী একটি ভেষজও তৈরি হচ্ছে। সেটা হলো কবিরাজী গাছগাছড়া থেকে প্রস্তুত 'কেও কার্পিন' কেশতৈল। আশা ছিল ভূপেনবাবু বলবেন যে, এই তেল মাখলে টাকেও চুল গজাবে গজগজ করে বর্ষাকালের তৃণলতার মতো। কিন্তু উনি তা বললেন না। টাকে চুল গজানোর মতো কোনো তেল বেরিয়েছে বলে ভূপেনবাবু প'য়তাল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতায় জানেন না, তবে যাঁদের চুল কমে টাক পড়ার উপক্রম হয় এই তেলে তাঁদের বেশ উপকার হয়।

ভূপেনবাবু আর একটা কথা বললেন, যা আগেও যেন কার কাছে শুনেছি। মানুষের চুল একেবারে কালো হয় না। ঘন কালো কেশ-টেশ বাজে কথা। সেই কৃষ্ণকুন্তলে উজ্জ্বল আলো ফেললেই দেখা যাবে যে সেটা ডীপ-ব্রাউন কিংবা স্টীল-গ্রে। পাঠিকারা যদি এ বিষয়ে কোনো প্রতিবাদ করতে চান তো সরাসরি ভূপেন দে মশায়কে পত্রাঘাত করুন; ঠিকানা দেওয়া আছে।

মাস দেড়েক আগে 'অরগ্যানাইজেশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডিউসার্স অব ইণ্ডিয়ার' (সংক্ষেপে ও. পি. পি. আই) এক প্রেস কনফারেন্স উপলক্ষে দে'জ মেডিক্যাল এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল-এর দুটি কারখানাই দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। উৎপাদনসূচিতে দুটি প্রতিষ্ঠানের অনেক পার্থক্য থাকলেও আধুনিকতায় দুইটিই চমৎকার। আর দুটিই নির্ভেজাল বাঙালী প্রতিষ্ঠান। এ'দের দেখবার পর শিল্প ও বাণিজ্যে বাঙালীর ক্ষমতা বিষয়ে মনের মধ্যে নতুন করে প্রেরণা পেলাম।

প্রবন্ধ শেষ করার আগে আমি দে'জ প্রতিষ্ঠানত্রয়ের শ্রমিক ও কর্মিবৃন্দকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছাড়া কোনো প্রচেষ্টাই সফল হতে পারে না সন্দেহ নেই, কিন্তু উপযুক্ত অনুচরের অভাবে শ্রেষ্ঠ নেতৃত্বও ব্যর্থ হয়ে যায়। দে'জ মেডিক্যাল গ্রুপ উভয়তই ভাগ্যবান।

এ'দের নেতাটি কিন্তু অসাধারণ। সিনেমা-বাতিকগ্রস্ত, লেখাপড়ায় অমনোযোগী এক পলাতক ছেলে—গুরুজনরা যাকে হয়তো বখা বাউণ্ডুলে বলে খরচের খাতাতেই লিখে রেখে-ছিলেন তার কৈশোরে—সে ছেলেটিই কিনা সারা জীবনের শ্রম ও অধ্যবসায় দিয়ে আজ একষট্টি বছর বয়সে নিজেকে এবং বাঙালীর অতিপ্রয়োজনীয় এক শিল্পকে ধাপে ধাপে বিরাটত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৯



আটত্রিশ

ফুটবলের পেলে, ইউসেবিও, চুনি গোস্বামী আর প্রদীপ ব্যানার্জিদের মতো আমাদের শিল্পবাণিজ্যের ভাস্বর জ্যোতিষ্কদের কৃতিত্বের কথায় আজ অবধি প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ ভরিয়ে ফেলেছি। পাঠকের মনে হয়তো এই ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছি যে, শিল্পবাণিজ্যের রশিদ আর আহমেদরা যেন একা লড়েই গোল স্কোর করেছেন রাউন্ডের পর রাউন্ড, ফাইন্যাল পর্যন্ত। যাঁরা ব্যাক হাফব্যাক ইন আউট থেকে বল যুগিয়েছেন অনেক সময়েই তাঁদের কথা ঝাপসা হয়ে গেছে দু' একটি আদিত্যের চোখ-ধাঁধানো আলোর ঝলকে। ভুলে গিয়েছি যে, ফুটবলে যেমন কম্বিনেশন ব্যতীত, টীম-স্পিরিট ছাড়া কোনো স্কোরার গোল দিতে পারেন না, তেমনি শিল্প-বাণিজ্যেও সহকারী ও কর্মচারীদের যথার্থ সহায়তা ছাড়া কেউ শিল্পপতি কিংবা শ্রেষ্ঠী হতে পারেন না। নিজের দোষ আমি স্বীকার করছি, কিন্তু আমার একটি অনুযোগও আছে। অনেক ক্ষেত্রেই টীমের ক্যাপ্টেন এবং দু' একজন তারকার নাম ছাড়া বাকী খেলোয়াড়দের বিষয়ে কোনো উল্লেখই করা হয়নি আমার কাছে।

ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেডের ইতিহাস শুনতে শুনতে 'টীম-স্পিরিট' কথাটাই বারবার মনে হচ্ছিল। মনে পড়ছিল স্কটল্যান্ডের 'সেলটিক' ফুটবল টীমের কথা-- যাঁরা পেলে, ইউসেবিও বা স্যার স্ট্যানলি ম্যাথিউজ ছাড়াও নিছক দলগত ঐক্যের জোরে কিছু দিন আগে 'ইয়োরোপীয়ান কাপ' জিতলেন--পোর্তুগাল, হাঙ্গেরির চেয়েও বেশী পয়েন্ট পেয়ে।

ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালের ম্যানেজিং ডিরেক্টরযুগল, শ্রীঅশোক সেন এবং শ্রীহীরেন দত্তগুপ্ত মহাশয়রাও তাঁদের প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে এই টীম-স্পিরিটের উল্লেখই করলেন একাধিকবার।

রসায়নে এম এস-সি. শ্রীঅশোক সেন ডালহাউসি পাড়ার ৮ নম্বর হেয়ার স্ট্রীটে মাত্র ৫।৬ জন কর্মী নিয়ে ১৯৩৬ সালে ছোট্ট একটা ওষুধের কারখানা খুলে সামান্য কিছু

ইনজেকশনের অ্যামপুল, ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক 'কিলোম্যাল'-এর মতো গোটা দুচ্চার বড়ি এবং একটা পাউডার তৈরি শুরু করেছিলেন। সেদিন তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি যে, সেই ছোট্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল আজ বেহালার সাত বিঘা জমির ওপরে কারখানা আর সরযূনার ষাট বিঘার ওপরে ছড়ানো ছবির মতো সাজানো ফ্যাক্টরি গড়ে তুলে বছরে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার ওষুধ বিক্রি করতে পারবেন। কেবল তাই নয়, দুর্গাপুরে ষাট বিঘা জমি নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া সিনথেটিক এবং ফাইন কেমিক্যাল তৈরির জন্যে প্রকাণ্ড একটি ফ্যাক্টরি পত্তনের ব্যবস্থাও করেছেন। মৌলিক উপাদানের অনেক কিছুই দুর্গাপুর কেমিক্যাল থেকে পাওয়ার আশাতেই তাঁরা এই স্থান নির্বাচন করেছেন।

গোড়ার ৫।৬ জন কর্মীর জায়গায় এখন কর্মিসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৫০০, এবং বলা বাহুল্য যে, তার মধ্যে শতকরা ৮০ জন বাঙালী। বেতন, বোনাস প্রভৃতি খাতে সেই দেড় হাজার কর্মী বছরে ৬৩½ লক্ষ টাকা উপার্জন করছেন। সরকারি তহবিলে পেঁছচ্ছে—ইনক্যাম-ট্যাক্স বাবদ ১৪।১৫ লক্ষ টাকা, সেল-ট্যাক্স বাবদ ১১।১২ লক্ষ টাকা এবং একসাইজ ডিউটি বাবদ ২৫।২৬ লক্ষ টাকা। এত সব দিয়ে-থুয়েও ২৪ লক্ষ টাকা পেড-আপ ক্যাপিট্যালের কম্পানির রিজার্ভ ফাণ্ড আজ এসে দাঁড়িয়েছে ৩৫ লক্ষ টাকারও ওপরে এবং তারপরেও অংশীদাররা ডিভিডেণ্ড পাচ্ছেন ১৪।১৫ পারসেণ্ট।

ইস্ট ইণ্ডিয়ার ওষুধ বিক্রির ক্রমিক উন্নতির সামান্য একটু পরিসংখ্যান এবং তুলনামূলক কয়েকটি তথ্য লিপিবন্ধ করে হিসেবনিকেশ একবারেই শেষ করে নেওয়া যাক।

বিক্রি

১৯৪০	...	...	...	০·৪২ লক্ষ
১৯৫০	...	...	...	২৮·৩৪ „
১৯৬০	...	...	...	১২০·৫৭ „
১৯৬৭	...	...	...	২৯৪·৩৬ „
১৯৬৮	...	...	...	৩৫০·০০ „ (আনুমানিক)

আটাশ বছরে ৪২ হাজার টাকা থেকে ৩½ কোটি টাকার বিক্রি—ক্রিকেট ফুটবলের পরিভাষায় বলতে হয় 'টল স্কোর'। বাঙালীর মালিকানায় বাঙালী পরিচালিত উল্লেখযোগ্য ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দে'জ মেডিক্যালের পরেই এখন বোধ হয় ইস্ট ইণ্ডিয়ার বিক্রি; কারণ, শ্রমিক অস্থিরতায় বেঙ্গল ইমিউনিটি আজ প্রায় বন্ধ। সেই প্রতিষ্ঠানের বিক্রি ইতিপূর্বে পৌনে তিন কোটি আন্দাজ ছিল; চালু থাকলে তাঁদের অঙ্কও সম্ভবত তিন কোটি টাকার অনেক বেশীই হতো।

ভারতীয় মালিকানায় প্রাচীনতম ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠান হলো ১৮৯৩ সালে আচার্য রায়ের প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল। প্রাচীনত্বে দ্বিতীয় হলো বরোদার অ্যালেম্বিক কেমিক্যাল।

অ্যালেম্বিকের বিক্রি বছরে প্রায় দশ কোটি টাকার। গ্ল্যাক্সো ল্যাবোরেটরিজ, স্কুইব-সারাভাই, ফাইজার, স্যান্ডোজ, ব্রিটিশ ড্রাগ হাউস, রোশ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এই শ্রেণীতে পড়ে না। তাঁদের বিক্রিও মস্ত। এক গ্ল্যাক্সো ওষুধ ও বেবি-ফুড ইত্যাদির বিক্রি বছরে ২০।২১ কোটি।

বাংলাদেশে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্ট্যাডমেড, ইন্ডিয়ান হেলথ, জি ডি ফার্মাসিউটিক্যাল (বোরোলিন-এর আবিষ্কর্তা), ক্যালকাটা কেমিক্যাল প্রভৃতি বাঙালী প্রতিষ্ঠান, অ্যালবার্ট ডেভিড, মার্টিন হ্যারিস, স্মিথ স্ট্যানিস্ট্রীটের মতো অবাঙালী প্রতিষ্ঠান, এবং স্বর্গত ডাক্তার হেমেন ঘোষ প্রতিষ্ঠিত স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল।

শ্রদ্ধেয় ডাক্তার ঘোষের নামের উল্লেখ করে আপনাদের একটু প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। ভারতীয় ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে 'হেমেন ঘোষ' নামটি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নামের সঙ্গে উচ্চারিত হওয়ার দাবী রাখে। আচার্যদেব প্রধানত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি রসায়নের ক্ষেত্রে অনেক কিছুর সূত্রপাত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওষুধের প্রস্তুত-প্রণালীকে যথার্থ আধুনিকত্ব দেওয়ার কৃতিত্ব ডাক্তার হেমেন ঘোষের। ঔষধ জগতে একজন যেন শ্রীরামকৃষ্ণ আর অন্যজন স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতবর্ষে সিরাম, ভ্যাকসিন ইত্যাদি প্রথম তৈরি করার ব্যাপারেই শুধু নয়, ইজ্জত দেওয়াতেও অগ্রণী ছিলেন ডাক্তার ঘোষ এবং বেঙ্গল ইমিউনিটির প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় ক্যাপ্টেন নরেন দত্ত।

১৯৩৬ থেকে ১৯৪০-এ যে ক'জন ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেডে অশোক সেন মহাশয়ের সঙ্গে একে একে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীনির্মাল্য সেন, স্বর্গীয় জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, স্বর্গীয় নির্মলচন্দ্র গুহ, শ্রীনির্মলাপদ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত।

দলটা যে একটু বৈদ্যপ্রধান সেটা লক্ষণীয়। বারেন্দ্র ও বৈদ্যরা শুনেছি বেজায় স্বজাতিবৎসল হন। কালি তৈরির সুলেখা ওয়ার্কসে গিয়ে মনে হয়েছিল বরেন্দ্রভূমিতে প্রবেশ করেছি। আর ইস্ট ইন্ডিয়ায় মনে হলো, যেন ঢাকা জেলার অতীত বৈদ্য-স্ট্রংহোল্ড বিক্রমপুরে ঢুকলাম। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন সভ্য এবং পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের জামাতা ডক্টর আশুতোষ সেন এবং স্বনামধন্য চক্ষুচিকিৎসক ডাঃ নীহারকুমার মুন্সী মহাশয়দের মতো বৈদ্যকুলভূষণেরা এখন প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ অলঙ্কৃত করে রয়েছেন। আমি আবার নিজে বৈদ্য না হয়েও সারাজীবন এক বৈদ্যকন্যার সঙ্গে ঘর করে এবং নিজ কন্যাকে বৈদ্যসমাজে পাত্রস্থ করে ওই সম্প্রদায়টিকে রীতিমতো ভয় ও সম্ভ্রম করে চলি।

শ্যালককুলের বিষয়ে রহস্যালাপ করতে গিয়ে আমি কিঞ্চিৎ অনৃতভাষণ করে ফেললাম বোধহয়। ইস্ট ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর বোর্ডে বৈদ্য ছাড়া ব্রাহ্মণ কায়স্থও অনেকে আছেন এবং অতীতেও ছিলেন। এমন কি কম্পানির প্রথম যুগের পরিচালকবৃন্দের মধ্যে অতীতের চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট স্বর্গত যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের মতো প্রাতঃস্মরণীয় খ্রীষ্টানও ছিলেন। বিশ্বাস মহাশয় যে খ্রীষ্টান হয়েও রামকৃষ্ণ মিশনে প্রভূত দান করে গিয়েছিলেন সে কথা এখনকার অনেকেই জানেন না।

আদি ডিরেক্টর বোর্ডে উল্লেখযোগ্য আরও যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কন্ট্রাক্টর স্বর্গীয় জীতেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, উকীল স্বর্গীয় রাসবিহারী গোস্বামী, ডাঃ কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় এবং ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কামাখ্যাবাবু ও ধীরেনবাবু এখনও বোর্ডে আছেন।

বর্তমান ডিরেক্টরবৃন্দের নাম আরেকবার গুছিয়ে বলি : ডাঃ কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ নীহারকুমার মুন্সী, শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মিত্র, শ্রীমণীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, ডঃ আশুতোষ সেন, ডঃ শিবনারায়ণ সেন এবং দুই ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীঅশোককুমার সেন ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত।

আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, কিন্তু তাঁর লাভের মোটা অংশ যায় জনশিক্ষার জন্য বহুমুখী দানে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস-সি. পাস করে অশোক সেন সায়ান্স কলেজেই রিসার্চ শুরু করেছিলেন। এমন সময়ে খবর পেলেন যে, ক্যাপ্টেন নরেন দত্ত তাঁর বেঙ্গল ইমিউনিটির জন্যে উচ্চশিক্ষিত বিজ্ঞানের ছাত্র খুঁজছেন। তাঁর ডাক শুনে অশোককুমার ও নির্মলানন্দ রিসার্চ ছেড়ে বেঙ্গল ইমিউনিটিতে যোগ দিলেন। নির্মল গুহ আগে থেকেই সেখানে ছিলেন।

কর্মীসংগঠনের মতো শক্ত কাজটা দেখা যাচ্ছে কুমিল্লার লোকদের বৈশিষ্ট্য। আর 'নরেন দত্ত' নামধেয়রা দেখি ঠেলে ঠেলে সবার সামনে এগিয়ে আসেন। স্বামী বিবেকানন্দের কথা নতুন করে কিছু বলার নেই। উপরন্তু কুমিল্লার দুই নরেন দত্তও বাংলা দেশকে অনেক দিয়ে গেলেন। একজনের অবদান বাঙালীর ব্যাঙ্কিং-এ, আর অন্যজনের হলো বাঙালীর ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে। ক্যাপ্টেন দত্তের কর্মীবৃন্দের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়ার অশোক সেন-রা ছাড়াও যে সমস্ত শিল্পোদ্যোক্তার নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন ইউনিয়ন ড্রাগ কম্পানির প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় বিনোদ সেন এবং ইণ্ডিয়ান হেলথ্ ল্যাবোরেটারিজের স্থাপয়িতা শ্রীবিমল দাশ এবং স্বর্গীয় ডাক্তার অমূল্য সেন। ডাঃ হেমেন ঘোষও প্রথমে বেঙ্গল কেমিক্যালে চাকরি করার পর বেঙ্গল ইমিউনিটিতেও কিছুদিন ছিলেন। তারপরে তিনি স্বাধীনভাবে স্ট্যাণ্ডার্ডের স্থাপনা করেন। এইরকম আরও কে কে ছিলেন তার খবর আমি পাইনি।

বেঙ্গল ইমিউনিটির চাকরি ছেড়ে স্বাধীন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনার পরিকল্পনা ইস্ট ইণ্ডিয়ার দলের মধ্যে অশোক সেনের মাথাতেই আগে খেলেছিল। তাতে ইন্ধন যুগিয়েছিলেন নির্মাল্য সেন ও প্রভাত গুপ্ত নামে দুই ভদ্রলোক। সহকর্মী নির্মল গুহ এবং নির্মলাপদ চ্যাটার্জিকেও অশোকবাবু দলে টানলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেডের জন্ম হলো। তার পরের পরিচ্ছেদের শুরুটা আগেই বলেছি।

হীরেন দত্তগুপ্ত অশোকবাবুর চেয়ে অনেক ছোট। অশোকবাবুর এখন চৌষট্টি আর হীরেনবাবু সবে পঞ্চান্নো পেরিয়েছেন। হীরেন্দ্রনাথ ১৯৩১ সালে ১৮ বছর বয়সে যুগান্তর পার্টির বিপ্লবী কর্মী হিসেবে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে বছর চারেকের দণ্ড নিয়ে জেলে ঢুকলেন।

সাজা খাটবার পর জেল থেকে বেরোবার মুখে আবার তিনি কারাগারে প্রত্যাবর্তন করলেন ডেটেনিউ হয়ে। ছাড়া পেলেন ১৯৩৮ সালে, অর্থাৎ মোট সাত বছর একটানা বন্দী থেকে। সেই সময়ে স্বগীয় জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত-ও তাঁর সঙ্গে বছর সাতেক জেলে ছিলেন রাজবন্দী হয়ে। বন্দী হবার সময়ে হীরেনবাবু বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, কিন্তু ডেটেনিউ অবস্থায় জেল থেকে সায়ান্স পড়া বা পরীক্ষা দেবার সুযোগ ছিল না বলে ভেতরে বসে বি-এ পরীক্ষাটা পাস করে ফেললেন—ক্যালকাটা ফ্যানের অন্যতম ডিরেক্টর শান্তি গাঙ্গুলির মতো।

মুক্তি পেয়ে হীরেনবাবু কিছু দিন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবসা করলেন। এটা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার কথা। লড়াই জমে উঠতেই সেসব বিদেশী যন্ত্রপাতির আমদানি বন্ধ হয়ে গেল। দেশে তখন সে জাতীয় সরঞ্জাম খুব কমই তৈরি হতো। অতএব হীরেনবাবুর একক বাণিজ্য প্রয়াসের ইতি হয়ে গেল।

তারপর বিপ্লবী বন্ধু জ্যোতির্ময়বাবুর মাধ্যমে হীরেন দত্তগুপ্ত চল্লিশ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়াতে যোগ দিলেন। প্রভাত গুপ্ত মশায় ইতিমধ্যে ঢাকা শহরে নিজের আর একটি ব্যবসা দেখাশোনার চাপে ইস্ট ইণ্ডিয়া ছেড়ে দিলেন। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, প্রভাতবাবুও পলিটিক্যাল সাফারার ছিলেন।

ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে যাঁরা সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিন শ্রেণীর যোদ্ধা ছিলেন।

প্রথম শ্রেণীর সকলেই অল্পবিস্তর সন্ত্রাসবাদী ছিলেন। তাঁদের কাছে সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস পুরনো হয়নি এবং সেই মনের আগুনে ইন্ধন যুগিয়েছিল ইটালিয়ান বিপ্লবী মাৎসিনি ও গ্যারিবলডির বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষে আবার সশস্ত্র বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন মহারাষ্ট্রের বীর বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে। ১৮৭৮-৭৯ সালে তিনি মহারাষ্ট্রে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে আন্দোলন বেশী দিন চললো না। ফাড়কে বন্দী হলেন। তাঁর দ্বীপান্তর হলো সুদূর এডেনের জেলে এবং সেখানেই তিনি প্রাণত্যাগ করেছিলেন। তারপরে এলেন মহারাষ্ট্রের পুণা শহরের তিন ভাই—দামোদর, বালকৃষ্ণ ও বাসুদেব চাপেকার এবং তাঁদের সহবিপ্লবী বিনায়ক রাণাডের মতো অসমসাহসী বীরবৃন্দ। এঁরা চারজনেই ফাঁসির মঞ্চে শহীদ হলেন ১৮৯৮ ও ১৮৯৯ সালে। লোকমান্য তিলক ছিলেন এইসব তরুণ বিপ্লবীদের সমর্থক। অনেকে বলেন যে, বালগঙ্গাধর তিলকের মন্ত্রেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বরোদার শিক্ষাব্রতী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। বিপ্লবের অলিম্পিক ফায়ার বয়ে নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ এলেন বাংলাদেশে। তার পরের ইতিহাসও অদ্ভুত, কিন্তু এখানে অবান্তর। এখানে আমি মদনলাল ধিংড়া, বিনায়ক সবরকার আর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বা সূর্য সেনের কাহিনী বলতে বসিনি; সুভাষচন্দ্রের বীরত্বের কথাও নয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন অহিংস সংগ্রামে বিশ্বাসী গান্ধীবাদীরা।

আর তৃতীয় সারিতে ছিলেন নীরব দেশপ্রেমিকরা। তাঁদের ব্রত ছিল গঠনমূলক কাজের

মধ্য দিয়ে দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে দেওয়া। তাঁদের কার্যসূচীতে ছিল শিক্ষার প্রসার, শহর ও গ্রামাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নতির প্রয়াস এবং স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্য প্রচেষ্টাকে সমৃদ্ধ করা।

ইস্ট ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅশোককুমার সেন মশায় এই পিছনের সারির দেশহিতৈষী।

হীরেন দত্তগুপ্ত আগে ছিলেন উল্লিখিত প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা। তিনিও দীর্ঘ সাত বছর কারাবাসের পর তৃতীয় পথটাই বেছে নিলেন।

ধীরে ধীরে অদ্ভুত একটি টীম গড়ে উঠলো, যার পুরোধায় রইলেন এঁরা দু'জন এবং স্বর্গীয় নির্মলচন্দ্র গুহ, শ্রীনির্মলাপদ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীনির্মাল্য সেন।

এঁরা নিজেদের সাধুতা এবং অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত সর্বদা সকলের সামনে রেখে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মীকেও টীমে ভর্তি করে নিতে পেরেছেন—স্কটল্যাণ্ডের সেই 'সেলটিক' ফুটবল টীমের মতো।

আমি জানি না, জোর করে বলতেও পারি না যে, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লোককে কেন এত কাছের মনে হয়। সুট পরলেই কি সেই লোকটি দূরে সরে যায়? তা তো নয়। সুট পরা মানুষের মধ্যেও তো অসংখ্যজন আছেন যাঁরা সহজ, যাঁদের কাছে পৌঁছতে ভয় করে না। কিন্তু তাঁরাই যখন সুটের বদলে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আমাদের সামনে আবির্ভূত হন তখন যেন তাঁদের আরও বেশী আপনজন বলে মনে হয়। সুট-বুটের এত চল হবার পরেও এটা আমার কেন হয়?

ধুতি-পাঞ্জাবি পরা অশোক সেন আর হীরেন দত্তগুপ্তকে আমার খুব ভালো লাগলো তাঁদের নম্র ও সরল ব্যবহারের জন্য নিশ্চয়ই, কিন্তু বোধ হয়, সাদাসিধে পরিচ্ছদের জন্য আমার দু'জনকেই খুব কাছের লোক বলে মনে হলো। এই পোশাক তাঁদের মিটিং-কা-কাপড়া নয়। তাঁরা তাই পরেই কাজ করেন ও সর্বত্র যাতায়াত করেন।

কিন্তু এসব কথা তুলে আমার আসল কথাটাই চাপা পড়ে যাচ্ছে। সেদিকে এগোই।

ইস্ট ইণ্ডিয়ার ১৯৪০ সালের বিক্রির অঙ্ক যে ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না তা আমরা দেখেছি—দিনগত পাপক্ষয়ের মতো কাজ চলার বেশী নয়। তাও হতো না বোধ হয়, যদি না অধুনালুপ্ত সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীদেবীদাস রায় আর্থিক সাহায্য করে ইস্ট ইণ্ডিয়াকে বাঁচিয়ে রাখতেন।

অত কষ্টের মধ্যেও এদিকে কিন্তু নির্মল গুহ, নির্মলাপদ চ্যাটার্জি প্রমুখ গবেষকরা হাতেকলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন নতুন কিছু পাওয়ার আশায়।

প্রফেসার ডোমাগ্ নামে এক জার্মান রাসায়নিকের গবেষণার ফলে ১৯৩৬ সালে 'সালফা ড্রাগ' বলতে এখন যা বোঝায়, সেই গ্রুপের ওষুধ রোগ নিরাময়ের কাজে প্রথম ব্যবহৃত হয়। তখন ওষুধটি ছিল খানিকটা উপপণ্যের মতো; 'ডাইস্টাফ' অর্থাৎ রঙের উপপণ্য বা বাইপ্রোডাক্ট। এই জাতের একটি বিষহর ওষুধের কথা আমার মনে আছে। তার নাম ছিল 'প্রোন্টোসিল রুবরাম'। কাটাকুটি থেকে সেপটিক হয়ে গেলে এই লাল রঙের ওষুধটি ছিল অমোঘ প্রতিষেধক। গনোরিয়া সিফিলিসের মতো বিশ্রী রোগেরও এটা একটা মোক্ষম দাওয়াই ছিল। ডোমাগের গবেষণাকে ভিত্তি

করে অন্যান্য জার্মান এবং ফরাসী রসায়ন পণ্ডিতরা এর আরও উন্নতি করেন। এর মূল সংজ্ঞা ছিল 'সালফোনামাইড গ্রুপ' এবং একে 'সিনথেটিক ড্রাগ' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

১৯৪১ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া সিনথেটিক ড্রাগ তৈরি আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে তাঁরা এই গ্রুপেরই প্রশাখা 'সালফাসিটামাইড' গ্রুপের একটি ওষুধ 'লকুলা' তৈরি করেন। আজ সেই ওষুধ ভারতবিখ্যাত এবং সেটা আজ লক্ষ লক্ষ লোকের চোখ কান ও নাকের অসুখ সারাচ্ছে।

'আইওডোক্লোরহাইড্রোক্সোকুইনোলিন' শব্দটি উচ্চারণ করতে গিয়ে আপনার দাঁত ভেঙে গেলে কি ওষুধ ব্যবহার্য তা আমি হীরেন বাবুকে জিজ্ঞেস করে পরে জানাবো। ইস্ট ইণ্ডিয়াতে এই শ্রেণীর ওষুধ (এটারও দেশজোড়া নাম) 'এন্টেরোকুইনল' তৈরি হলো ১৯৪২ সালে।

আমি নিজে এই ওষুধটাকে জানি যৌবনকাল থেকে। অখাদ্য-কুখাদ্য চিরকালই চেখেছি। তার ফলে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ডিজীজ আমাশা বা অ্যামিবিঅসিসের কবলেও পড়েছি কখনো-সখনো। বহুদিন আগে উত্তর কলিকাতার 'চাচার হোটেল' না কোথায় যেন ফাঁসির খাওয়ার মতো ভুরিভোজন করে পরের দিন কাত হয়ে পড়েছিলাম। তখন ডাক্তার আমাকে কয়েকদিনে গোটা ত্রিশ চল্লিশ ওই বড়ির ব্যবস্থা করে দেন। সেই যে ওটা খাবার অভ্যেস করলাম, এখনো তাই চলছে। লোভ এখনো সামলাতে পারি না বলে কোনো নেমন্তন্ন বাড়িতে চর্ব্যচূষ্য খেয়ে বাড়ি ফিরেই নিজের প্রেসক্রিপশনে গোটা দুই বড়ি খেয়ে ফেলি প্রিভেনটিভ হিসেবে। শত্রুর মুখে রসগোল্লা দিয়ে এখনো যে মোটের ওপর সুস্থ সবল আছি এটা বোধ হয় তার একটা কারণ।

আরও কত রকমের ওষুধের গবেষণা এবং প্রস্তুত প্রণালী এ'দের সরষুনার বিরাট কারখানাতে দেখলাম। তার পরে আর তাঁদের বেহালার কারখানা দেখতে যাওয়ার শক্তি রইলো না। শুনলাম সেখানে জন পনেরো রসায়নশাস্ত্রী ইস্ট ইণ্ডিয়ার গবেষণা বিভাগে কাজ করে চলেছেন।

ডেভেলপমেণ্ট বিভাগও বেহালাতে অবস্থিত। কেমিক্যাল লাইব্রেরিও সেখানেই। এ'দের লিটল রাসেল স্ট্রীটের হেড অফিসে একটি সুবিন্যস্ত মেডিক্যাল লাইব্রেরিও আছে। কোয়ালিটি কনট্রোল বিভাগটি সরষুনার কারখানাতে। অ্যানালিটিক্যাল ও মাইক্রো-বায়োলজিক্যাল বিভাগও সেইখানেই। উপরন্তু, এ'দের সাহায্যে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ, সায়ান্স কলেজ এবং যাদবপুর, উত্তরবঙ্গ ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে, এমন কি মান্দ্রাজ মেডিক্যাল কলেজেও রিসার্চ স্কলাররা বিবিধ গবেষণায় লিপ্ত আছেন।

উৎপাদনের কথাটাই এতক্ষণ বললাম, বিপণনের বিবরণ দেওয়া হয়নি। সংক্ষেপে বলা যায় যে, কলকাতার হেড অফিস বাদ দিয়ে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়ার নিজস্ব ১৮টি শাখা আছে। সবই বিক্রয় কেন্দ্র।

সরষুনায় যেদিন আমরা কয়েকজন সাংবাদিক দল বেঁধে গিয়েছিলাম সেদিন আকাশে সাদা সাদা মেঘ ভাসছিল, আর ইস্ট ইণ্ডিয়ার বিশাল প্রাঙ্গণের সীমানায় সারি সারি নারকেল গাছ মৃদু হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছিল। ফ্যাক্টরির সামনের দিকে কেয়ারি করা ফুলের বাগান—এত রঙীন আর এত নরম যে ছুঁতে মায়া হয়।

প্রাসাদের মতো মস্ত বাড়িটার ঝকঝকে দরজার ঢুকেই ইতস্তত অনেককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। অশোক সেন ও হীরেন দত্তগুপ্তের সঙ্গে তখনো আলাপ হয়নি। যাঁরা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন তাঁদের মধ্যে কাউকেই কেষ্টবিষ্টুর মতো লাগলো না। সেই দলের মধ্য থেকেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর দু'জনকে খুঁজে নিতে হলো। অন্য প্রতিষ্ঠানে এত অসুবিধে হয় না; এক-নজরেই বুঝে নেওয়া যায় যে, কে সবার উপরে আর কে তার পরে। বুঝলাম যে এটা তারকাখচিত মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল কিংবা পোর্তুগাল, ব্রেজিল টীম নয়—এ হলো স্কটল্যাণ্ডের 'সেলটিক', যে টীমের খেলার বৈশিষ্ট্য হলো সংহতি।

১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯





ঊনচল্লিশ

জ্যোতির্বিদরা বলেন যে, গ্রহসংস্থান অনুসারে জাতকের যেমন ভালোমন্দ হয়, তেমনি দেশ-মহাদেশেরও নাকি শুভাশুভ ঘটে থাকে। তাঁদের কথা যদি ঠিক হয় তবে নিশ্চয়ই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা দেশের ওপর এমন সব শুভগ্রহের সন্নিবেশ দীর্ঘকাল ধরে প্রভাব বিস্তার করেছিল যার ফলে কয়েক দশকের মধ্যে একাধিক মহাপুরুষ, বহু মনীষী এবং একদল সংগঠক জন্মগ্রহণ করে উত্তরকালে জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এনেছিলেন।

বেঙ্গল ইমিউনিটি কম্পানি লিমিটেড-এর ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়েই সেই মনীষীদের কয়েকজনের নাম সগৌরবে উল্লেখ করা চলে।

বেঙ্গল ইমিউনিটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্যার নীলরতন সরকার, স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু, এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ বাংলা দেশ, তথা ভারতবর্ষের চিকিৎসা জগতের বিরাট পুরুষরা। তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে।

মহাযুদ্ধের আগে সিরাম, ভ্যাকসিন এবং জৈবভেষজ (বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্টস) ইত্যাদি বিলেত থেকে আমদানি হতো। যুদ্ধের সময়ে এই অত্যাবশ্যক ওষুধগুলির আমদানি বন্ধ হয়ে গিয়ে ভারতবর্ষে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। দেশে মহাপণ্ডিত চিকিৎসকের অভাব নেই, অথচ প্রয়োজনীয় ওষুধ ও প্রতিষেধকের অভাবে অসংখ্য রোগী ডিপথেরিয়া, টিটেনাস এবং ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি প্রভৃতি মারাত্মক রোগে নিতান্ত অসহায়ভাবে মারা যেতে লাগলো। পরিস্থিতির এই শোচনীয়তাকে নীলরতন কৈলাসচন্দ্ররা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ১৯১৯ সালে কলকাতার কলেজ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ের কাছে ছোট একটি ঘরে ল্যাবোরেটরি বসিয়ে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্ত্য প্রণালীতে জৈবভেষজ শিল্পের পথিকৃৎ বেঙ্গল ইমিউনিটির কাজ আরম্ভ করলেন।

প্রথমে এটিকে তিন লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধনের একটি প্রাইভেট লিমিটেড কম্পানি হিসেবে গঠন করা হয়েছিল। তার মধ্যে পেড-আপ ক্যাপিট্যাল ছিল ৮৩ হাজার টাকা।

পরবর্তীকালে অবশ্য তার রূপান্তর ঘটে নতুন পাবলিক লিমিটেড কম্পানির মূলধন করা হলো ৫০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে এখন পেড-আপ ক্যাপিটাল ২৬ লক্ষ টাকার কিছু কম। বর্তমানে কম্পানির অর্থনৈতিক কাঠামোর আরও একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে, প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শ্রমিক এবং কর্মচারীই এর শেয়ারহোল্ডার।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, উত্তরকালে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বে অনেক রদবদল হওয়া সত্ত্বেও স্যার নীলরতন মৃত্যুকাল পর্যন্ত বেঙ্গল ইমিউনিটির বোর্ড অব ডিরেক্টর্সে চেয়ারম্যান ছিলেন।

কিছুদিন পরে ল্যাবোরেটরিটি স্থানান্তরিত হয়ে ২০৫নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের দোতলায় স্থাপিত হলো। সিরাম তৈরির জন্যে কয়েকটি ঘোড়া কিনে মানিকতলার এক খোলার চালের আস্তাবলে রাখা হলো এবং ডাঃ চারুব্রত রায় নামে এক বিজ্ঞানী কয়েকজন সহকারীর সহযোগিতায় সিরাম প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ করলেন। ডাঃ অমূল্য উকীলও চারুব্রতর সহকর্মী ছিলেন।

তখনকার দিনে ভারতে সিরাম তৈরি করা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। ঘোড়া আর ল্যাবোরেটরি হলেই সিরাম তৈরি হয় না; ঘোড়ার সঞ্চরমান রক্তের মধ্যে রোগের 'অ্যান্টিবডি' বা বিষঘ্নতা আনতে হলে রোগ বিশেষের জীবাণুর যে মারক বিষ বা 'অ্যান্টিজেন'-এর দরকার তার এক ফোঁটাও তখন ভারতবর্ষে তৈরি হতো না, তৈরি করতে কেউ জানতোও না। সুতরাং বেঙ্গল ইমিউনিটির বিজ্ঞানীদের তখন প্রতিপদে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করে অতি সন্তর্পণে কাজ করতে হয়েছিল।

উচ্চমানের সিরাম তৈরি করেও তাকে জাতে তোলা ছিল আরেক দুঃসাধ্য কর্ম। স্বাধীনতার একুশ বছর পরে আজও আমরা অনেকে বিলিতী মাল পেলে দেশী ছুঁতে চাই না, আর তখন তো ছিল বিলিতীরই রাজত্ব। তায় আবার ওষুধ। এ বিষয়ে বিধান রায় মশায় বহুকাল পরে এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, বেঙ্গল ইমিউনিটির সিরাম বা ভ্যাকসিন ব্যবহার করা তো দূরের কথা, সেকালের উন্নাসিক ইংরেজ আই এম এস-রা এঁদের অ্যান্টিটিটেনাস্ সিরাম ব্যবহারের ফলাফল বিচার করে দেখতেও নারাজ ছিলেন। শেষে বিধানবাবুর বন্ধু এক আই-এম-এস ভদ্রলোক অনুগ্রহ করে সেটার ট্রায়াল দিতে রাজী হলেন। হাই মার্কস পেয়ে সেই পরীক্ষায় বেঙ্গল ইমিউনিটি পাস করলো এবং সেই থেকেই আজ এমন দাঁড়িয়েছে যে, যে-কোনো বিদেশী সিরামের তুলনায় এই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনকে আর কেউ নিকৃষ্টতর বলে মনে করেন না।

কাজ বাড়ার সঙ্গে স্থানের অকুলান হতে কিছুদিন পরে ল্যাবোরেটরিটি ডাঃ বিধান রায়ের ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বাড়ির পশ্চিমে ১৩৫নং প্রিনসেপ স্ট্রীটে উঠিয়ে আনা হলো। কয়েক বছর ব্যবসা বেশ ভালোই চলছিল; কিন্তু ১৯২৩-২৪ সালে দেখা গেল যে অলক্ষ্যে অনেক তৈরী মাল ও পাওনা টাকা নষ্ট হয়ে গিয়ে কম্পানির সঙ্গীন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভালো করে অনুসন্ধান করে কর্তারা—মানে ডিরেক্টররা দেখলেন যে, বাজারে প্রচুর দেনা জমে গিয়েছে আর কম্পানির এমনই অপযশ হয়েছে যে দশ টাকার জিনিসও ধারে পাওয়া যায় না।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ডিরেক্টর বোর্ড পরিচালক সংস্থার পরিবর্তন করা স্থির করলেন। তাঁদের অন্যতম পরামর্শদাতা (পরবর্তীকালে ক্যাপ্টেন দত্তের প্রধান সহকারী) স্বর্গত ডাঃ অমূল্যরতন চক্রবর্তী তখন বেঙ্গল ইমিউনিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ডাঃ চক্রবর্তী ক্যাপ্টেন নরেন দত্তের সতীর্থ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। পরিচালনায় রদবদলের জন্যে যখন কম্পানীর ডিরেক্টররা জল্পনা কল্পনা সলাপরামর্শ করছেন এমন সময়ে যুদ্ধ ফেরতা ক্যাপ্টেন দত্তের সঙ্গে ডাঃ চক্রবর্তীর দেখা হলো এবং তাঁরই মাধ্যমে নরেন্দ্রনাথের ওপর বেঙ্গল ইমিউনিটির সব দায়িত্ব অর্পিত হলো। কম্পানির তহবিলে তখন নগদ ৪২ টাকা জমা এবং বাজারে ৩৪,০০০ টাকা দেনা। এই ভীষণ বোঝা মাথায় নিয়ে ১৯২৫ সালে ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত বেঙ্গল ইমিউনিটির কর্ণধার হলেন।

মাথায় বোঝা বওয়া কাজটি নরেন্দ্রনাথের পক্ষে নতুন কিছু ছিল না। 'চমকপ্রদ' 'লোমহর্ষক' প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষণ আছে যা আমি সাধারণত এড়িয়ে চলি। কিন্তু ডাঃ অমূল্যরতন চক্রবর্তী লিখিত ক্যাপ্টেন দত্তের 'জীবনকথা' বইটি পড়ে প্রথমোক্ত বিশেষণটি একাধিকবার আমার মনে এসেছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তরুণ বয়সের কৃচ্ছ্রসাধনার ইতিহাসের পর এমন একটি উদাহরণ আর পেয়েছি বলে মনে পড়ছে না। যে সাধনা করে ঈশ্বরচন্দ্র সরস্বতীর বরপুত্র হয়েছিলেন এবং জাতি ও সমাজের হিতৈষণায় বাংলার শিরোমণি হয়েছিলেন, এ যেন ঠিক তারই প্রতিচ্ছবি। তফাত শুধু ইষ্টদেবতার; নরেন্দ্রনাথের পক্ষে তিনি ছিলেন বাণিজ্যলক্ষ্মী।

১৮৮৪ সালে কুমিল্লা শহরের অদূরে শ্রীকাইল নামে ছোট্ট একটি গ্রামে অতি সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কৃষ্ণকুমার চট্টগ্রামে স্কুল মাস্টারি করতেন। নরেন্দ্রনাথের ছ' বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়। কৃষ্ণকুমার তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কামিনীকুমার এবং দ্বিতীয় সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে চট্টগ্রাম ফিরে যান। তৃতীয় নরেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথকে তিনি দেশের বাড়িতে তাঁর বড় ভাই এবং ভগ্নীর তত্ত্বাবধানে রেখে যান। নরেন্দ্রনাথ নিম্ন প্রাথমিক স্কুলে পড়তেন এবং পড়াশোনায় ভালোই ছিলেন; কিন্তু কঠোর দারিদ্র্যের জন্য খাতা পেনসিল কেনার সঙ্গতিও তাঁর ছিল না। দু'-তিন বছর যেতেই নরেন দেখলেন যে এভাবে চললে তাঁর লেখাপড়ায় কোনো উন্নতিই হবে না। ইতিমধ্যে তাঁর বৃদ্ধ জ্যাঠামশায়ও দেহত্যাগ করেছেন। স্বাবলম্বী হয়ে কি করে নিজের বইখাতা কেনা আর স্কুলের মাইনেটুকু যুগিয়ে যাওয়া যায় সেই ভাবতে ভাবতে তিনি একদিন এক বর্ধিষ্ণু কৃষকের খেতে আগাছা নিড়ানোর কাজ নিলেন। এক কাঠা জমি নিড়ানোর পারিশ্রমিক চার পাঁচ পয়সা। তখন বালক নরেনের বয়স ন' বছর। তারপরে তিনি এক মুদির দোকানে চাল ডাল বিক্রির কাজে সাহায্য করার চাকরি নিলেন। মুদি মাসে মাসে তাঁকে কিছু দিতেন। এই কাজ করতে করতেই তিনি নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাস করে মাসিক দু' টাকার জলপানি গেলেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতে তিনি কিন্তু জলপানি পেলেন না। কায়িক পরিশ্রমে ইতিপূর্বে সামান্য সামান্য যা রোজগার করেছিলেন তা থেকে সঞ্চয় করার অভ্যাস তাঁর সেই ছেলেবেলা থেকেই ছিল। সেই সঞ্চিত যৎসামান্য পুঁজি নিয়ে নরেন্দ্রনাথ একাই কুমিল্লা শহরের হাইস্কুলে পড়তে গেলেন। সেই ক'টা টাকা নিয়ে সেখানে বেশী দিন পড়াশোনা চালাবার ক্ষমতা নরেনের থাকতো না যদি-না স্থানীয় এক ভদ্রলোকের বাসায় গৃহশিক্ষক হয়ে থাওয়া-থাকার ব্যবস্থাটা হতো। কিন্তু কেবল তাতেই

চলে না, জামা জুতো লাগে আর পড়তে গেলেই বইখাতারও দরকার হয়। সেই অভাব মেটাবার জন্যে তিনি শাকসবজির ফেরীওয়ালার ব্যবসা আরম্ভ করলেন।

ডাক্তার চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থটিতে লিখেছেন যে, ক্যাপ্টেন দত্ত অত্যন্ত প্রচারবিমুখ ছিলেন। নিজের ছেলেবেলার কথা, দারুণ অর্থাভাব মোচনের জন্য এইসব তথাকথিত হেয় বৃত্তি অবলম্বনের কাহিনী কিছুই বন্ধুবান্ধবদের কাছে প্রকাশ করতেন না। পরিণত বয়সে একবার এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে এই সমস্ত কথা ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়িতে বসে বলেছিলেন। চক্রবর্তী-দম্পতি ছাড়া এর শ্রোতা আর কেউ ছিলেন না। তাঁদের দু'জনের কাছ থেকে ক্যাপ্টেন দত্ত প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন যে, তাঁর জীবদ্দশায় যেন এই কাহিনী তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর না হয়। নরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'জীবনকথা' গ্রন্থটির কোনো কোনো জায়গায় ডাঃ চক্রবর্তী নরেন্দ্রনাথের জবানিতেই যা লিপিবদ্ধ করেছেন তার কিছু কিছু উদ্ধৃতি এখানে উপস্থিত করছি: "নিকটস্থ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পেঁপে কলা ঝিঙা বেগুন ইত্যাদি ক্রয় করিয়া (ঝাঁকায় করিয়া) মাথায় লইয়া সন্ধ্যার পূর্বেই সদর বাজারে আসিয়া দোকানদারদের নিকট সামান্য লাভে বিক্রয় করিতাম। প্রত্যহ দশ-বারো আনা লাভ থাকিত।...অল্প দিনের মধ্যে (গ্রামে) সকলেরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হইল ও মাসি পিসি খুড়ি সম্পর্ক পাতাইলাম।...এত ক্লেশ করিয়া পাঠের খরচ চালাইতেছি বলিয়া সহানুভূতিও বেশ প্রকাশ করিত। স্কুল থেকেই ছুটিয়া গ্রামে গিয়া ঘরে ঘরে সংগ্রহ করিয়া ফিরিতাম বলিয়া অনেকেই মুড়ি গুড় নাড়ু ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিত।...কিছু না পেটে দিলে কথাই বলিবে না বলিয়া শাসন করিত। সে বড় মধুর দিন গিয়াছে।...পরবর্তীকালে যখনই কুমিল্লা যাইতাম, আমার এই বাল্যের কুটুম্বদের খোঁজখবর লইতাম।"

এরই কিছুকাল পরে নরেন্দ্রনাথের বড় দাদা স্বর্গত কামিনীকুমার দত্ত মহাশয় বি. এল. পাস করে কুমিল্লা শহরে আসেন ওকালতি করতে। নরেন্দ্রনাথের মতো চাষী আর ফেরীওয়ালার কাজ না করলেও কামিনীবাবুও অনেক ক্লেশ সহ্য করে বি. এল. পাস করেছিলেন। যশস্বী আইনজীবী কামিনীকুমার দত্ত মশায়ের নাম অনেকেই জানেন। দেশবিভাগের পর তিনি পাকিস্তানেই থেকে যান এবং মৃত্যুর কিছু আগে তিনি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী হয়েছিলেন। পাকিস্তানের সংবিধানের খসড়া করার সময়েই তাঁর মৃত্যু হয়। কামিনীকুমারের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীঅজিতকুমার দত্ত কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট অ্যাডভোকেট এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল।

কামিনীবাবু কুমিল্লায় বসবাস আরম্ভ করাতে কিছুকালের জন্য চার ভাইয়ের একত্র বাস হলো। এফ এ (আই এ, আই এস-সি'র মতো) পাস করে নরেন দত্ত কলকাতায় এলেন মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়তে। এখানেও অভাবের তাড়না এবং আর এক দফা কৃচ্ছ্রসাধনা। এবারে নরেনবাবু খিদিরপুর ডকে নাইট ডিউটিতে ডক-কুলির কাজ শুরু করলেন। প্রথমটায় ডক-বাবু ঘোরতর আপত্তি করে বললেন যে, নরেন্দ্রনাথ বাঙালীর ছেলে হয়ে সারারাত ধরে ভারী ভারী মাল ওঠাতে নামাতে পারবেন না। কিন্তু নরেনবাবুর পীড়াপীড়িতে তিনি শেষ পর্যন্ত রাজী

হলেন। নাইট ডিউটির মজুরী ছিল দফায় এক টাকা বারো আনা। প্রচন্ড পরিশ্রমের কাজ, কিন্তু নরেন দত্ত তাতে পিছপাও হবার মানুষ ছিলেন না। তাঁকে ডাক্তারী পাস করে বড় হতে হবে—একমাত্র এইটাই ছিল তাঁর পণ। ডকের মজুরীতে তাঁর কলেজের মাইনে, হসটেলের খরচ, দামী দামী মেডিক্যাল বই কেনা সবই মোটামুটি চলে যেত। জামা কাপড় বলতে দু' প্রস্ত খদ্দরের ধুতী ও সার্ট ছিল, আর ছিল কুমিল্লা থেকে কলকাতায় আসার সময়ে কেনা জীবনের প্রথম স্লিপার জোড়া। তিনি অতিকষ্টে স্থান পেয়েছিলেন আমহার্স্ট স্ট্রীটের সেন্ট পলস্ হসটেলের নিকৃষ্টতম ঘরখানিতে। দিনের বেলায় কলেজে ক্লাস করে হসটেলে ফিরতেন। তারপর সন্ধ্যে হতে না হতেই ৫/৬ মাইল পায়ে হেঁটে খিদিরপুর ডকে পোঁছতেন। পাছে সবেধন নীলমণি স্লিপারটি ছিঁড়ে যায় সেই ভয়ে তিনি হসটেলের একটু দূরে এসেই সবার অলক্ষ্যে সেটিকে একটা গামছায় জড়িয়ে খালি পায়েই সেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতেন। ফেরার সময়েও খালি পায়েই ফিরতেন।

বিপদ হলো হসটেল কর্তৃপক্ষকে নিয়ে। তাঁরা দেখলেন যে নতুন বোর্ডারটি রাত্রে নিয়মিত-ভাবে অনুপস্থিত থাকে এবং সকালে বেশ বেলা পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমোয়। আর ঘুম থেকে উঠেই আবার বই খাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। নরেন দত্তকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে জানলেন যে তিনি রাত্রে কাজ করেন। কিন্তু কী কাজ করেন সেটা তিনি বললেন না। সদুত্তর না পেয়ে হসটেলের দুই কর্তার ঘোর সন্দেহ হলো। তাঁরা একদিন ঠিক সময় বুঝে নরেনবাবুর পেছু নিয়ে খিদিরপুর ডকে হাজির হলেন। অবাক হয়ে তাঁরা ডক-বাবুর কাছে পূর্ণ-বৃত্তান্ত শুনলেন এবং পরের দিনই হসটেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে নরেন দত্তের ডাক পড়লো। অযথা সন্দেহ করার জন্য সেণ্ট পলসের প্রিন্সিপ্যাল এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নরেনবাবুর কাছে ক্ষমা চাইলেন। গরিব ছাত্রটির সাধুতা ও অধ্যবসায়ে মুগ্ধ হয়ে প্রিন্সিপ্যাল রেভারেণ্ড ডঃ হল্যাণ্ড তাঁকে নিজের বাসায় আশ্রয় দিতেও চাইলেন, কিন্তু স্বাধীনচেতা নরেন দত্ত সে প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। ডঃ হল্যাণ্ডের মনে নরেন দত্ত মশায়ের প্রতি সেই থেকে এমন প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মালো যে তাঁরই সুপারিশে নরেনবাবু ডাক্তারী পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কর্নেল ক্যালভার্টের সাহায্যে যুদ্ধকালীন এমার্জেন্সি কমিশনে আই এম এস-এ চাকরি পেয়ে গেলেন।

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন শিবিরে অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করে ক্যাপ্টেন দত্ত দেশে ফিরলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে এবং যুদ্ধের পরে বহু উচ্ছৃংখল সৈনিকের সঙ্গে দীর্ঘ ন' বছর কাটিয়েও তাঁর মিতব্যয়িতা গুণটি তিনি বজায় রেখে যথেষ্ট সঞ্চয় নিয়েই এলেন।

আমি নিজে যা করিনি তা নিয়ে অন্যাকে বক্তৃতা দেওয়াটা আমার ধৃষ্টতা হবে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিমান, স্বাস্থ্যবান বাঙালী ছেলেদের মধ্যেও যখনই বেকার জীবনের হতাশ্বাস লক্ষ্য করি তখনই মনে হয় যে, সরকারী বে-সরকারী মহাপ্রভুদের চাকরি দেবার অনুগ্রহের ওপর ভরসা না রেখে তাঁরা কায়িক পরিশ্রম করে স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করলেই তো পারেন। কলকাতা শহরে অগণিত অবাঙালী যুবক সেই করেই জীবিকা অর্জন করছেন। তাঁদের অনেকেই

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। প্রেসটিজে বাধলে, বাঙালী তরুণেরা চলে যান না অজানা অচেনা জায়গায়, যেখানে গিয়ে বুটপালিশ, মুটেগিরি বা হকারের কাজ করতেও লজ্জা করবে না। ভ্রান্ত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের প্রেসটিজ-বোধকে শিকেয় তুলে রাখার সময় যে বহুকাল আগেই এসেছিল আচার্য রায়ের উক্তি থেকেই তা বোঝা যায়। তাঁর উপদেশ যে বাঙালী জাতি নেয়নি সে দোষ আজকের বাবা-মায়েদের—আমার মতো প্রবীণ ব্যক্তিদের, যাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের নিয়ে পরমব্যস্ত থেকে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যত পথনির্দেশে অবহেলা বা ভুল করে এসেছি। এখন পদে পদে দোষ দিচ্ছি সেই নেতা, সেই সরকারকে যাঁদের আমরা নিজেরাই নির্বাচন করে থাকি।

পাঞ্জাবেও তো রাজনৈতিক নক-আউট টুর্নামেন্ট চলেছে একটার পর একটা। অথচ সেখানকার পরিশ্রমী যুবকরা তা সত্ত্বেও খেটে খাচ্ছেন এবং পেট ভরেই তাঁরা খান বলেই শুনি। মন্ত্রিত্ব গড়াভাঙার সঙ্গে জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টাকে তাঁরা জড়িয়ে ফেলছেন না, আর অন্য অঞ্চলের লোক এসে আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে ('পাঞ্জাবী গর্জে ওঠো') জিগির তুলে বাঙালীর মতো গজরাচ্ছেন না, কান্নাকাটিও করছেন না। অবাঙালীরা যদি বাঙালীর চেয়ে যোগ্যতর হয়ে, পরিশ্রমী হয়ে বাঙালীকে অর্থনৈতিক ব্যাপারে কোণঠাসা করে ফেলে তবে দোষটা হয় বাঙালীরই, ভিন্ন অঞ্চলের লোকের নয়।

দি ফিটেস্ট উইল সারভাইভ—এটাই নিয়ম। ক্যাপ্টেন দত্ত এবং তাঁর ভাই-ভাইপোরা সেই ধাতুতে গড়া বলেই তাঁরা কৃতকার্য হতে পেরেছিলেন, বড় হতে পেরেছিলেন।

সংখ্যায় নগণ্য হলেও আজকের দিনেও আমাদের কিছু কিছু সুশিক্ষিত বাঙালী ছেলেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সর্বাঙ্গে ধুলো কাদা মেখে আত্মনির্ভর হবার চেষ্টা করছেন; কেউ কেউ সফলতা অর্জনও করেছেন।

মস্ত বাজার দেনা এবং বিয়াল্লিশ টাকা নগদ, এই প্রকাণ্ড বোঝা মাথায় নিয়ে ক্যাপ্টেন দত্তের একনিষ্ঠ সাধনা শুরু হলো। সঙ্গে রইলো আরও সমস্ত দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। সেদিনকার শাসকবর্গের মত ছিল যে, ভারতের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সিরাম ও ভ্যাকসিন উৎপাদন করা সম্ভব নয়। বেঙ্গল ইমিউনিটির উৎপাদিত ভেষজ তাঁরা ছুঁতে চাইতেন না, নাম করলে হেসে উড়িয়ে দিতেন।

অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে ক্যাপ্টেন দত্ত প্রথমে পরিচালনার সংস্কার করলেন। তারপর স্যার নীলরতন, ডাঃ রায় প্রমুখ ব্যক্তিদের সহায়তায় ধীরে ধীরে সমস্ত প্রতিকূলতা দূর করে বেঙ্গল ইমিউনিটির সিরাম ও ভ্যাকসিনের প্রচলন করালেন, ইজ্জত দেওয়ালেন। তার জন্যে তাঁকে হাড়-ভাঙা খাটুনিই খেটে চলতে হলো। দাদারা সংসারী হয়েছিলেন, ছোট ভাই দেবেন্দ্রনাথের বিয়ে ক্যাপ্টেন দত্তই উদ্যোগী হয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে চিরকুমারই থেকে গেলেন। স্বজন-বন্ধুরা পীড়াপীড়ি করলে বলতেন, "বিয়ে করলে আর কাজটাজ করা হবে না।"

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের মানসিকতা, বৈষয়িক ও প্রযুক্তিবিদ্যার মান—এই সমস্ত কথা মনে রাখা দরকার; না হলে নরেন্দ্রনাথের সফলতার পরিধির মূল্যায়ন সম্ভব হবে না।

দুর্জয় মনোবল এবং নিষ্ঠা নিয়ে তিনি একে একে সকল বাধা অতিক্রম করলেন। তার ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠে প্রতিষ্ঠানকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করলেন।

বেঙ্গল ইমিউনিটির সিরাম আজ দেশীয় বিজ্ঞানীর হাতে, দেশীয় কাঁচামাল থেকে, সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক মানে তৈরি হয়। এ'রা আমদানি করা মাল এখানে একটু প্রোসেসিং করে 'মেড ইন ইণ্ডিয়া' বলে চালান না। দেশের চারিদিকে এখন কোল্যাবোরেশনের হিড়িক চলেছে। তার ফলাফল ভবিষ্যতে দেশের পক্ষে কল্যাণের হবে কি হবে না, তার বিচার করার যোগ্যতা আমার নেই। প্রাচীন বেঙ্গল ইমিউনিটির বর্তমান কর্তৃপক্ষ কিন্তু আজও কোনো বিদেশী সহ-যোগিতার আশ্রয় নেননি। তাঁরা খাঁটি স্বদেশী ওষুধ তৈরির সংকল্পে অনড়। বেঙ্গল ইমিউনিটির বিজ্ঞানীরা যে যুগে কাজ আরম্ভ করেছিলেন তখন পেপটোন বা প্রোটিন-জীর্ণ জৈবরাসায়নিক পদার্থ এবং পেপটোন তৈরি করতে যেসব অনুঘটক (এনজাইমস্) প্রয়োজন হয় তার কিছুই এখানে পাওয়া যেত না। গবেষণার মাধ্যমে সে সমস্তই তাঁরা তাঁদের রিসার্চ ল্যাবোরেটরিতে তৈরি করতেন। সেই রেওয়াজ তাঁরা আজও বজায় রেখেছেন।

১৯১৯ সালে হ্যারিসন রোডের ছোট্ট ঘরটিতে যার জন্ম হয়েছিল তা আজ পরিণতি পেয়েছে বরানগরের ৬০ বিঘা জমিতে অবস্থিত বিরাট এক নম্বর ফ্যাক্টরি এবং অশ্ব ও অশ্বেতরের আস্তাবলে, ২০ বিঘা ও ৭ বিঘা জমির ওপর দুই ও তিন নম্বর আস্তাবলে এবং আচার্য জগদীশ বসু রোডের আড়াই বিঘা জমির ওপর অবস্থিত বেঙ্গল ইমিউনিটি রিসার্চ ইন্সটিটিউটে। এ'দের পশুশালায় ৮০০ ঘোড়া, অনেক গরু এবং হাজার হাজার খরগোস, গিনিপিগ ইত্যাদি জন্তু আছে। প্রতিষ্ঠানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেরাদুনে প্রায় ১৪৫ বিঘা জমি নিয়ে বেঙ্গল ইমিউনিটি আরেকটি কারখানা ও স্টেবল গড়ে তুলেছেন এবং বোম্বাই শহরের অনতিদূরে থানা নামক স্থানে এক সুসজ্জিত ল্যাবোরেটরিতে কম্পানির আরও একটি ইউনিটের কাজ চালু হয়েছে।

ভারতবর্ষের নানা জায়গায় এ'দের ১৩টি সেলস্ অফিস আছে। তার মধ্যে কয়েকটা অফিসের বাড়ি বেঙ্গল ইমিউনিটিরই সম্পত্তি। সমস্ত কিছু পরিচালিত হচ্ছে ১৫৩নং ধর্মতলা স্ট্রীটের 'ইমিউনিটি হাউসে' অবস্থিত হেড অফিস থেকে। প্রায় ৮০ জন বিশেষজ্ঞ নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মিসংখ্যা প্রায় ২০০০।

বেঙ্গল ইমিউনিটিতে সিরাম ছাড়াও আর যে সমস্ত ওষুধ তৈরি হয় তার সংখ্যা হবে প্রায় আড়াইশো।

প্রায় কুড়িটি ফার্মাসিউটিক্যাল ও ফাইন কেমিক্যাল সহ দীর্ঘ তালিকার মধ্যে আছে : (ক) সিরাম ও ভ্যাক্সিন (টিটেনাস, ডিপথেরিয়া এবং গ্যাস-গ্যাংরিন অ্যাণ্টিটক্সিন; ডিপথেরিয়া, টিটেনাস টক্সয়েড, ট্রিপল অ্যাণ্টিজেন এবং নানা জাতের রোগ প্রতিরোধক এবং আরোগ্যের ভ্যাক্সিন); (খ) ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিক্যাল এবং ওষুধ (অ্যাণ্টাসিড, পেপটোন, আইসো-নিয়াজিড, ক্লোরোকুইন প্রভৃতি); (গ) ফরমুলাভিত্তিক বিবিধ ওষুধ (ভিটামিন, মিনার‍্যাল, হরমোন,

এনজাইম, অ্যামাইনো-অ্যাসিড এবং প্রোটিনঘটিত ইনজেকশন, ট্যাবলেট ও লিকুইড ওষুধ); (ঘ) গ্ল্যান্ডঘটিত ওষুধ, এবং (ঙ) ডিসইনফেকট্যান্টস্।

ফার্মাসিউটিক্যাল এবং ফাইন কেমিক্যাল বিভাগটি অপেক্ষাকৃত নতুন হলেও ইতিমধ্যে সেটা ভেষজের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিস্তারলাভ করেছে। আমদানি করা ইন্টারমিডিয়েটের সাহায্য না নিয়ে মূল (বেসিক) কাঁচামাল থেকে ফাইন কেমিক্যাল প্রস্তুত করার নীতি তো পুরোমাত্রায় বজায় আছেই, উপরন্তু এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার বিষয় যে, প্রয়োজনীয় কলকব্জা ও যন্ত্রপাতিও এঁদের নিজ তত্ত্বাবধানে, নিজস্ব যন্ত্রকুশলীদের দ্বারা নিজেদের কারখানাতেই (মেশিন শপে) এঁরা যথাসম্ভব তৈরি করিয়ে নিয়েছেন। সম্পূর্ণ নূতন কম্পাউন্ড-জাত বিবিধ ফাইন কেমিক্যালের মধ্যে বহুলাংশ এঁরাই প্রথম নিজেদের নো-হাউয়ের সাহায্যে তৈরি করেছেন।

বেঙ্গল ইমিউনিটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো গবেষণার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, যে কারণে উল্লেখিত রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিপুল ব্যয়ে নির্মিত হয়ে দেশ বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছে। ভারতবর্ষের ভেষজশিল্পে এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগার স্থাপনার জন্য পথিকৃতের সম্মান বোধহয় বেঙ্গল ইমিউনিটিরই প্রাপ্য। ক্যাপ্টেন নরেন দত্ত গবেষণা বিভাগটিকে সংহত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালে একে স্থানান্তরিত করেছিলেন। এখানে নতুন ওষুধের উদ্ভাবন এবং পুরনোর মানোন্নয়ন ছাড়া কেমিস্ট্রি, বায়োকেমিস্ট্রি, নিউট্রিশন, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি প্রভৃতি বিষয়ে বহুবিধ গবেষণার কাজ চলে। গ্রন্থাগারটিও বিশেষ সমৃদ্ধ। উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবেও বেঙ্গল ইমিউনিটি রিসার্চ ইনস্টিটিউট ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। কেন্দ্রীয় সি-এস-আই-আর (বিজ্ঞান ও শিল্পসংক্রান্ত গবেষণা পরিষদ)-এর গবেষকবৃন্দ এখানে কাজ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এ যাবৎ এখানকার বাইশজন গবেষক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছেন। ওয়ার্ল্ড হেলথ্ অরগ্যানাইজেশন দ্বারাও এই প্রতিষ্ঠান স্বীকৃত।

রিসার্চের সুবিধার জন্য আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কম্পানির খরচে ২৪টি বেড সংবলিত 'বি-আই থেরাপিউটিক ওয়ার্ডে' বেঙ্গল ইমিউনিটির উদ্ভাবিত ওষুধের ব্যবহারিক প্রয়োগ কার্য সম্পন্ন হয়। নর্থ সুবার্বান হাসপাতালেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের কোনো ভেষজ প্রতিষ্ঠান এইভাবে ব্যবহারিক গবেষণার কাজ আগে করেছেন বলে আমার জানা নেই।

জনকল্যাণমূলক কাজেও এই কম্পানির একটা নিজস্বতা আছে। ক্যাপ্টেন দত্তের স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যে স্থাপিত 'ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত মেমোরিয়্যাল কমিটি'-র মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভেষজ গবেষণা এবং অন্যান্য জনহিতকর কাজে এ পর্যন্ত আট লক্ষাধিক টাকা খরচ করা হয়েছে। মেমোরিয়্যাল কমিটির অর্থভাণ্ডারের প্রায় সমস্তটাই কম্পানির দানে পুষ্ট।

১৯৪৯ সালের ৬ এপ্রিল কর্মযোগী নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হলো। 'কর্মযোগী' বিশেষণটিরও অপপ্রয়োগ বহু ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে কিন্তু ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ যথার্থ।

বেঙ্গল ইমিউনিটি ছাড়া আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের গঠন এবং গঠন কার্যে সহায়তা ক্যাপ্টেন দত্ত করে গিয়েছিলেন। সেগুলির নাম হলো র‍্যাডিক্যাল (লাইফ) ইনসিওরেন্স কোং লিঃ,

ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোং লিঃ, ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট লিমিটেড, ভারতী প্রিণ্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং কম্পানি লিমিটেড প্রভৃতি।

জ্যোতিষীরা হয়তো বলবেন যে, যে-গ্রহসংস্থানের ফলে ক্যাপ্টেন নরেন দত্তের মতো সংগঠকরা বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সন্নিবেশ আজ ভারতের পূর্ব থেকে সরে উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিমের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু পুরুষকার? সে তো শুনেছি দুষ্টগ্রহের মারাত্মক দৃষ্টিকেও নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। চেষ্টা করলে আমরা বাঙালীরা কি ক্যাপ্টেন দত্তের প্রবল পুরুষকারের ছোট ছোট অংশের অধিকারীও হতে পারি না?

১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯





সেই সবই উৎপন্ন হচ্ছে। অ্যালাম (ফিটকিরি), সালফিউরিক অ্যাসিড, কোল-টার প্রিপারেশনস্ প্রভৃতি নানা হেভি কেমিক্যাল, অগুনতি ফাইন কেমিক্যাল, ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার অন্তর্গত ওষুধ, চ্যবনপ্রাশ দ্রাক্ষারিষ্টের মতো আয়ুর্বেদীয় ওষুধ, ইনজেকশনের ভ্যাকসিন ও সিরাম, ব্যান্ডেজ গজ অর্থাৎ সার্জিক্যাল ড্রেসিংস, সাবান ও প্রসাধন সামগ্রী, সবই এখন বেঙ্গল কেমিক্যালে উৎপাদিত হচ্ছে। বেঙ্গল কেমিক্যালের তৈরী প্রিন্টিং ইংক এবং ফাউন্টেন পেনের কালিও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

আরেকটি জিনিসের নাম করা হয়নি—বেঙ্গল কেমিক্যালের সিরাপ, মানে সরবতে মিশিয়ে খাবার সিরাপ। মনে পড়ে যায় ছেলেবেলার কথা। 'সন্দেশ', 'মৌচাক' আর 'শিশুসাথী' পত্রিকার সেই সচিত্র বিজ্ঞাপন—"দারুণ গ্রীষ্মে যখন বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায় তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের সিরাপ খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ হয়"। শব্দবিন্যাসে হয়তো একটু ভুল হলো, কিন্তু ছবিটি এখনো পরিষ্কার মনে আছে; গোটা দুই কেঁদো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গায়ে গা ঘেঁষিয়ে গরু-ছাগলরা একটা জলাশয় থেকে চোঁ চোঁ করে জল খাচ্ছে। কী অদ্ভুত মিতালি—যেন যুক্তফ্রন্ট আর কংগ্রেস একসঙ্গে মন্ত্রিসভা গড়ে ড্রিংকপার্টি সেলিব্রেট করছেন!

সেটা নিশ্চয়ই 'পরশুরাম' রাজশেখর এবং 'নারদ' যতীন্দ্রকুমার সেনের ভাষা আর ছবি। 'মেঘদূত', রামায়ণ-মহাভারত আর চলন্তিকা তো কত বছর পরের কথা; কারিয়া পিরেত, গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া, বিরিঞ্চিবাবা, লটবর লন্দী, লুটবেহারী, গাঁট্টালাল, লালিমা পাল (পুং), বিপুলা মল্লিক, নেত্যকালী আর জিগীষা দেবীরই তখনো জন্ম হয়নি পরশুরামের কলমের কালিতে। সাহিত্য জগতে প্রবেশের প্রস্তুতি পর্ব তখন চলেছে রাজশেখর বসু মশায়ের।

স্যার রাসবিহারী ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র বেঙ্গল কেমিক্যালের বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ বলীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় আমাকে বললেন যে, প্রথম ত্রিশ বছর (১৯০৩—১৯৩২) এই প্রতিষ্ঠান যদি রাজশেখরের সুষ্ঠু পরিচালনাধীনে না থাকতো তাহলে এর বর্তমান খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা কখনোই হতো না। ডাঃ ঘোষের মতে, আচার্য রায় পথিকৃৎ ও প্রতিষ্ঠাতা এবং স্যার রাসবিহারী এই সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেও বেঙ্গল কেমিক্যালের 'রিয়্যাল বিল্ডার' ছিলেন স্বর্গত রাজশেখর বসু।

১৮৬১ সালে বাংলা দেশে দু'জন মহাপুরুষ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। প্রথমে জন্মগ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। তার মাস তিনেক পরে দোসরা অগস্ট তারিখে যশোর (পরে খুলনা) জেলার 'বোধখানার জমিদার' রায়চৌধুরীদের বংশে জন্মালেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মস্থানের নাম রাড়ুলি। কপোতাক্ষী নদীর তীরের এই গ্রামটির পাশেই হলো কাটিপাড়া গ্রাম—মাইকেল মধুসূদন দত্তের মামার বাড়ি। কিছু দূরেই ছিল মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের বাড়ি পলুয়া-মাগুরা গ্রাম, পরে যার নাম হয়েছিল অমৃতবাজার।

প্রফুল্লচন্দ্রের পিতৃদেব হরিশ্চন্দ্র রায় ছিলেন প্রগতিপন্থী 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি। আচার্য রায়ের আত্মজীবনী পড়লে বোঝা যায় যে পিতার উদারনৈতিক প্রভাবই পুত্রকে মহৎ চিন্তায় অনুপ্রাণিত করেছিল। তারপরে প্রফুল্লচন্দ্র যখন কলকাতার হেয়ার স্কুল, অধুনালুপ্ত অ্যালবার্ট স্কুল এবং মেট্রোপলিটান (অধুনা, বিদ্যাসাগর) কলেজে পড়তেন তখন

তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষকের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং উত্তরকালে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

মেট্রোপলিটান কলেজে এফ এ (ফার্স্ট আর্টস) পড়ার সময়ে প্রফুল্লচন্দ্র গোপনে লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হলেন। উদ্দেশ্য, পরীক্ষায় প্রথম হয়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পেয়ে বিলেতে উচ্চশিক্ষা লাভ করা। প্রফুল্লচন্দ্র পরীক্ষা দিলেন কিন্তু ফল বেরোতে এত দেরি হতে লাগলো যে তিনি স্কলারশিপ পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে হঠাৎ একদিন কলেজে ক্লাস শুরু হবার আগে এক সহপাঠী তাঁকে সেদিনকার 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকাটি দেখালেন। দু'জন ছাত্রের ছবি দিয়ে খবর বেরিয়েছে : কলকাতার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং বোম্বাইয়ের একটি পার্শী ছেলে বাহাদুরজী গিলক্রাইস্ট স্কলারশিপ পেয়েছেন।

ছ'বছর বিলেতে থেকে ১৮৮৮ সালে প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট অব সায়ান্স নিয়ে দেশে ফিরলেন। বছরখানেক পরে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিস্ট্রির অধ্যাপনায় নিযুক্ত হলেন। ১৮৯০ সালে তিনি বর্তমান সায়ান্স কলেজের পাশে ৯১নং আপার সারকুলার রোডের (অধুনা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) ভাড়াটে বাড়িতে এসে উঠলেন। এই বাড়িটিই বেঙ্গল কেমিক্যালের সূতিকাগৃহ। (বাড়িটা এখনো আছে, এবং এস আনটুল কোং প্রাইভেট লিমিটেড নামে কার্ডবোর্ড বাক্স তৈরির একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের কারখানা গত চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে এখানেই অবস্থিত)।

ইয়োরোপের দেশগুলি যে কী প্রচণ্ড পদক্ষেপে শিল্পোন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে এবং শিল্পোন্নতির মাধ্যমে ইংলণ্ড জার্মেনি ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের জাতীয় চরিত্র যে দিন দিন কত উন্নত হয়ে উঠছে, সেটা প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর অনুসন্ধিৎসা এবং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে এসেছিলেন। দেশভক্ত তরুণ অধ্যাপকের মন সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন শিল্প ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধ বাংলা দেশের মানুষ ভারতবর্ষের লোকের কাছে আদর্শ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। সেই যুবাবয়সে প্রফুল্লচন্দ্র যে ব্রত নিলেন—নিজের স্বার্থকে তুচ্ছ করে, চিরকৌমার্য অবলম্বন করে, তাঁর দীর্ঘ তিরাশী বছরের জীবনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে সেই ব্রতই পালন করে গিয়েছিলেন। আমার চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটি প্রবন্ধে এ পর্যন্ত তাঁর কর্মময় জীবনের অনেক উদাহরণ লিপিবদ্ধ করে এসেছি, সুতরাং তাঁর বিষয়ে এখানে এর বেশী বলা বাহুল্য হবে।

হরিশ্চন্দ্রের জীবনের শেষ কয়েকটি বছর দুর্ভাবনা ও অর্থকষ্টের মধ্যেই কেটেছিল; সন্তান-সন্ততির জন্য তিনি যে কিছু রেখে যাবেন তেমন অবস্থা তাঁর ছিল না। অধ্যাপনা করে প্রফুল্লচন্দ্রও যা উপার্জন করতেন তার কতটুকুই বা তিনি শিল্পোদ্যোগের মূলধন হিসেবে নিয়োগ করতে পারেন! নতুন উদ্যোগে পরের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়াও সহজ নয়। তাছাড়া সারাদিন অধ্যাপনার পর অন্য কোনো কাজ করার সময়ও বেশী থাকে না। সমস্ত কিছু বিচার করে প্রফুল্লচন্দ্র স্থির করলেন যে খুব ছোট করে তিনি ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার অন্তর্গত রোগীর নিত্য-প্রয়োজনের কয়েকটি ওষুধ তৈরি দিয়েই কাজ আরম্ভ করবেন।

অন্যের সাহায্যের প্রত্যাশী না হয়ে প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের সময়টুকু বাদ দিয়ে নিজের হাতে, নিজের যৎসামান্য পুঁজি নিয়ে কাজ শুরু করলেন। সেইজন্যে তাঁকে প্রতিদিন চোদ্দ পনেরো ঘণ্টা করেও খাটতে হতো। কিন্তু মস্ত বাধা এলো সেই দেশী ওষুধ বাজারে বিক্রির বেলায়। প্রফুল্লচন্দ্রের নিজের হাতে তৈরী ওষুধ ক'টির বাজারে অভাব ছিল, কিন্তু সেকালের চিকিৎসকরা দেশী ওষুধের নামে ভ্রূকুঞ্চিত করতেন।

তবুও তিনি সাহসে ভর করে কাজ করে চললেন। এমন করে কতদিন চালাতে পারতেন তা বলা যায় না, কিন্তু ইতিমধ্যে একদিন ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু নামে প্রফুল্লচন্দ্রের এক সতীর্থ, বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসে এই একক প্রতিষ্ঠানের কার্যসূচী দেখে আকৃষ্ট হলেন। অমূল্য-চরণ চিকিৎসক হিসেবে তখনই বেশ নাম করেছেন—উপার্জনও করছেন যথেষ্ট। প্রফুল্লচন্দ্রের উদ্যোগের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তিনি বুঝতে পেরে অবিলম্বে কিছু মূলধন নিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। চিকিৎসক এবং রসায়নশাস্ত্রীর মিলিত উদ্যোগে ভারতবর্ষে প্রথম ভারতীয় কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো।

ওষুধ তৈরিতে বেঙ্গল কেমিক্যালই ভারতের প্রথমতম উদ্যোগ—সে সময়ে বিলিতী কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পপ্রতিষ্ঠানও এদেশে কারখানা খোলেনি। তবে কেমিক্যালের ক্ষেত্রে সেকথা প্রযোজ্য নয়। বর্তমান ডি. ওয়ালডি কম্পানির প্রতিষ্ঠাতা স্কটল্যাণ্ডের ডক্টর ডেভিড ওয়ালডি ১৮৫৩ সালে ভারতে পদার্পণ করে কলকাতার শহরতলী আলমবাজারে যে কারখানার স্থাপনা করেন সেটাই হলো ভারতবর্ষের প্রথম কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী। (ডি ওয়ালডির বর্তমান ফ্যাক্টরীটি কোন্নগরে অবস্থিত)। ১৮৪৭ সালে প্রচলিত ক্লোরোফর্ম দ্রব্যটির অন্যতম আবিষ্কর্তা হিসেবেও ডেভিড ওয়ালডির নাম করা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঘটনাচক্রে সেই আবিষ্কারের সম্পূর্ণ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন এডিনবরার প্রফেসর সিম্পসন। ডক্টর ওয়ালডির তরফে তাঁর এক ভাই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ডেভিড ওয়ালডি বাধা দেওয়াতে তিনি বিরত হ'ন। আমাদের দেশেও এই জাতীয় অন্যায় দু' একটা ঘটেছে। কালাজ্বরের একটি বিখ্যাত ওষুধের আবিষ্কর্তা স্বীকৃতি এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পেয়ে তাঁর সহযোগীর বিরুদ্ধে মামলা করে শেষপর্যন্ত জিতেছিলেন বলে শোনা যায়।

প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে মূলধনে সহযোগিতা করা ছাড়াও ডাঃ অমূল্যচরণ বসুর কাজ হয়ে দাঁড়ালো চিকিৎসক মহলে বেঙ্গল কেমিক্যালের ওষুধকে চালু করা। অমূল্যচরণের বান্ধববর্গের মধ্যে প্রথমে এগিয়ে এলেন অধুনা আর জি কর (অতীতের কারমাইকেল) মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর। স্যার নীলরতন সরকার, লেঃ কর্ণেল সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রমুখ কলকাতার চিকিৎসক মহলের নেতৃবৃন্দও অমূল্যচরণের অনুরোধে বেঙ্গল কেমিক্যালের পৃষ্ঠপোষকতা করতে আরম্ভ করলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে এই দেশী কম্পানির ওষুধও চিকিৎসা জগতে সমাদৃত হলো।

অমূল্যচরণ ও রাধাগোবিন্দের কবিরাজী ওষুধের দ্রব্যগুণের বিষয়েও প্রচুর আস্থা ছিল। তাঁরা নিজেরা তাঁদের প্রেসক্রিপশনে কালমেঘ, কুর্চি, বাসকের সিরাপ, অ্যাকোয়া-টাইকোটিস বা যোয়ানের আরক ইত্যাদি ঢুকিয়ে অসমসাহসিকতার পরিচয় তো দিলেনই, উপরন্তু, পাশ্চাত্ত্য

মতে যাঁরা চিকিৎসা করতেন সেই সব ডাক্তারের মধ্যে প্রচারকার্য চালিয়ে বেঙ্গল কেমিক্যালে উৎপন্ন এই আয়ুর্বেদীয় ওষুধের প্রচলন করে দিলেন।

কাজ এত বৃদ্ধি পেতে লাগলো যে একা প্রফুল্লচন্দ্রের পক্ষে উৎপাদন সামলানো কঠিন হয়ে উঠলো। অমূল্যচরণই তখন সমস্যার সমাধান করলেন। তাঁর এক তরুণ ভগ্নিপতি সতীশ-চন্দ্র সিংহ সবেমাত্র কেমিস্ট্রিতে এম. এ. (তখনো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এস-সি. ডিগ্রির প্রবর্তন হয়নি) পাস করে আইন পড়বার উদ্‌যোগ করছিলেন। অমূল্যচরণ তাঁকে এনে প্রফুল্ল-চন্দ্রের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে বসিয়ে দিলেন। কিন্তু বছর দেড়েক যেতে না যেতেই বিনামেঘে বজ্রপাত হলো। পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়স্ক সদ্যবিবাহিত যুবক সতীশচন্দ্র একদিন ল্যাবোরেটরিতে অ্যাসিডের বিষে প্রাণত্যাগ করলেন।

মর্মান্তিক শোকের কিছুটা উপশম হওয়ার পর আবার প্রফুল্লচন্দ্র একা হাতেই কাজ আরম্ভ করলেন। কিন্তু ওদিকে উৎপাদনবৃদ্ধির জন্যে মূলধনের অভাবটাও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল। এ পর্যন্ত প্রফুল্লচন্দ্র, অমূল্যচরণ এবং সতীশচন্দ্রের নিয়োজিত মূলধনের অঙ্ক ছিল মাত্র তিন হাজার টাকা। আর প্রফুল্লচন্দ্র অমূল্যচরণের এমন উপার্জনও ছিল না যে নিজেদের কাছ থেকে আরও টাকা যোগান। তা সত্ত্বেও তাঁরা সাহস করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন যথাসাধ্য। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের ভাগ্য অপ্রসন্ন। অমূল্যচরণ এক প্লেগ রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে নিজেই সেই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। তারিখটা ছিল চৌঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮।

পর পর দুটি প্রিয়জন এবং যোগ্য সহকারীর অপঘাত মৃত্যুর শোকে প্রফুল্লচন্দ্র প্রায় ভেঙে পড়েছিলেন; কিন্তু কয়েকদিন পরেই তিনি আবার বুক বেঁধে দাঁড়ালেন। কাজ চালাতেই হবে, যে ব্রত তিনি নিয়েছেন তার উদ্‌যাপন করতেই হবে—এটা হলো তাঁর পণ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও তিনি উপলব্ধি করলেন যে, আরও অনেক মূলধন এবং অনেক সহকর্মীর সহায়তা ব্যতিরেকে একা তাঁর পক্ষে বেঙ্গল কেমিক্যালের উন্নতিসাধন অসম্ভব।

১৯০১ সালের ১২ এপ্রিল বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড কম্পানিতে পরিণত হলো। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিলেন সেকালের প্রসিদ্ধ ওষুধ ও রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রেতা বটকৃষ্ণ পাল কম্পানির স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল, ডাঃ কার্তিক-চন্দ্র বসু (উত্তরকালে বোসেজ ল্যাবোরেটারির প্রতিষ্ঠাতা), চারুচন্দ্র বসু, প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিস্ট্রির ডেমন্সট্রেটার চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ি এবং অমূল্যচরণ ও সতীশচন্দ্রের বিধবা পত্নীরা।

এই হলো বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রথম অধ্যায়ের মোটামুটি ইতিহাস। নব কলেবর ধারণ করে এই বিরাট ঐতিহ্যশালী সংস্থা যৌথ উদ্যোগের পথে পা দিল।

আজকের বেঙ্গল কেমিক্যালের পেড-আপ ক্যাপিটাল হলো প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। আর রিজার্ভ ফান্ডের অঙ্ক হলো ৭০ লক্ষ টাকারও বেশী। অবশ্য পেড-আপ ক্যাপিটালের সবটাই নগদ টাকায় বিক্রি শেয়ারের দাম নয়। এতকাল ধরে বছরে বছরে প্রভূত লাভ করে অংশীদারদের

বিনামূল্যে বোনাস শেয়ার বিলি করেই এর অঙ্ক ক্রমিক পর্যায়ে বর্ধিত হয়ে আজ ৮০ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে। নগদ টাকায় বিক্রি শেয়ারের দাম বোধ হয় এর অর্ধেকও নয়।

কিন্তু গোড়ায় এক বছর আন্দাজ কাজ করার পর বেঙ্গল কেমিক্যালের পেড-আপ ক্যাপিট্যাল হয়েছিল মাত্র ২৩,৫০০ টাকা।

এই তো গেল লিমিটেড কম্পানির অর্থনৈতিক কাঠামোর নৈরাশ্যব্যঞ্জক রূপ। যথাযথ অগ্রগতির পক্ষে সামান্য বিশ পঁচিশ হাজার টাকা শতাব্দীর গোড়ার দিকেও অপ্রতুল ছিল। কিন্তু আচার্য রায়ের ডাক শুনে একের পর এক বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দিয়ে সেই অর্থাভাবকে তুচ্ছ করলেন।

সর্বপ্রথমে এগিয়ে এলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের ডেমন্সট্রেটার চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ি মহাশয়। প্রযুক্তিবিদ্যায় নিপুণ চন্দ্রভূষণ কাজে যোগ দিয়েই হাত লাগালেন উৎপাদনে ব্যবহৃত মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি হাঁড়ি কলসি বিদায় করে আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে ল্যাবোরেটরিটিকে সজ্জিত করার কাজে। সেই সঙ্গে এগিয়ে এলেন প্রথিতযশা ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু। ডাঃ বসু পরলোকগত অমূল্যচরণের পদে অধিষ্ঠিত হলেন। তাঁর চেষ্টায় একদিকে কম্পানির অনেক শেয়ার বিক্রি হলো এবং অন্যদিকে চিকিৎসা জগতে বেঙ্গল কেমিক্যালের ওষুধের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। বিপণনের দায়িত্ব নিলেন বি কে পাল কম্পানির মালিক ভূতনাথ পাল মহাশয়। কার্তিকচন্দ্র ১৯০২ সালে কম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদাভিষিক্ত হলেন। (১৯০৭ পর্যন্ত পাঁচ বছর সেই কাজ করার পর ভূতনাথবাবু ও কার্তিক বসু কম্পানির ম্যানেজিং এজেন্টস্ হলেন। ১৯০৯-এ ম্যানেজিং এজেন্সি উঠিয়ে দেওয়া পর্যন্ত এঁরা দুজনে এক সঙ্গে কাজ করেছিলেন)।

সকলের মিলিত প্রয়াসে কম্পানির উত্তরোত্তর উন্নতি হতে লাগলো এবং কিছুদিনের মধ্যেই ৯১নং আপার সারকুলার রোডের বাড়িতে স্থানের অকুলান হলো। ইতিপূর্বেই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ মানিকতলা অঞ্চলে ১০ বিঘা জমি কিনে রেখেছিলেন। ১৯০৫ সালে মানিকতলার নব-নির্মিত কারখানায় ওষুধ ছাড়া সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরির কাজও আরম্ভ হয়ে গেল। কম্পানির হেড অফিস রয়ে গেল আপার সারকুলার রোডের সেই পুরনো বাড়িতেই।

রাজশেখর বসু মহাশয় বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দিয়েছিলেন ১৯০৩ সালে। ১৯০৪ সালে তিনি ফ্যাক্টরি ম্যানেজার পদে উন্নীত হলেন। কেমিস্ট্রিতে সদ্য এম. এ. পাস করা যুবক রাজশেখর সকল কাজের-কাজী ছিলেন। তিনি একাধারে কেমিস্ট, কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ার, হিসাবরক্ষক ও সেলস্ ম্যানেজার ছিলেন। অধিকন্তু প্রচারকার্যেও তিনি অপূর্ব দক্ষতা লাভ করেছিলেন। বিজ্ঞাপনের ডিজাইনের খসড়াও তিনিই অনেক সময়ে নিজের হাতে করে দিতেন। সেই খসড়া অবলম্বন করে চিত্ররূপ দিতেন তাঁর চিরজীবনের বন্ধু ও সঙ্গী যতীন্দ্রকুমার সেন। শান্ত, গম্ভীর এবং সংযমী বিদগ্ধ রসসাহিত্যিক রসিকতার সামান্য সুযোগ পেলেই তার সদ্ব্যবহার করতেন। একটি উদাহরণ হঠাৎ মনে পড়ে গেল। সে বিষয়ে পড়েছিলাম শ্রীকুমারেশ ঘোষের সম্পাদিত 'যষ্টিমধু' পত্রিকার 'পরশুরাম স্মৃতি' সংখ্যায়। শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয় যষ্টিমধুর জন্যে একটা কার্টুন এঁকেছিলেন। ছবিটির নাম 'তৃতীয়পক্ষ'। ছবিতে দেখানো হয়েছে—

তৃতীয়পক্ষের তরুণী স্ত্রী খাটে শুয়ে আছে, আর টাকমাথা বৃদ্ধ স্বামী বিনয়াবনত হয়ে ঘরে ঢুকছেন। খাটের কাছে একটা বাচ্চা বেড়াল। যতীনবাবু ছবিখানা কুমারেশবাবুর হাতে তুলে দেবার সময়ে বললেন, "এই বেড়ালটা আঁকার কথা আমার মাথায় আসেনি। উনি (রাজশেখরকে দেখিয়ে) বলায় আঁকি।" রাজশেখরবাবু বললেন, "বউটির তো ছেলেপিলে হবে না, কি নিয়ে তার সময় কাটে? তাই বেড়াল বাচ্চা এঁকে দিতে বললাম।"

বেঙ্গল কেমিক্যালে দীর্ঘ ত্রিশ বছর কাজ করার পর ১৯৩৩ সালে ৫৩ বছর বয়সে রাজশেখর অবসর গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি তিনি এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর পদে আসীন ছিলেন। ২৭ এপ্রিল, ১৯৬০ সালে মৃত্যুর দিনটিতেও তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিংয়ে যাবেন বলে খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরবেলায় বিশ্রাম করছিলেন। গাড়ি এলে তিনি মিটিংয়ে যাবেন। ভবানী মুখোপাধ্যায় তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলিতে বলেছেন, 'গাড়ি নয়, রথ এলো, সেই রথ তাঁকে দিব্যলোকে কখন নিয়ে গেল কেউ দেখতে পেল না'।

বেঙ্গল কেমিক্যালের সুদীর্ঘ সত্তর বছরের ইতিহাসে এই রকম কত জ্ঞানী, কত গুণী স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার পূর্ণবৃত্তান্ত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। পুরনোদের মধ্যে প্রায় সকলেই আজ ইহজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন। একজন এখনো আছেন—শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। বহুদিন বেঙ্গল কেমিক্যালের ফ্যাক্টরি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ অলংকৃত করার পর সতীশবাবু ১৯২৫ সালে পদত্যাগ করে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

রাজশেখরের পরিচালনায় বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্রমিক উন্নতি হয়ে একদিন মানিকতলার প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরিতেও স্থানাভাব ঘটলো। তখন সরকারের সাহায্যে কর্তৃপক্ষ ১৯১৯ থেকে ১৯২১ এই দু'বছরের মধ্যে কলকাতার মাইল দশেক দূরে পানিহাটিতে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপরে ১৩৫ বিঘা জমি কিনলেন। ১৯২২ সালে এই দু'নম্বর ফ্যাক্টরিতে 'কোল টার' ডিসটিলেশনের জন্য একটি নতুন কারখানা স্থাপিত হলো এবং ১৯২৪ সালে পুরোদমে ফিটকিরি উৎপাদন আরম্ভ হলো। বর্তমানে কলকাতা শহরের পানীয় জল শোধনের জন্য যতখানি ফিটকিরি লাগে তার অধিকাংশ আসে বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে। ১৯৩১ সালে এই পানিহাটিতেই এঁদের নতুন একটি সালফিউরিক অ্যাসিড প্ল্যাণ্ট স্থাপিত হলো।

তারপরে শুরু হলো বাংলা দেশের সীমানার বাইরে বেঙ্গল কেমিক্যালের ফ্যাক্টরি খোলার পালা। ১৯৩৮ সালের মধ্যে বোম্বাইয়ের কারখানা চালু হলো এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে কানপুরের 'লেসকো' কারখানাটি কিনে সেখানেও বেঙ্গল কেমিক্যালের উৎপাদন আরম্ভ হলো।

প্রথমেই বলেছি যে, আরম্ভে স্যার রাসবিহারী ঘোষের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে বেঙ্গল কেমিক্যাল আজ এই বিরাটত্বে উপনীত হতে পারতো কিনা সন্দেহ। প্রতিষ্ঠানের প্রথমাবস্থায় স্যার রাসবিহারী কয়েক বছরের ব্যবধানে দু'বার এক লক্ষ করে মোট দু'লক্ষ টাকার শেয়ার কিনেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর বিশাল সম্পত্তির প্রায় সবটাই সায়ান্স কলেজ আর যাদবপুরে

এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে দান করে গিয়েছিলেন। ডাঃ বলীন ঘোষ বললেন যে তাঁর জ্যাঠামশায়ের উইলে ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পরে লক্ষ লক্ষ নগদ টাকা ছাড়াও তাঁর বাড়ি গাড়ি আসবাবপত্র, এমন কি জামা জুতো সর্বস্ব নীলাম করে যে টাকা উঠবে তার সবটাই যাদবপুর কলেজকে দিতে হবে; বংশধরদের জন্য কেবল থাকবে বেঙ্গল কেমিক্যালের শেয়ার। ১৯২১ সালে কলকাতার বিখ্যাত 'অক্শনীয়ার ফার্ম' ম্যাকেঞ্জি লায়েলের তত্ত্বাবধানে সেই নীলাম করা হয়েছিল।

পারিবারিক সম্পত্তি বলতে স্যার রাসবিহারী রেখে গিয়েছিলেন সেই মোটা অঙ্কের বেঙ্গল কেমিক্যালের শেয়ার, কিন্তু ডাঃ বলীন ঘোষ ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল কেমিক্যালের সাধারণ ডিরেক্টর ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। রাজশেখরবাবু রিটায়ার করার পর কম্পানির সর্বময় কর্তা হয়েছিলেন যথাক্রমে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রভূষণ সেন, জগদীন্দ্রনাথ লাহিড়ী মশায়, শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন এবং শ্রীনদীয়াবিহারী অধিকারী। (বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে অবসর গ্রহণ করে সত্যপ্রসন্ন এখন ক্যালকাটা কেমিক্যালের ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত আছেন)। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয়শিষ্য নদীয়াবিহারী ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনে গুরুর একান্ত সচিবের কাজ করার পর উত্তরকালে বেঙ্গল কেমিক্যালে কেমিস্ট হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। দক্ষতার জন্য ইনি ক্রমে ক্রমে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার এবং শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেনের অবসর গ্রহণের পর ম্যানেজার পদে উন্নীত হন। ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদ সৃষ্ট হলে নদীয়াবিহারীই প্রথম সেই আসন অলঙ্কৃত করেন।

১৯৪৮-এর গোড়ায় কম্পানির ডিরেক্টর ফিলজফার ও গাইড রাজশেখর বসু মহাশয়ের পরামর্শ এবং নির্বন্ধাতিশয্যে স্যার রাসবিহারীর সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ বলীন ঘোষ বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদগ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। তার আগে পর্যন্ত ডাঃ ঘোষের পেশা ছিল স্বাধীন চিকিৎসাবৃত্তি; অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ান হিসেবে তিনি শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ডাঃ ঘোষ কলকাতার এম-বি এবং গ্ল্যাসগোর এফ আর এফ পি এস।

এঁদের প্রচার বিভাগের শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসু প্রদত্ত সুমুদ্রিত পত্রিকাটি (প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত) থেকে যে তথ্য পাচ্ছি তদনুযায়ী ডাঃ ঘোষই এই কম্পানির দ্বিতীয় ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ১৯০২ সালে ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় একবার বছর পাঁচেকের জন্যে এই পদ অলঙ্কৃত করার পর দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে আর কেউই ম্যানেজিং ডিরেক্টর হননি।

ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে এখন আছেন শ্রীশোভনাক্ষ বসু (এম. এস-সি.) নামক এক তরুণ বিজ্ঞানী।

ডাক্তার ঘোষের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয়নি। তিনি এখন বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের উপ-সভাপতি। উপরন্তু তিনি 'অল-ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অরগ্যানাইজেশনের' আঞ্চলিক সভাপতি এবং 'অরগ্যানাইজেশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডিউসার্স অব ইণ্ডিয়া' নামক বিশিষ্ট সংস্থার উপ-সভাপতি।

বেঙ্গল কেমিক্যালের ডিরেক্টর বোর্ড চিরকালই তারকাখচিত। বাঙালীর সমাজ এবং শিল্প-

বাণিজ্য জগতের এইসব মুকুটমণি—ডাঃ অমূল্য বসু, ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু ও ভূতনাথ পাল মহাশয় থেকে আরম্ভ করে কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, মেজর বি কে বসু, রায় বাহাদুর চুনিলাল বসু, রায় বাহাদুর হেমচন্দ্র মিত্র, রায়সাহেব হরিধন দত্ত, সত্যানন্দ বসু প্রমুখ অতীতের ডিরেক্টরবর্গ এবং বর্তমানে যাঁরা আছেন তাঁদের সকলের নাম করতে গেলে পাতার পর পাতা ভরে যাবে। তাঁরা সকলেই বাঙালীর নমস্য।

কম্পানির চার হাজার অংশীদারের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই বাঙালী। বাকী দশ শতাংশ হলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের চিকিৎসকবৃন্দ। তাঁরা বেঙ্গল কেমিক্যালের 'মেডিক্যাল অর্ডিনারী শেয়ার'-এর স্বত্বাধিকারী।

আমার কাছে কিন্তু সকলের চেয়ে বড় হলেন প্রতিষ্ঠানের সেই প্রথম কর্মী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যিনি স্বহস্তে ওষুধ তৈরি করে এর জন্ম দিয়েছিলেন, এবং তাঁর উত্তরসাধক কর্মিবৃন্দ, যাঁদের সংখ্যা আজ এসে দাঁড়িয়েছে চার হাজারে। পরিচালকবর্গ নিশ্চয়ই আমাদের ধন্যবাদার্হ কিন্তু বেঙ্গল কেমিক্যালের শ্রমনিষ্ঠ কর্তব্যপরায়ণ কর্মিবৃন্দই বাঙালীর কাছে মণি-মাণিক্যের মতো।

৮ মার্চ, ১৯৬৯



নির্ঘণ্ট

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	ভুল	শুদ্ধ
৩	করখানা	কারখানা
৩২	হন	হয়
৩২	কাগড়ের	কাপড়ের
৩২	কথনো	তখনো
৩২	বৃদ্ধি	বৃদ্ধি
৩৭	প্রকাশিতজনাম	প্রকাশিত। নাম
৫৭	পায় ধরাবাঁধা	প্রায় ধরাবাঁধা
৬০	ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে	ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে;
৬৭	পি-৫১, সুন্দরীমোহন ইঃ	৩৩, সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ
৭৫	কোন্দ্রুলিতে	কেন্দ্রগুলিতে
৯৩	নাহি	লৌহ
৯৪	মিলগুলো	মিলগুলির
১৩১	গুন	গুনে
১৫৩	আছে	আছেন
১৭৭	১৯৫৬-র	১৯৬৫-র
১৮৬	রোগী	রোগীর
১৯৯	দাশরথি ব্যানার্জ্জির	দাশরথি ব্যানার্জির মতো
২১৮	কাছ	কাছে
২৫৬	ঘাট	ষাট
২৮০	রোয়	রায়
৩২৯ (ফুটনোট)	২৮ সেপ্টেম্বর	২৭ সেপ্টেম্বর